ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৮, জানুয়ারি, ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
Vol. 12th Issue 28th, January, 2025

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 12th Issue 28th, 20th January, 2025, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১২ তম বর্ষ ও ২৮ তম সংখ্যা
২০ জানুয়ারি, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিস্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, পি. কে. কলেজ, কাঁথি)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০ - ২৫০০ এর মধ্যে।
২. বাংলা হরফে লিখলে অভ্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।
৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল - ebongprantik@gmail.com
৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।
৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 8250595647
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

উপনিবেশ উত্তর পর্বের উপন্যাস ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’র আখ্যানতাত্ত্বিক পাঠ
উর্বী মুখোপাধ্যায় ১১
বাংলাদেশের শিশুদের মানস গঠনে রবীন্দ্র সৃজনের ভূমিকা : *মৌয়ামারী* গ্রামের উপর একটি সমীক্ষা
মিজানুর রহমান ১৮
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মচেতনা : একটি ঐতিহাসিক বীক্ষণ
রাজেশ বিশ্বাস ২৫
টানা ভগত আন্দোলন (১৯১৪-২০) : এক নবজাগরণ
সোমা গোল ৩১
ঔপনিবেশিক যুগের বাঙ্গালী বিজ্ঞান সাধক পরিচিতি
উমা দে (নন্দী) ৪০
দ্বিজেন্দ্র কাব্যে বাৎসল্য রস
শম্পা সরকার ৪৭
ব্যক্তির অভিন্নতা সম্পর্কে নৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
সানিয়া ধর ৫৪
‘নিমগাছ’ : জীবনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী আখ্যান
অরূপ পলমল ৬১
দেশজ শিক্ষাধারার নিরিখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০
ভবেশ মণ্ডল ৬৬
কালীপূজা : প্রান্তিক এবং গুপ্ত সাধনার স্তর থেকে জনপ্রিয়তা অর্জনের বৈচিত্র্যময় বিবর্তন
শিল্পা দেবনাথ
বিরাজলক্ষী ঘোষ ৭৫
কোভিড কাল : মন খারাপের কাল
অরুমিতা দে ৮২
কমল চক্রবর্তীর ছোটগল্প ‘ইঁদুর-মানুষ’ : এক বিপরীত জীবনের উপাখ্যান
আশ্চর্য মাহাত ৯০
সমরেশ বসুর ছোটগল্পে শিশু ও কিশোর প্রসঙ্গ : নির্বাচিত পাঠ
পূজা ভুঁঞে ৯৭
বোধিচর্যাবতার গ্রন্থ অবলম্বনে বোধিচিত্তের দার্শনিক বিশ্লেষণ
প্রিয়াঙ্কা দত্ত ১০৪
ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠিত স্বাস্থ্য নীতির বিবর্তন : উনিশ শতক থেকে কুড়ি শতক
প্রদ্যুৎ মন্ডল ১১১
আখ্যানের বিষণ্ণতাবোধ : প্রেক্ষিত মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের নারী
বনানী টিকাদার ১২২
জলসাঘর : সামন্ততন্ত্রের মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন
মৌসুমী চক্রবর্তী ১২৯
বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের বিকাশে পত্রিকার অবদান
আঁখি সরকার ১৩৫
আদিবাসী মহাসভা : ঝাড়খন্ড আন্দোলনের ঊষা কাল (১৯৩৮-১৯৫০)
কৃশানু ঘোষ ১৪২

উনিশ শতকে শৈলশহরে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ : প্রসঙ্গ অবসরযাপন
উত্তম মেইকাপ ১৫১
থিয়েটারে সিনিক ডিজাইনের উপাদান : দৃশ্য সৃজনে নান্দনিক
উপাদানের তত্ত্বগত ও শৈল্পিক গুরুত্ব অন্বেষণ
আরাফাতুল আলম ১৫৮
বাংলা শিশু সাহিত্যে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার : আলোচনা ও পর্যালোচনা
কৃষ্ণা মাখাল ১৬৭
বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কিত *অনুমান*-র গুরুত্ব : অসঙ্গ
গীতা রাণী জানা ১৭৩
নাট্যজগতের অনন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ’ নাট্য : মনস্তাত্ত্বিক
দ্বন্দ্বের জটিলতায় প্রকৃত পিতৃত্ব পূরণে ব্যর্থ
চাঁদ কুমার দাস ১৭৯
মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে আফসার আমেদ-এর
‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ : জীবনবৃত্তের জীবন্ত দর্পণ
চৈতালী দাস ১৯০
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভগিনী নিবেদিতা
পৌলমী চক্রবর্ত্তী ১৯৫
ভারতবর্ষের কৃষি সমাজ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা
প্রভাস মণ্ডল ২০৮
জেলে সমাজ ও মৎস শিকারের ইতিবৃত্ত
মিঠুন পাল ২১৪
মনুবর্ণিত সমাজে বর্ণবৈষম্য ও ন্যায়বিচার : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
মৌমিতা হালদার ২২৫
তন্ত্র ও পুরাণে পশুবলি প্রথা
মৌসুমী সাঁপুই ২৩২
বাংলার কবিতায় রাজনীতি : ওপার বাংলার আটের দশক
রিয়া ঢোল ২৩৯
জলবায়ু পরিবর্তন ও ইকো-রিফিউজি : একটি পর্যালোচনা
সুশান্ত মণ্ডল ২৪৬
সমাজমানসের বিশ্লেষণের নিরিখে : লোককথার ‘ভূত’
মেঘা ভট্টাচার্য ২৫৪
চৈতন্যের প্রকাশান্তর নিরপেক্ষত্বে অদ্বৈতমত সমীক্ষা
রাহুল ভৌমিক ২৬১
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ‘আনন্দমঠ’
সুমন মণ্ডল ২৬৮
নবনীতা দেবসেনের গল্পে নারী : স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে
সন্দীপ মুখার্জ্জী ২৭২
নৈতিকতার অনুসন্ধান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি
রাহুল শীট ২৮১
লুই পার পদে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও সাধনা
বিশ্বনাথ পাহাড়ী ২৮৮
ভারতীয় দর্শনে ধর্মের স্বরূপ
বিপ্লব সরকার ২৯৫

বিশ্বায়ন ও আফসার আমেদের কথাসাহিত্য
তাপস পাল ৩০৪
নাগার্জুনের কাল পরীক্ষা : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
আয়েসা খাতুন ৩১০
নীতিকথা ও লোকছড়ার এক অনন্য সৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষীরের পুতুল’
এমডি. বাবুল হোসেন ৩১৭
শৈব তীর্থ ঊনকোটি ; ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির অনন্য ধারক
মৌসুমী পাল ৩২২
বিশ্বব্যাপী রামকথার প্রসার একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা :
পীযূষ সরকার ৩২৯
‘দূর থেকে দেখা’ উপন্যাস : গ্রাম ও নগরজীবনের দ্বন্দ্বের আলোয়
রাম কোনাই ৩৩৬
গৌণ ধর্মাচরণে যৌনতা : কর্তাভজা সম্প্রদায় ও উনিশ শতকের নৈতিকতা
সেন্টু কোনাই ৩৪০
মধ্যযুগীয় ভারতে জল উত্তোলন কৌশলের ধারণা এবং জলসেচ প্রযুক্তি
হিসেবে পার্শি চাকার উদ্ভব এবং বিবর্তন
সুমন মুখার্জী ৩৪৭
তৃতীয় লিঙ্গের আত্মকথা ও বিবিধ সংকট : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ’
মাধব মণ্ডল ৩৫৪
ন্যায়-বৈশেষিক মতে স্বপ্ন
শিবশঙ্কর নাইয়া ৩৬১
অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভাষার ভূমিকা
সুব্রত মজুমদার ৩৬৬
The Idea of Interdependence and Environmentalism in Buddhism
Abinash Sengupta ৩৭২
Perspectives on Equity and Inclusion of Marginalized
Community with Reference to NEP 2020
Biswajit Khan
Lipika Das ৩৭৯
Role of Visual Identity Design in Branding Higher
Educational Institutions of West Bengal
Rahul Kumar Shaw ৩৮৮
Dr. B.R. Ambedkar's Legacy and Contribution to Education in India
Ratan Sarkar ৪০১
Steel, Concrete, and Empire : The Development of
Bridge Technology in Colonial Bengal
Santigopal Jana ৪০৯

সম্পাদকীয়

কোন বিষয়ের গুরুত্ব নির্ভর করে আপনার বিচার বিবেচনাকে কেন্দ্র করে। যেমন ভাবে দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন, অন্যরা কিছু সময়ের জন্য হলেও সেটাই দেখে। আপনার দেখানো বিষয় যদি অন্যকে মুগ্ধ করতে পারে তাহলে আপনি সফল। আপনার শানিত বুদ্ধি যদি অন্যকে বশ্যতা শিকারে বাধ্য করে, তাহলে অন্যদের থেকে শত হস্ত এগিয়ে থাকবেন। আপনার এগিয়ে থাকাতেই আপনার নামাঙ্কিত ফলক প্রতিষ্ঠিত হবে। কোন জিনিসকে কেমন ভাবে ব্যাখ্যা করে প্রতিষ্ঠা দেবেন সেটাই মূল বিবেচ্য হওয়া উচিত। উচিত অন্যদের মনের মধ্যে নতুন বীজ বপন করা। নতুনত্বের সন্ধানে একজন প্রাবন্ধিক নিজেকেও নতুন করে আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক বারের মত এবারেও ‘এবং প্রান্তিক’ সেই নতুন নতুনের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

উপনিবেশ উত্তর পর্বের উপন্যাস ‘সূর্য দীঘল বাড়ী’র আখ্যানতাত্ত্বিক পাঠ

উর্বী মুখোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : উত্তর উপনিবেশ পর্বের বাংলা উপন্যাস ধারণ করে আছে সামাজিক নানা বীক্ষাকে। সেই রকমই একটি উপন্যাস হল সূর্য দীঘল বাড়ি। এই উপন্যাসে যেমন আছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দূর্বিক্ষের অনুষঙ্গ তেমনই আখ্যানে প্রাধান্য পেয়েছে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ছবিটিও। ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক মুসলিম সমাজে এককভাবে দুই নারীর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কাহিনি উপস্থাপন করেছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দুই নারীর সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই আখ্যানের পরতে পরতে। আখ্যানের বাচনস্তরে কীভাবে তা বর্ণিত হয়েছে তার অনুসন্ধান করা হবে এই প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ : আখ্যান, উত্তর ধ্রুপদী আখ্যানতত্ত্ব, বাচন, নিরীক্ষণ।

মূল আলোচনা:
বাংলা উপন্যাসের পথচলা দু’শো বছর অতিক্রান্ত। এই সুদীর্ঘ পর্বে বাংলা উপন্যাস ধারণ করে আছে তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা পর্বকে। ইংরেজ শাসন, তার বিরোধিতা, বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই, দেশভাগ, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দাঙ্গা, মন্বন্তর, ছিটমহল সমস্যা, নরনারীর জীবনে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মতো বহু বিচিত্র বিষয় স্থান পেয়েছে সাহিত্যে। সেরকমই একটি জীবন্ত বিষয় হল ঔপনিবেশিক পর্ব। পৃথিবীর বহু দেশের মতো ভারত এই সমস্যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে, এক সময় তার থেকে উত্তরণের পর্বও এসেছে। মানুষ এসে পৌঁছেছে উপনিবেশ উত্তর পর্বে। ঔপনিবেশিক পর্ব ও উপনিবেশ উত্তর পর্বে মানুষের জীবনের নানা ছবি ধরা পড়েছে সাহিত্যিকদের রচনায়। ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশ উত্তর পর্বের উপন্যাসকে বিষয়ের ভিত্তিতে, সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, মানুষের মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন গবেষকরা।

উপনিবেশ উত্তর পর্বে সামাজ সাহিত্যকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, এসেছে নানা নতুন তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হল, আলোচনায় উঠে এল বিষয় ও ফর্মের মধ্যে কার গুরুত্ব বেশি – সেই সংক্রান্ত তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বাচন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে আখ্যানকে – তা নিয়েও তাত্ত্বিকদের মধ্যে দেখা দিল মত পার্থক্য। এই পর্বে এসে বিশ্বায়নের হাত ধরে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার দুনিয়ায় খুলে গেছে নতুন অভিমুখ। সেরকমই একটি দিক আখ্যানতত্ত্ব বা ‘ন্যারেটোলজি’। বর্তমান নিবন্ধে আমরা উপনিবেশ উত্তর পর্বে লেখা একটি উপন্যাসের সাংগঠনিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি আখ্যানতত্ত্বের আলোকে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই তাত্ত্বিক প্রস্থানটি নানাভাবে তার আলোচনার পরিসরকে প্রশস্ত করেছে। প্রাথমিক পর্বে আখ্যানতত্ত্ব যে পথে অগ্রসর হয়েছিল, উপনিবেশ উত্তর পর্বে আখ্যানতাত্ত্বিকরা আখ্যান সংক্রান্ত ভাবনাকে আরো নানা দিকের সঙ্গে যুক্ত করে দেন এবং আন্তর্বিদ্যাচর্চার একটা অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আখ্যানতত্ত্ব নিজেকে তুলে ধরে। উত্তর-

ঔপনিবেশিক পর্বে আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় প্রাধান্য পেল বাচন বা 'ডিসকোর্স'। আখ্যানকে একটি স্বাধীন মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সংগঠনবাদী ধারায় "structuralist theory argues that each narrative has two parts: a story (histoire), the content or chain of events (actions, happening), plus what may be called the existents (characters, items of setting); and a discourse (discours), that is, the expression, the means by which the content is communicated. In the simple terms, the story is the *what* in a narrative that is depicted, discourse the *how*." (Chatman, 1980 : 19) সিমুর কথিত বয়ান অনুযায়ী আখ্যান গঠনের দ্বিবিধ স্তর লক্ষ করা যায় – কাহিনিস্তর বা 'স্টোরি লেভেল' আর বাচনস্তর বা 'ডিসকোর্স লেভেল'। কাহিনিস্তরের ঘটনাক্রম সংবর্তন বা 'ট্রান্সফরমেশন'-এর মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বাচনস্তরে পরিণত হয়। বাচনস্তরে প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা। একটা বিশেষ পাঠের ক্ষেত্রে প্রেরক থাকেন একজন কিন্তু তার গ্রাহক থাকেন অসংখ্য, যাদের সম্পর্কে লেখক জ্ঞাত থাকেন না।

উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে আখ্যানতাত্ত্বিকদের মধ্যে মণিকা ফ্লুদারনিক ও ডেভিদ হারমেন, জেরল্ড প্রিন্স-এর হাত ধরেই ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল ন্যারেটলজি উত্তর-ধ্রুপদী আখ্যানতত্ত্ব বা পোস্ট-ক্লাসিক্যাল ন্যারেটলজি-তে উত্তীর্ণ হল – "I will sketch a postcolonial narratology which would basically adopt and rely on the results of (post)classical narratology but would inflect it and perhaps enritch it by wearing a set of postcolonial lenses to look at narrative" (Prince, 2005 : 373) ক্লাসিক্যাল ন্যারেটলজি ছিল পাঠকৃতি নির্ভর (text-centric) কিন্তু পোস্ট-ক্লাসিক্যাল ন্যারেটলজি হয়ে উঠল কনটেক্সট কেন্দ্রিক (context-oriented), যেখানে প্রাধান্য পেল প্রেক্ষিত বা 'ফোকালাইজেশন'-এর ধারণা। আখ্যানের প্লটের বিন্যাসে কীভাবে বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে কিংবা আখ্যানে বর্ণিত চরিত্রগুলো সমাজের কোন শ্রেণি, কোন পেশা, কোন লিঙ্গ বা কোন ধর্মীয় আবহকে তুলে ধরছে তার নতুনতর ব্যাখ্যায় নিমগ্ন হলেন আখ্যানতাত্ত্বিকরা – "In recent decades a number of proposals of a postcolonial narratology have attempted to bridge the gap between formal analysis and ideological criticism and advocated a narratological analysis of texts emerging from contexts outside of narratology's original breeding ground, definable as mainstream white Western culture." (Heinen, 2021 : 20) উত্তর-ধ্রুপদী আখ্যানতত্ত্বের চর্চায় স্থান পেল 'অন্তর্বিদ্যাবিষয়ক চর্চা'। ইতিহাস, লিঙ্গ, সংস্কৃতি, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত হল আখ্যানের ধারণা। উত্তর-ধ্রুপদী আখ্যানতত্ত্ব বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে পরল নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক আখ্যানতত্ত্ব, উত্তর-উপনিবেশিক আখ্যানতত্ত্ব, সাইবার আখ্যানতত্ত্ব প্রভৃতি। আখ্যানতত্ত্ব নব্য-ইতিহাসচর্চায়, সংস্কৃতিচর্চার ভিন্নতর পাঠ বিশ্লেষণে রত হল।

২

১৯৫৫ তে প্রকাশিত 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের গ্রাম জীবন। এক সহায়সম্বলহীন মুসলিম পরিবারের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে এই উপন্যাসে। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, অনাহার-এর প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থান করছে দুই

নারী। চার সন্তানের জন্মদাত্রী জয়গুনের দুবেলার অন্ন সংস্থান করে বেঁচে থাকার লড়াই এ উপন্যাসের মূল চালিকা শক্তি হলেও, এই উপন্যাসের অপর কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হিসেবে বাচনে ধ্বনিত হয়েছে চিরাচরিত অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এক নারীর বিদ্রোহী স্বর। কোনো পুরুষ চরিত্র এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবস্থান করছে না। কিন্তু একাধিক পুরুষ চরিত্র এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে তাড়িত করে প্লট নির্মাণে সহায়তা করেছে। বাচনে বারবার উঠে এসেছে ধর্মীয় অনুষঙ্গ, শাস্ত্রের দোহাই, সামাজিক কুপ্রথার নিষ্ঠুর নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে তৎপর হয়েছে তথাকথিত পুরুষশাসিত সমাজ। তাদের দৃষ্টিতে এক সহায়-সম্বলহীন নারীর সমাজের বস্তাপচা শাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা ঔদ্ধত্য হিসেবে ধরা পড়েছে। জয়গুনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় যে ভাবনা তা তো আসলে বহু নারীর মনের কথা। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে নারীর অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন অনেকেই। আর তাকেই যখন আখ্যানের বাচনে স্থান দিতে বদ্ধপরিকর হলেন আবু ইসহাকের মতো ঔপন্যাসিক তখন স্বাভাবিকভাবেই উত্তর-ধ্রুপদী আখ্যানতাত্ত্বিক পাঠও তার মতো করে খুঁজে নিল বিশ্লেষণের মাধ্যম।

> "না খাইয়া জানেরে কষ্ট দিলে খোদা বেজার হয়। মরলে পরে খোদা জিগাইব, তোর আত-পাও দিছিলাম কিয়ের লেইগ্যা? আত দিছিলাম খাটবার লেইগ্যা, পাও দিছিলাম বিদ্যাশে গিয়া ট্যাকা রুজি করনের লেইগ্যা।"

এই উপন্যাসের বাচনে প্রকাশ পেয়েছে চূড়ান্ত নিস্পৃহতা। কোথাও এতটুকু অতিরিক্ত আবেগ নেই। অত্যন্ত সংযত ভাবে, নির্দিষ্ট শব্দচয়নের মধ্যে ধরা পড়েছে শিল্পকৌশল। উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায় বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এসে গেছে। সকলেই খুশি। সেই খুশির হাওয়া এসে লাগে জয়গুন ও হাসুর মনেও। বাড়িতে দেশের পতাকা লাগাতে চায় তারা। কিন্তু পতাকার রং, তার অর্থ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাদের। অথচ এর জন্য লেখক তাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করেননি, করেননি উপহাস। বরং অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে এই অজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে।

> "হাসু বলে – টাউনে আইজ বেবাক বাড়ীতে নিশান ওড়তে আছে, মা। কি সোন্দর বড় বড় নিশান! তুমি একটা বানাইয়া দ্যাও, মা। ......
>
> জয়গুন ঘরে যায়। একটা গাঁট্‌রি নামায় মাচার ওপর থেকে। লাল কাপড়ের একটা টুকরো বের করে হাসুকে দেখায়।
>
> উহুঁ, রাঙ্গায় অইব না, মা। এই রকম কচুয়া অওয়ন চাই। ...
>
> ক্যাঁ? রাঙ্গায় দোষ কি? কী সোন্দর খুনী রঙ! মীরপুরের শাহ সা'বের দরগায় দেইক্যা আইলাম লাল নিশান।
>
> -টাউনের এক বাড়ীতেও রাঙ্গা নিশান দ্যাখলাম না। বেবাক এই রহম কচুয়া।
>
> -আসমানী রঙ্গে অইব?
>
> -উহুঁ, কইলাম যে এই রঙ। ... ...
>
> মায়মুন সুঁই নিয়ে আসে। সাদা কাপড়ের চাঁদ ও তারা কেটে নিশানের মাঝে জুড়ে দেয়।
>
> বেশ সুন্দর নিশান হয়েছে। ... হাসুর ছোখে-মুখে হাসি ফোটে।"

জয়গুনের কাছে সবুজ নতুনের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। নতুন করে বাঁচার আশা জাগে তার।

জেফ্রি লিচ লক্ষ করেছিলেন, উপন্যাস সাধারণত তিনটে স্তরের বাচনকে ধারণ করে থাকে, যারা একে অপরের মধ্যে বিগর্ভিত হয়ে থাকে। বাচনে প্রথমপুরুষ কথনরীতিতে সর্বজ্ঞ

কথকের সার্বিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আখ্যানের বাচনস্তরের বিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে লিচ এবং জেনেথ নানান স্তরের কথা বলেছেন। লিচের দেওয়া মডেল অনুসরণে আমরা ত্রিস্তরীয় বয়ান লক্ষ করতে পারি, যারা একে অপরের মধ্যে বিগর্ভিত হয়ে থাকে।

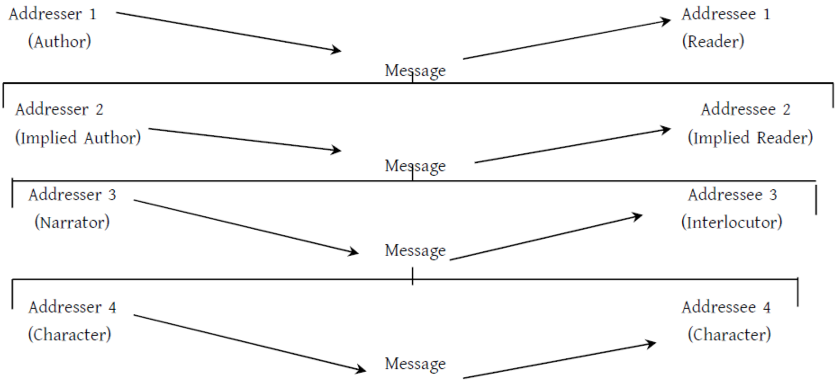

(Leech, 1995 : 269)

উপন্যাসের চরিত্ররা একজনের সঙ্গেই বার্তা আদান-প্রদান করে এমন নয়। তারা একজনের প্রেরিত বার্তা, অন্যজনের কাছেও প্রেরণ করে থাকে। যেমন, উপন্যাসে দেখতে পাই, জয়গুন হাসুকে দিয়ে হাসেঁর প্রথম ডিম মসজিদে উৎসর্গ করতে পাঠায়। ইমাম সাহেব সেটা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাদের দৃষ্টিতে জয়গুন ‘বেপর্দা মেয়েছেলে’। হাসু দূর থেকেই তার মা সম্পর্কে একাধিক নামাজীর নানা কূট মন্তব্য শোনে এবং বাড়ি ফিরে মাকে তা জানায়। এই অংশটিকে প্রেরক-গ্রাহক সম্পর্কে বিন্যস্ত করতে হলে যা পাওয়া যায় -

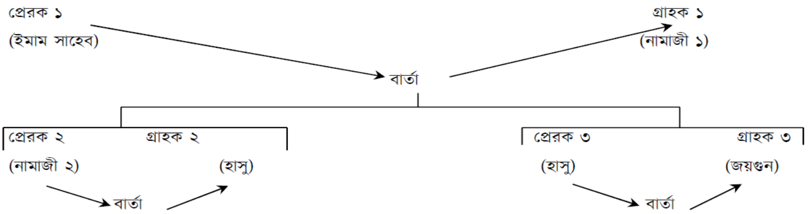

আখ্যানে দেখা যায়, শফীর মা জয়গুনকে তৃতীয়বার বিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। আসলে গ্রামের পয়সাওয়ালা মাতব্বর গদু প্রধান নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিয়ের ব্যাপারে। শফীর মা এখানে মধ্যস্থতার কাজ করেছে।

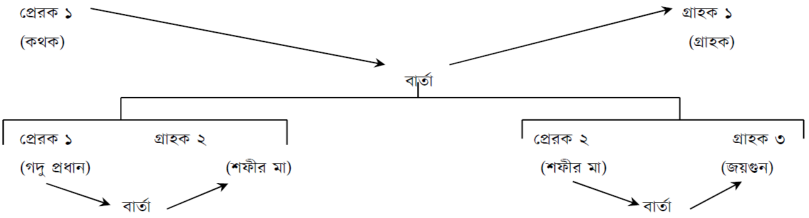

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখি দেশ স্বাধীনতা পাচ্ছে। জয়গুন, হাসু সকলেই শুনেছে দেশ স্বাধীন হলে ভাত কাপড়, চাল সস্তা হওয়ার কথা। কিন্তু দুজনের শোনার প্রেক্ষাপট আলাদা। রাতে খেতে বসে দুজনেই এই তথ্য একে অপরকে দিচ্ছে। অর্থাৎ পাঠক এখানে তিনবার একই তথ্য পাচ্ছে ভিন্নসূত্র থেকে। সেই বিশেষ তথ্যের উপর পাঠকের ভরসা গড়ে তুলতে কথক এই ধরনের কথনরীতি গড়ে তোলেন।

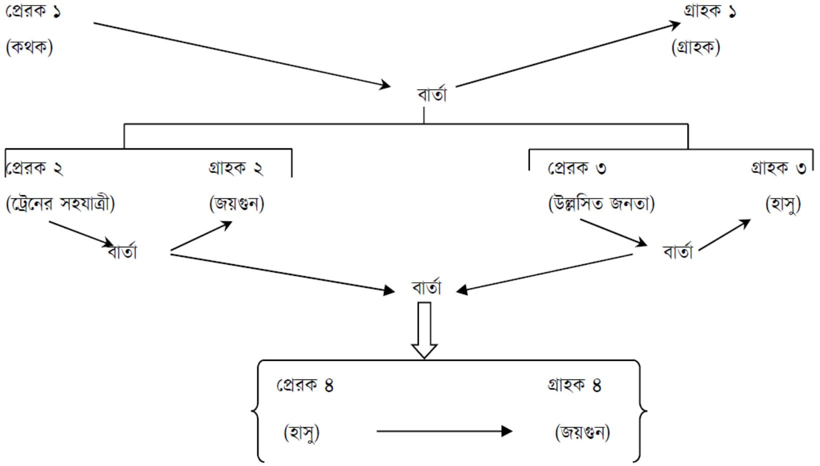

আখ্যানের বাচনে গুরুত্ব পায় 'নিরীক্ষণ', শব্দটি ইংরেজি 'point of view' ও 'Focalization'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নিরীক্ষণের আলোচনা মূলত বাচনে কোনো ঘটনা 'কে দেখছে' এবং 'কে বলছে' তার ভিত্তিতে আলোচিত হয় – "…. a confusion between the question who is the character whose point of view orients the narrative perspective? And the very different question who is the narrator? – or, more simply, the question who sees? And the question who speaks?" (Genette. 1983 : 186) আখ্যানের বাচনে বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ নিরীক্ষণ দেখা যায়। বহিঃস্থ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কোনো বস্তু বা বিষয়কে বাইরে থেকে নিরীক্ষণ করে থাকে। বাইরে থেকে নিরীক্ষণ করলে শুধু বাইরের লক্ষণই বর্ণনা করা যায়। বহিঃস্থ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক ও কথক একই ব্যক্তি হওয়ায়, উভয়েই আখ্যানের কথনবিশ্ব সম্পর্কে সব জানে। সে একই সঙ্গে কাহিনির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বর্ণনা দিতে পারে। তার জ্ঞানের পরিধি অবাধ। তবে তাকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করতে হয়। অন্তঃস্থ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কাহিনিতলের মধ্যে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে কথক একাধারে কাহিনির চরিত্রও। সময়গত বিন্যাসে তার অবস্থান শুধুই বর্তমানে। তার জ্ঞানের পরিধিও হয় সীমিত, কারণ সে নিজেই সেই আখ্যানের কথনবিশ্বের অংশ। তবে জটিল নিরীক্ষণ পরিস্থিতিও দেখা যায়। সেক্ষেত্রে নিরীক্ষকের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নিরীক্ষণ বিন্দুরও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। বহু নিরীক্ষকের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। (Genette. 1983 : 182) এই উপন্যাসেও কথক যেমন একজন বহিঃস্থ নিরীক্ষক, তেমনই আবার সময়ে সময়ে চরিত্রদের ভাবনার প্রকাশে তিনি অন্তঃস্থ নিরীক্ষণের দারস্থ হয়েছেন, প্রতিফলক হিসেবে হাসু, শফীর মা, কিংবা অন্য কোনো চরিত্রকে অবলম্বন করেছেন।

নিরীক্ষক	প্রেক্ষিত	উদাহরণ
কথক	বহিঃপ্রেক্ষিত	‘বাঘিনীর তেজ মিলিয়ে যায় শুধু একটা নামে। কি মধুর নাম! কাসু! রাগের মাঝে বাৎসল্যের হঠাৎ আবির্ভাব সে সহ্য করতে পারে না। সরে যায় সেখান থেকে।’ ‘বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে জোরে। সত্যি সত্যি আকাশটাই ভেঙে পড়ছে যেন। ...অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ কমে। কিন্তু বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয় না একেবারে। এখন যে রকম অলস বর্ষণ শুরু হয়েছে, তাতে সারা রাতেও বৃষ্টি থাম্বার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।’
হাসু	অন্তঃপ্রেক্ষিত	‘হাসু রেগে ওঠে মনে মনে। একবার ইচ্ছে হয় – দেয় ছুঁড়ে ডিম ক’টা ইমামের মুখের ওপর। কিন্তু সাহস হয় না।’ ‘ডিম চারটে সে বিক্রি করেই ফেলবে। কেন দেবে সে মসজিদে? মা জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে, জুম্মার ঘরে দেয়া হয়েছে।’
জয়গুন	অন্তঃপ্রেক্ষিত	‘পরক্ষণেই তার মনে হয় – সে খোদার কাছে পাপ করছে। বাড়ীর বার হয়ে খোলা রাস্তায় সে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। ...বেপর্দা মেয়েমানুষের কি আজাব হয়, সে জানে।’ ‘তার প্রথম স্বামীর মুখখানাও মনে পড়ে যায়। কী সুন্দর চাপদাড়ি শোভিত মুখখানা জব্বর মুন্‌শীর।’

ধ্রুপদী আখ্যানতত্ত্ব ও উত্তর ধ্রুপদী আখ্যানতত্ত্ব আসলে একে অপরের সম্পূরক। উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে এসে আখ্যানতত্ত্ব তার আলোচনার পরিধিকে প্রসারিত করেছে। প্লটের বিন্যাস বা কাহিনির উপস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে সাম্প্রতিক নানা তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ। অন্তর্বিদ্যাচর্চার হাত ধরেই গবেষকরা আখ্যানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বাচনের মধ্যে খুঁজে নিচ্ছেন নতুনতর ভাষ্য, যেখানে উঠে আসছে সমাজের নিচু তলার মানুষের কথা, বাচনে স্থান করে নিচ্ছে নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর কিংবা প্রতিরোধের ভিন্নতর পাঠ।

তথ্যসূত্র:

- ইসহাক, আবু। ২০১২। সুর্য-দীঘল বাড়ী। কলকাতা : চিরায়ত। [প্রবন্ধে ব্যবহৃত যাবতীয় উদ্ধৃতি এই মুদ্রণ থেকে গৃহীত হয়েছে]
- দত্ত, অঞ্জন ও সিংহ, উদয়নারায়ণ। ২০১০। উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
- পাল, রবীন। ২০১৯। উপন্যাস তত্ত্ব : কিছু কথা। কলকাতা : এবং মুশায়েরা।

- লাহিড়ী, রণবীর। ২০১১। আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান। কলকাতা : চর্চাপদ।
- Chatman, Seymour. 1980. Story and Discourse : Narrative Strucutre in Fiction and Film. New York : Cornel University Press.
- Genette, Gerard. 1983. Narrative Discourse : An Essay in method. New York : Cornel University Press.
- Gerald, Prince. 1982. Narratology : The Form and Functioning of Narrative. Berlin: Mouton Publisher.
- Gerald, Prince. 2005. On a Postcolonial Narratology. In A Companion to Narrative Theory. James Phelan & Peter J. Rabinowitz. Blackwell Publishing Ltd, UK.
- Heinen, Sandra. 2021. On Postcolonial Narratology and Reading Postcolonial Literature Narratologically. In Diegesis, interdisciplinary E-Journal for Narrative Research.
- Leech., Geoffrey N. 1995. Style in Fiction : A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London : Longman.

বাংলাদেশের শিশুদের মানস গঠনে রবীন্দ্র সৃজনের ভূমিকা : *মৌয়ামারী* গ্রামের উপর একটি সমীক্ষা

মিজানুর রহমান
গবেষক, ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বিশ্বকবি, বাংলা সাহিত্যের সূর্য পুরুষ। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। উপমহাদেশসহ বিশ্বের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদিতে তাঁর প্রভাব ব্যাপক। বিশেষত ভারত-বাংলাদেশে অপরিসীম। এ অপরিসীম প্রভাবের প্রারম্ভিক ধাপ শৈশবকাল। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি শিশুই রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত। কেননা, তারা শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভ থেকে শেষোব্দি রবীন্দ্র সৃজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে। আর রবীন্দ্র সৃজন কালের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যপুস্তকে তাঁর ছড়া, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ ও প্রবন্ধ পাঠ আর প্রাত্যহিক প্রাতিষ্ঠানিক শুরুর কার্যক্রমে জাতীয় সংগীত হিসেবে *আমার সোনার বাংলা* গাওয়ায় শিশুদের মনে বিশাল রেখাপাত করে। শিশুরা ছড়া, কবিতা, গল্প ও গানের বিষয়বস্তু তাদের চারপাশেই খুঁজে পায়। এগুলো দেখলেই রবীন্দ্র সৃজনের সাথে বাস্তবতা ও প্রাসঙ্গিক মিল খুঁজে পেতেই রবীন্দ্রনাথকে অতি আপন ও পরিচিত মনে হয়। প্রবন্ধটিতে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার কৈমারী ইউনিয়নস্থ মৌয়ামারী গ্রামের শিশুদের উপর রবীন্দ্র সৃজন নিয়ে একটি জরিপ চালানো হবে। তাদের উপর রবীন্দ্রনাথের রেখাপাত ও প্রভাবগুলো তুলে ধরা হবে।
সূচকশব্দ: রবীন্দ্র সৃজন, মৌয়ামারী, রেখাপাত, পাঠ্যক্রম, প্রাসঙ্গিকতা।

১.০ ভূমিকা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আমাদের উপমহাদেশের একজন বহুল পরিচিত বহুমাত্রিক লেখক। বাংলা ছোটগল্পের জনক। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ভারত-বাংলাদেশে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য (প্রভাব)। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। প্রত্যেকটি বাড়িতেই বা পড়ার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান। আবাল বৃদ্ধ বণিতা রবীন্দ্র সৃজনের সাথে পরিচিত। হোক তা ছড়া কিংবা কবিতা অথবা গল্প। এ পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে হাতে খড়ির পরপরই। প্রথম শ্রেণি থেকে শিক্ষাজীবনের অন্ত পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করে নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সাহিত্যকর্ম আমাদের এদেশের আপামর জনতার প্রাত্যহিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ। শিশুরা তাদের পাঠের শুরুতেই রবীন্দ্র শিশুতোষ লেখার সাথে পরিচিত হয়। এ লেখাগুলো যেমনি মনোহর তেমনি জীবন ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ। যা পাঠে শিশুরা রবীন্দ্র চিন্তা ও উপস্থিতিকে সমকালীন বাস্তবতার পরতে পরতে খুঁজে পায়। বিশেষ করে একান্ত আপন মনে হয় জাতীয় সংগীত আমার সোনার বাংলাকে। কেননা, এ গানে যে বাংলার রূপ, রস, নৈসর্গিক আবহ ও সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রতিনিয়তই দেখছে ও সেগুলোতে খেলা করে বেরোচ্ছে।

২.০ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ:

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। যদিও তিনি এদেশে জন্মগ্রহণ করেননি বা বেড়ে ওঠেননি ও সমাহিত হননি। তবুও তাঁর জমিদারি দেখভালের কাজে পতিসর, শাহজাদপুর ও শিলাইদহে অবস্থানের জন্য রবীন্দ্র ছোটগাল্পিক জীবনের উন্মেষ ঘটে। গীতাঞ্জলির কিছু গীতিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা তিনি এখানে অবস্থানকালীন লিখেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ উপলক্ষে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। আর যেহেতু বাংলাদেশের দুটো (বাংলা ও সিলেটি নাগরী) ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাই ছিলো রবীন্দ্র ভাব প্রকাশের মাধ্যম সেহেতু এদেশের আপামর জনতার মনের কথা প্রকাশের বহুমাত্রিক সহায়ক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

৩.০ গবেষণা পদ্ধতি, সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা:

এটি যেহেতু ক্ষেত্র সমীক্ষা সেহেতু এখানে গ্রন্থগত সহায়তা তেমন প্রয়োজন পড়েনি। মৌয়ামারী গ্রামের ১৬টি শিশুর সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করে তাদের উপর রবীন্দ্র সৃজনের প্রভাব বিশেষ করে মানস গঠনে যে ভূমিকা আছে তা অন্বেষণ করা হবে। আমার জানা মতে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এ ধরনের কোনো ক্ষেত্র সমীক্ষা চালানো হয়নি। সে হিসেবে রবীন্দ্র গবেষণা ধারায় এটি একেবারেই নব প্রয়াস। এ সমীক্ষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি নিরুপণ করা সহজ হবে। এটি একটি নমুনা মাত্র। এর মাধ্যমে গোটা দেশের অবস্থা অনুমিত হবে। প্রথম প্রয়াস হেতু এটির গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা সন্দেহাতীত এবং আগামী গবেষণার উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

৪.০ মৌয়ামারী পরিচিতি:

এক রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধের মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত জেলা নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার কৈমারী ইউনিয়নস্থ ছয় নং ওয়ার্ডের মূল গ্রামের নাম মৌয়ামারী। কৃষি প্রধান গ্রামটিতে দুটো প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতটি মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মক্তব, দশটি ছোট্ট দোকান, দুটো খেলার মাঠ আছে। গোলাকার তরমুজের ঠিক মাঝখানে ভাগ করলে একাংশের যেমন আকার ধারণ করে তেমনিই এটির আকার। রংধনুর আলোর বাঁকানো আকারের মতো উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে পেঁচিয়ে আছে ছোট্ট নদী আউলিয়াখানা যাকে ঘাঘট নদী নামে বই পুস্তকে পাওয়া যায়। নদীর দুই তটের পাশে আছে চোখ জুড়ানো সবুজ আমন ও বোরো ধানের ক্ষেত। গ্রামটির বিভক্তকারী সেই দাগটি হচ্ছে কালো পিচের একটি রাস্তা। এই রাস্তার উত্তর দিকের কিছু অংশ বাদেই পূর্ব প্রান্তে একটি বিল ছড়িয়ে আছে। সেই বিলটিই হলো মৌয়ামারীর বিল। এ বিলে মোয়া বা আঞ্চলিক ভাষায় মৌয়া নামক বিশেষ ধরনের মাছের আধিক্য ছিলো। আলের নিচে খাল করে সেগুলো বাস করতো। মাছ শিকারীগণ আলের উপর কান পেতে নিচে অবস্থান নেয়া মাছের ঝাঁকের অবস্থান ঠাহর করে শিকার করতো। কেননা, মৌয়া মাছ গিজগিজ শব্দ করে। এই মৌয়া মাছের নামেই বিলের নাম মৌয়ামারী। আর সেই বিলের নামেই গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে মৌয়ামারী। এখানে শীতকালে অতিথি পাখি তথা বালিহাঁস ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। এছাড়াও ডাহুক, বক ও অন্যান্য শিকারী পাখির আধিক্য দেখা যায় শীতকালে। জোঁক লিকলিকে পলিমাটির বিলটির ঠিক মাঝখানে নাভি পর্যন্ত ডুবে যাওয়া কাদামাটি। শিং মাছের আধিক্য ছিলো। শোল মাছের কালশিটে ঝাঁক খেলে বেড়াতো। কিন্তু এখন এটি আগের রূপে নেই। স্থানীয় ফজলার রহমান নামক ব্যক্তি ঠিক কেন্দ্রটি ক্রয় করে বিশাল আল দিয়েছেন। তবুও বিলটি তার সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হয় শরৎকালে। সাদা শাপলায়

গর্ভবতী হয়ে আকর্ষণ করে সবাইকে। মাছ শিকারীগণ বরশি, জাল ফেলে আর ছোট্ট ছোট্ট অংশ সেঁচে মাছ শিকার করেন। ইরির সময় কৃষকের গোলা বা মাচান ভরিয়ে দেয় সোনালি ধানে। বন্যার সময় আউলিয়াখানা নদীর লিংক ব্রিজের নিচ দিয়ে ঘোলাটে পানির সাথে কচুরিপানা ঢুকে যেয়ে সবুজ হয়ে ওঠে বিলগর্ভ।

প্রায় চার হাজার বাসিন্দার মধ্যে একহাজার শিক্ষার্থী। প্রাক প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দের নাড়ীপোঁতা গ্রামটি।

৫.০ প্রভাব বা রেখাপাত:

আমরা যেমনটি জেনেছি যে শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভ থেকে রবীন্দ্র সৃজন পাঠ করতে হয় শিক্ষার্থীদের তাই তারা সহজেই রবীন্দ্রনাথের সহজ অথচ জীবনঘনিষ্ঠ সব বিষয়ের সৃজন পাঠ করে ও অন্তরে ধারণ করে। ফলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন তাদের নিত্যদিনের পাঠ, খেলা, প্রকৃতি আর পারিপার্শ্বিক আবহের সঙ্গী। এমনই আবহের সঙ্গী হিসেবে খুঁজে পায় দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী তাশভিক মিজান। তার বিগত শিক্ষা বছরের বাংলা পাঠ্যবইয়ে পড়েছিলো রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি *ছুটি* নামক কবিতা। সে ছুটি খোঁজে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আর এদিনটির সাথে অন্য কোনো ছুটি যদি মিলে যায় তাহলে সে আওড়াতে থাকে *আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।* সে কী কী করবে তার ফিরিস্তি করতে বসে। এই যে, আওড়ানো লাইনগুলি আর বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্যান্য খেলাধূলায় মেতে ওঠার জন্য যে উচ্ছ্বাস তা রবীন্দ্রনাথের এ কবিতার সাথে মিলে যায়। এখানে স্পষ্ট প্রভাব ও মানস গঠনে রবীন্দ্র সৃজনের রেখাপাত প্রস্ফুটিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মধুর সৃষ্টি আমাদের ছোট নদী অন্যতম প্রভাবক। আমি নাগর নামক সেই নদী দেখতে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের জমিদারি দেখভালের জন্য নওগাঁ জেলার পতিসরে অবস্থিত কুঠি বাড়ির সামনে। আসলেই আঁকাবাঁকা নদী। এ নদীর গতি-প্রকৃতি দেখে কবি লিখেছিলেন। কিন্তু মৌয়ামারী গ্রামকে রঙধনুর মতো বেষ্টনী দিয়ে রাখা আউলিয়াখানা নদীটিও বেশ আঁকাবাঁকা। এ নদীতে মাছ ধরতে যায় গ্রামের প্রত্যেকটি শিশু। অপ্রশস্ত নদীটির দুধার ছাপিয়ে যায় বন্যার পানি। আছে পাশে বাঁশঝাড়। ঝড়ের সময় হেলেদুলে পড়ে। বৈশাখে হাঁটু জল থাকে। বালুর চর পড়ে। ধারে কাশফুল জন্মে শরতে। গরমের দাপটে শিশুরা ডুব সাঁতার কাটে। আবার যে মৌয়ামারী বিলের বর্ণনা আমি দিয়েছি তাতেও এশিশুরা দলবেঁধে ভ্যাট, শাপলা তুলতে নামে।

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মোছাম্মৎ তানিয়া খাতুনের সাক্ষাৎকার নিলে কম্পমান গলায় *আমাদের ছোট নদী* কবিতাটি আবৃত্তি করে বলে যে, 'আমি যখন মাছ ধরতে যাই, তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। আর বারবার মুখ দিয়ে বলি', *গামছায় জল ছেঁকি ছোট মাছ ধরে।*

তাঁর শিশুসুলভ কথায় তার উপর রবীন্দ্র সৃজনের রেখাপাত স্পষ্ট।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সিদরাতুল মুনতাহা নুহানকে জিজ্ঞেস করলে সে *তালগাছ* কবিতাটি সাবলীলভাবে আবৃত্তি করে। আর উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে যে, পাশের গ্রাম অর্থাৎ শৌলমারী কাজিপাড়ায় রাস্তার পাশে সে তালগাছ দেখেছে ইয়া উঁচু! সেটি সবগাছ ছাড়িয়ে। একাএকা আকাশের আলো-বাতাস গায়ে মাখছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতো সুন্দর করে তালগাছ নিয়ে কবিতা লিখেছেন যে, এই তালগাছটি দেখে যেনো তিনি এখনিই লিখছেন। যতবার সে তার গ্রামের বাড়ি যায় ততবারই গাছটি দেখলে রবীন্দ্রনাথ অতি কাছের জন হয়ে ওঠেন। সেও নাকি আনমনে

তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে, /সবকিছু ছাড়িয়ে/উঁকি মারে আকাশে, আওড়ায়।

ছোট এ শিশুর মনে কি পরিমাপের দাগ কেটেছেন যুগান্তকারী রবীন্দ্রনাথ!

দুই তীরে আমাদের রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রখ্যাত একটি কবিতা। প্রকৃতি, নদী, গ্রাম আর শিশুমনের ভাবনার মিশেলে কি নান্দনিকতা আর ব্যঞ্জনা! নদীর দু'ধারের অপরূপ সৌন্দর্য্যের যে বুনন ও উপস্থাপনা তা প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামীণ শিশুকেই ভাবাপ্লুত করে। মৌয়ামারী গ্রামটি যেহেতু নদী ও বিল বেষ্টিত সেহেতু এ কবিতাটি আরও প্রাসঙ্গিক ও গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারী। শরৎকালে আউলিয়াখানা নদী আর শীতকালে মৌয়ামারী বিলে বিদেশি বা অতিথি বালিহাঁসের ঝাঁক গ্রামের আলোবাতাসে বেড়ে ওঠা মোছাম্মৎ মাশরুফা খাতুনকে দোলায়িত করে। বিলের ধারে উঁচু আলে দাঁড়িয়ে যখন বালিহাঁসের কোয়াক কোয়াক ডাকে মুখর থাকতে দেখে বিলগর্ভ আর মাঝে মাঝে আকাশে দলবেঁধে উড়ে এখান থেকে সেখানে যাওয়া দেখে তখন নেচে ওঠে শিশুমন। আর আওড়ায়, *শীতের দিনে বিদেশি সব হাঁসের বসবাস।* আবার শরতের শুভ্র কাশফুলের একগাছি হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দু একটি ফুলের অংশ যেভাবে বাতাসে ডানা মেলে, সেভাবেই তার মনও উড়ে যেতে চায় আকাশ পানে। হতে চায় কোমল। এই যে, পেলবতা, বালিহাঁস দেখে হৃদয় বীণার তারে সুর জাগা, এত্ত এত্ত ভাললাগা সবকিছুর আবশ্যিক অনুষঙ্গ রবীন্দ্র সৃজন।

অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোছাম্মৎ সিমি খাতুনের মানসে। তার মা ঢাকায় তৈরি পোশাক শিল্পের কাজে নিয়োজিত। সে যখন তার মায়ের কাছে বেড়াতে যায় তখন চারপাশে শুধু ইট-পাথরের দালান-কোঠা দেখে। আবার রাতে মায়ের কাছে পড়তে বসলে *দুই তীরে* কবিতা পড়লে আউলিয়াখানা নদীর উত্তর পাড়ে লতিফ কাজীর সুপারির বাগান ও তার সাথে সবুজ বাঁশবাগানের বাতাসে হেলেদুলে পড়ার স্মৃতি জাগায়। এ কবিতা ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপট তাকে রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত করেছে।

কাবুলিওয়ালা গল্পের বাস্তবতা নিয়ে জিজ্ঞেস করতেই লুবাইনা বিনতে আনোয়ার নামক কিশোরীর উচ্ছ্বসিত চোখ দেখলাম। সে বলল, রবীন্দ্রনাথ রচিত *কাবুলিওয়ালা* গল্পের *মিনি* ছোট্ট মেয়ে। সে দূর দেশের কাবুলিওয়ালাকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়েছিল। ভয় পাওয়ারই কথা। কেননা, তার চারপাশের লোকজন তাকে জানিয়েছিল যে, ঐ কাবুলিওয়ালার ঝুলি খুঁজলে তার মতো আস্ত বেশ কয়েকটি মানবশিশুর সন্ধান মিলবে। কিন্তু কাবুলিওয়ালার সাথে আস্তে আস্তে তার মিল হয়। এরপর কত্ত খুনসুটি আর কথার ফুলঝুরি। লুবাইনা জানালো যে, প্রায়ই এদেশে ছেলেধরা বেরিয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়। গত দুবছর আগে তো পদ্মাসেতু নিয়ে বিশাল কাণ্ড ঘটে গেছে। বাবা, মা বা পড়শি তাকে নিষেধ করেছে এরকম অজানা দূরদেশী লোকজনের থেকে সাবধান থাকতে। যখনই এধরণের কথা ওঠে তখনই কাবুলিওয়ালা গল্পের কথা মনে পড়ে তার। রবীন্দ্রনাথকে মনের মণিকোঠায় বসিয়ে বলে, *তুমি কি গল্প লিখেছ, যা আমার জীবনে নিত্য প্রাসঙ্গিক।*

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী রিফাত বাবু সাগর জানালো যে, দূর থেকে যারা বাদাম, চানাচুর ইত্যাদি বিক্রি করতে আসে তাদের দেখলেই তার *কাবুলিওয়ালা* গল্পের কথা মনে পড়ে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তার উপর রবীন্দ্র সৃজনের রেখাপাত স্পষ্ট।

একই শ্রেণির শিক্ষার্থী আবু সায়েমের অভিব্যক্তি আবার ভিন্ন। তাকে বেশি ভাবায় তার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত *নতুন দেশ* কবিতাটি। তাদের বাড়িতে টেলিভিশন ও ডিশ অ্যানটেনা সংযুক্ত থাকায় ডিসকভারি ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল দেখে তার কৌতুহলের শেষ নেই। সে

যেতে চায় দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট-মার্টিনে। সেখানে এই কবিতার লাইনে উদ্ধৃত নারকেলের সারি সে নিজ চোখে দেখতে চায়। তার কৌতুহল জাগে সাগরের তলায় ডুবে সেখানকার জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জানতে। আবার জানতে চায় আফ্রিকান মানুষদের সম্পর্কে। সেখানে নাকি জুলু, কুলু, মাউরি উপজাতি বাস করে। আর এক্ষেত্রে তাকে প্রভাবিত করে একই কবিতার

জানি না কোন দেশে/পৌঁছে যাবে শেষে,/সেখানেতে কেমন মানুষ /থাকে কেমন বেশে। লাইনগুলি।

দেশ, সমাজ ও জাতির এক চরম বাস্তবতার কথা বলে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আখ্যা দিয়েছে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। রবীন্দ্রনাথের *দুই বিঘা* জমি শীর্ষক কবিতা তার পাঠ্য। সে বলল যে, এখন আমাদের আশেপাশে যারা শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী তারা গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের জমি জোর করে দখল করে নিচ্ছে। খাস জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের দ্বারা সাধারণ মানুষ নানাভাবে নিপীড়িত। তারা ক্ষমতাসীন দলীয় ব্যক্তিবর্গ। এসব রাঘববোয়ালদের সাথে দুই বিঘা জমির জমিদারের তুলনা করেছে। আর নিরীহ ব্যক্তির সাথে এখনকার নিপীড়িত জনগণের কথা উল্লেখ করেছে। সে জানালো যে, রবীন্দ্রনাথ সত্যিই মেধাবী কবি। তাঁর কবিতা আমাদের চারপাশে বাস্তবে দেখি। যখন আমাদের বাজারে বা আশেপাশে এরকম জমি দখল করা দেখি তখন আমার মুখে চলে আসে,

আমি শুনে হাসি আঁখি জলে ভাসি এই ছিলো মোর ঘটে
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে।

মানস গঠন ও রেখাপাত অন্বেষার ধারাবাহিকতায় দশম শ্রেণি পড়ুয়া মোহাম্মদ হাসানুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে, তার পাঠ্য গদ্য *সুভা* পড়ে বেশ আলোড়িত ও নিজেকে পরিবর্তন করেছে। সুভার অপর দুবোন *সুহাসিনী* ও *সুকেশিনী* স্বাভাবিক হলেও বাক প্রতিবন্ধী সুভা সমাজের প্রায় সকলের কাছেই বোঝা। সে খেলার সাথি পায় না। প্রতাপ ও অন্যান্য কিছু গৃহপালিত পশু তার বন্ধু এবং প্রকৃতি তাকে সঙ্গ দেয়। সে নানাবিধ যাতনা ও মনঃকষ্টে ভোগে। লেখক তাঁর এ গল্পে একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে সমাজের কাছে বোঝা নয় মূল স্রোতের একজন করে নেয়ার আহবান জানিয়েছেন। তাকে ভালোবাসা ও একটু সঙ্গ দিলেই তার দ্বারাও সমাজের উপকার হবে তা কিন্তু ভুলেই গেছি আমরা। এই যে, মানসিক পরিবর্তনের আহবান এ গল্পে এসেছে তা তাকে প্রভাবিত করেছে। আশেপাশের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সে সদয় হয়। তাদের মনঃকষ্ট উপলব্ধি করে।

একই শ্রেণির শিক্ষার্থী নূহ ইবনে আনোয়ারকে তার উপরে রবীন্দ্র প্রভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয় যে, রবীন্দ্রনাথকে অমর সৃষ্টি *জুতা আবিষ্কার* নামক দীর্ঘ কাহিনি কবিতাটি তাকে বেশ ভাবায়। কেননা, দেশ ও জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখন চরম বিশৃঙ্খলায়। চাটুকারে ভরে গেছে। কোনো সমস্যা সমাধানের কার্যকরী কোনো উপায় কেউই বের করতে পারছে না। সবাই 'বেশ! বেশ!' রব তোলে। এসব কাণ্ড দেখলে সে এই দীর্ঘ কবিতার খানিক আওড়ায় আর বলে রবীন্দ্রনাথ কি করে বুঝলেন এরকম চাটুকারিতা আমাদের সময়েও হবে!

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষার্থী সামিউল মাউনকে রবীন্দ্র সৃজন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে জানায় যে, সেও *সুভা* গল্পের দ্বারা প্রভাবিত। পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সাথে বাংলাদেশের প্রকৃতির কথা উল্লেখ করে তার প্রাসঙ্গিকতা সবখানেই খুঁজে পায় বলে জানায়।

দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মুস্তাকিম বিল্লাহ *ছুটি* নামক ছোটগল্পের প্রসঙ্গ টেনে জানালো যে, তার পিঠাপিঠি ছোটভাই মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রায় দেড়মাস তার মামার বাড়িতে থেকে আসলো। তারা দুই ভাই ঠিক ছুটি গল্পের দুই ভায়ের মতো ঝগড়া-মারামারি করত। সে দীর্ঘ দেড়মাস তার ছোট ভায়ের অনুপস্থিতি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আর ছোট ভাইও শহুরে জীবনে বন্দী থেকে মা, ভাই, প্রকৃতিকে অনুভব করে চোখের জল ফেলেছে। এ গল্পটি তাকে বেশ প্রভাবিত করেছে। মা, ভাই, প্রতিবেশী আর প্রকৃতি যে তার আপন ও অকৃত্রিম তা রবীন্দ্রনাথ পড়েই সে বুঝেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ তার মানস পুরুষ।

মোহাম্মদ লিমন মিঞা নামক দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রবীন্দ্র সংগীতের অন্যতম অনুরক্ত। অঘ্রাণ মাসে আমন ধানের খেত যেনো সোনালি দিগন্ত মনে হয় তার কাছে। আর ফাগুনে আমের নতুন কুঁড়ির ম ম ঘ্রাণ তাকে মাতোয়ারা করে তুলে। তাই সে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত *আমার সোনার বাংলার* লাইনগুলি মুখে মুখে আওড়ায়। এ গীত আর প্রকৃতিই বেড়ে ওঠার জমিন ও মাধ্যম। তাই রবীন্দ্রনাথ তার মনে গভীর রেখাপাত করেছেন।

সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর জানায় যে, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে গরমকালে বটের ছায়ায় মানুষ জিড়িয়ে নেয়। প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়গুলো বিশেষ করে তার গ্রামীণ আবহের সার্বিক বিষয়গুলো জাতীয় সংগীতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সে আরও জানায় যে, তার পাঠ্য *অপরিচিতা* গল্পটির চরিত্রও তার আশেপাশে অনেকেই আছে। *আমাদের ছোট নদী, দুই তীরে, ছুটি, তালগাছ*সহ অন্যান্য কবিতাগুলি তাকে বেশ প্রভাবিত করেছে এবং মানসে দাগ কেটেছে।

৬.০ উপসংহার:

রবীন্দ্র সৃজন সত্যই যুগান্তকারী। যার প্রমাণ উপরোক্ত মন্তব্যগুলি। মৌয়ামারী গ্রামের ১৬টি শিশুর কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে যে, তাদের শিক্ষায়তনের প্রারম্ভিক কার্য সূচির মাধ্যমে গাওয়া জাতীয় সংগীত, নানা শ্রেণিতে পাঠ্য ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি তাদেরকে গভীরভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছে। এ রেখাপাত তাদের মানস গঠনে নিজ নিজ ধর্মীয় প্রভাবের পরেই স্থান লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তি, গ্রামীণ, পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের সাথী।

তথ্যসূত্র:

১. মো. মুস্তাকিম বিল্লাহ, পিতা: মো. ইব্রাহিম আলী, বয়স: ১৮ বছর, দ্বাদশ শ্রেণি, কৈমারী স্কুল এন্ড কলেজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪ মে, ২০২২ খ্রি.

২. মোহাম্মদ লিমন মিঞা, পিতা: মো. মাহমুদুল হাসান, বয়স: ১৮, দ্বাদশ শ্রেণি, গ্রাম: কচুয়া, ইউনিয়ন: নোহালী, গঙ্গাচড়া, রংপুর, কৈমারী স্কুল এন্ড কলেজ। পড়াশোনার জন্য নানা বাড়ি মৌয়ামারীতে অবস্থান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫ মে, ২০২২ খ্রি.

৩. সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর, পিতা: মাওলানা আনওয়ার হোসাইন, বয়স: ১৮ বছর, দ্বাদশ শ্রেণি, রংপুর কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৬ মে ২০২২ খ্রি.

৪. নূহ ইবনে আনোয়ার, পিতা: মাওলানা আনওয়ার হোসাইন, বয়স: ১৫ বছর, দাখিল দশম শ্রেণি, শৌলমারী আনছারহাট ইসলামিয়া দ্বিমুখী দাখিল মাদরাসা।। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৬ মে ২০২২ খ্রি.

৫. মোহাম্মদ হাসানুর রহমান, পিতা: মশিয়ার রহমান, বয়স: ১৫ বছর, দাখিল দশম শ্রেণি, কৈমারী দাখিল মাদরাসা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৩ মে, ২০২২ খ্রি.

৬. মো. হাবিবুর রহমান, পিতা: হাবলু মিয়া, বয়স: ১৪ বছর, অষ্টম শ্রেণি, কৈমারী দাখিল মাদরাসা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০১ মে ২০২২ খ্রি.

৭. মো. আবু সায়েম, পিতা: মো. নজরুল ইসলাম, বয়স: ১৩ বছর, সপ্তম শ্রেণি, কৈমারী দাখিল মাদরাসা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০১ মে ২০২২ খ্রি.

৮. লুবাইনা বিনতে আনোয়ার, পিতা: মাওলানা আনওয়ার হোসাইন, বয়স: ১৩ বছর, সপ্তম শ্রেণি, কৈমারী স্কুল এন্ড কলেজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৬ মে ২০২২ খ্রি.

৯. রিফাত বাবু সাগর, পিতা: মো. আহাদ আলী, বয়স: ১৩ বছর, সপ্তম শ্রেণি, কৈমারী স্কুল এন্ড কলেজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ৩০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি.

১০. মোসাম্মৎ সিমি খাতুন, পিতা: মো. সেরাজুল ইসলাম, বয়স: ১০, পঞ্চম শ্রেণি, মৌয়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৩ মে ২০২২ খ্রি.

১১. মোছাম্মৎ মাশরুফা খাতুন, পিতা: মশিয়ার রহমান, বয়স: ০৯ বছর, চতুর্থ শ্রেণি, মৌয়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০২ মে, ২০২২ খ্রি.

১২. সিদরাতুল মুনতাহা নুহান, পিতা: মো. আব্দুল হাকিম, বয়স: ০৯ বছর, চতুর্থ শ্রেণি, কৈমারী কিন্ডার গার্ডেন স্কুল, গ্রাম: ডাউয়াবাড়ি, শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী। সে মৌয়ামারী গ্রামে তার ফুফুর কাছে থেকে পড়াশোনা করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯ মে, ২০২২ খ্রি.

১৩. মোসাম্মৎ তানিয়া খাতুন, পিতা: মো. তপিজুল ইসলাম, বয়স: ০৮ বছর, তৃতীয় শ্রেণি, মৌয়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১২ মে, ২০২২ খ্রি.

১৪. সামিউল মাউন, পিতা: মো. সাইদুল ইসলাম সানু, বয়স: ১৫ বছর, মাধ্যমিক সমাপ্ত, কৈমারী স্কুল এন্ড কলেজ। গ্রাম: চেংমারি, পোস্ট: বড়ঘাট, কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী। পড়াশোনা করার জন্য মৌয়ামারী নানার বাড়িতে অবস্থান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫ মে, ২০২২ খ্রি.

১৫. তাশভিক মিজান, পিতা: মীম মিজান, বয়স: ০৭ বছর, দ্বিতীয় শ্রেণি, বায়তুল হিকমাহ মডেল একাডেমি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৫ মে, ২০২২ খ্রি.

১৬. দেলোয়ার হোসেন, পিতা: মো. ইব্রাহিম আলী, বয়স: ১৪ বছর, অষ্টম শ্রেণি, কৈমারী দাখিল মাদরাসা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০৪ মে, ২০২২ খ্রি.।

উদ্ধৃত ছড়া, কবিতা ও গল্পের অংশ এবং নামগুলি বাংলাদেশের জাতীয় পাঠ্যক্রম থেকে গৃহীত।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মচেতনা : একটি ঐতিহাসিক বীক্ষণ

রাজেশ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ (অটোনোমাস), নরেন্দ্রপুর

সংক্ষিপ্তসার: পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে মাঝে মাঝেই শান্তির বাতাবরণ নষ্ট হয়। কখনো আর্থিক, রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য, কখনো বা মতাদর্শ গত বিভাজনের জন্য অশান্তি শুরু হয়। আবার কখনো কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ গোলমালের জন্যও সেই দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বামীজীর মতামত বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক। যদিও বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। কিন্তু এই সমস্ত সংগঠনের ব্যর্থতার ইতিহাসও পরিলক্ষিত হয়। স্বামীজীর চিন্তাভাবনার মৌলিক বিষয় হলো মানুষ গড়া। তাই তার চিন্তাধারা ব্যর্থ হওয়ার নয়। তাঁর চিন্তাভাবনা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বিভেদ দূর করার কথাই ঘোষণা করে। আর এখানেই তাঁর ভাবনার মৌলিকতা। তাইতো বলা হয়ে থাকে, আমাদের বিবেকানন্দ আসলে বিশ্ব বিবেকানন্দ। স্বামীজীর মনে করতেন মানুষের উচিত জগতের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত থাকা। জগৎ স্বামীজিকে চিনেছিলেন তাঁর চিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে। আর এই বক্তৃতায় হয়তো তাঁকে যেমন আত্মবিশ্বাসী করেছিল, তেমনি, তাঁর চিন্তাধারাও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর বিশ্ব ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের কর্মদক্ষতা ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ভাবনার মিলন। বিশ্বশান্তি কি এবং তা বর্তমানে কেন প্রয়োজন? স্বামীজীর ধর্মভাবনা কি? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কিভাবে ঘটতে পারে আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি আলোকপাত করেছে।
মূল শব্দ: প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, বিশ্ব শান্তি, কর্ম, ধর্ম আধ্যাত্মিকতা।

মূল আলোচনা:

বিশ্বের চিন্তা চেতনার ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। দেশ, কাল,পৃথিবীর সম্পর্কে তার মতামত সব সময় গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত মানুষই সুষ্ঠ সমাজ, দেশ, পৃথিবী গঠন করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। প্রকৃত মানুষ এবং সুস্থ সুন্দর পৃথিবী গঠনের ক্ষেত্রে তার ধর্ম চেতনা বহুজন সমাদৃত। তাঁর চিন্তা চেতনায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার কর্মপন্থা ও ধর্ম ভাবনা তাই সবসময় সমান প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে মাঝে মাঝেই শান্তির বাতাবরণ নষ্ট হয়। কখনো আর্থিক, রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য, কখনো বা মতাদর্শ গত বিভাজনের জন্য অশান্তি শুরু হয়। আবার কখনো কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ গোলমালের জন্যও সেই দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বামীজীর মতামত বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক। যদিও বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে কাজ

করে চলেছে। কিন্তু এই সমস্ত সংগঠনের ব্যর্থতার ইতিহাসও পরিলক্ষিত হয়। স্বামীজীর চিন্তাভাবনার মৌলিক বিষয় হলো মানুষ গড়া। তাই তার চিন্তাধারা ব্যর্থ হওয়ার নয়। তাঁর চিন্তাভাবনা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বিভেদ দূর করার কথাই ঘোষণা করে। আর এখানেই তাঁর ভাবনার মৌলিকতা। তাইতো বলা হয়ে থাকে, আমাদের বিবেকানন্দ আসলে বিশ্ব বিবেকানন্দ। স্বামীজীর ভাবনায় মানুষের উচিত জগতের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত থাকা। জগৎ স্বামীজিকে চিনেছিলেন তাঁর চিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে। আর এই বক্তৃতায় হয়তো তাঁকে যেমন আত্মবিশ্বাসী করেছিল, তেমনি, তাঁর চিন্তাধারাও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর বিশ্ব ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের কর্মদক্ষতা ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ভাবনার মিলন।

স্বামীজি ভারতীয় ভাবপ্রচারের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। তবে কেউ কেউ মনে করেন, স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার মূল কারণ ছিল অর্থ সংগ্রহ। আবার অনেকেই মনে করেন যে, ভারতীয় সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় পাশ্চাত্যের মানুষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বামীজি পাশ্চাত্যকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্ততা পাশ্চাত্যবাসীকে যেমন মুগ্ধ করেছিল, তেমনি, তিনি পাশ্চাত্যকেও আপন করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ চিরকালই আধ্যাত্মিকতার দেশ। স্বামীজি চাইতেন আধ্যাত্মিকতার বলেই ভারতবর্ষ জগৎ জয় করবে। আসলে ভারত ভ্রমণকালেই স্বামীজি বুঝেছিলেন যে, দেশে দারিদ্রতা রয়েছে। এই দারিদ্রতা দূর করার জন্য প্রয়োজন পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলন। কারণ পাশ্চাত্য দেশগুলোর কর্মক্ষমতা এবং আর্থিক ভাবে যথেষ্ট উন্নত। তবে পশ্চিমের দেশগুলি ভারতের চেয়ে আধ্যাত্মিকতায় পিছিয়ে। ভারতবর্ষ যদি আধ্যাত্মিকতায় পিছিয়ে পড়ে তবে পৃথিবী থেকেও আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এবং পৃথিবীর নৈতিকতাও নষ্ট হতে পারে। এই কারণে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে হবে।

ভারত বর্ষ আসলে শান্তি এবং প্রেমের মাধ্যমেই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে - এই বিশ্বাস স্বামীজীর ছিল। তাঁর বক্তৃতা স্বামীজিকে বিশ্বের কাছে বরেণ্য করে তুলেছিল আর এই কারণেই স্বামীজীর কথা বিশ্ববাসী বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। তিনি ভারতীয় ধর্ম প্রচারক থেকে পৃথিবীর ধর্ম নেতা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। আসলে বিশ্বজুড়ে যে নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক দারিদ্রতা দেখা দিয়েছিল, সেই সময়, স্বামীজি তার থেকে জগতকে মুক্তি দিতে চাইছিলেন। আর এক্ষেত্রে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা স্বামীজি আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই দূর করতে চাইছিলেন বৈজ্ঞানিক উন্নতি যখন মানুষের বিভেদ বাড়িয়ে দিয়েছিল স্বামীজি সেই ভেদাভেদ দূর করে জগতকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণেই হয়তো স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতীয়রা যতটা তাদের নিজের মনে করেন, পাশ্চাত্যবাসী স্বামীজিকে ততটাই পাশ্চাত্যের মনে করে থাকেন। পাশ্চাত্যের মহৎ যে আদর্শ গুলো ছিল সেগুলোও স্বামীজি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ভারতীয়দের যেমন আধ্যাত্মিকতা আছে, তেমনি পাশ্চাত্যেরও বেশ কিছু গুণাবলী আছে এবং পৃথিবীর কাছে সেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম- এগুলো স্বামীজি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ স্বামীজীর ভাবনায় বিশ্বের সমন্বয় বার্তা সব সময় ফুটে উঠেছিল। তিনি মনে করতেন বিবাদ নয়, একমাত্র সহায়তার মাধ্যমে শান্তি এবং সমন্বয় সম্ভব। তিনি সব ধর্মের সার সত্যকে গ্রহণ করার কথা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। আর একারণেই তিনি বিশ্ববাসীর

কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাই স্বামীজীর বাণী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বাসী উভয়েই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মেলবন্ধনের পুরোধাপুরুষ।

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে এবং সেটি সেই জাতির মেরুদন্ড। রাজনীতি কোনো কোনো জাতির জীবনের মূল ভিত্তি, আবার কোনো জাতির ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক উন্নতি সাধন বা মানসিক উন্নতি বিধান আবার কারো বা অন্য কিছু।[১] কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্মই হচ্ছে ভারতীয় জীবনের মেরুদন্ড[২] বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষের কাছে পৃথিবী অনেকটাই ঋণী। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্ম হল এমন একটি বিষয় যা পশুকে মনুষ্যত্বে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। স্বামীজীর এই যে ধর্ম ভাবনা, এই ধর্ম ভাবনার মূল কথাই হচ্ছে পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হওয়ার চেষ্টা করা।[৩] পাশ্চাত্য দেশগুলি তাঁর এই চিন্তা চেতনা গ্রহণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের এই ধর্ম ভাবনা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ধর্মের মাধ্যমেই সমগ্র জাতির কল্যাণ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এই ধর্ম সবসময়ই সমান ভাবে মানব জাতিকে সাহায্য করতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।[৪] যা কিছু আধ্যাত্মিক, যা কিছু মানসিক সমস্ত কিছুর বিকাশ এই ধর্মের মাধ্যমেই সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, পরধর্ম বা পর মতের প্রতি শুধু ঘৃণা পোষণ করলেই চলবে না। পরধর্মকে এবং ওই ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করতেও হবে। সত্যই হচ্ছে সকল ধর্মের ভিত্তি।[৫] স্বামীজীর বিশ্বাস করতেন যে, কারো নিন্দা না করে সাহায্য করা উচিত এবং সকলকে আশীর্বাদ করা উচিত। আমাদের অধিকাংশ মতভেদ হচ্ছে ভাষার বিভিন্নতা মাত্র।[৬] স্বামী বিবেকানন্দের মতে পরোপকারীই হল ধর্ম, শক্তি ও সাহসিকতাই হল ধর্ম, স্বাধীনতাই হল ধর্ম, অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, ঈশ্বর ও নিজ আত্মাকে বিশ্বাস করাই ধর্ম।[৭] সুতরাং তাঁর এই যে মতামত তা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এমনকি গোটা বিশ্বেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ ধর্ম যদি ঈশ্বর লাভ হয় তবে তাঁর মতে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[৮]

তিনি মনে করতেন যে, প্রত্যেক নর নারীকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তাদের সেবা করতে হবে। এই সেবার মাঝেই নিজেকে ধন্য মনে করতে হবে। নিজেদের খুব বড় কিছু না ভেবে এই সেবামূলক কাজ চালিয়ে যেতে হবে।[৯] দরিদ্রদের মধ্যে স্বামীজি ঈশ্বর দেখেছেন এবং নিজের মুক্তির জন্যই তাদের পূজা করা উচিত বলে স্বামীজি মনে করতেন। দারিদ্রতা দূর করার জন্য কাজ করে যেতে হবে - এটাই স্বামীজীর ধর্মের আদর্শ। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ জগতের যথার্থ উপকার করতে চেয়েছিলেন ধর্মবোধের মাধ্যমে এবং সেবার মাধ্যমে। মানুষ, তাঁর মতে, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী এবং মানুষের জন্যই জগতের কল্যাণ সাধন সম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস। মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন এবং এই ঈশ্বরকে সেবা করাই মানুষের কর্তব্য বলেই তিনি মনে করতেন। এই পৃথিবীতে যখন খাদ্যের জন্য লড়াই হয়, উপনিবেশ দখলের জন্য লড়াই হয়, তখন এই লড়াই দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সবার মঙ্গলার্থে কাজ করলেই শান্তি স্থাপিত হবে। এই শান্তি সমস্ত ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে তার বিশ্বাস ছিল। ঘৃণা বা অন্যকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে ভালোবাসা এবং ক্ষমা মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে বলে স্বামীজি বিশ্বাস করতেন। কারণ সকলের মধ্যেই

ঈশ্বরের প্রকাশ তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং স্বামীজীর এই যে চিন্তা ধারা এই চিন্তা ধারা তা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে, জগতের পক্ষে, হিতকর এবং সমান প্রাসঙ্গিক।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি তিনি পাশ্চাত্যের কর্মদক্ষতাকে যথেষ্ট গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দুঃখ নিপীড়িত ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতি ঘটুক। একারণেই তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধন চেয়েছিলেন এবং সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতার যে আদর্শ, কর্মযোগের যে আদর্শ তিনি তা ভারতবাসীকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন সমস্ত বিষয়ে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটুক। আসলে এর ফলে সমগ্র বিশ্বই আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবে এবং কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে। ফলে জগতের কল্যাণ হবে স্বামীজীর একথা বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের প্রতি, যুক্তিবাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের আর্থিক দুর্বলতা এই বিজ্ঞান, এই যুক্তিবাদী দ্বারা দূর করা সম্ভব হবে। এবং এর সঙ্গে যদি ধর্মের ও আধ্যাত্মিকতার যোগাযোগ ঘটে তবে যেমন কর্মের প্রসার ঘটবে, শান্তির প্রসারও ঘটবে - স্বামীজি একথা বিশ্বাস করতেন। যদি কোনো সর্বজনীন ধর্ম থাকে, তবে তা সব ভাবেই সমষ্টির হওয়া আবশ্যক[১০] কারণ সমষ্টির উন্নতি ঘটলেই পৃথিবীর উন্নতি ঘটবে। তাঁর মতে আসলে সকলেরই কর্তব্য হওয়া উচিত গ্রহণ করা, বর্জন করা নয়। তিনি গ্রহণে বিশ্বাসী ছিলেন।[১১]

স্বামীজীর মূল দর্শনই ছিল শান্তি, মৈত্রী এবং পরবর্তীকালে তৈরি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনেরও মূল বক্তব্যে স্বামীজীর ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়।[১২] বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আবার শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন মতামত উঠে এসেছে। আর বেশ কিছু আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দেশের ভেতরে কিংবা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লীগ অব নেশনস। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের দারিদ্র দূর করা এবং জনকল্যাণমুখী কর্মসূচিও এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই লীগ অফ নেশনস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল মানব জাতিকে যুদ্ধের উন্মাদনা এবং দুঃখ দুর্দশা থেকে রক্ষা করা। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা এবং জগতের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা বজায় রাখাও এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এই প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি দূর করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও বিভিন্ন দেশের কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে উত্তেজনা এখনো দেখা যায়। আবার আঞ্চলিক পর্যায়েও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের কাজ করে চলেছে নিরন্তর। তবে অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা কিংবা বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না।

আর এই পারস্পরিক অসহযোগিতা আন্তরিকতার অভাব কিংবা বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রতুলতার জন্যই বারবার বিশ্ব শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তার ধর্ম ভাবনায় বারংবার বলে

এসেছেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ভাবনা তাই আজও সমান প্রাসঙ্গিক। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী রামকৃষ্ণ মিশন প্রচার করে চলেছে সব সময়।[১৩] স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম ও কর্ম চেতনার বিষয় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন।[১৪] আসলে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয়ে সাধনকারী।[১৫] আর এই ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন জগতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সবসময়ই ধর্মভাবনা। অসত ব্যক্তিদের সংশোধন করা উচিত বলে স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন।[১৬] অসততা দূর হলেই জগত ন্যায় পথে চলবে জগতের শান্তি ফিরে আসবে। পাশ্চাত্যের অর্থ স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ের মূল্যরূপে নিতে চেয়েছিলেন।[১৭] আর প্রাচ্য থেকে আধ্যাত্মিক চেতনা পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করতে হবে বলে স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন। আর এই পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া এবং ধর্ম ভাব বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ আসলে বিশ্ব প্রেমের কথা বলেছেন এবং স্বামীজি নিজের কাজে সেই বিশ্ব প্রেমেরই প্রসার ঘটিয়েছেন। আর তাঁর ভাবানুরাগীরা এই বিশ্বপ্রেমকে প্রচার করে গিয়েছেন। সর্বসাধারণের শিক্ষা, সর্বসাধারণের স্বাধীনতা, সর্বসাধারণের উন্নতি, সর্বসাধারণের পবিত্রতা আসলে জগতের মনুষ্য জাতির কল্যাণ করতে পারে - এ কথা স্বামীজি বিশ্বাস করতেন। কোনো ব্যক্তিকে দেশকাল সীমানায় আবদ্ধ রাখা যায় এ কথা সত্যি। কিন্তু তার চিন্তাভাবনা, চিন্তা চেতনার গ্রহণযোগ্যতা সারা বিশ্বেই থেকে যেতে পারে। বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্ব এক্ষেত্রে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তার চিন্তাধারা সারা বিশ্বই গ্রহণ করে চলেছে। সারা পৃথিবীতেই তিনি তাই সবসময় সমান প্রাসঙ্গিক।

সূত্রনির্দেশ:

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খন্ড ৫ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১) পৃঃ ৫০
২. তদেব; পৃঃ ৫০
৩. তদেব, খন্ড ৬, পৃঃ ২৬৩
৪. তদেব, খন্ড ২, পৃঃ ১৭৫
৫. তদেব, খন্ড ৭, পৃঃ ২৯
৬. তদেব, খন্ড ২, পৃঃ ১৭৪
৭. তদেব, খন্ড ১০, পৃঃ ২১২
৮. তদেব, খন্ড ৯, পৃঃ ১৫০
৯. স্বামী বিবেকানন্দঃ আমার ভারত অমর ভারত (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক, কলকাতা, ২০১৯) পৃঃ ৯৩ - ৯৪
১০. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খন্ড ২, (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১) পৃঃ ৭৯ - ৮০
১১. স্বামী চৈতন্যানন্দ (সম্পা); জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বামী বিবেকানন্দ; স্বামী গিরিশানন্দ: বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ (উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা ৩) পৃঃ ৬০-৬২
১২. তদেব, পৃঃ ৬২
১৩. স্বামী বীরেশ্বরানন্দ: রামকৃষ্ণ সংঘের ব্যাপ্তি প্রকাশ (সূত্রধর, বাগবাজার, কোলকাতা ৩,২০২০) পৃঃ ৩১

১৪. স্বামী সুপর্ণানন্দ (প্রকাশক): পরিব্রাজক স্বামীজী দেশে ও বিদেশে (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক কলকাতা ২৯ ২০21) পৃ. ৮৮-১০৮
১৫. কনিষ্ক চৌধুরী: বিবেকানন্দ মানস ঐতিহ্য ও আধুনিকতা (সেতু, কলকাতা, ২০১৩) পৃ ১৭৮
১৬. স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় খন্ড, (উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, ১৪০০) পৃষ্ঠা ৩-৪
১৭. অমলেশ ত্রিপাঠী: ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ (আনন্দ, কলকাতা ২০১৮) পৃষ্ঠা ৬৪।

টানা ভগত আন্দোলন (১৯১৪-২০) : এক নবজাগরণ

সোমা গোল
সহকারী অধ্যাপক, বি.এড. বিভাগ
কালনা কলেজ, পূর্ব বর্ধমান

সারাংশ: ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় কয়েকটি দেশীয় রাজ্য শক্তির কাছে বাধা প্রাপ্ত হয়। এরা হল উত্তরে মারাঠা সাম্রাজ্য ও শিখ সম্প্রদায় এবং দক্ষিণে হায়দার আলী ও টিপু সুলতান। ইতিহাসে এই কাহিনী আমরা পড়েই থাকি, তবে ইতিহাস রাজশক্তির ইতিহাস। অন্যদিকে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম গণ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত হল আদিবাসীদের সংগ্রাম। আদিবাসী কোন রাজশক্তির সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির লড়াই হয়নি, কারণ আদিবাসী রাজশক্তিবলে কিছু ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের অভ্যুত্থানের মধ্যে কিছুটা গণ সংগ্রামের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যি কারের গণসংগ্রাম একমাত্র এবং প্রথম আদিবাসীরাই করেছে। আদিবাসীদের সংগ্রাম খন্ড খন্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মত। নিজেদের প্রেরণায় নিজেদের ঐক্যে ও উদ্যোগে পরিচালিত সংগ্রাম। এগুলি হলো হো বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। এই আন্দোলনগুলি, ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য শুরু হয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের ৫৯ বছর পরেএইরকমই আর এক উপজাতি আন্দোলন হয়, তার নাম টানা ভগত আন্দোলন। মূলত সমাজ সংস্কারের জন্যই এই আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এই আন্দোলন কোনো কোনো সময় বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। আবার পুনরায় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়ে যায়। ওরা ওঁরা বসবাস করত ছোটনাগপুরের নির্জন মালভূমিতে। ওরাওঁ সমাজে অনেক কু-প্রথা ছিল, যেমন ভূত পুজো, আত্মায় বিশ্বাস, মদ্যপান, ডাইনিতন্ত্র ইত্যাদি। এইসব সামাজিক দোষগুলিকে দূর করবার জন্য ওরাওঁ সংস্কারকরা একের পর এক চেষ্টা করেন। এইসব সংস্কারকরা দল ভগৎ নামে খ্যাত। এই রকমই একটি আন্দোলন হলো টানা ভগৎ আন্দোলন। ১৯১৪ সালের যাত্রা ভগত নামের একওরাওঁ যুবক নতুন এক বাণী প্রচার করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওরাওঁ সমাজের সংস্কার সাধন। যাত্রা ভগতের আবেদনে হাজার হাজার ওরাওঁ সাড়া দেয়। কিন্তু গভর্মেন্ট এই আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে এবং যাত্রা ভগতকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়নি। পরবর্তীতে এই আন্দোলনের আবার পুনরুত্থান ঘটে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় আন্দোলনের সাথে মিশে যায়।

মূল শব্দ: টানা ভগত আন্দোলন, ওরাওঁ, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, যাত্রা ওরাওঁ, যাত্রা ভগত।

ভূমিকা:

ছোটনাগপুরের নির্জন মালভূমি হল ভারতের আদিম গোষ্ঠী বা আদিবাসীদের বাসস্থানের প্রধান কেন্দ্র। এখানে ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল, বীরড়হ, শবর, লোধা প্রভৃতি উপজাতিদের বসবাস দেখা যায়[i]। এই উপজাতিদের মধ্যে ওরাওঁরা শুধু সংখ্যায় নয় বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক অগ্রগতিতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে বলে মনে হয়। মালভূমিতে চাষের জন্য তারা

নিয়মিত লাঙ্গলের ব্যবহার চালু করে, এই সম্মান দাবি করে। তাদের এই ভৌগোলিক অবস্থান তাদের জীবিকা ও সামাজিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতোই মেধা ও সাহসিকতার দিক থেকে ওরাওঁরা অনেক পিছিয়েছিল। নিরক্ষরতা এবং আর্থসামাজিক অনগ্রসতার কারণে তারা কুসংস্কার এবং কিছু কিছু সেকেলে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যকিছু সংখ্যক ওরাওঁ সমাজ সংস্কারকরা নেশা, যাদুবিদ্যা, ভূত পূজা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে, তাদের জীবনকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সমাজ সংস্কারকদের বিভিন্ন দল ভগত নামে পরিচিত ছিল। প্রথম গোষ্ঠী সংস্কারক ছিলেন ভূঁইফুট ভগত। অন্য দলগুলি হলো নেমহা ভগত গোষ্ঠী, বিষ্ণু ভগত গোষ্ঠী, কবির পন্থী ভগৎ গোষ্ঠী, টানা ভগত গোষ্ঠী[ii]। ভুঁইফুট ভগত গোষ্টি মহাদেবের পূজা করে, মহাদেবের কাছে পশু বলি দেয়। তারা শুদ্ধাচারে চলে। নেমহা ভগত গোষ্ঠী খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নিয়ম পালন করে তাই তাদের নেমহা অর্থাৎ নিয়মওয়ালা এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বিষ্ণু ভগত বংশের কোন কোন ব্যক্তিবৈষ্ণব বৈরাগীর কাছে মন্ত্র নিতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রায়পুর এবং বিলাসপুর জেলা থেকে কবীর সম্প্রদায়ের প্রভাব রাঁচি জেলায় প্রবেশ করে। এদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কিছু ভগত তাদের অনুসরণ করে। এই সকল ব্যাক্তিদের বলা হয় কবীরপন্থী। কবীরপন্থীরাও অতিশয় শুদ্ধাচারী।এই সব ভগত গোষ্ঠী গুলিরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল টানা ভগত গোষ্ঠী। টানা ভগতরা ভূত বা অশুভ আত্মাকে বের করে ওরাওঁদের সমস্ত দুর্দশা থেকে মুক্তি দেবে এমনই বলা হয়েছিল। তারা প্রতিটি গ্রামে নিজেদের সমাজে যা কিছু অশুভ ও অকল্যাণকর বলে মনে করত তা টেনে বের করে ফেলে দেবার জন্য সমবেতভাবে কীর্তন করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। এই জন্য এই সম্প্রদায় টানা ভগৎ গোষ্ঠী নামে পরিচিতি লাভ করে[iii]। আন্দোলনটি একটি সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে তাদের অর্থনৈতিক শোষণ ও দারিদ্র্যের প্রতিকারের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটেন এবং জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করে। এই ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।কারণ এই দুটি এলাকা ছিল পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ জার্মান বা লুথেরান এবং অস্ট্রিয়ান মিশনের, মিশনারি কার্যকলাপের কেন্দ্র। আদিবাসীদের উপর অন্যান্য মিশনের তুলনায় জার্মান বা লুথেরান মিশনের একটি নিয়ন্ত্রণ ছিলঅনেক বেশী। তাই ব্রিটিশরা আশঙ্কা করেছিল যে এই অঞ্চল থেকে যে কোনদিন কোন না কোনো সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। সেই জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন ঝাড়খন্ডে জার্মান এবং অস্ট্রেলিয়ার ধর্ম প্রচারকদের ওপর নজরদারি করতে থাকে। এই রকম পরিস্থিতিতে ওরাওঁদের মধ্যে টানা ভগৎ আন্দোলনের সূচনা হয়, যা ছিল একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন, যাকে ওরাওঁদের নবজাগরণ আন্দোলনও বলা যেতে পারে।

আন্দোলনের সূচনা ও প্রথম পর্যায়

টানা ভগত আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন কুড়ি বছর বয়সী এক যুবক, যার নাম যাত্রা ওরাওঁ। তিনি ছিলেন চিংড়ি গ্রামের বাসিন্দা। এই চিংড়ি গ্রাম হল রাঁচি জেলার, গোমলা থানার বিষ্ণুপুর সার্কেলের অন্তর্গত। ১৯১৪ সালে যাত্রা ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি তাদের দেবতা ‘ধর্মেশের’ দর্শনে, ওরাওঁরাজ প্রতিষ্ঠার আদেশ পেয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে ওরাওঁ দের ভক্তির মাধ্যমে পরম ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে। ঈশ্বরের আদেশ ছিল যে, প্রত্যেকটি মানুষকে তপস্বীর

জীবনযাপন করতে হবে, পশু বলি, মাংস, মদ, উপজাতীয় নৃত্য, গান এবং শোভাময় অলংকার পরিধান থেকে বিরত থাকতে হবে। অচিরেই এই আন্দোলন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং এর সঙ্গে যুক্ত হলো জীবন ও জীবিকা। এখানে বৈষ্ণব এবং কবীরপন্থী মতবাদের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে এমন কথা প্রচারিত হতে থাকে যে ওরাওঁদের উচিত স্থানান্তরিত চাষে ফিরে আসা। যাত্রা ওরাওঁ প্রশ্ন তোলেন যে জমিদারদেরকে কেন তারা খাজনা দেবে? কেন ওরাওঁরা জমিদারদের শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে? এমনকি তারা ইংরেজ সরকার তথা রাষ্ট্রের খাজনা আদায়ের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। হিন্দু মুসলমান এবং খ্রিস্টান ব্যবসায়ী যারা প্রতিদিন আদিবাসীদের প্রতারিত করছে তাদের কাজ নিয়েও প্রশ্ন তোলে ওরাওঁরা। ওরাওঁরা ঘোষণা করে যে, তারা আর কোনভাবেই জমিদারদের জমি চাষ করবে না। ক্রমে এই আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহে পরিণত হলো যা কিছুটা মিশনারীদেরও বিরুদ্ধে গেল।বিরসা মুন্ডার মতই যাত্রা ভগত ওরাওঁদের সতর্ক করে বলেছিলেন যে, যারা তাকে অনুসরণ করবে না তারা খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন বিদেশীদের খুব তাড়াতাড়ি এই দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং ওরাওঁ রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তিনিই হবেন প্রথম রাজা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওরাওঁ উপজাতির বাইরে দূর দূরান্ত এলাকায় যাত্রা ভগতের অনুগামী সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্রমশ টানা সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হয়। আদিবাসীদের মধ্যে এই আন্দোলনে জনপ্রিয়তা একদিকে যেমন বাড়তে থাকে অন্যদিকে তেমন জমিদার মহাজন এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে খুব আতঙ্কের সৃষ্টি করে। জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এক আতঙ্কবাদী রূপ ধারণ করে। ওরাওঁরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেলে সরকার এবং জমিদারদের ভৃত্যরা তাদের অত্যাচার করে, মারধর করে, তাই তারা জমিদারদের এবং সরকারের জন্য কোন কাজ করবে না, লাঙ্গল চালাবে না এমন দাবি জানায়। কে.এস. সিং তাই এই আন্দোলনকে "একটিকৃষক চেতনা" বলেছেন[iv]। বি.বি. চৌধুরী আবার এর মধ্যে "বিদ্রোহী উপজাতীয় চেতনার" প্রকাশ দেখতে পান[v]। যাত্রা তাঁর অনুগামীদের পাশের গ্রামে একটি স্কুল নির্মাণের জন্য কুলি হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এর ফলস্বরূপ তিনি এবং তাঁর সাতজন নেতৃ স্থানীয় শিষ্যকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতে বিচার হলে কার্যবিধির ১৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের জমিদার ও সরকার পক্ষে কাজ না করার জন্য প্ররোচিত করার অভিযোগে এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সংগঠিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারণা প্রচার করার অভিযোগে দেড় বছরের কারাদন্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন যাত্রার স্ত্রী দেবমানিয়া[vi]। সঙ্গীতা দাশগুপ্ত লিখেছেন, "leaders arose and withdrew their movement, gained momentum and ebbed at various points initial and amidst this historical process"।তিনি আরো লিখেছেন, "Tana attempts reordering there world continued"[vii]. এক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে টানা ভগত আন্দোলন ছিল ওরাওঁদের উত্থানের একটি সামাজিক ও ধর্ম সংস্কার মূলক আন্দোলন। যাত্রা একটি সরল তপস্বী জীবন এবং সরল হৃদয়ের প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনে বস্তুবাদের কোন স্থান ছিল না। ২রা জুন ১৯১৫ সালে যাত্রা মুক্তি পান। তার অনুগামীরা তাকে হার্দিক স্বাগত জানায়। কিন্তু তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব ত্যাগ করেন এবং পালামু জেলার নেতারহাট সড়ক নির্মাণের শ্রমিক হয়ে ওঠেন। অপুষ্টি এবং শারীরিক নির্যাতনের কারণে জেলেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সম্ভবত: ২২ বছর বয়সে ১৯১৬ সালে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান[viii]। মৃত্যুর আগে তিনি তার অনুগামীদের বলেছিলেন

তাঁকে সাত দিন যেন, দাহ না করা হয়। আদিবাসীরা এই মহান প্রয়াত আত্মার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমায়। এই জমায়েত দেখে মনে হয়েছিল যে যাত্রা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অবনতিশীল আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলনের জন্য একত্রিত করছেন। তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়। পরবর্তীকালে ১৯২০ সালে জাতীয় আন্দোলনের সাথে টানা ভগত আন্দোলনের আত্তীকরণ ঘটে।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

যাত্রার মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফলে আবার একটি নতুন প্রেরণার সঞ্চার ঘটে। এই সময় সর্বত্র জার্মানদের বিজয় ছিল একটি চর্চিত বিষয়। ছোটনাগপুরের কমিশনার বিহার ও উড়িষ্যার সরকারকে রিপোর্ট করে যে, রাঁচিতে জার্মান মিশনারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আদিবাসীরা ভুল পথে চালিত হচ্ছে। এবং পরবর্তী কালে এই অঞ্চল জার্মান শক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে। সুদূর ভবিষ্যতেজার্মানি হয়তো ভারত জয় করবে[ix]। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অবিলম্বে উনিশে আগস্ট ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জন জার্মান মিশনারীকে আহমেদনগরে আটক করা হয়। ইতিমধ্যে লিথো ওরাওঁ নিজেকে দেবী বলে ঘোষণা করেন এবং যাত্রা ওরাওঁ এর শিক্ষা অনুসরণ করেছিলেন। অচিরেই টানা ভগত আন্দোলন খুব দ্রুত রাঁচি, পালামু এবং হাজারীবাগ জেলার ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। লিথো ওরাওঁ কে গ্রেফতার ও আটক করা হয়। তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং কারাদণ্ডের দণ্ডিত হন। তাঁর মুক্তির সময় তার স্মৃতি বিভ্রম ঘটে। ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে মাঙ্গার ওরাওঁ নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁরও সেই একই পরিণতি হয়েছিল[x]। টানা ভগত আন্দোলন দুটি অবস্থা অতিক্রম করেছিল - প্রথমটি হল পুরনো অভ্যাস বা অশুভ আত্মাকে বিতরণের অভ্যাস। দ্বিতীয়টি হল নতুন ধর্মাচরণের নিয়ম জারি এবং সেই মতবাদের সুনির্দিষ্ট গঠন। টানা ভগতদের কিছু কিছু মন্তব্য এবং গানের মধ্যে রয়েছে জার্মান বিজয়ের আহ্বান[xi]। বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানেও টানা ধর্মের অনুসারীদের সন্ধান পাওয়া গেছিল। ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রায় ষাট হাজার অভিবাসী ওরাওঁ কুলিরা রাতে সভা করেছিল এবং 'জার্মান বাবার' স্তোত্র গেয়ে তাঁকে ঈশ্বর এর মতো আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। জার্মান বাবা' এসে যেন 'ইংরেজ শয়তানদের' তাড়িয়ে দেয় এমনই ছিল তাদের প্রার্থনা। ইংরেজরা চলে গেলে ওরাওঁদের স্বাধীন রাজপ্রতিষ্ঠিত হবে এমনই ছিল তাদের আশা। ১৯১৬ সালের ২৫ শে জানুয়ারি ধুপগুড়ি থানায় এক আত্মহত্যার চেষ্টা করার ঘটনা ঘটে। চারুয়া ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তি স্ত্রীর গলা কেটে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করবে, এমনই সংকল্প করে। পুলিশকে তারা বলেছিল যে গ্রামবাসীরা তাকে 'জার্মানদের নাম গান' গাইতে বলেছিল এবং হুমকি দিয়েছিল যে যদি তারা তা না করে তাহলে লোগ নামে এক শয়তান তাদেরকে হত্যা করবে। সে এবং তার স্ত্রী শয়তানদের দ্বারা নিহত হওয়ার চেয়ে এমন মৃত্যুর পথ অনেক ভালো বলে এই পথ বেছে নিয়েছিল। ব্রিটিশরা এই আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহ আন্দোলনের সাথে চলতে থাকা ধর্মীয় আন্দোলন বলে আখ্যা দেয়। সামাজিক সংস্কারের মধ্যে ছিল মাংস খাওয়া নিষিদ্ধকরণ এবং মদ্যপান বন্ধ করা। মহুয়াদানের রোমান ক্যাথলিক মিশনের ফাদার এনেরেসের মতে, নেতার হাটে রাস্তা তৈরির জন্য পুলিশ কনস্টেবলরা আদিবাসীদের থেকে বেকার শ্রম আদায় করে। এছাড়া পাখি হত্যা ইত্যাদির জন্য আদিবাসীদের মনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিগুলোই ছিল টানা ভগত আন্দোলনের

শক্তি বৃদ্ধির কারণ। আদিবাসীরা আরও দাবী করে যে নায্য হারে বেতন দিলে নেতারহাটে কাজ করতে তারা আপত্তি করবে না[xii]।

আন্দোলনের গতি হ্রাস

১৯১৬ এবং ১৯১৭ সালের উপজাতীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অভাবে অভাবের কারণে ভালো ফসল উৎপন্ন না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯১৬ সালের মে মাসে মানভূম এবং সিংভূম জেলায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে একইসঙ্গে সাঁওতাল পরগনায় অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ভুট্টা চাষে খুব ক্ষতি হয়। ১৯১৭ সালে সিংভূম জেলা আরও খরার কবলে পড়ে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনার আদিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উত্তর পূর্ব ভারতের রাঁচি জামশেদপুর এবং চা উৎপাদিত হয় এমন অন্যান্য অঞ্চলে জীবিকা এবং কর্মসংস্থানের জন্য চলে যায়[xiii]। ১৯০০ সাল থেকেই রাঁচি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল[xiv]। আদিবাসীদের ওপর এই নিরবিচ্ছিন্ন শোষণ অব্যাহত ছিল। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অবগত থাকলেও এটা সংশোধনের কোন চেষ্টা করেনি অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ব্রিটিশদের বাধ্য করে পুলিশ এবং যোদ্ধা হিসাবে মেসোপটেমিয়া, ফ্রান্স ইত্যাদি অঞ্চল থেকে স্থানীয় জনগণ যোগাড় করতে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা ভারতের ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগনা থেকে এমন লোক সরবরাহ করতে থাকে। ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল-পরগনা থেকে আদিবাসীরা দেশত্যাগ করতে থাকে। বৃষ্টির ঘাটতির কারণে ফসল না হওয়া বা অতিবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, এইসব ঘটনা তাদেরকে অত্যন্ত দুর্দশা জনক পরিস্থিতিতে ফেলে। জীবিকার সন্ধানে তারা জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এটা অনুমান করা হয় যে ১৯১৮ সালের শেষ তিন মাসে প্রায় ৯০০০০ এর বেশি কুলি আসাম ডুয়ার্স এবং বাংলায় চলে এসেছিল। মানভূম ইত্যাদি অঞ্চল থেকে, যারা কোনো কারণে চলে আসতে পারেনি তারা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে।

আন্দোলনের পুনরুত্থান ও নববিস্তার

১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে সুরগুজা রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে মাদগুরি, মান্ডওয়ার, পালামৌ এবং রাঁচি জেলার সীমান্ত এবং যশপুরের সামন্ত রাজ্যের কিষান ও ওরাওঁদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটে। এর ফলস্বরূপ ৫৩ জনকে হত্যা করা হয়। আন্দোলনের নেতারা তাদের অনুগামীদের ব্যাখ্যা করে যে তারা জার্মানদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। খিখির কিষাণ যিনি, ১৯১৭ সালে আসামের একটি চা বাগানে কুলি হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের বলেছিলেন যে তিনি জার্মানিতে গিয়েছিলেন এবং জামিরাপাটে বিদ্রোহ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ নিয়ে ফিরে এসেছেন[xv]। এই কিষান - ওরাওঁ বিদ্রোহ ছিল ঝাড়খণ্ডের পালামু জেলা এবং সুরগুজা রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতির ওপর জমিদার এবং সরকারের দীর্ঘস্থায়ী অত্যাচারের ফল। এই আন্দোলনের অনুগামীরা বিশ্বাস করতেন যে তাদের এলাকা থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করলে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। টানা ভগত আন্দোলন ছিল অহিংস আন্দোলন। আর এই পুনরুত্থিত বিদ্রোহ টানা ভগত আন্দোলনের তারা প্রভাবিত একটি সহিংস আদিবাসী বিদ্রোহ। তবে এই আন্দোলনে ওরাওঁদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। ১৯১৮ সালের ছোটনাগপুরে টানা ভগত আন্দোলন ঘটে অখ্রিস্টান ওরাওঁদের মধ্যে। নতুন নেতা বা নবিরা হলেন সিসাইগ্রাম গ্রাম থানার কুড়ি বছর বয়সী শিবু ওরাও, সেরো গ্রামের মায়া ওরাওঁ, সোপা গ্রামের প্রভু ওরাওঁ। শিবু এবং প্রভু ১৯১৮ সালে টানা ভগৎ আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করে। শিবু ১৯১৪- ১৫ সাল এর সময়ে যাত্রা ভগতের সংস্পর্শে আসে এবং পরবর্তীকালে যাত্রা ভগতের পরে একজন মহান

নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবু ১৯১৯ সালে মায়া ওরাওঁ এর সাথে একত্রে আন্দোলনে গতিশীলতা আনে। শিবুকে ভগবান বলা হয়েছিল। তিনি বিশ্ব সংস্কারের জন্য গৃহ এবং পরিবার ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের জমিদারদের জন্য কোন কাজ করতে এবং মোটিয়া কাপড় ব্যবহার করতে বাধা দেন। সকলেই তার অনুগামী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে শিবু টানা ভগত আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। তিনি ঘোষণা করেন যে শাসন ক্ষমতা ওরাওঁদের হাতে ফিরে আসবে। এবং হোলি উৎসবের পরে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। আর এই নতুন শাসনব্যবস্থায় জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকার এবং খ্রিস্টানদের কোন স্থান থাকবে না।

লোহারদাগার ইন্সপেক্টর, রাচির ডেপুটি কমিশনার কে জানিয়েছিলেন যে প্রায় ৮০০ জন ওরাওঁ সেরগ্রামে মায়া ওরাওঁ এর বাড়ির কাছে জমা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে তারা কোন কাজ করবে না। কারণ ভগবান তাদের খাওয়াবেন। শিবু এবং মায়া সাতপাহাড়ীতে (চাঁদোয়া) চলে যান। তাঁরা সেখানে এক মাসের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে দেবতার আবির্ভাব ঘটবে। হেসালং এ কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এর পর শিবু ঘোষণা করেছিলেন যে, টানারা আর খাদ্য, পানীয় এবং আচার-আচরণের বিধি নিষেধ পালন করবে না। তারা সমস্ত ধরনের শারীরিক আনন্দ এবং সমস্ত ধরনের খাবার উপভোগ করবে। তাদের সাত বছরের বিরতি শেষ হয়েছিল। তারা এখন স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছামতো জীবন উপভোগ করতে পারবে। তারা আর কোল নয়, হিন্দু ও মুসলমানের ভাই হিসেবে সমান ভাবে বিবেচিত হবে এবং সমান অধিকার ও সম্মান পাবে। কে.এস. সিং মনে করেন এই আন্দোলনের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের আরোহন অস্বাভাবিক ছিল না[xvi]। শিবু দাবি করে যে ঈশ্বর তাদের জমি চাষ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা স্বশাসনের দাবি জানায়। শিবু এবং মায়া ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ ৪০০ জন লোকের এক জমায়েত করে। কুড়িজন সশস্ত্র পুলিশের সহায়তায় রাঁচির পুলিশ সুপার বয়লান, শিবু এবং মায়াকে গ্রেপ্তার করে। নায়া ওরাওঁ এর নেতৃত্বে টানা ভগৎ আন্দোলনের অনুগামীরা বয়লান কে অনুসরণ করতে থাকে। তারা তাদের নেতাদের মুক্তির দাবি জানায়। নায়া ওরাওঁ এবং তার তিন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা ১৫০০ টাকা জরিমানা দিতে অক্ষম হবার জন্য তাদেরকে হাজতে রাখা হয়েছিল। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নেতাদের গ্রেফতারের পর টানা ভক্তরা শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের আন্দোলন চালিয়ে গেছিল এবং অহিংস নীতির প্রতি তাদের অটলতা প্রদর্শন করেছিল। রাঁচি থেকে ১৬ মাইলের মধ্যে টানা ভবতদের একটি শিবির স্থাপিত হয়। এই শিবিরে প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ জন আন্দোলনকারী উপস্থিত থাকতো। তারা সুশৃংখলভাবে শিবু এবং মায়ার মুক্তির দাবি জানাতে থাকে। গুমলা মহকুমায় এই আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৯ সালের, ২০শে এপ্রিল ডিআইজি ক্রাইম রেলওয়ে, বিহার ও ওড়িশার সরকারকে লেখা একটি চিঠিতে টানা ভগতদের সুশৃংখলতার প্রশংসা করেন। তাদের কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তারা নিজেরাই নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তারা সরকারকে কোন চৌকিদারি কর না দেওয়ার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর ছিল। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকতার জনক এস. সি. রায় টানা ভগতদের এই অবস্থান আন্দোলন কে সমর্থন করেছিলেন[xvii]। শিবুর অনুসারীরা ১৯১৯ সালের ২০ শে এপ্রিল পর্যন্ত শিবির থেকে ছত্রভঙ্গ হয়নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের এই স্থিরতায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। গোমলার দুই ওরাওঁ নেতা সোমা এবং গোসাইন ওরাওঁ ১৯১৯ সালের মে মাসে খাজনা ও চৌকিদারী ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য আরো প্রচার করতে থাকে। তাদের রাজনৈতিক সফলতা প্রদর্শনের জন্য তারা গুমলা মহকুমার সদর দপ্তরে গিয়ে, ঘোষণা করে যে

ওরাওঁরাই এখন থেকে দেশের শাসক। ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে পুলিশ স্টেশন কুরুর টানা ভগতরা স্থানীয় জমিদারদের উপর হামলা চালায়। তারা জোর পূর্বক ফসল অপসারণ করে[xviii]। শিবু এবং মায়ার অনুপস্থিতিতে তুরিয়া ওরাওঁ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তারা শিবু এবং মায়ার মুক্তির দাবি জানায়। চেচারিতে আন্দোলনকারীরা জমিদার এবং তহশীলদের সাথে সহিংস আচরণ করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তুরিয়া এবং জিতু ১৯২০ সালে জানুয়ারিতে জামিনে মুক্তি পায়। শিবুও ১৯২০ সালে মুক্তি পান। তাঁর মুক্তি টানা ভাগতদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। তারা ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা নির্ধারণের জন্য হাজারীবাগ জেলার পুলিশ স্টেশন তাণ্ডব এর কাছে সাতপাহাড়িতে একত্রিত হয়। সেখানে চার দিন কাটানোর পর সেই এলাকায় খাবার দাবার না পাওয়ায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সম্ভবত: তাঁরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। এই সময় শিবু ভগত তাঁর সহযোগী দের নিয়ে রাঁচি জেলার পালকোটের দিকে চলে যান। ফের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে রাঁচি জেলায়। জমিদাররা যাতে আদিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা এবং চৌকিদারি কর আদায় করতে না পারে তার জন্য সভা সংঘটিত করে জমিদারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে। শিবুকে টানা ভগতদের মালিক হিসাবে গণ্য করা হয়। সকল টানা ভগতরা তাদের ঘরবাড়ি, গবাদি পশু এবং জমি ছেড়ে শিবু ভগবানের সাথে চলে যায়। ১৯২০ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর রাঁচি, পালামু এবং হাজারীবাগের আদিবাসীরা প্রচুর সংখ্যায় সাত পাহাড়ি পাহাড়ে যায়। তান্ডয়ার সাব ইন্সপেক্টর এস. মঞ্জুর. হক, হাজারীবাগের এস.পির কাছে রিপোর্টে লেখেন যে, টানারা ব্রিটিশদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলে। কোন শক্তি বা সহিংসতা দেখিয়ে নয় বরং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা তারা এই আন্দোলন গড়ে তোলে। সম্ভবত তারা সত্যাগ্রহ অর্থাৎ গান্ধীর তত্ত্ব অনুসরণ করেছিল। সাতপাহাড়ি পাহাড়কে তাদের তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফলে আদিবাসীরা এখানে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতে আসতে শুরু করে। তাদের ধর্মীয় স্তোত্রে 'জার্মান বাবার' অন্তর্ভুক্তি টানাদের ব্রিটিশ বিরোধী অনুভূতিকে প্রতিফলিত করেছিল। শিবু ওরাওঁ সাব-ইন্সপেক্টরকে হুমকি দিয়েছিলেন, যে তারা যদি ভারতীয় দণ্ডবিধি দন্ডবিধি অনুসরণ না করে তাহলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। যাইহোক হাজারীবাগের এস. পি., ডিকেনসন, টানা ভগতদের প্রচারিত ধারণাগুলিকে বলশেভিজম, গান্ধীবাদ এবং মূর্খতার মিশ্রণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। টানা ভগতরা হাজারীবাগের এস. পি কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা কোন শান্তি ভঙ্গ করবেন না, পরিবর্তে এস.পি. টানা ভগতদের বক্তব্য উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ডি.সি., কমিশনার এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর (বিহার ও ওড়িশা) দের কাছে পৌঁছে দেবেন। অন্যদিকেবিষ্ণু ভগৎ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিক্ষু ভগত পুলিশ স্টেশন সেসাই এ নো - রেন্ট ক্যাম্পেন শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী অবস্থানের জন্য তাকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হয়।

উপসংহার

১৯২০ সালে টানা ভগতরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির সমর্থক হয়ে ওঠে। এই সময় টানা ভগতরা সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং গ্রেপ্তার হন। ফলে টানা ভগত আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। কুরু এরিয়াতে ১৯২০ সালে সত্যাগ্রহ প্রচারের কারণে টানা ভগতদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এরপর ১৯২১ সালে গান্ধীজি চক্রধরপুর, জিয়াবাসা ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। ফলে টানা ভগতদের সঙ্গে অহিংসবাদী জাতীয় আন্দোলনের একজন যোগসুত্র তৈরি হয়। পরে রাঁচি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে টানা ভগতরা প্রায় ২০০ মাইল হেঁটে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের যোগ দিতে যান। টানা

ভগৎ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। তাই ভগতদের কাছে খাদি বস্ত্র পরিধান এবং ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা বহন করার নির্দেশ পাঠানো হয়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে টানা ভগত আদিবাসীরা চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে। গভর্মেন্ট হাজার হাজার টানা ভগতের জমি ও অ -অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে চড়িয়ে দেয়। তবুও এদের সংগ্রামী উৎসাহ নিষ্প্রভ হয়নি[xix]। টানা ভগত আন্দোলন ক্রমশ পূর্বের বৈপ্লবিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং ভারতীয় রাজনীতির মূল স্রোত ও কংগ্রেস ভাবাদর্শের সাথে মিশে যায়।

তথ্যসূত্র:

i রায়, হিমাংশু মোহনভারতের আদিবাসী .(১৩৮৭) ., মন্ডল এন্ড সন্স, p. ১০

ii বসু, নির্মল কুমার. (১৩৫৬).হিন্দুসমাজের গড়ন,বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, pp.41-43

iii বসু, নির্মল কুমার. (১৩৫৬).হিন্দুসমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, pp.44

iv Sing, K. S. (1988). 'Tribal Peasantry, Millenarianism, Anarchism and Nationalism: A case study of Tana Bhagat in Chotonagpur', *Social Scientist*, 16(11), p. 39.

v Chaudhury, B. B. (1989). 'The Story of Tribal Revolt in the Bengal Presidency: The Religion and Politics of the Oraons, 1900- 1926 in Adhir Chakravarty (ed.). *Aspect of Socio-Economic Changes and Political Awakening in Bengal*, Calcutta. p. 55.

vi Kumar, P. (1990). 'Tana Andolan ‘, *Prabhat Khabar.*

vii Dasgupta, S. (1999). 'Reordering a World: The Tana Bhagat Movement, 1914-1919'. Studies in History, p. 15 I.N.S. Sage Publications, New Delhi.

viii Sharan, A. B. (1990). 'Tana Andalon Ka Kritti Stambh: Jatra Bhagat'. *Prabhat Khabar.*

ix Home Political Special File No. 877/ 1915. H. (n.d). Mc Pherson to H. Wheeler. D.O. No. 994-C. Ranchi, i6. 5.15.

x Roy, S.C. (1981). 'A new religious movements among the Oraon', Man in India, 6(4). p. 381

xi Roy, S.C. (n.d). The Oraon Religion and Custom. pp. 384- 387

xii Sinha, S. P. (n.d). The problem of Land Alienation of the Tribals in around Ranchi (1955-65). p. 8.

xiii Pal, A. (1995). 'The Political Economy of Migration among the Orans'. *Man in India.* 75(1). p. 72.

xiv Sinha, S. P. (n.d). The problem of Land Alienation of the Tribals in around Ranchi (1955-65). p. 8.

xv Political Police Department File No. P-5R-3 of 1999. (n.d). Report of Feudatory Chief, Chandanpore, 13 June, 1918. p. 14.

---

xvi Sing, K. S. (1988). 'Tribal Peasantry, Millenarianism, Anarchism and Nationalism: A case study of Tana Bhagat in Chotonagpur', *Social Scientist*, 16(11), p. 39.

xvii Roy, S.C. (1915). The Oroan of Chotonagpur. p. 282

xviii Jha, J.C. (n.d). Indian National Congress and the Tribals 1885-1985. p. 23.

xix ঘোষ, সুবোধ. (১৩৫৫). ভারতের আদিবাসী, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং কোং, p- ৫০.

ঔপনিবেশিক যুগের বাঙ্গালী বিজ্ঞান সাধক পরিচিতি

উমা দে (নন্দী)
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয়। এই নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার নতুন প্রজন্ম আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। মধুসূদন গুপ্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ বিজ্ঞান চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। কিন্তু বাংলার এমন কিছু সংখ্যক গবেষক-বিজ্ঞানী রয়েছেন যাদের সম্পর্কে পাঠক সম্যক অবহিত নন। এদের মধ্যে পঞ্চানন নিয়োগী, দেবেন্দ্রমোহন বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধ কুমার মিত্র প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরা বিজ্ঞান গবেষণায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান। তাঁদের কালজয়ী আবিষ্কার ও গবেষণা জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং মানবকল্যাণ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।
সূচক শব্দ: পাশ্চাত্য শিক্ষা, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা, গবেষক-বিজ্ঞানী, মানবকল্যাণ।

মূল আলোচনা:

উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতের বিজ্ঞানচর্চা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরে পশ্চিমের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পের প্রবেশ ঘটে এ দেশে। চিন্তা জগতে ভারত এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটে। বিজ্ঞানে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব কৃতিত্ব অর্জন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্র ধরে তরুণ সমাজ আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় সামিল হন। গবেষণাগারে উপলব্ধ জ্ঞানকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। "বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চার ... উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে আমাদের সমাজের সঙ্গে একীভূত করা, তাকে একটি সংস্কারে পরিণত করা।"[১] এই পর্বের প্রবাদ প্রতিম বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য, যাদের বিজ্ঞান চর্চার কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। কিন্তু আরও অনেক বাঙ্গালী গবেষক-বিজ্ঞানী রয়েছেন যাদের অসাধারণ প্রতিভা অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোচিত থেকে গেছে, বহুল প্রচারের আলোকে আসেনি। তাই তাঁরা প্রায় অনালোচিত ও অশ্রুত থেকে গেছেন। এদের মধ্যে পঞ্চানন নিয়োগী (১৮৮৩), দেবেন্দ্রমোহন বসু (১৮৮৫), গিরীন্দ্রশেখর বসু (১৮৮৬), জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩), সুবোধ কুমার মিত্রের (১৮৯৬) বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক যুগে বাঙ্গালীর বিজ্ঞানভাবনা সম্পর্কিত আলোচনায় ও প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলিতে মূলত প্রথিতযশা বহু আলোচিত বিজ্ঞানীদের ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তাঁদের প্রবল প্রচারের আলোকে ঢাকা পড়ে গেছে অপেক্ষাকৃত কম প্রচারের আলোকে আসা বিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের গবেষণা। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষে উপযুক্ত বিজ্ঞানসাধনা পরিকাঠামোর অভাব, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এবং নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও তাঁরা বিজ্ঞান সাধনায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য স্বল্প

পরিসরে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত পূর্বোল্লেখিত কয়েকজন গবেষক-বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব আলোচনা করা।

অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী: রসায়ণশাস্ত্রে মৌলিক পদার্থ গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন পঞ্চানন নিয়োগী। ছোটবেলা থেকে দারিদ্র নিত্যসঙ্গী হওয়ায় পড়াশনার জন্য নির্ভর করতে হয়েছিল বিভিন্ন বৃত্তির উপর। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় ছাত্রজীবনে প্রচুর বৃত্তি লাভ করেছিলেন। সরকারী বৃত্তির সঙ্গে উড্রো বৃত্তি, গঙ্গাপ্রসাদ সুবর্ণ পদক, গ্রিফিথস্ মেমোরিয়াল প্রাইজ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রভৃতি।

প্রথমে রাজশাহী কলেজে পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। রসায়নের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বহুমুখী পান্ডিত্য প্রতিফলিত হয়েছিল নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে ‘Iron in Ancient India’ এবং ‘Copper in Ancient India’ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। বাংলা ভাষায় রচিত ‘আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন’- এ তিনি সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত ধাতুঘটিত ওষুধগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং ওষুধগুলির উপযোগিতা নির্দেশ করেছেন।

রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপক নিয়োগীর অসামান্য অবদান হল দুষ্প্রাপ্য গেলিয়াম নামক ধাতুর যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার। তিনি গেলিয়ামের অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এমনকি ধাতুটির গুণাগুণও বিশ্লেষণ করে দেখান। রসায়ণ জগতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এছাড়া জৈব রসায়ন, অজৈব রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যামূলক রসায়নের সব শাখাতেই তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। অজৈব রসায়নে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের একটি কঠিন ও দানাদার রূপ তিনি আবিষ্কার করেন। অজৈব রসায়নে অপর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল দস্তা এবং ক্যাডমিয়াম নামে দুটি ধাতু ভেঙ্গে তার কয়েকটি যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার। ক্যাডমিয়াম এবং দস্তার ধাতুশংকর প্রস্তুতিও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। রসায়নের অন্য শাখায় ‘জিওমেট্রিক্যাল ইনভারসার’ নামে থিয়োরি আবিষ্কার করায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের থিয়োরি ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়। এছাড়া রেসোনেন্স রি-অ্যাকশন নামে বিশেষ একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ারও তিনি উদ্ভাবক। “অধ্যাপক নিয়োগী ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ।”[২]

দেবেন্দ্রমোহন বসু: বিংশ শতাব্দীর অন্যতম পরমানুবিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ শে নভেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি বিখ্যাত গনিতজ্ঞ আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতুস্পুত্র এবং মাতুল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়। বাল্যকালে পিতৃহারা হওয়ায় জগদীশচন্দ্রের কাছে থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেন। অতএব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একটা বিজ্ঞানমনস্ক পরিবেশে তিনি বড় হন।

সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ, অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এস. সি পাশ করে লন্ডনে পাড়ি দেন। লন্ডনের রয়াল কলেজ অফ সায়েন্স-এ উচ্চ শিক্ষা লাভের পর জার্মানীতে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সান্নিধ্য লাভ করেন। অধ্যাপক ই. রেগানের তত্ত্বাবধানে আয়নিত আলফা ও বিটা কনিকার গতিপথ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ এ দেশে ফিরে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন ১৯০৫ এ।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে গবেষণায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আমরা জানি, পরমাণুর কেন্দ্রকের মধ্যে ধনাত্মক তড়িৎ কণা প্রোটন, নিস্তড়িৎ নিউট্রন, অ্যান্টিপ্রোটন, ভি কণা,

মেসন প্রভৃতির অবস্থান। পরমাণু কেন্দ্রকে অবস্থানকারী মেসন কণা সম্বন্ধে প্রথমে তিনিই গবেষণা করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে। ফটোগ্রাফিক প্রলেপের দ্বারা মেসন কণার ভর নির্নয়ে সক্ষম হন। তবে নিখুঁত ফটোগ্রাফিক প্লেটের অভাবে তাঁর কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায়। তাঁর পদ্ধতি অবলম্বন করে মেসন কণার ভর নির্ণয় করেন বিজ্ঞানী লিনাস পাওয়েল এবং নোবেল পুরস্কার পান। বিজ্ঞানী পাওয়েল দেবেন্দ্রমোহনের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি গবেষণা করেন। পরাচৌম্বকের ধর্ম নিয়ে তিনি গবেষণা চালিয়ে যান। লোহা, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি পদার্থের চৌম্বক ধর্ম প্রকাশের কারণ বিষয়ে গবেষণালব্ধ মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, নিউক্লিয়াসের চারপাশে আবর্তনের জন্য নয়, ইলেকট্রনের ঘূর্নন হল এর জন্য দায়ী। এই তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ তৈরী করেন দেবেন্দ্রমোহন এবং তাঁর সহগবেষকেরা; কিন্তু এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন স্টোনার। পরাচৌম্বক পদার্থের ধর্ম সম্পর্কিত এই তত্ত্ব 'বোস স্টোনার ফর্মূলা' নামে পরিচিত হয়। এছাড়া শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাব সম্পর্কেও তিনি আগ্রহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। প্রবাহী তরলে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এর জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরীতে সহযোগিতা করেন তাঁর ছাত্ররা তথা সহযোগিরা। এই ভাবে পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্র গবেষনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর প্রয়ান পরবর্তীকালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা হিসাবে ১৯৩৮-১৯৬৭ পর্যন্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন তিনি। শুধু প্রশাসন নয়, গবেষনার ক্ষেত্রকেও সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যায় মৌলিক গবেষণার সঙ্গে প্রায়োগিক গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা বিষয়ে চর্চা শুরু হয়। কৃষি গবেষণার জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ থেকে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ পান ১৯৪০ এর দশকে। ফলে পরীক্ষা নিরীক্ষার উপযুক্ত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বসু বিজ্ঞান মন্দির। নিজেই যেহেতু ছিলেন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের গবেষক, তাই বিভিন্ন যন্ত্র নির্মান ও ব্যবহার সম্পর্কে অন্যান্য গবেষক ও গবেষনাকর্মীদের উৎসাহিত করতেন।

জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের কাজকে তিনি আরো এগিয়ে নিয়ে যান। সেই সময় যে সব ভৌতিক বা রাসায়নিক মতবাদ প্রচলিত ছিল তার ভিত্তিতে গাছের জীবন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছিলেন 'র‍্যাশনাল অ্যান্ড পজিটিভিস্টিক অ্যাপ্রোচ টু সায়েন্স' নামক প্রবন্ধ। উত্তেজনায় উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার যে ঘটনা জগদীশচন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেছিলেন তাকে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন তিনি। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিরীক্ষণ করেন গাছের সাড়া দেওয়ার সঙ্গে তার কোষকলায় ঘটে যাওয়া নানা ভৌতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া। গবেষণাগারে প্রতিষ্ঠিত হয় মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তিনি। রসায়ন বিজ্ঞানে 'বোস স্টোনার থিওরি' তত্ত্ব আবিষ্কারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যান্য মৌলিক গবেষণাগুলির মধ্যে কেম্ব্রিজে জে. জে. টমসনের অধীনে মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক গবেষণা। বিভিন্ন গ্যাসীয় মাধ্যমে আলফা কণিকার গতিপথের আলোকচিত্র গৃহীত হতে ডারউইন কর্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক ধারণার প্রায়োগিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতে রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার উপর সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণা ধারা প্রচলিত হয়। শেষ জীবনে জৈব বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, ভারতের বিজ্ঞান মানসের ইতিহাস এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের

পারস্পারিক সম্পর্কের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরও পঠনপাঠন পর্ব চালাতে থাকেন। তাই “নিজেকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন রেকর্ডিং সায়েন্টিস্ট।”[৩]

গিরীন্দ্রশেখর বসু: বস্তু বিজ্ঞানের মতই মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি বিশেষ ধারা। অবচেতন মনের ধারণাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় মৌলিক গবেষক হিসাবে গিরীন্দ্রশেখর বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিন্তাভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটেছিল। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর মৌলিক উদ্ভাবনের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে সুপন্ডিত এবং ভারতীয় বেদান্ত দর্শনে বিশেষ পারদর্শী। গিরীন্দ্রশেখরের শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর তৈরী হয় পিতার কাছে। ছোটবেলা থেকেই মানব মনের গভীর রহস্যের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাই চিকিৎসকের পেশায় নিজ বৈশিষ্ট্যানুসারে সাধারণ রোগ চিকিৎসার পরিবর্তে মনের রোগের চিকিৎসার দিকে মনোনিবেশ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এবং চিন্তার মৌলিকতা প্রকাশ পায় ‘The Concept of Repression’ গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি মনঃসমীক্ষকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়। এতে তিনি ‘বিপরীত ইচ্ছা’ তত্ত্ব (theory of opposite wish) ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বানুযায়ী মানুষের প্রত্যেক ব্যক্ত ইচ্ছার অন্তরালে একটি বিপরীতধর্মী ইচ্ছা সুপ্ত থাকে। ব্যক্ত ইচ্ছাটির প্রাধান্য থাকে বলে সেটি কার্যকর হয় এবং বাইরে তার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু মানুষের কর্ম-পরিস্থিতিতে সুপ্ত ইচ্ছাটি অন্তরালে থাকে। তাই প্রত্যেক পরিস্থিতিরই একটি কর্তৃকের (subject) দিক এবং একটি কর্মকের (object) দিক থাকে। যে কোন পরিস্থিতিতেই ব্যক্তির ইগো বা অহং দুভাগে ভাগ হয় – কিছুটা অংশ কর্তৃক ইগোর দিকে এবং কিছুটা অংশ কর্মক ইগোর দিকে প্রবাহিত হয়। স্বল্পস্থায়ী হলেও কর্তৃক ইগো কর্মক ইগোর সাথে একাত্ম হয়ে যায়। ফলে কর্তৃক ইগো কর্মক ইগোর অনুভূতির অংশভাগী হয়। এই তত্ত্ব প্রকাশকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মনঃসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ফ্রয়েডের লেখনীর ইংরেজী অনুবাদ ভারতে দুর্লভ ছিল। তাসত্ত্বেও অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে উভয়ের সিদ্ধান্তের অনেক মিল রয়েছে। পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়েছিল। “গিরীন্দ্রশেখর মনঃসমীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের মৌলিক কিছু তত্ত্ব গড়ে তোলেন ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং প্রধানত ভারতীয় মনোবিজ্ঞান চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ও তাঁর মানসিক রোগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এ ব্যাপারে তিনি ঋষি পতঞ্জলির (প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ মোটামুটি) যোগসূত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।”[৪]

গিরীন্দ্রশেখরের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষর। এগুলির মধ্যে ‘A New Theory of Mental Life’, ‘The Yoga Sutras’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মনঃসমীক্ষণ চিন্তার মূল উৎস নিহিত ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে, এই গ্রন্থগুলিতে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। ফ্রয়েডের চিন্তার সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল থাকলেও অমিলের অভাব ছিল না। ‘Yoga Sutra’ গ্রন্থে উপনিষদের অদ্বৈতবাদের দার্শনিক উপলব্ধি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীন ঋষিরা পরম সত্যের অনুসন্ধানে উপলব্ধির শুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থায় উপনীত হন। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সকল বিরোধের অবসান ঘটে। তিনি এই দার্শনিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁর কর্মপ্রবাহ প্রভাবিত হয়। এছাড়া ‘গীতার ভাষ্য’, ‘পুরাণ প্রবেশ’, ‘লাল-কালো’, ‘স্বপ্ন’ প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতীয় ও পশ্চিমী চিন্তার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক

কর্মকান্ড 'ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতি' (১৯২২), 'লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল' (১৯৪০) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর স্বদেশ প্রেম, আধুনিকতা প্রকাশ পায়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: রসায়ন শাস্ত্রের অন্যতম বিজ্ঞানী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তি চরিত্রে ছিলেন সরল, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, সুবক্তা। তাঁর রসায়ন বিজ্ঞানের সারগর্ভ ভাষণের প্রতি আকর্ষণ ছিল দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের। আশুতোষ মুখার্জীর আহ্বানে বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি কোলয়ডিয়েল রসায়ন বিষয়ে আগ্রহী হন এবং কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অফ কলেজ লাইব্রেরীতে গবেষণা করে ডি. এস. সি. উপাধি লাভ করেন। পরে দেশে ফিরে এসে বিজ্ঞান কলেজে যোগ দেন। রসায়নে দ্রাব, দ্রাবক, দ্রবণ বিষয়ে নানা ধরণের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন ফ্যান্ট, অস্টওয়াল্ড, বিজ্ঞানী গ্রেহাম প্রমুখেরা। কিন্তু সাধারণ দ্রবণের ধর্ম থেকে কোনো কোনো দ্রবণের ধর্ম আলাদা হয় অর্থাৎ যে দ্রবণে দ্রবীভূত পদার্থগুলো থিতিয়ে পড়ে না, তাদের স্বতন্ত্র ধর্ম লক্ষ্য করে বিজ্ঞানী গ্রেহাম নামকরণ করেন কোলয়ডিয়েল দ্রবণ। দুধ এই জাতীয় একটি দ্রবণ। রসায়ণে কোলয়ডিয়েল দ্রবণের গুরুত্ব অসামান্য যা কোলয়েড রসায়ন নামে পরিচিত। বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার হয়। জীব ও উদ্ভিদ দেহের বহু তরল পদার্থই কোলয়েডধর্মী। কোলয়েড দ্রবণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কোলয়ডিয়েল দ্রবণের তড়িৎ ধর্ম বিষয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এর মীমাংসার জন্য ঐ বছর অক্টোবর মাসে বিলাতের ফ্যারাডে সোসাইটি এবং ফিজিক্যাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞান সভায় আমন্ত্রিত হন এই তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী। এখানে তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, যাতে প্রকাশিত হয় কোলয়েড দ্রবণে অতিকায় কণাগুলির দ্বারা যে সকল আয়ন অধিশোষিত হয় তার দ্বারা ঐ কণাগুলির বৈদ্যুতিক ধর্ম সম্পর্কিত তত্ত্ব। তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিজ্ঞান মহলের মতপার্থক্যের অবসান ঘটে। ইংল্যান্ডের প্রথম সারির পত্রিকাগুলি বিজ্ঞানী জ্ঞানেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে। তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয়গুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মান প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞান পত্রিকায়। তিনি কোলয়েড রসায়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের স্বীকৃতি লাভ করেন। নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী জিগমন্ডী কোলয়েড দ্রবণের তড়িৎ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনায় চারজন বিজ্ঞানীর গবেষণার উল্লেখ করেছেন – ফ্রয়েন্ডলিক, ফ্যায়ন্সে, মিকাইলিস এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ। দ্বৈত স্তর তত্ত্ব ও আয়নের বৈদ্যুতিক অধিশোষণ বিষয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষ মূল্যবান।

বিদেশ থেকে দেশে ফেরার পর তিনি স্বদেশে বিজ্ঞান পত্রিকার অভাব অনুভব করেন। ভারতীয় গবেষকদের গবেষণাগুলো প্রকাশের জন্য বিদেশী পত্রিকার উপর নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রসায়ন সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সভার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন দেশের রসায়ন সভাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। রসায়ন বিষয়ক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। প্রায় চার বছর পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় নিজস্ব গবেষণাগারে তিনি কোলয়েড রসায়ন বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি লন্ডনের 'কেমিক্যাল সোসাইটি' ও ভারতের এন. আই. এসের ফেলো ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্যার উপাধি দিয়েছিলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তাঁর উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন চর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এছাড়া কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানেও

তাঁর অবদান আছে। মাটিতে যে সব কোলয়েড ধর্মী বস্তু আছে তাদের মধ্যে আয়ন বিনিময় বিষয়ে তিনি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। কৃষি বিদ্যার প্রয়োজনীয় আবহাওয়া ও ভূমি সংক্রান্ত নানা তথ্য অন্তর্ভূক্ত করে তিনি বিশেষ ধরণের মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ভারতীয় কৃষি বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম অধিকর্তা। মৃত্তিকাবিদ্যা এবং খনিজ মৃত্তিকার তড়িৎ রসায়ন বিষয়ে ভারতবর্ষে গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন তিনি। রুরকির বাস্তু গবেষণা কেন্দ্রেও অধিকর্তা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এইভাবে তাঁর কর্মময় জীবন দিয়ে দেশ তথা বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ তৈরীতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। “আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই মানস সন্তানকে অনুভব করতে হবে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁর গবেষণায়, তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী, নব ভারতের এক অন্যতম রূপকার।”[৫]

ডঃ সুবোধ কুমার মিত্র: চিকিৎসা জগতে ডঃ সুবোধ কুমার মিত্র ছিলেন খ্যাতনামা। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. বি. পাশ করে বিদেশ যাত্রা করেন। প্রথমে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি, পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এবং FRCS উপাধি লাভ করেন। স্বদেশে ফিরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট পদে, পরবর্তীকালে সুপারিন্টেনডেন্ট এবং ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। জীবনের বেশিরভাগ সময় চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে অতিবাহিত করেন। দেশী-বিদেশী বহু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেও কর্মক্ষেত্র হিসাবে বাংলাকেই বেছে নেন।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয়ে ক্যান্সারের সুষ্ঠু অস্ত্রোপচার পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশেষত জরায়ুর ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রসু যা ‘মিত্র অপারেশন’ নামে খ্যাত। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। “দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার চিকিৎসায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে পরিণত হয়েছে।”[৬] ১৯৬০ সালে আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ‘মিত্র অপারেশন ফর ক্যান্সার অফ দি সারভিকস’ নামক পদ্ধতি। দেশী-বিদেশী চিকিৎসকেরা ক্যান্সার চিকিৎসায় তাঁর এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানীর বিখ্যাত সংস্থা ‘জার্মান একাদেমী অফ সায়েন্স’-এর সভ্য পদ দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কলেজ অফ অব্স্টেট্রিকস এবং গাইনোকলজিক্যাল’ বিভাগের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে বাংলায় এমন কিছু বিজ্ঞানীদের কথা জানা যায়, যাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তা বিজ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে যারা পরিচিত হয়ে ওঠেননি, তাদের কৃতিত্ব লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে। সেই সব গবেষক-বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব ও প্রতিভা চর্চার প্রয়োজন। নতুবা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কৃতিত্ব স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার সম্ভবনা থেকে যাবে। তাঁদের অবদান অনালোচিত থেকে যাবে।

তথ্যসূত্র:

১) মুখোপাধ্যায়, অত্রি, (২০১৭), স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালী বিজ্ঞানী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ, পৃ. ৮৬

২) পাত্র, সুধাংশু, (১৯৮০), ভারতের বিজ্ঞান সাধক, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, বাণীশিল্প, পৃ. ৬৯

৩) ঘোষাল, ধনঞ্জয়, সম্পা. (২০১৮), বাঙ্গালীর বিজ্ঞানচর্চাঃ প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব, কলকাতা, আশাদীপ, পৃ. ১৬৯

৪) তদেব, পৃ. ৯৮

৫) তদেব, পৃ. ১৪৬

৬) পাত্র, সুধাংশু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

দ্বিজেন্দ্র কাব্যে বাৎসল্য রস

শম্পা সরকার
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা কাব্যে বাৎসল্য রসের স্থান অল্প। দ্বিজেন্দ্রলালও বাৎসল্যরসের কবিতা অন্যান্য রসের কবিতার তুলনায় কমই লিখেছেন। কিন্তু সংখ্যা বিচারে না হলেও বৈচিত্র্যে, গাম্ভীর্যে, প্রগাঢ়তয় প্রতিটি বাৎসল্যরসের কবিতা বাংলাসাহিত্যে অতুলনীয় সম্পদ হয়ে আছে ও থাকবে। কাব্যের রসকে পণ্ডিতগণ অলৌকিক বলেছেন। কারণ কবির ব্যক্তিগত ভাব বা লৌকিক অনুভূতি সার্বজনীন আনন্দময় চেতনা রূপে রস পরিণাম লাভ করে। কিন্তু লোকোত্তর রসের মূল যে লৌকিক কোন বাসনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত থাকে; তাতে কারও সংশয় নেই। দাম্পত্য জীবনের পবিত্র প্রেমের উপর একান্ত আস্থাশীল পত্নীব্রত দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র হৃদয় পত্নীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই উপছে পড়েছিল পুত্র-কন্যার উপরে। প্রেমের কবিতা ও গান তিনি অনেক রচনা করেছেন এবং অনেকগুলি চমৎকার রসোত্তীর্ণও হয়েছে। অবশ্য পত্নী বিয়োগের পূর্বেও বাৎসল্য রসের কবিতার প্রাচুর্য নেই। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মন্দ্র কাব্যগ্রন্থের 'জীবন পথের নবীন পান্থ' কবিতাটির মধ্যে নিজের শিশুপুত্রের যে বিচিত্র লীলার বর্ণনা করেছেন। কবি বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যে, আবেগের তীব্রতায়, অনুভূতির প্রগাঢ়তায় তা বৈষ্ণব সাহিত্যের ও শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজলীলা অপেক্ষা যেন অধিকতর জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী। মাতৃহীন পুত্রকন্যার প্রতি কবির গভীর স্নেহ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'সাজাহান'ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের সাজাহানে ও চাণক্য চরিত্রের মধ্যে এবং আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের 'ঘুমন্ত শিশু', 'পুত্র-কন্যার বিবাদ', 'মাতৃহারা' প্রভৃতি কবিতায়।
সূচক শব্দ: ইমোশন, বাৎসল্য প্রীতি, শিশু পুত্রের বিচিত্র লীলা, পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা, অমৃতলোকের সন্ধান, অকৃত্রিম জীবনাবেগ, ঘরকন্নার বাণীচিত্র।

মূল আলোচনা:

কথিত আছে 'ফলেন পরিচায়তে'- ফল দেখেই গাছের পরিচয়। কবির পরিচয়ও কাব্য দেখে; দেখে ঠিক নয়, কাব্যামৃতফল চেখে। ফলের মত কাব্যের স্বাদও নানাপ্রকার। অম্ল-মধু-কটু ইত্যাদির মত হাস্য-মধুর-করুণাদি নানা রসে কাব্যফল রসাল। কবি-হৃদয় সাধারণতঃ কোন একটি রস বিশেষের পাদপ মাত্র নয়, তা বহু রসাল পাদপের উদ্যান। প্রতি মানুষের মনই এক একটি অরণ্য, নানা 'আইডিয়া' ও 'ইমোশনের'। ভাব ও ভাবাবেগে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের মনের মত এক একটা বাগান সাজিয়ে নেয়, পরিমিত সীমার মধ্যে নিজের প্রয়োজনে তার ফুল-ফল ব্যবহার করে। কিন্তু কবি মনে মনে যে বাগানখানি সাজান, তার ফুল ফল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক অর্থাৎ সকলের জন্য।

দ্বিতীয়ত: বাগানের পরিচয়, বাগানে নানা জাতীয় ফুল-ফল থাকলেও যে জাতীয় ফুল ফলের প্রাচুর্য, তার নামেই হয়। ঠিক এইরকমই কবির পরিচয় ধারাও। বহু ভাব ও রসের কাব্য রচনা করলেও সামগ্রিকভাবে কাব্যে যে যে ভাব ও রসের প্রাধান্য থাকে, কবিকে সেই ভাব ও

রসের কবি বলে পরিচয় দিলে তাঁর প্রতি অবিচার হয় না এবং তা দ্বারা অন্যান্য রসের কবিতার অস্বীকৃতিও বোঝায় না।

নানা ভাব বা ইমোশনের আধার মনুষ্য-হৃদয়। কবিরা নিজ নিজ অভিরুচি মত তার ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কতগুলি ইমোশনের প্রভাব সাধারণ ভাবেই মনুষ্য হৃদয়ে প্রবল; যেমন রতিভাব অর্থাৎ ভালবাসার আবেগ। সকল সমর্থ মানুষের মধ্যেই রতিভাবের আবেগ প্রবলতর। এইজন্য রতি ভাব থেকে কাব্যে যে রস সৃষ্টি হয়, সেই শৃঙ্গার রসের আর এক নাম আদিরস।

মানুষের ক্ষেত্রে, সমাজবদ্ধ পারিবারিক জীবনে রতিভাবটি পুরুষ নারীর একমাত্র জৈব ও যৌন সম্বন্ধের মধ্যে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না – শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, স্নেহে, সৌহার্দে, প্রীতিতে নানা মানুষের মধ্যে নানা রঙে ছড়িয়ে পড়ে। একই মানুষ একদিকে বিভিন্ন বয়সে পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধবী ইত্যাদি নানা সম্বন্ধের সূত্রে বিচিত্র রসের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়; আবার অন্যদিকে একই সময় ত্রিকোণ কাঁচের মধ্যে প্রতিস্ফুরিত বর্ণালির মত নানাজনের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ সূত্রে স্নেহ-প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বিচিত্র অনুভূতি মনুষ্য প্রবৃত্তির অন্তর্গত। পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদিত এই বিচিত্র জীবন ভঙ্গীটি একদিকে যেমন জীবন রক্ষার, অন্যদিকে কাব্যভাবের মৌলিক বীজ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রুচি অনুসারে পারিবারিক জীবনেও দেখা যায় যে, ভালবাসার বিচিত্র ও বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে কোন একটি বিশেষভাব ব্যক্তি বিশেষের জীবনে প্রাধান্য লাভ করে। কারো মধ্যে সন্তান বাৎসল্যের, কারো বা দাম্পত্য প্রেমের, কারো পিতৃ-মাতৃভক্তি, কারো বা বন্ধু প্রীতির ভাবটি প্রবল হয়ে ওঠে।

কাব্যক্ষেত্রেও কবির অভিমুখিতা ও রুচি অনুসারে রতিভাবের নানা বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে একে ভাগ করা হয়েছে সেবা, বিস্রব্ধ, বৎসলতা ও মধুরা- এই চারশ্রেণিতে এবং তদনুযায়ী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটি রসের নিষ্পত্তি হয়েছে। সামাজিক বিচার ও পারিবারিক পরিবেশে দাম্পত্য সম্বন্ধ যেমন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ, তেমনি রসের বিচারেও মধুর রস আদিরসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই কারণে প্রেমের কবিতার মধ্যে কি বৈষ্ণব পদাবলী ও কি মানুষী প্রেমে - মধুর রসের কান্তা প্রেমের গৌরব সংখ্যাধিক্যের ও প্রগাঢ়তার দিক থেকে সর্বাধিক।

কান্তা প্রেম বা মধুর রসের পর কাব্যশাস্ত্রে তথা জীবনে প্রাধান্য পায় বাৎসল্য রস। বৈষ্ণব পদাবলীতে যশোদার ও গৌরলীলায় শচীমাতার আর্তি, আর শাক্তপদাবলীতে আগমনী ও বিজয়ার সঙ্গীতে মেনকার আকুলতা বাংলা সাহিত্যে এবং মনে হয় বিশ্ব সাহিত্যে বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আধুনিক বাংলা কাব্যে বাৎসল্য রসের স্থান অল্প। দ্বিজেন্দ্রলালও বাৎসল্যরসের কবিতা অন্যান্য রসের কবিতার তুলনায় কমই লিখেছেন। কিন্তু সংখ্যা বিচারে না হলেও বৈচিত্র্যে, গাম্ভীর্যে, প্রগাঢ়তয় প্রতিটি বাৎসল্যরসের কবিতা বাংলাসাহিত্যে অতুলনীয় সম্পদ হয়ে আছে ও থাকবে। তাঁর কাব্যে পিতৃহৃদয়ের করুণ উৎসারের মধ্যে এমন একটা অনন্যতা আছে, তার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা কাব্যে বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে অভিনন্দন যোগ্য।

(২)

কাব্যের রসকে পণ্ডিতগণ অলৌকিক বলেছেন। কারণ কবির ব্যক্তিগত ভাব বা লৌকিক অনুভূতি সার্বজনীন আনন্দময় চেতনা রূপে রস পরিণাম লাভ করে। কিন্তু লোকোত্তর রসের মূল যে লৌকিক কোন বাসনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত থাকে; তাতে কারও সংশয় নেই। এই কারণে কাব্যের সঙ্গে কবিজীবন বা কবিমানসে বিশ্লেষণ আধুনিক সমালোচনার একটা অন্যতম বীজ হয়ে উঠেছে এবং এ যুক্তি সর্বদা সার্থক না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসাস্বাদনে এই রীতি অন্যতম সহায় হিসাবে কাজ করে থাকে। সূত্রানুসারে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের মধ্যে এই বাৎসল্য রস ধারার উৎস অনুসন্ধেয়।

(৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলেত থেকে এস্-আর্-এস্-এই এবং এস্-আর্-এ-সি এই দুটি ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন ২৩ বছর বয়সে (১৮৮৬, ২৩শে ডিসেম্বর) তাঁর আগেই পিতামাতা দু'জন লোকান্তরিত হয়েছেন। দেশে এসে তিনি একঘরে হলেন। তার তিন চার মাস পরে ১৮৮৭, এপ্রিল মাসে প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালাকে তিনি হিন্দুমতে বিয়ে করলেন। বিয়ের দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করলেন প্রথম পুত্র মন্টু (দিলীপ রায়) এবং দেড় বছর অন্তে প্রথমা কন্যা মায়া। তারপর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর, বিবাহের ষোল বছর অন্তে সুরবালা দেহরক্ষা করলেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স ৪০ বছর মাত্র। বিগতদার কবি আরও দশ বছর বেঁচেছিলেন এবং এই সময় তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল মাতৃহীন পুত্র-কন্যা এবং মুখ্য কর্তব্য ছিল তাদের লালন-পালন। অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবকুমার রায়কে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রে এর একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

> "... মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র। পুত্র কন্যা যদি না জন্মিত, তো হয়তো একদিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতাম। নিজের ভোগ-লালসা বড় বেশি নাই, -যা আছে তাও বোধ হয় বিনা বেশী আয়সে ত্যাগ করতে পারি। তবে সাহিত্যিক যশ এখনও আমার কাছে অতি প্রিয়; আরও, সর্বাপেক্ষা মন্টু-মায়ার মায়াই ত্যাগ করা শক্ত। সে টান বিষম টান। তাদের জন্যই আজও এই দাস্য করছি।" (গয়া, ২২ জুলাই, ১৯৬০)[১]

দাম্পত্য জীবনের পবিত্র প্রেমের উপর একান্ত আস্থাশীল পত্নীব্রত দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র হৃদয় পত্নীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই উপছে পড়েছিল পুত্র-কন্যার উপরে। প্রেমের কবিতা ও গান তিনি অনেক রচনা করেছেন এবং অনেকগুলি চমৎকার রসোত্তীর্ণও হয়েছে। কিন্তু সন্তান বৎসলতার জীবন্ত চিত্রের কাছে তা-ও যেন ম্লান হয়ে গেল। যা হোক এই জীবন ভূমিকায় দাঁড়িয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের বাৎসল্য রসের কাব্য আলোচিতব্য।

(৪)

পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা ও প্রকাশনার তালিকা: আর্যগাথা (দুইভাগ-১৮৮২ ও ১৮৯৩); একঘরে (১৮৮৯); সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার (১৮৯৫); বিরহ (১৮৯৮); ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০); প্রায়শ্চিত্ত (১৯২২); নক্সা নাটিকা প্রহসন - পাঁচখানি; বঙ্গকাব্য আষাঢ়ে (১৮৯৯); হাসির গান (১৯০০); গীতিকাব্য মন্দ্র (১৯২২); গীতি/নাটিকা পাষাণী (১৯০০); নাট্যকাব্য সীতা (পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৯০৮) ও ঐতিহাসিক নাটক তারাবাঈ (১৯০৩) — মোট ১৩টি গ্রন্থ।

পত্নী বিয়োগের পর কাব্য লিখেছেন আলেখ্য (১৯০৭) ও ত্রিবেণী (১৯১২) এবং নাটক ১১টি, প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), পরপারে (১৯১২) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত ভীষ্ম (১৯১৪), সিংহল বিজয় (১৯১৫) এবং বঙ্গনারী (১৯১৬)। প্রধান এই ১৩টি গ্রন্থের মধ্যে বাৎসল্যরসের প্রকাশ লক্ষণীয়।

অবশ্য পত্নী বিয়োগের পূর্বেও বাৎসল্য রসের কবিতার প্রাচুর্য নেই। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মন্দ্র কাব্যগ্রন্থের 'জীবন পথের নবীন পান্থ' কবিতাটির মধ্যে নিজের শিশুপুত্রের যে বিচিত্র লীলার বর্ণনা করেছেন। কবি বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যে, আবেগের তীব্রতায়, অনুভূতির প্রগাঢ়তায় তা বৈষ্ণব সাহিত্যের ও শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজলীলা অপেক্ষা যেন অধিকতর জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী। অধিকন্তু এটি লৌকিক ভাবের লোকোত্তর রস পরিণতর এক চিত্ত চমৎকারী উদ্ধৃতি। অংশ বিশেষ উদ্ধার করা যাক-

'অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব; অনিন্দ্য সুন্দর কোমল আস্য;
ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব; ক্ষুদ্র দন্তে তোর মোহন হাস্য;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া দুটি আসিস্ ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে; দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে,
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণ বিক্ষেপে, কক্ষ হতে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ
ধরিয়া আমার আঙ্গুলিটি চেপে, সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।'[২]

এই সুন্দর সূক্ষ্ম অকৃত্রিম চিত্রটির পাশে দাঁড়িয়ে পিতৃ-হৃদয়ের বাল গোপাল বন্দনা শুনুন-

"দেখেছি সন্ধ্যায় শান্ত হৈম করে রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত;
দেখেছি ঊষায় নীল সরোবরে অমল কমল শিশির লিপ্ত;
নিদাঘে, নির্মেঘ প্রভাতের ছটা; বসন্তের নব শ্যামল কান্তি;
বর্ষায়, বিদ্যুতে দীর্ণ ঘনঘটা; শরতে চন্দ্রের স্বপন ভ্রান্তি;
এ বিশ্বে সৌন্দর্য্য যেই দিকে চাই, রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট;
তেমন সৌন্দর্য্য কিন্তু দেখি নাই, শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট!"[৩]

মাতৃহীন পুত্রকন্যার প্রতি কবির গভীর স্নেহ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'সাজাহান'ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের সাজাহানে ও চাণক্য চরিত্রের মধ্যে এবং আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের 'ঘুমন্ত শিশু', 'পুত্র-কন্যার বিবাদ', 'মাতৃহারা' প্রভৃতি কবিতায়। সাজাহান ও চাণক্য চরিত্র বাঙালী সাধারণের কাছে সুপরিচিত, কাজেই সে সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক; কেবল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কবিতা সমূহ থেকেই দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক-

'ঘুমন্ত শিশু' কবিতায় পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুল ছবিটি দর্শনযোগ্য-

"এ কী খেয়াল বাছারে তোর? গাছের তলে ভূঁয়ে,
কেবল দুটো ঘাস-বিছানো ধূলার উপর শুয়ে?
মৌরুষি তোর মায়ের কোলে, বাপের বুকে হেন
ছেড়ে এসে, বাছা'রে তুই হেথায় শুয়ে কেন?
আয়রে আমার ননীর পুতুল, আয়রে আমার পাখী,
-ধূলায় কেন? আয়রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।"[৪]

'পুত্রকন্যার বিবাদ' কবিতার ব্যক্তিগত ভূমিকাটি দিলীপকুমার তাঁর 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। হয়েছিল কি, মায়া ছিল একটা রঙচঙে পিঁড়িতে বসে সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে নীচের তলায়। কবি খাচ্ছেন। আমি চাইছি ক্রমাগত সেই পিঁড়িটি-ই, কারণ আমার পিঁড়িটি রঙীন ছিল না। কবি দেখছেন আমরা চেঁচামেচি করছি, কিন্তু- এমন সময় আমার ধাক্কায় মায়া পড়ে গেল। তখন কবি আমাকে দিলেন এক দারুণ ধমক। আমি চমকে উঠে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। মায়া তখন দু'বছরের মেয়ে। আমার কাছে এসে হাত ধরে বলল- বোসো দাদা। চাই না ও পিঁড়ি- তুমিই বসো।"[৫]

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন-

"...অন্তরেতে বিরক্ত হচ্ছি ক্রমেই
কথা কিছু কচ্ছি না ক কাকে
বিচার করছি কেবল মনে মনে
ছেলে পিলে অমন করেই থাকে।"[৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সামান্য ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন, নারী হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব প্রকাশ প্রত্যক্ষ করলেন কবি—

"মরি! মরি! এ কি মধুর ছবি! ওরে শিশু! ওরে ক্ষুদ্র নারী।
তব মায়ার, এই স্বার্থ ত্যাগে পেলি কোথায় বুঝতে নাহি পারি।
কোথা গেল বৈজ্ঞানিকী বানী?- তোরে শিশু শেখায় নি ত কেহ
পৃথিবীটা স্বার্থ ভরা যদি, তুইরে কোথা পেলি এত স্নেহ?"[৭]

* * * *

পুরুষরা ত স্বার্থমগ্ন; যদি রৈত স্বার্থ নারীর প্রেমমূলে,
আমাদের এই পাপের বসুন্ধরা, পাপে ভরে উঠত কূলে।

* * * *

মনে হল- 'শুধু স্বার্থে নহে, স্বার্থ ত্যাগও আছে এ সংসারে
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি, তত খারাপ না হতেও পারে।[৮]

এইরকম বেদনার জমাট বাঁধা অশ্রু-মুক্তাখচিত আর একা কবিতা 'মাতৃহারা'।-

'বুঝবি তখন পড়বি যখন
মাতৃস্নেহের গাথা
ইতিহাসে অথবা অন্যথা;
তখন রে তোর আপন মায়ের কথা
স্বপ্নের মত ভেসে আসবে সব।
তখন বুঝবি মায়ের মূল্য
বুঝবি নাই কেউ মায়ের তুল্য;
তখন যাদু মায়ের অভাব করবি অনুভব।'[৯]

একি সান্ত্বনা না, হাহাকার! আরো উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আসলে দ্বিজেন্দ্রলাল পারিবারিক জীবনের কবি, ঘর গৃহস্থালীর কাব্যকার। বাস্তব জীবন চেতনা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির মর্ত্যলোকেই অমৃতলোককে আকর্ষণ করেছে, মাটি ছেড়ে অমৃতলোকের সন্ধানে স্বপ্ন পথে উধাও হয়নি। দাম্পত্য জীবনের যে সব টুকরো ছবি তাঁর কবিতার মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য ধারায় এবং

'বিধবা', 'বিপত্নীক', 'কারদোষ' প্রভৃতি কবিতার চরণে চরণে অকৃত্রিম জীবনাবেগের প্রস্রবণে বিচিত্র বর্ণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তা অতুলনীয়। 'নূতন খাতা' কবিতা থেকে একটি চিত্র উদ্ধার করা হল-

"ডাকে মা 'চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যা রে!
একবার তাকায় সাধে আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় সুখে কোলের চাঁদের মুখে।
হাসে মেয়ে! ডাকে শরচ্চন্দ্র মাকে,

সঙ্গে সঙ্গে - 'আ'রে চিক্ দিয়ে যা রে!
হাসে মা। এ ধরায়, চন্দ্রনীলাকাশে।
হাসে মেয়ে ; হাসে তিনের হাসি গড়ায়
নুকিয়ে নুকিয়ে আমি মেয়ের মায়ের স্বামী-
লুকিয়ে আমি কবি তুলে নিলাম ছবি।"[১০]

এই ছবি কবিপ্রিয়া সুরবালা, মায়া আর কবির নিজের জীবনের, একেবারে ব্যক্তিগত জীবনের ঘরকন্নার বাণীচিত্র। শুধু কি এইটুকু? এর মধ্যে কি নিখিল পিতৃমাতৃ হৃদয়ের বাৎসল্য ধারায় কলধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে না?

বাংলাদেশের এই শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য রসের প্রকাশ হয়েছে বৈষ্ণব ও শক্তি কাব্যধারায় যশোদা ও মেনকার মধ্যে। এই রসের ধারা মুখ্যত: মাতৃহৃদয়ের তুষার উৎস থেকেই প্রবাহিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বাৎসল্যরসের সঙ্গে তার সর্বাপেক্ষা মৌলিক পার্থক্য এই যে দ্বিজেন্দ্র কাব্যে বাৎসল্য রস নির্ঝরণী মুখ্যত: আত্মপ্রকাশ করেছে পিতৃহৃদয়ের পৌরুষ কঠোর উপল-শিলা সরাসরি বিদীর্ণ করে। শুধু সমসাময়িক কালে কেন, পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই কোন কালে পুরুষের বাৎসল্য এত বলিষ্ঠভাবে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। পিতৃহৃদয়ের প্রকাশে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্য। পারিবারিক কাব্য ও দাম্পত্য প্রেমের প্রকাশ অক্ষয় কুমার বড়াল ও ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের মধ্যেও অকৃত্রিম। কিন্তু মুখ্যত: বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান সে সকলের উপরে তা প্রশ্নাতীত।

তথ্যসূত্র:

১। রায়চৌধুরী দেবকুমার, আগষ্ট, ২০০৩, 'দ্বিজেন্দ্রলাল', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, পৃ.২১৪
২। রায় রথীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, জানুয়ারী, ২০১৪ 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', ২য় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৬৩।
৩। তদেব, পৃ. ৫৬৪।
৪। তদেব, পৃ. ৫৮০।
৫। রায় দিলীপ : উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ. ৩০০।
৬। রায় রথীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, জানুয়ারী, ২০১৪ 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', ২য় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৮০।
৭। তদেব, পৃ. ৫৮১।
৮। তদেব, পৃ. ৫৮২।
৯। তদেব, পৃ. ৫৮৭।

১০। তদেব, পৃ. ৫৮২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। রায় রথীন্দ্রনাথ: দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার, ভাদ্র ১৩, বাকসাহিত্য (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, ২য় সংস্করণ।

২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

ব্যক্তির অভিন্নতা সম্পর্কে নৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

সানিয়া ধর
গবেষক, দর্শন বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড ও ব্যক্তিত্বের মানদন্ড নিয়ে দর্শনের জগতে নানান আলোচনা বর্তমান। আমরা ব্যক্তির অভিন্নতা নিয়ে দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হই না। আমরা যখন দেখি কোন ব্যক্তি তার কোন কর্মের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পায় তখন আমরা প্রশ্ন করি না যে, যে ব্যক্তি শাস্তি পাচ্ছে বা যে ব্যক্তি পুরস্কৃত হচ্ছে সেই ব্যক্তি কাজটি করছে কিনা। আমরা নিজের ক্ষেত্রেও এরকম প্রশ্ন করি না যে, আমি কাল ঘুম থেকে উঠে আজকের মত একই ব্যক্তি থাকবো কিনা। আমরা বিশ্বাস করি, ব্যক্তির অভিন্নতা নানান পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিত থেকে যায়। কিন্তু ব্যক্তির অভিন্নতা নিয়ে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শনে নানান মতভেদ রয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তির অভিন্নতার মানদণ্ড নিয়ে যে প্রশ্নগুলি আলোচিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো কি বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় দু'জন ব্যক্তিকে একই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করি? অর্থাৎ কি বা কি কি মানদন্ড পূরণ হলে বলা যায় যে এই ব্যক্তি হল পূর্বের ব্যক্তি যে একটা সময়কাল ধরে একই আছে ? এর উত্তরে পাশ্চাত্য দর্শনের মূলত তিন ধরনের মানদন্ডের উপস্থাপনা করা হয়েছে। যথা ১) দৈহিক মানদণ্ড ২) মানসিক মানদণ্ড ৩) মিশ্র মানদণ্ড। এই প্রবন্ধে কেন দৈহিক ও মানসিক মানদন্ডের তুলনায় মিশ্র মানদন্ড বেশি গ্রহণযোগ্য তা আলোচনা করা হবে। এবং ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ডের ওপর নির্ভর করে আছে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় আলোচিত কিছু সমস্যা। যেমন - যদি ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড নির্ণয় না করা যায় বা একজন সত্তাকে ঠিক কোন সময় থেকে 'ব্যক্তি' বলা যায় তা যদি নির্ণয় না করা হয় তাহলে ভ্রূণকে ব্যক্তি বলা যায় কিনা তা বলা যাবে না। এর ফলে ভ্রূণ হত্যা বা abortion কে নৈতিক বলা যায় কিনা সেটিও নির্ণয় করা যাবে না। একইভাবে কোনো মানুষ যদি সম্পূর্ণ চেতনাহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন Coma - স্তরে থাকেন এবং তাঁর যদি সেই অবস্থা থেকে চেতন অবস্থায় ফেরার সম্ভাবনাও না থাকে সেই ক্ষেত্রে কৃপাহত্যাকে নৈতিক বলা যায় কিনা এই প্রশ্নও নির্ভর করে আছে Coma স্তরে থাকা সত্তাকে 'ব্যক্তি' বলা যায় কিনা তার ওপর। এই প্রবন্ধে ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড, ব্যক্তিত্ব থাকার মানদন্ড কী হতে পারে তা বিচারমূলক আলোচনা করে ভ্রূণকে ব্যক্তি বলা যায় কিনা, ভ্রূণহত্যা নৈতিক কিনা, যে সত্তা সম্পূর্ণ অচেতন স্তরে অর্থাৎ PVS এ আছে তাকে ব্যক্তি বলা যায় কিনা,তার কৃপা হত্যা নৈতিক কিনা, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মূল শব্দ: ভ্রূণ, কৃপাহত্যা, ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, অভিন্নতা, মানদণ্ড, মিশ্র, দৈহিক, মানসিক।

মূল আলোচনা:

(i)

কিভাবে ব্যক্তির অভিন্নতাকে আমরা জানবো, এই প্রশ্নটি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন এবং কী কী মানদন্ড পূরণ হলে কোন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়কালে একই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করা যায় এই

প্রশ্নটি একটি আধিবিদ্যক প্রশ্ন। এই প্রবন্ধে ব্যক্তির অভিন্নতা নিয়ে আধিবিদ্যক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই প্রশ্নের যে উত্তরগুলি পাওয়া যায়, তাকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - দৈহিক মানদন্ড, মানসিক মানদন্ড ও মিশ্র মানদন্ড।দর্শনের ইতিহাসে এমন কোন বিষয় পাওয়া যায় না যার কোন সমালোচনা নেই - যা সর্বজন সম্মত।ঠিক একইভাবে এই মানদন্ডগুলো নিয়েও মতভেদ বর্তমান।নানা মতভেদ থাকার দরুনই তিন প্রকার মানদন্ডের অবতারণা করা হয়েছে। আমার এই প্রবন্ধে মিশ্র মানদন্ডের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হলেও এই মানদন্ড সমালোচনার অতীত নয়। তবে, আমার মতে, মিশ্র মানদণ্ড স্বীকার করলে অপেক্ষাকৃত বেশি সমস্যা সমাধান হয় এবং কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

(ii)

যখন প্রশ্ন করা হয় কি মানদন্ড পূরণ হলে বলা যায় যে অতীত ও বর্তমানের কোন দু’জন ব্যক্তি অভিন্ন এর উত্তরে দৈহিক অভিন্নতা মতবাদের সমর্থকরা বলেন যদি এবং কেবল যদি অতীত বর্তমানে দু’জন ব্যক্তি দৈহিক অভিন্নতা থাকে তাহলে বলা যায় যে, তারা অভিন্ন ব্যক্তি। এখানে দৈহিক অভিন্নতা বলতে কেউ কেউ সমগ্র দেহ আবার কেউ কেউ কেবল মস্তিষ্কের অভিন্নতার কথা বলেছেন। এরিক.টি.ওলসন, বার্নার্ড উইলিয়ামস, জুডিথ যারভিস থমসন, - প্রমূখ দার্শনিকগণ ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হিসেবে দৈহিক মানদণ্ডকে সমর্থন করেন।

ওলসনের মতে, আমরা মনুষ্য প্রজাতির প্রাণী (Human Animal)। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে অভিন্নতার মানদন্ড এবং মনুষ্য প্রজাতির প্রাণীর অভিন্নতার মানদন্ডের কোন পার্থক্য নেই। তাঁর মতে, “humans are biological organisms”। দুটো ভিন্ন সময় X ও Xn কে অভিন্ন বলা যায় যদি তাদের মধ্যে "Life process " বা জীবনের ধারার মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নতা থাকে। তাঁর মতে, ব্যক্তির বর্তমানতার জন্য মানসিক নিরবিচ্ছিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর বিরুদ্ধে একটি মুখ্য সমালোচনা হল, যেহেতু ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হিসেবে মানসিক অভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ নয় তাই Embryo ও Fetus অর্থাৎ প্রথম স্তরের ও দ্বিতীয় স্তরের ভ্রূণ এবং Pvs অর্থাৎ সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় যারা থাকে, যাদের আর চেতন অবস্থায় ফেরার সম্ভাবনা নেই - তাদের একই নৈতিক মূল্য স্বীকার করতে হয়। এবং একই ভাবে শুক্রাণুকেও সম্ভাব্য ব্যাক্তি বলে একই গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। যা সাধারণ জ্ঞান সম্মত নয়। এবং এই মত স্বীকার করলে নানান দার্শনিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আবার ওনার মতে, মস্তিষ্কের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তার সাথে সাথে মানসিক বিভিন্ন অবস্থা যেমন-বিশ্বাস, ইচ্ছা ইত্যাদি অন্য কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করালেও পূর্বের জীবনধারা (Life process) অব্যাহত থাকায় ব্যক্তির অভিন্নতার কোন পরিবর্তন হয় না। উনি ব্যাক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হিসেবে দৈহিক মানদন্ডকে একমাত্র গুরুত্ব দিয়েছেন।

বার্নার্ড উইলিয়ামসও ব্যাক্তির অভিন্নতার মানদন্ড বলতে দৈহিক মানদন্ডকে গুরুত্ব প্রদান করলেও মানসিক মানদন্ডকে সম্পূর্ণরূপে গুরুত্বহীন বলেননি। তবে তাঁর মতে, কেবলমাত্র মানসিক অভিন্নতার মানদন্ড দ্বারা ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড নির্ণয় করা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি চিন্তন পরীক্ষনের সাহায্যে তিনি মানসিক অভিন্নতা মানদন্ডের সীমাবদ্ধতা ও দৈহিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও উইলিয়ামসের প্রদত্ত মানদন্ড সমালোচনার অতীত নয় তা এই প্রবন্ধেই আলোচনা করা হবে। তাঁর মতে, দৈহিক অভিন্নতা ছাড়া ব্যক্তির অভিন্নতা নির্ণয় করা যায় না। যদি কোনো ব্যক্তি চার্লস, হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে নিজেকে একজন অতীতের ব্যক্তি গাইফক্স বলে মনে করতে শুরু করেন এবং তিনি যদি দাবি করেন

সেই অতীতের ব্যক্তির সমস্ত স্মৃতি তার বর্তমানে আছে তাহলে তাকে মানসিক অভিন্নতা সমর্থনকারীরা বলবেন এই চার্লস নামক ব্যক্তি বর্তমানে গাইফক্স। কারণ গাইফক্সের স্মৃতি তার আছে। কিন্তু যদি সেই সময় আরো একজন ব্যক্তি- রবার্ট নিজেকে গাইফক্স বলে দাবি করেন এবং তারও বক্তব্য অনুযায়ী ধরে নিতে হয় যে তারও গাইফক্স এর সমস্ত স্মৃতি আছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, একই সময় দু'জন ব্যক্তিকে যেহেতু গাইফক্স বলা যায় না, কারণ একই সময় একই স্থানে দুজন ব্যক্তি এক ব্যক্তি হতে পারে না। তাহলে কে গাইফক্স? এর উত্তরে বার্নার্ড উইলিয়ামস দৈহিক অভিন্নতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই দু'জন ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তির সাথে গাইফক্স এর দৈহিক অভিন্নতা বা দৈহিক ক্রমানুবর্তিতা থাকবে সেই ব্যক্তি হবে গাইফক্স। এখানে কেবল মানসিক অভিন্নতা দিয়ে কে গাইফক্স তা নির্ণয় করা যায় না বলে তিনি মনে করেন। তাই, দৈহিক অভিন্নতার মানদন্ড আবশ্যিক।

আবার থমসন একটি চিন্তন পরীক্ষণ এর সাহায্যে ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হিসেবে দৈহিক অভিন্নতার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর "পিপল এন্ড দেয়ার বডিস" নামক প্রবন্ধে চারটি ঘটনার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে মানসিক অভিন্নতা মানদন্ডের দ্বারা ব্যক্তির অভিন্নতা নির্ণয় করা যায় না। নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো -

এক : ধরা যাক, ব্রাউন নামক একজন ব্যক্তির মস্তিষ্ককে রবিনসন নামক একজন ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করানো হলো। এর ফলে যে ব্যক্তি ব্রাউনের মস্তিষ্ক ও রবিনসনের দেহের সংমিশ্রণে তৈরি হলো সে নিজেকে ব্রাউন বলেই চিহ্নিত করবে, কারণ তার ব্রাউনের সমস্ত স্মৃতি বর্তমান এবং তার সাথে সাথে সে এটাও জানবে যে তার দেহটা রবিনসনের।

দুই : এই ক্ষেত্রে ব্রাউন এর মস্তিষ্ক রবিনসনের দেহে প্রবেশ করালেও যাতে ব্যক্তিটির রবিনসনের স্মৃতি থাকে তাই একটা ওষুধ ব্যবহার করা হলো। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেকে রবিনসন বলেই চিহ্নিত করবে, যেহেতু তার রবিনসনের স্মৃতি আছে। কেউ যদি এই ব্যক্তিকে ব্রাউন বলতে চান তবে তার ভিত্তি হবে ব্রাউনের মস্তিষ্ক।

তিন : যদি ব্রাউনের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক রবিনসনের দেহেতে প্রবেশ না করিয়ে কেবল ব্রাউনের স্মৃতিগুলি রবিনসনের দেহে প্রবেশ করানো হয় তাহলে ব্যক্তিটির ব্রাউনের স্মৃতি রবিনসনের মস্তিষ্ক ও সম্পূর্ণ দেহ থাকলেও সে নিজেকে ব্রাউন বলেই চিহ্নিত করবে।

চার: যদি কোন ব্যক্তি শরীরে অন্যের মস্তিষ্ক প্রবেশ না করেও স্মৃতি, ইচ্ছা, বিশ্বাস প্রবেশ করানো যায় তাহলে কোন একজন ব্যক্তির বদলে একাধিক ব্যক্তির মধ্যেও কোন একজন ব্যক্তির স্মৃতি, ইচ্ছা ইত্যাদি প্রবেশ করানো যাবে। এতে কোন বিরোধিতা নেই। তাই, রবিনসনের স্মৃতি ইত্যাদি যদি ব্রাউনের মধ্যে প্রবেশ করানো যায় তবে তা ডিকেনশনের মধ্য প্রবেশ করানো যাবে। এবার, দু'জন ব্যক্তি যদি নিজেকে ব্রাউন বলে দাবি করে তাহলে কে ব্রাউন তা নির্ধারণ করার জন্য কেবল মানসিক অভিন্নতা মানদন্ড দিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

তাই মানসিক অভিন্নতা মানদন্ডকে ব্যক্তির অভিন্নতা নির্ণয়ের মানদন্ড হিসাবে পর্যাপ্ত বলা যায় না। থমসনের মত, একজন ব্যক্তিকে একটি সময়কাল ধরে একই ব্যক্তি বলা যায় যদি এবং কেবল যদি তার দেহ অভিন্ন থাকে এবং দেহ চেতনার আশ্রয় হিসেবে থাকে।

দৈহিক অভিন্নতা মানদন্ড সমালোচনার অতীত নয়। দেহ সর্বক্ষণ পরিবর্তনশীল। এত পরিবর্তনের মধ্যেও দেহর ক্রমানুবর্তিতাকে ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হিসেবে ধরলে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে দৈহিক অভিন্নতা দিয়ে ব্যক্তির অভিন্নতা নির্ণয় করা যায় না। যেমন

- যদি কোন 'X' নামক ব্যক্তির মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ 'Y' নামক ব্যক্তিকে ও অর্ধেক অংশ 'Z' নামক ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করানো হয় তাহলে ফলস্বরূপ 'Y' ও 'Z' ব্যক্তিকে আর যথাক্রমে 'Y; ও 'Z' ব্যক্তি বলা হবে নাকি দু'জনকে 'X' ব্যক্তি বলা হবে, নাকি কোন একজনকে 'X' ব্যক্তি বলা হবে তার কোন সদুত্তর দৈহিক অভিন্নতা মানদন্ডের স্বপক্ষে যারা যুক্তি প্রদান করেন তারা দিতে পারেন না। 'Y' ও 'Z' ব্যক্তির মধ্যে তাদের দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মস্তিষ্কটি 'X' ব্যক্তির। তাই তাদের 'Y' ও 'Z' বলা যায় না। আবার এই 'X' ব্যক্তির মস্তিষ্ক একসাথে দু'জনের মধ্যে থাকায় দুজনকে 'X' বলা যাবে না। দেহের কোন অংশটির অভিন্নতার দ্বারা ব্যক্তির অভিন্নতাকে নির্ণয় করা যায় তা দৈহিক অভিন্নতার সমর্থকরা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না।

(iii)

জন লক মানসিক অভিন্নতা মানদণ্ডের সমর্থক। তিনি তার "অ্যান এসে কনসর্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং" নামক গ্রন্থে "আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডাইভারসিটি" নামক অধ্যায়ে এই বিষয় নিয়ে নানান আলোচনা করেছেন তাঁর মতে, 'মানুষ' ও 'ব্যক্তি' আলাদা এবং এদের অভিন্নতার মানদন্ডও আলাদা। মানসিক নানা পরিবর্তন হলেও কেবল দৈহিক অভিন্নতা থাকলেও আমরা দু'টো সময়ে কোনো একজনকে অভিন্ন মানুষ বলতে পারি। কিন্তু ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হলো বুদ্ধিবৃত্তি, চেতনা, আত্মচেতনা। এগুলোর ক্রমানুবর্তিতা না থাকলে দু'টো ভিন্ন সময়ে দু'জন ব্যক্তিকে অভিন্ন বলা যায় না। তাঁর মতে, স্মৃতির ক্রমানুবর্তিতা হল ব্যক্তির অভিন্নতার প্রাথমিক শর্ত। কোন ব্যক্তি যদি তার অতীতের করা কর্মকে বর্তমানে স্মরণ না করতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তিকে আর সেই কাজের জন্য দায়ী বলা যাবে না, কারণ এখানে পূর্বের ও পরের ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তি, তারা একই মানুষ হতে পারে কিন্তু একই ব্যক্তি হতে পারে না। লকের মতে স্মৃতি অথবা মানসিক ক্রমানুবর্তিতা ব্যক্তির অভিন্নতার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত। লক ছাড়াও জোসেফ বাটলার, থমাস রিড - এই মানদণ্ডের সমর্থক।

পূর্বে দৈহিক মানদন্ডের আলোচনায় মানসিক মানদন্ডের নানান সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও, একই সময় দু'জন ব্যক্তি একই ব্যক্তির স্মৃতির অধিকারী হিসেবে নিজেদের দাবী করলে কোন ব্যক্তির বক্তব্যকে সঠিক ধরা হবে তাও কেবল মানসিক অভিন্নতাবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, এক ব্যক্তির মনকে অন্য ব্যক্তি সরাসরি জানতে পারে না। এছাড়া একজন ব্যক্তি কোনো কর্ম করে যদি তা স্মরণ না করতে পারে বা তার দায় যদি সে অস্বীকার করে সেক্ষেত্রেও মানসিক অভিন্নতা মতবাদকে সমর্থন করলে বলতে হয় যে তার কর্মের দায় তার আর নয় কারণ সে তার কৃতকর্মকে স্মরণ করতে পারে না, সে আর এক ব্যক্তি নয়। - এটি সাধারণমত সম্মত নয়।

(iv)

দু'প্রকার মানদন্ডের নানা সমস্যা বর্তমান থাকায় অপর একপ্রকার মানদন্ডের অবতারণা করা হয়েছে, যা হলো মিশ্র মানদন্ড।

এই মানদন্ডে সমর্থকদের মতে, কোন দু'টি ভিন্ন সময় দু'জন ব্যক্তিকে অভিন্ন বলা যায় যদি তাদের মস্তিষ্ক ও মানসিক অভিন্নতা থাকে। এখানে মস্তিষ্ক যেহেতু দৈহিক বিষয় এবং তার সাথে মানসিক বিষয়কে যুক্ত করার জন্য এই মানদণ্ডকে মিশ্র মানদন্ড বলা হয়। মস্তিষ্ক দেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং চেতনার আধার। কিন্তু কেবলমাত্র মস্তিষ্ককে ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড বলা যায় না তা পূর্বে বলা হয়েছে। রিচার্ড গেইল মিশ্র মানদন্ডের সমর্থক।

তিনি ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হিসেবে ৫০ শতাংশের বেশি মস্তিষ্কের অংশ ও মানসিক বিভিন্ন অবস্থার ক্রমানুবর্তিতাকে বলেছেন। এই মানদণ্ড অনুযায়ী কোন দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একই সময় ৫০ শতাংশের বেশি মস্তিষ্কের অংশ থাকতেই পারে না। একজন ব্যাক্তির মধ্যে ৫১ শতাংশ অংশ থাকলে অন্যজনের মধ্যে ৪৯ শতাংশের বেশি অংশ কোনোভাবেই থাকতে পারে না, সেখানে বিরোধিতা হয়। তাই পূর্বে চিন্তন পরীক্ষণে যে সমস্যা গুলো দেখা যাচ্ছিল তার সদুত্তর এখানে পাওয়া সম্ভব।

দৈহিক অভিন্নতা মতবাদের সমর্থক বার্নার্ড উইলিয়ামস গাইফক্স ও রবার্টের যে চিন্তন পরীক্ষনের সমস্যার উল্লেখ করেছেন যেখানে একই সাথে দু'জন ব্যক্তি নিজেকে গাইফক্স বলে দাবি করেছে সেখানে কোন ব্যক্তি গাইফক্স তার উত্তরে এই মানদণ্ডের সমর্থকগণ বলবেন, যার মধ্যে গাইফক্সের ৫০ শতাংশের বেশি মস্তিষ্কের অংশ ও মানসিক অবস্থার ক্রমানুবর্তিতা আছে সেই গাইফক্স।

আবার থমসন যে চিন্তন পরীক্ষনের দ্বারা মানসিক মানদন্ডের সমালোচনা করেছেন সেখানেও এই মিশ্র মানদন্ড দ্বারা সমাধান সম্ভব। রবিনসন ও ডিকেনশন এর ক্ষেত্রে যার মধ্যে ব্রাউন এর মস্তিষ্কের ৫০ শতাংশের বেশি অংশ ও মানসিক অবস্থার অভিন্নতা থাকবে সেই ব্রাউন। একই সাথে রবিনসন ও ডিকেনশনের মধ্যে তা থাকতে পারে না।

আবার, ওলসন প্রদত্ত মানদন্ড স্বীকার করে নিলে শুক্রাণু, ভ্রূণ (Embryo, fetus), সম্পূর্ণ অচেতন স্তরে থাকা সত্তাকে (Pvs) 'ব্যাক্তি' হিসেবে স্বীকার করে ব্যাক্তির মতোই নৈতিক মূল্যবান হিসেবে গণ্য করার যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধানও মিশ্র মানদন্ড স্বীকার করলে সম্ভব হয়।

ব্যাক্তির ক্ষেত্রে চেতনা, বিচারবুদ্ধি ও তার আধার হিসেবে মস্তিষ্ক দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলোর দ্বারাই একজন ব্যক্তিকে অ - ব্যাক্তি (Non - person) থেকে পৃথক করা যায়। তাই, মিশ্র মানদন্ড দ্বারা যেমন ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, ঠিক তেমন ব্যক্তিকে অ - ব্যাক্তি থেকে পৃথক করার মানদন্ডও নির্ণয় করা যায়। এবং এই মানদন্ড স্বীকার করার ফলে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় আলোচিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও লাভ করা যায় যা নিম্নে আলোচিত হবে।

তবে, মিশ্র মানদণ্ড দিয়ে পূর্বে উল্লেখিত নানা সমস্যাগুলো সমাধান হলেও মিশ্র মানদন্ডের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন ওঠে যে, কোন ব্যক্তির যদি ৫০ শতাংশের বেশি মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে কি তাকে আর পূর্বের ব্যক্তি বলা যাবে ?

আমার মতে, ধরাযাক, একজন X নামক ব্যাক্তির কোনো দুর্ঘটনায় ৭০ শতাংশ মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সে বর্তমানে পূর্বের ৩০ শতাংশ মস্তিষ্কের অধিকারী। যতক্ষণ না অপর কোনো ব্যক্তি (Y) যে ব্যাক্তির মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেই ব্যক্তি (X) হওয়ার দাবী রাখছে ততক্ষণ পর্যন্ত ৫০ শতাংশর কম-বেশি এমনকি ৭০ শতাংশ মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাকে আমরা অন্য ব্যক্তি বলবো না, সে পূর্বের ব্যক্তিই (X) থাকবে। অর্থাৎ একসাথে দু'জন ব্যাক্তি একই ব্যাক্তির ৫০ শতাংশের বেশি মস্তিষ্কের অধিকারী হিসেবে যতক্ষণ না দাবী করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যাক্তির মধ্যে যতটুকুই মস্তিষ্কের অংশ ও মানসিক অভিন্নতা থাকুক না কেন তাকে আমরা ভিন্ন ব্যাক্তি বলবো না। যদি, কোনো ব্যাক্তির তার থেকে বেশি সেই মস্তিষ্কের অধিকারী হয় তখনই দু'জনের মধ্যে যার মধ্যে বেশি পরিমাণে মস্তিষ্কের অংশ থাকবে তাকে পূর্বের ব্যাক্তি বলা হবে। তাই, মিশ্র মানদন্ডর বিরুদ্ধে এই সমালোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু কোনো ব্যাক্তির ৫০

শতাংশর বেশি মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়ে গেলে, তার মানসিক অবস্থার কোন ক্রমানুবর্তিতা না থাকলে তাকে আর 'ব্যক্তি' (Person) বলা যায় কিনা বা তার 'ব্যক্তিত্ব' (Personhood) থাকবে কিনা তা অপর এক গবেষণার বিষয়।

(v)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্যক্তির অভিন্নতার মানদণ্ড হিসেবে মিশ্র মানদণ্ডকে স্বীকার করে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় আলোচিত নানান সমস্যার উত্তর প্রদান করা সম্ভব। যেমন, ভ্রূণ হত্যা নৈতিক কিনা, বা কৃপাহত্যা নৈতিক কিনা ইত্যাদি। এই ৫০ শতাংশের অধিক মস্তিষ্ক ও চেতনা অভিন্নতার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ব্যক্তি বলে যাকে চিহ্নিত করি তার চেতনা, বিচার বুদ্ধি, কোনো কাজ করার জন্য কর্তা হিসেবে নিজেকে দেখা, ইত্যাদি থাকে বলেই তাকে ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করি। এই প্রতিটা ক্ষেত্রে চেতনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আবার চেতনার আশ্রয় হিসেবে মস্তিষ্ক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই বলা যায় ভ্রূণের যেহেতু সেই চেতনা নেই বা তার পরিপূর্ণ মস্তিষ্ক নেই এবং বিচারবুদ্ধি নেই তাই ভ্রূণকে ব্যক্তি বলা যায় না। কেউ কেউ বলতে পারে যে ভ্রূণ ব্যক্তি না হলেও সম্ভাব্য ব্যক্তি। তাই তার নৈতিক মূল্য ব্যক্তির সমান। কিন্তু এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। সম্ভাব্যতা আর বর্তমানতার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন ভোট প্রদানকারী যে সুবিধা পেতে পারে একই সুবিধা যেমন সম্ভাব্য ভোট দাতা পেতে পারেনা, ঠিক তেমন একজন ব্যক্তি যে সুবিধা পেতে পারে, একজন সম্ভাব্য ব্যক্তি সেই সুবিধা পেতে পারেনা। মা ও ভ্রুনের মধ্যে মায়ের অধিকার সব সময় বেশি থাকে যেহেতু মা একজন ব্যক্তি। তারমানে এই নয় যে যেকোনো কারণে ভ্রূণ হত্যাকে নৈতিক বলা যাবে। কিন্তু ভ্রুণ হত্যা আর যে কারণেই অনৈতিক হোক না কেন 'ভ্রুণ একজন ব্যক্তি' তাই ভ্রূণ হত্যা অনৈতিক এ কথা বলা যায় না। কারণ, ভ্রুণ কোন ব্যক্তি নয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যেসব সত্তা সম্পূর্ণ অচেতনস্তরে থাকে অর্থাৎ PVS স্তরে থাকে তাদের ক্ষেত্রে তাদের ইউথেনেসিয়া বা কৃপাহত্যা নৈতিক কিনা। এই বিষয়েও সিদ্ধান্তে আসতে হলে দু'টো প্রশ্ন করার কথা Bryant ও Lavalle বলেছেন যা আমার মতে যথাযোগ্য-

১) তারা কি সাধারণ বেঁচে থাকার অর্থে বেঁচে আছে?

২) তাদেরকে কৃত্রিম উপায়ে খাবার খাওয়াতে হচ্ছে?

এই দু'টি প্রশ্নের মধ্যে যদি প্রথম প্রশ্নটির উত্তর 'না' ও পরের প্রশ্নটির উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তাহলে আরো দুটি প্রশ্ন সে ক্ষেত্রে করা হয়। যথা -

৩) তাদের সুস্থ হবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

৪) তাদের কি কাপ বা চামচ করে খাবার দিলে তারা খেতে পারে?

এই দু'টো প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে তার চিকিৎসা বন্ধ করা হবে না এবং উত্তর যদি না হয় তাহলে চিকিৎসা বন্ধ করা হবে। এর সাথে বর্তমানে অপর একটি প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেটি হল- এই অবস্থায় চিকিৎসা কি তার কোনো উপকার দিচ্ছে নাকি তার কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে? যদি উপকার হয় তাহলে চিকিৎসা চলবে, যদি উপকার না হয় তাহলে চিকিৎসা বন্ধ করার মাধ্যমিক কৃপাহত্যা করা হবে।

কৃপাহত্যা অনেক প্রকারের হয়। চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া, কোনো ওষুধের মাধ্যমে হত্যা করা ইত্যাদি। এই বিষয়ে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় যে ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যার মস্তিষ্ক আর সচল নয় এবং সচল

হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন অবস্থায় রোগীকে আর ব্যক্তি বা Person বলা যায় না। কারণ ব্যক্তি হতে গেলে যে মানদন্ডগুলো পূরণ হতে হয় তা এক্ষেত্রে হয় না। তাই এই অবস্থায় থাকা কোনো সত্তার ক্ষেত্রে কৃপাহত্যা অনৈতিক হওয়ার কোনো কারণ আর যাই হোক না কেন 'সে ব্যক্তি বলে তার হত্যা করা যাবে না'- এই কারণ প্রযোজ্য হবে না।

ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ডের সাথে যুক্ত হয়ে আছে ব্যক্তিত্ব বা Personhood এর মানদন্ড। আবার ব্যক্তিত্বের মানদন্ডের উপর নির্ভর করে আছে ভ্রুণ বা PVS এ থাকা কোন রোগীকে ব্যক্তি বলা যায় কিনা সেই প্রশ্ন। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হল যে ব্যক্তির অভিন্নতার মানদন্ড হলো ৫০ শতাংশের বেশি মস্তিষ্ক ও চেতনা এবং ব্যক্তিত্বের মানদন্ড হলো চেতনা ও বিচার বুদ্ধি। ভ্রূণ বা PVS এ থাকা রোগী কোন ব্যক্তি নয় কারণ তাদের ব্যক্তিত্ব নেই। তাদের হত্যা অন্য যেকোনো কারণে নৈতিকভাবে অনুচিত হলেও ‘ব্যক্তি হওয়ার কারণে তাদের হত্যা করা যায় না’- তা বলা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জি:

- Copleston, F. (1946). A History of Philosophy. (Volume I). UK : Doubleday.
- Olson, E. (1994), “Human People or Human Animals?” in Philosophical Studies, Kluwer Academic Publisher, Netherlands.
- Williams, B. (1973), Problems of the Self, Cambridge University Press, UK.
- Harris, J. (1985). The Value of Life : An Introduction to Medical Ethics. London and New York : Routledge.
- Locke, J. (1829), An Essay Concerning Human Understanding, Hackett Publishing.
- Tooley, M. (2009). "Personhood", in Helga Kushe, Peter Singer (Eds.), A Companion to Bioethics, (pp. 129-139). Malden : Blackwell Publishing Ltd.
- Swinburne, R. and Shoemaker, S. (1984). Personal Identity. Oxford : Blackwell.
- Thomson, J. (2008). "People and their bodies", in Theodore Sider, John Hawthorne & Dean W. Zimmerman (Eds.), Contemporary Debates in Metaphysics, (pp. 153-176). Blackwell.
- Perfit, D. (2008). "Persons, Bodies, and Human Beings", in Theodore Sider, John Hawthorne & Dean W. Zimmerman (Eds.), Contemporary Debates in Metaphysics, (pp. 177-209). Blackwell.
- Noonan, H.W. (1989). Personal Identity. London and New York : Routledge Taylor & Francis Group.
- Spinoza, B. (1954). Ethics, New York : Hafner Publishing Company.
- Lin, M. (2005). "Memory and Personal Identity in Spinoza". Canadian Journal of Philosophy, (pp. 243-268). University of Toronto.
- Dasti, M.R. (Ed.) ,(2013). Free Will, Agency and Selfhood in Indian Philosophy. New York : Oxford University Press.
- Siderites, M. (2007). Buddhism as Philosophy. UK : Ashgate Publishing Limited.
- Hatfield, Gary. (2003), Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and Meditations. Routledge.
- Bryant, J & La,Velle,(2019), Introduction to Bioethics, Wiley, UK.

‘নিমগাছ’ : জীবনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী আখ্যান

অরূপ পলমল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গর্ভ: জেনারেল ডিগ্রি কলেজ অ্যাট গোপীবল্লভপুর- টু

সারসংক্ষেপ: বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বনফুল এক বিশিষ্ট নাম। তাঁর অমর সৃষ্টি ছোটগল্প বা অনুগল্পগুলি। ‘নিমগাছ’ গল্পটি এমনই একটি প্রতীকী গল্প বা রূপক গল্প। ‘নিমগাছ’ গল্পটিকে গ্রহণ করলে দেখা যাবে কবির অনুভব আর গল্পকারের ভাবনার সমন্বয়ে যেন জীবনের চরম সত্যকে উদঘাটিত করেছেন শিল্পী। মাত্র এক পৃষ্ঠার পরিমিত পরিধি সত্ত্বেও জীবনের বৃহত্তর পরিচয়কে যেন মুক্ত প্রসারিত করেছেন অনন্য এই গল্পে। বনফুলের এক অনবদ্য সৃষ্টি ‘নিমগাছ’ গল্পে যেন কবিতার রূপাঙ্গিকে মানব জীবনের সীমাবদ্ধতার চিরন্তন আর্তিটুকু আভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। গল্পটিতে গাছ হল বধূর জীবন ধর্মের প্রতীক প্রতীম অস্তিত্ব। গল্পের জীবন-সত্য রূপ কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে নিমগাছের বৈশিষ্ট্য ধরে একমাত্র বধূর বাস্তবতাতেই ব্যঞ্জনা গর্ভ করেছেন গল্পকার। তাই গল্পের চরিত্র ও লেখকের লক্ষ্য পরিণামে হয়েছে একাকার। গল্পে নায়িকা ও গল্পের কেন্দ্রীয় জীবন-সত্য হয়েছে মহৎ শিল্পের ব্যঞ্জনায় একাকার, একাত্ম। এখানেই নিমগাছ নামক প্রতীকটির শিল্প- সার্থকতা। বনফুলের অধিকাংশ গল্পের মতো এ গল্পও প্রতীকী। অত্যল্প পরিসরে জীবনের গভীর অথচ বিস্তৃত অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে এছাড়া আর উপায় নেই। এবং তাঁর গল্পের ভাষা এই কারণেই দ্ব্যর্থক, বহুমাত্রিক অর্থে বিভূষিত, খানিকটা এইজন্য লিরিক কবিতার আত্মীয়ও বটে। এই ধরনের গল্পাণুতে কোনো ভার নেই, বিশেষ একটি ভাবকে মুক্তি দিয়েই যেন গল্পগুলি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারপর পাঠক মনে গল্পের আরেক ধরনের শুরু। প্রচলিত ছোটগল্পের আঙ্গিক থেকে ‘নিমগাছ’ মুক্ত, ছোটগল্পের নবীন এক গঠনের দিকে তাঁর ইশারা।

সূচক শব্দ: প্রতীকী গল্প, জীবনের চরম সত্য, বহুমাত্রিক, একমুখিনতা, মানবজীবনের সঙ্গে একাত্মতা।

এক

“পেশায় চিকিৎসক শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে তিনি পরিচিত ‘বনফুল’ ছদ্মনামে, বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পের এই নব-আঙ্গিকের জন্যে। উপন্যাস নাটক কবিতা কিংবা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর গতিবিধি স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস হলেও বাংলা সাহিত্যের বনফুলকে ‘বড়ো’ করেছে তাঁর ‘ছোট’ গল্প।”[১]

কথাশিল্পী বনফুল বিশেষ ভাবেই ছিলেন মানব-জীবন-সন্ধানী। জীবন নিয়ে তাঁর নানা কৌতূহল নানা জিজ্ঞাসা গল্পের বিচিত্র রূপাধারে নানামুখী আবেদন নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তারও মধ্যে এক বিশেষ ধরণের গল্পে শিল্পীর মানুষ-দেখা চোখের চমকপ্রদ অভিজ্ঞান একের পর এক উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিরূপের অনন্যতা ও অসামান্যতা গাঢ় উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিফলিত হয়েছে বনফুলের গল্পে- সে এক বিশেষ ধরণের সৃষ্টি। লেখক নিজে বলেছিলেন-

> “জীবনের নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতে প’ড়ে নানা রকম মানুষ দেখেছি আমি। মানবজীবনের বৈচিত্র্যই আমাকে সব চেয়ে বেশী ইন্সপায়ার করে।”[২]

অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে বলেছেন-

> "মানুষই আমার বিষয় এবং প্রেরণা। আমার লেখার একটা মেসেজ বা বলবার কথা আছে। সেটা হল মানুষ বহু বিচিত্র। মানুষকে অনুসরণ করে আমি আমার লেখার নিত্য নতুন বিষয় ও ভঙ্গি আবিষ্কার করেছি।"[৩]

আর মানুষকে অনুসরণ করায় বনফুলের প্রধান পাথেয় ছিল তাঁর নিগূঢ় পর্যবেক্ষণী শক্তি। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন-

> "মানুষের বিচিত্র স্বভাবের গভীরে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি চালনার ক্ষমতাই তাঁকে কবিতার ভাবরাজ্য থেকে প্রথমেই টেনে নিয়ে গেছে ছোটগল্পের দিকে।"[৪]

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) রচিত 'নিমগাছ' অণুগল্পটি বা প্রতীকীগল্প বা রূপকগল্পটি 'অদৃশ্যলোক' (১৯৪৬) গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। ছোট-মাঝারি-বড় ২৯টি বাক্যে গল্পটি সমাপ্ত। বনফুলের বিবিধ-বিচিত্র গল্পমালায় এটি একটি বিশিষ্ট অনুগল্প হিসেবে স্বীকৃত।

দুই

'নিমগাছ' গল্পটি একটি প্রতীকী গল্প বা রূপক গল্প। আপাতচোখে গল্পে ধরা পড়ে, নিমগাছের বর্ণনা, এর পাতা, বাকল, ছায়া ইত্যাদির বাহ্যিক উপকারিতা। কবিরাজ তার চিকিৎসার কাজে, সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নিমগাছকে অনবরত ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কেউ এই গাছের সামান্যও যত্ন নেয় না।

একজন কবি একদিন নিমগাছের গুণ ও রূপের প্রশংসা করে। কবি যখন অন্য দশজনের মতো না হয়ে নিমগাছটির প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি দেন ঠিক তখনই নিমগাছটির ভালোলাগা কবির সাথে চলে যেতে চাইলো কিন্তু পারলো না। মাটির গভীরে তার শিকড়। ততদিনে তার শিকড় মাটির গভীরে চলে গেছে। গল্পের আসল সত্য বা রহস্য এখানেই বলে মনে করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক-

> "'নিমগাছ' গল্পটিকে গ্রহণ করলে দেখা যাবে কবির অনুভব আর গল্পকারের ভাবনার সমন্বয়ে যেন জীবনের চরম সত্যকে উদঘাটিত করেছেন শিল্পী। মাত্র এক পৃষ্ঠার পরিমিত পরিধি সত্ত্বেও জীবনের বৃহত্তর পরিচয়কে যেন মুক্ত প্রসারিত করেছেন অনন্য এই গল্পে।"[৫]

নিমগাছের সাথে যা করা হয় তা আপাতচোখে ভেসে উঠলেও নিমগাছটিও বাড়ির বউ। নিমগাছ যেমন উপকারী বউটিও তেমনি উপকারী। নিমগাছটিকে যেমন ব্যবহার করা হয়, বউটিকেও তেমনি ব্যবহার করা হয়। বাড়ির প্রতি তার ভালোবাসা-দায়দায়িত্ব গভীর থেকে গভীরতর পৌঁছে গেছে। গাছটি যেতে পারে না। নিমগাছের পরিবর্তে বউটি এসেছে বলেই গল্পটি হয়েছে অনুগল্প বা রূপকগল্প। এ ক্ষেত্রে সমালোচকের মতামত যথার্থ বলে পরিগণিত হয়-

> "'নিমগাছ' গল্পের কেন্দ্রীয় সত্য ও লক্ষ্য এক বাস্তব গৃহবধূর জীবন যন্ত্রণা ও অসীম শূন্যতার অসহায় বেদনা। গোটা গল্পে একমাত্র চরিত্র ওই গৃহবধূ। গল্পের নিমগাছ আসলে এমন এক গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মীমন্ত বধূর জীবন ও হৃদয়ের কঠিন প্রতীক।"[৬]

গল্প সমাপ্তির এই শেষ চমকেই 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী- বউটার' ঠিক এই দশা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পের তাৎপর্য, এর পূর্ব পর্যন্ত ছিল কেবল গল্প রচনার প্রস্তুতি। দৈনন্দিন শত প্রয়োজনে সীমায় বাঁধা পড়ে ও প্রয়োজনের আন্তরিক মুক্তি নাগালের বাইরে থেকে গেলেও নিমগাছের প্রাণিক সত্তার অস্তিত্ব যেন লুপ্ত হয়ে যায় না,- তেমনই 'পাশের বাড়ির

বউটার' মন থেকেও হারিয়ে যায় না তার জীবনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা- নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চাওয়া এবং পারার প্রত্যাশা। অথচ ব্যক্তিজীবনে সেও অবহেলিতা, আবর্জনা স্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা নিমগাছের মতো। সমালোচকের মতে –

> "বনফুলের এক অনবদ্য সৃষ্টি 'নিমগাছ' গল্পে যেন কবিতার রূপাঙ্গিকে মানব জীবনের সীমাবদ্ধতার চিরন্তন আর্তিটুকু আভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। মূলত: প্রেমের সঙ্গে প্রয়োজনের এই দ্বন্দ্ব মানব অস্তিত্বের এক অনিবার্য রহস্য, যদিও শিল্পী জীবন- প্রেরণার উৎসরূপে প্রেমের সহজ আর্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ গল্পে।"[৭]

এ ক্ষেত্রে নিমগাছের শিরা উপশিরায় শিহরণের সঙ্গে 'পাশের বাড়ির বউটার' অসহায় প্রাণ রহস্য যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। এ গল্পে শিল্পী প্রকৃতির সত্তায় মানুষের আন্তর বাসনার পরিচয় আবিষ্কার করেছেন যেন। প্রকৃতির গোপন রহস্য যখন এসে ধরা দিল মানব-জীবনের পারাবারে- সেখানে দুয়ে মিলে মিশে একাকার,- এইখানেই এ গল্পের অতুলনীয়তা, কেবল ভাব বিদ্গ্ধতায় নয়, নির্মাণ কলাতেও। দেখা গেছে গোটা গল্পটি কবিতার কাঠামোয় গড়া। উপরন্তু এ গল্পের আবেদনে গাল্পিকতার চেয়ে 'কথার রস'- এর প্রাধ্যান্য বেশী, বলেছেন সমালোচক, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'কথিকা' বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন 'লিপিকা'র রচনা শৈলী প্রসঙ্গে। (ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ১৩৬৯, পৃ. ১৬৫)

তিন

ছোটগল্পকার বনফুল এর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠক যদি একবার দৃষ্টি দেন, বা আলোচ্য 'নিমগাছ' গল্পের নিরিখে ছোটগল্পকার বনফুলের বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু অংশ চোখে পড়বে। যথা-

এক. বনফুলের অনুগল্প বা গল্পিকাগুলি বৃত্তান্তহীন বৃত্তান্ত। এধরণের গল্পে প্রত্যক্ষত কোন আখ্যান থাকে না, আর যেটুকু থাকে তা সংক্ষিপ্ত, সংযত, সংহত ভাবে তার বিস্তার। বনফুলের অনুগল্পগুলি বেশির ভাগই ভাবকেন্দ্রিক। ভাব কেন্দ্রিক গল্পে প্রতীক- রূপকের ব্যবহারে গল্পকার তাঁর বক্তব্য ব্যঞ্জিত করেন। 'নিমগাছ' গল্পটিও একটি ভাবকেন্দ্রিক অনুগল্প। এ গল্পে একটি মানুষ কেন্দ্রিক ভাবকে কেন্দ্রে রেখে প্রকৃতির এক বিশেষ গাছ নিমগাছের বর্ণনার পর মানব-জীবনের কাহিনীকে তার সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন।

দুই. 'নিমগাছ' গল্পের মহা-মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স ধরা পড়ে কবির প্রসঙ্গে। নিমগাছটির ডাল, পাতা, ছাল সকলে স্বাস্থ্যের জন্য যখন ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত তখন 'হটাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এল'। যে ছাল তুলল না, পাতা ছিঁড়ল না, ডাল ভাঙল না। শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে নিমগাছটির দিকে চেয়ে থাকল আর 'খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেলো'। তিনি কবিরাজ নন, কবি।

অত্যাচারিত নিমগাছটির আত্যন্তিক মুক্তির আকূতিতে পূর্ণ এর পরের বাক্যটিই গল্পের চরমক্ষণ বা ক্লাইম্যাক্স-

> "নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।"

এরপর গল্পের Falling Action । কিন্তু নিমগাছটি যেতে পারল না। কারণ- 'মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।'

তারপর, গল্পের শেষ বাক্য- "ওদের বাড়ির গৃহকর্ম- নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।" এই বাক্যযোগের সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়। তখন নিমগাছ

আর নিমগাছ হয়ে থাকে না, বৃহত্তর জীবন সত্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে। তাই সমালোচক বলেছেন-

> "'নিমগাছ' গল্পে গাছ হল বধূর জীবন ধর্মের প্রতীক প্রতীম অস্তিত্ব। ... গল্পের জীবন- সত্য রূপ কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে নিমগাছের বৈশিষ্ট্য ধরে একমাত্র বধূর বাস্তবতাতেই ব্যঞ্জনা গর্ভ করেছেন গল্পকার। তাই গল্পের চরিত্র ও লেখকের লক্ষ্য পরিণামে হয়েছে একাকার।... গল্পে নায়িকা ও গল্পের কেন্দ্রীয় জীবন-সত্য হয়েছে মহৎ শিল্পের ব্যঞ্জনায় একাকার, একাত্ম। এখানেই নিমগাছ নামক প্রতীকটির শিল্প- সার্থকতা।"[৮]

তিন. 'নিমগাছ' গল্পের ভাব বা বিষয় একটি-ই। তা হল পাশের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুনা লক্ষ্মী বউটার করুণ চিত্র অঙ্কন। কিন্তু গল্পের শুরু থেকে নিমগাছের বর্ণনায় পূর্ণ থাকলেও শেষ বাক্যটি যুক্ত হওয়ার পরই নিমগাছের উপর অত্যাচারের তীব্রতা বা গভীরতা বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ পায়।

চার. 'নিমগাছ' গল্পে ভাবের একমুখিনতা লক্ষ্য করার মতো। গল্পের শুরু থেকে গল্পকার নিমগাছের কষ্টকর জীবনকথা বর্ণনা করতে করতে প্রবেশ করলেন কবির জগতে, কবি এসে কবির দৃষ্টিতে নিমগাছটিকে দেখলেন এবং চলে গেলেন। নিমগাছটিও কবির সঙ্গে চলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারল না, কারণ মাটির ভেতর তার শিকড় বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেছে। তাই আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল। এই বর্ণনায় এতটুকু বৃত্তান্ত নেই, আতিশয়তা নেই, একেবারে নির্মেদ বর্ণনা। তারপর শেষ বাক্য জুড়ে গল্পটিতে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন বনফুল। সমালোচকের মতে-

"আগাগোড়া প্রতীকের ইঙ্গিতময়তা গল্পের সর্বাবয়বে মূল্যবান অলংকারের মতো। চরিত্রের প্রকাশমূলকতায় নিমগাছটি হয়েছে গভীর বাস্তব জীবনভাবনার আনুষঙ্গিক অব্যর্থ বিষয়, যা প্রকরণে অচ্ছেদ্য।"[৯]

পাঁচ. বনফুল এ গল্পের বিষয় অনুযায়ী গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করেছেন। নিমগাছের উপকারিতা সম্পর্কে যে যা ভাবে সেভাবে তার ভাবরূপ দিয়েছেন। কবিরাজ যেভাবে ভাবে কবি সেভাবে জীবনকে ভাবে না। তাই কবিরাজ যেখানে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত, সেখানে কবি-

> "মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।
>
> বলে উঠল, - বা:, কি সুন্দর পাতাগুলি... কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার... এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বা :-"

-এমন একজন কবিই ভাবতে পারেন, কবিই বলতে পারেন। এ যেন বনফুলের কবি সত্ত্বারই একখণ্ড প্রকাশ।

ছয়. গল্পটির নাম বনফুল 'নিমগাছ' রেখেছেন। বিষয়ের সঙ্গে দেখতে গেলে নামটি যথার্থ নয়, কেননা, নিমগাছের কথা থাকলেও আদতে গল্পটি কোন আত্মকথা নয়, কিন্তু প্রতীকী অর্থে নামকরণ শিল্পসার্থক। কেননা, নিমগাছকে লক্ষ্যে রেখে কাহিনি বর্ণিত হলেও শেষ বাক্যটি যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটিতে নিমগাছ আর 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটা' এক হয়ে গেছে। নিমগাছ যেন বধূর প্রতীক আর বধূ যেন ঐ নিমগাছের প্রতীক। তাই প্রতীকধর্মী এই নামকরণ সার্থকমণ্ডিত হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে-

> "বনফুলের অধিকাংশ গল্পের মতো এ গল্পও প্রতীকী। অত্যল্প পরিসরে জীবনের গভীর অথচ বিস্তৃত অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে এছাড়া আর উপায় নেই। এবং তাঁর গল্পের ভাষা এই কারণেই দ্ব্যর্থক, বহুমাত্রিক অর্থে বিভূষিত, খানিকটা এইজন্য লিরিক কবিতার আত্মীয়ও বটে।... এই ধরনের গল্পাণুতে কোনো ভার নেই, বিশেষ একটি ভাবকে মুক্তি দিয়েই যেন গল্পগুলি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারপর পাঠক মনে গল্পের আরেক ধরনের শুরু। প্রচলিত ছোটগল্পের আঙ্গিক থেকে 'নিমগাছ' মুক্ত, ছোটগল্পের নবীন এক গঠনের দিকে তাঁর ইশারা।"[১০]

'নিমগাছ' গল্পটি আকারে যেন গদ্যকবিতা, কিন্তু প্রকারে অনুগল্প- 'ছোটগল্প'। চরণগুলিকে বনফুল কবিতার আকারে বাহ্যত সাজালেও কবি ও গৃহবধূর প্রসঙ্গে তা গল্পের জগতে পদার্পণ করেছে। এ গল্পে বিবৃতিমূলকতার চেয়ে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতাই প্রাধ্যান্য লাভ করেছে। গোটা গল্পে লেখক যে বিবৃতি দিয়েছেন নিমগাছের তা গৌণ হয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটির অত্যাচারিত, অবহেলিত জীবনকথা। তখন নিমগাছ আর নিমগাছ হয়ে থাকে নি, মানবজীবনের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। এখানেই সর্বদিক থেকে 'নিমগাছ' গল্পটি সার্থক রূপে ধরা দিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন বলে মনে করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমালোচক শ্রাবণী পাল –

> "ছোটগল্পের আঙ্গিক কেন এরকম হবে সে বিষয়ে কোনো আন্দোলন, ঘোষণা, বিদ্রোহের প্রস্তুতি ছাড়াই তাঁর হাতে অনুগল্পের এই অভিনব রূপ গড়ে উঠেছে এবং এই-ই বাংলা সাহিত্যে বনফুলকে অবিস্মরণীয়তা দিয়েছে।"[১১]

তথ্যসূত্র:

১. পাল শ্রাবণী, নিমগাছ: প্রকৃতিপাঠ, জীবনপাঠ; বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, ড. শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, ২০০৮, পৃ. ৯৭
২. বনফুল, শনিবারের চিঠি, ১৩৫৬, ভাদ্র, পৃ. ১৪
৩. বনফুল, আমার চোখে আমি, অমৃত, ১৯৭৯, পৃ.১৪
৪. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, বনফুলের কথাসাহিত্য, ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ১৩৮৯, পৃ. ৪৯
৫. ড. নন্দী ঊর্মি; বনফুল: জীবন, মন ও সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা- ৯, পৃ. ১১৬
৬. দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটোগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৯, পৃ. ৫৯৮
৭. ড. নন্দী ঊর্মি; পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬
৮. দত্ত বীরেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯
৯. দত্ত বীরেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯
১০. পাল শ্রাবণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪
১১. পাল শ্রাবণী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

দেশজ শিক্ষাধারার নিরিখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

ভবেশ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বঙ্কিম সরদার কলেজ

সারসংক্ষেপ: বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, সাহিত্য ও জ্যোতিষ বিদ্যার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হতো। পার্থিব জীবনের তুলনায় আধ্যাত্বিক বিষয়ের চর্চাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। শিক্ষালয়ে বা গুরুগৃহে যখন শিক্ষক বা গুরু উপস্থিত থাকতেন না তখন যে শিক্ষার্থী অগ্রবর্তী (মেধার বিচারে) বলে বিবেচিত হতো সে বাকিদেরকে শিক্ষাদান করত। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল আবাসিক ও অবৈতনিক। যার কেন্দ্র ছিল মানব সমাজের কোলাহল থেকে দূরের বিহার ও সংঘারামগুলি। যাতে ভিক্ষুরা তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কোনোরূপ বাধা না পায়। সেখানে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে আত্মসচেতনতাকে পূর্ণরূপে প্রকাশের চেষ্টা চলতো। সেকালে নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরীর মতো শিক্ষালয় বিশ্বকে শিক্ষার আলো দিয়েছে। অন্যদিকে ইসলামের শিক্ষার ধরণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা থেকে আলাদা ছিল। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ধার্মিক করে তোলা। কোরান বাধ্যতামূলক ছিল, এটি তাদের পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাথমিক বয়সে ছাত্ররা কোরানের প্রথম ১৩টি অধ্যায় কবিতা হিসেবে আবৃত্তি করতে শিখত। আর চোদ্দ বছর বয়সে তাঁরা তাঁদের পছন্দের বিষয় বেছে নেওয়ার সুযোগ পেত সাহিত্য, চিকিৎসা, জ্যামিতি, বাণিজ্যের মত বিষয়গুলি থেকে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সবার জন্য শিক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি মূল্যবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং শিশুর মতো করে শিক্ষাদানের চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।
সূচক শব্দ: শ্রবণ, চিন্তন, প্রণিধান, ব্রহ্মবাদিনী, সদ্যোদ্বাহা, ব্রতস্নাতক, প্রব্রজ্জা, উপসম্পদা, টোল, পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০।

বিষয় আলোচনা:
প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বিষয়কে বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন শ্রেণির পাঠক্রমে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বিষয়ে আলাদা পাঠ্যবিষয় রাখা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার নিরিখে "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০" কতটা প্রাসঙ্গিক কিংবা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির কিছু দিক এখানে উঠে এসেছে কিনা সেই বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধ। সমগ্র আলোচনায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে সম্যক ধারনার পাশাপাশি পরবর্তীকালে কি কি পরিবর্তন দেখা গেছে এবং পরবর্তীতে তা কতটা জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে সময়ানুক্রমিক চর্চার চেষ্টা রয়েছে।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, সাহিত্য ও জ্যোতিষ বিদ্যার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হতো। প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র যেমন নালন্দা,

তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরীর মতো শিক্ষালয় বিশ্বকে শিক্ষার আলো দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সেখানে পার্থিব জীবনের তুলনায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। যার প্রত্যক্ষ নিদর্শন হলো বৈদিক সাহিত্যগ্রন্থগুলি; বিশেষ করে বেদান্তগ্রন্থ বা উপনিষদ। বেদ ছিল বৈদিক শিক্ষার মূল আধার। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠদান ছিল গুরুকেন্দ্রিক এবং সেখানে গুরু শিষ্যদের পাঠদান করতেন শ্রুতি পদ্ধতিতে, যা সম্পন্ন হতো তিনটি ধাপে—শ্রবণ, চিন্তন এবং প্রণিধান। অর্থাৎ শুনে শুনে শিক্ষালাভ করতে হতো শিক্ষার্থীদের। গুরু নিজে বেদে বর্ণিত বিষয়গুলো পাঠ করতেন এবং কখনও কখনও গল্পের সাহায্য নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার চেষ্টা করতেন। বেদের বাণী কিংবা বেদকে ভিত্তি করে বলা গুরুর গল্প মনোযোগ সহকারে শুনে সে বিষয়ে চিন্তা করত শিক্ষার্থীরা এবং বোঝার চেষ্টা নিত। শেষে শিক্ষার্থীরা গুরুকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেত, যা তাদের শিখনকে আরও মজবুত করত। শিক্ষালয়ে বা গুরুগৃহে যখন শিক্ষক বা গুরু উপস্থিত থাকতেন না তখন যে শিক্ষার্থী অগ্রবর্তী (মেধার বিচারে) বলে বিবেচিত হতো সে বাকিদেরকে শিক্ষাদান করত।[১]

বেদ শিক্ষার দিনগুলিতে শিক্ষার্থীকে টানা বারো বছর গুরুগৃহে কাটাতে হতো। এই শিখন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হতো এবং তা শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধের বিকাশে অত্যন্ত কার্যকর ছিল। শিক্ষায় সঠিক উচ্চারণের ওপর জোর দেওয়া হত। ঋক্ বা মন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধির বিষয়েও বিশেষ জোর দেওয়া হত। শুরুতে উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে শিষ্যকে গুরুগৃহে প্রবেশ করতে হত। গুরুর কাছে শিক্ষার্থীর প্রতিটি মুহূর্তই ছিল শিক্ষণীয়। গুরুগৃহের শিক্ষা ছিল পুরোপুরি অবৈতনিক। গুরু নিজে শিক্ষাদান করাকে সম্মানজনক বিষয় এবং বিশেষ সমাজিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

বৈদিকযুগে নারীশিক্ষায় মেয়েদের বেদ পাঠে অধিকার ছিল কিনা সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে। ঋগ্বেদের যুগে ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোদ্বাহাদের কথা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিনীরা আজীবন বিয়ে করত না, শাস্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। অন্যদিকে সদ্যো-বধূরা বিয়ের পরেও শাস্ত্র চর্চা তথা শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। পরবর্তী বৈদিক যুগেও মেয়েরা বেদ-বিদ্যা চর্চা করতেন, যার প্রমাণ রয়েছে অথর্ববেদে (১১.৫,১৮) যেখানে স্পষ্টত বলা হয়েছে কুমারী নিজে ব্রহ্মচর্য অথবা বেদ অধ্যয়নের দ্বারাই যুবাপতি লাভ করে থাকে—"ব্রহ্মচর্যেন কন্যা যুবানম্ বিন্দতে পতিম্"। এই মন্ত্রটি একমাত্র বৈদিক উদ্ধৃতি যেখানে নারীর ব্রহ্মচর্য ও বেদধ্যয়নের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। অশ্বলায়ন গৃহসুত্রে (৩,৮,১১) সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে গুরুগৃহের পাঠ শেষ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। যে অনুষ্ঠানে দুই হাতের তালুতে তৈল জাতীয় স্নেহ পদার্থ ঘসে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মচারি) তার মুখে, ক্ষত্রিয় তার বাহুতে, বৈশ্য তার পেটে, নারী (ব্রহ্মচারিণী) তার নিম্নাঙ্গে এবং শ্রমজীবীরা (শূদ্রেরা) তাদের ঊরুদেশে মাখত। এ থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে বৈদিক যুগে নারীদেরও বেদ-বিদ্যার অধিকার ছিল।

সার্বিকভাবে বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়[২]—

(ক) বেদ ছিল বৈদিক শিক্ষার ধারক ও বাহক।

(খ) শিক্ষা-জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

(গ) উপনয়নের পর ছাত্রদের গুরুগৃহে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে জীবনযাপন করতে হত।

(ঘ) শিক্ষকের বাসগৃহ ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। ছাত্র ও শিক্ষক একসঙ্গে বাস করত এবং তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভালো।

(ঙ) গুরুগৃহে শিক্ষায় রাজা কিংবা শাসকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকত না।

(চ) নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ছাত্ররাই গুরুগৃহে বাস করার অধিকার পেত।

(ছ) জনগণের দানে শিক্ষকদের খরচ নির্বাহ হত।

(জ) ব্রহ্মচর্য পালন ছিল আবশ্যিক।

(ঝ) গুরুগৃহে উচ্চশ্রেণির (মেধার) ছাত্ররা নীচুশ্রেণির (মেধায় কম) ছাত্রদের পড়াত।

(ঞ) বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্তের পাশাপাশি ব্যাকরণ, ধর্ম, সংস্কৃত, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হত।

(ট) নারী শিক্ষার প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া হত।

(ঠ) ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ না থাকায় সমাজের সব স্তরের ছাত্ররা একই সঙ্গে গুরুর পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

(ড) বিধিবদ্ধ পরীক্ষা ছিল না, গুরুর বিবেচনাই ছিল শেষ কথা।

বেদ-পরবর্তীকালে সমাজে কর্মের ওপর ভিত্তি করেই জাতিবর্ণের সৃষ্টি হয়। আর জাতিবর্ণ প্রথায় সমাজে শীর্ষস্থান পায় ব্রাহ্মণরা। সমাজ চালিত হতে থাকে ব্রাহ্মণ্য নীতি নিয়মে। এই ব্রাহ্মণ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো নানা প্রশাসনিক নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও, সেখানে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম চালু ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত—

(ক) আত্মার মুক্তি—"আত্মার বন্ধন মোচন করে মানুষকে মুক্তি লাভ করতে হবে" এটাই ছিল ব্রাহ্মণ্যযুগের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

(খ) পরাবিদ্যার অনুশীলন—পরাবিদ্যার অনুশীলন ছাড়া মুক্তিলাভ অসম্ভব। এই পরাবিদ্য মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সক্ষম করে। অন্যদিকে অপরাবিদ্যা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, বরং সহস্র বন্ধনে বেঁধে ফেলে। তাই পরাবিদ্যা লাভ ছিল ব্রাহ্মন্য শিক্ষার লক্ষ্য।

(গ) ধ্যান—ব্রাহ্মন্য শিক্ষায় পরাবিদ্যা লাভের জন্য ধ্যানাভ্যাষকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেখানে পরমব্রহ্মের চিন্তা ও অনুশীলন ছিল অন্যতম লক্ষ্য।

(ঘ) দেহ ও মনের বিকাশ—এই শিক্ষাব্যবস্থায় নানা কাজকর্মের দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখা হত।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ থেকে বেদ-পরবর্তী সময়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কথা জানা যায়। বেদ ছাড়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ শিক্ষা দেবার জন্য চরণ, পরিষদ, কুল, গোত্র প্রভৃতি নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। যাঁরা যে বেদের ওপর সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারত তাঁরাই সেই বেদের শাখারূপে পরিগণিত হতেন। তাদের অনুসরণকারীদের 'চরণ' নামে অভিহিত করা হত।[৩] 'পরিষদ' ছিল বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ কেন্দ্র।[৪] স্মৃতিশাস্ত্র বা শাস্ত্রগ্রন্থজনিত কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে এই পরিষদ তার মীমাংসা করত। স্মৃতিকার বশিষ্ঠ ও বৌধায়নের মতে 'পরিষদ' দশজন সদস্য নিয়ে গঠিত হত। এই দশজনের মধ্যে চারজন হতেন বেদজ্ঞ অর্থাৎ যারা বেদপাঠ সমাপ্ত করেছেন (অন্তত একটি বেদে), অপর তিনজন সদস্য হন ছাত্র, গৃহৎ, তপস্বী বা যোগী, বাকি তিনজনের একজন হন মীমাংসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, একজন বেদাঙ্গে

পারদর্শী ও অপরজন স্মৃতিশাস্ত্রে সুপন্ডিত। এই দশজন হবেন সুশিক্ষিত, যুক্তিশীল এবং নির্লোভ। ব্রাহ্মণ্য যুগের পাঠপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত স্তরভেদ পাওয়া যায়—

(ক) উপক্রম—এটি বেদ পাঠ পর্বের পূর্বের এক অনুষ্ঠান। প্রথমে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে পাঠের উপক্রম বা প্রস্তুতি করা।

(খ) অভ্যাস—যে বিষয়টি বা বিষয়বস্তুটি পড়ানো হল সেটিরই আবৃত্তি বা অভ্যাস করানো।

(গ) অপূর্বতা—এই স্তরে বিষয়বস্তু বোঝাবার চেষ্টা করতেন আচার্য।।

(ঘ) ফল—এই স্তরে বিষয়বস্তুর উপলব্ধির পরীক্ষা চলত।

(ঙ) অর্থবাদ—এই স্তরে বেদের ভাষ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ পাঠ করানো হত।

(চ) উপপত্তি—এই স্তরে ছাত্ররা বিষয়বস্তুর মর্মার্থ গ্রহণে সমর্থ হত।

এছাড়াও কোনো কোনো গ্রন্থে নিম্নোক্ত পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে—

ক) উপক্রম—পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে পাঠের উপক্রম করা হত।

(খ) শুশ্রুষা—আচার্যের পাঠদান শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করাই হল শুশ্রুষা।

(গ) শ্রবণ—শিক্ষার্থী কর্তৃক বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ।

(ঘ) গ্রহণ—বিষয়বস্তুকে উপলব্ধির চেষ্টা ইত্যাদি।

শিক্ষাশেষে অনুষ্ঠিত হত সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এই সমাবর্তন হল ব্রহ্মচর্যের পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠান, যারা বেদবিদ্যা পাঠ সম্পূর্ণ করেছেন তারাই সমাবর্তনের যোগ্য হতেন। যারা বেদপাঠ সমাপ্ত করলেও ব্রত অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমাপ্ত করতে পারতনা তাদেরকে বলা হয় বিদ্যাস্নাতক; যারা বেদপাঠ সমাপ্ত না করে শুধু ব্রত সমাপন করে তাদেরকে বলা হয় ব্রতস্নাতক; আর যারা বেদপাঠ ও ব্রত দুটিই সমাপন করেছেন তাঁরা বিদ্যাব্রতস্নাতকরূপে অভিহিত হতেন।

পরবর্তীতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতে বৈদিক ধর্মের জটিলতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সূচনা হয়। যাগযজ্ঞ, পশু-বলি, সমাজে পুরোহিত শ্রেণির প্রাধান্য, শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির অনুশাসন, আন্তরিকতাশূন্য বর্ণভেদ, অর্থহীন বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের বাহুল্য বৈদিক অনাড়ম্বর ভক্তিময় পবিত্র ভাবকে নষ্ট করে দেয়। নিম্নবর্ণীয়দের প্রতি পুরোহিত সমাজের ঘৃণার ভাব সমাজে বিরাট অসন্তোষ ডেকে আনে। এর ফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই দুঃখ থেকে মানবজীবনের মুক্তি লাভের সন্ধানে নিরত হন। 'যাগযজ্ঞমূলক' ধারার বিরোধী একটি শিবির হিসাবে বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধশিক্ষার সূচনা ঘটে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রম জীবনের ন্যায় এখানে সংঘজীবন বিদ্যাচর্চার ভিত্তি ছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবসায় অন্তেবাসী জীবন আর বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবথায় শ্রমণ-জীবনের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। এই শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল আবাসিক ও অবৈতনিক। মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হত। সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থিক অনুকুল্যের উপরই শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ন্যায় বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং লোকালয়ের বাইরে বিশেষ অনুকুল পরিবেশে উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান করা হত। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় নারী শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল বেদ নির্ভর ও বৌদ্ধশিক্ষা ছিল বেদ বিরোধী। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রিবর্গের শিক্ষালাভের অধিকার ছিল; অন্যদিকে বৌদ্ধ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ধনী, দরিদ্র প্রত্যেকেই শিক্ষালাভ করতে পারত।[৫]

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বিহার ও সংঘারামগুলি। যা মানব সমাজের কোলাহল থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। যাতে ভিক্ষুরা তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কোনোরূপ

বাধা না পায়। সেখানে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে আত্মসচেতনতাকে পূর্ণরূপে প্রকাশের চেষ্টা চলতো। তাই বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলিতে বিহার ও সংঘজীবনকে আত্মোন্নতির শ্রেষ্ঠ স্থান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরুতবপূর্ণ দুটি বিষয় হল প্রব্রজ্যা বা প্রব্রজ্জা এবং উপসম্পদা।[৬]

উপসম্পদা বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে একজন নবীন ভিক্ষু পূর্ণ ভিক্ষুতে উন্নীত হন। প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত নবীন ভিক্ষুদের (সাধারণত পনেরো বছর বয়সী হয়ে থাকে) বলা হয় শ্রমণ বা শ্রমণোদ্দেশক এবং তাদের শ্রমণ অবস্থাকে বলা হয় শ্রামণ্য বা প্রব্রজ্যা। আর শ্রমণ যখন একজন ভিক্ষুর অধীনে ধর্মশাস্ত্র ও আনুষঙ্গিক নিয়মকানুন শিখে পূর্ণ দীক্ষালাভের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হন তখন তাকে বলে উপসম্পদা। উপসম্পদা গ্রহণের ন্যূনতম বয়স বিশ বছর। অনুপযুক্ত শ্রমণকে (বিশেষত বিকলাঙ্গ, ঋণগ্রস্ত, দৃষ্টিহীন, রাষ্ট্রীয় দন্ডপ্রাপ্ত, কুষ্ঠরোগী, কিংবা অন্য কোনো কঠিন রোগে আক্রান্তদের) উপসম্পদা দেওয়ার নিয়ম ছিল না।উপসম্পদা অনুষ্ঠানে ন্যূনতম পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। আট প্রকার উপসম্পদার মধ্যে বর্তমানে কেবল ‘ঞত্তিচতুত্থ কম্ম’ উপসম্পদাই প্রচলিত আছে, কারণ অন্যগুলি বুদ্ধের অবর্তমানে করা সম্ভব নয়।

পুণ্যার্জনের প্রত্যাশায় বৌদ্ধ গৃহীরা শ্রদ্ধাসহকারে উপসম্পদা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের মতো জাঁকজমকের সঙ্গে এ অনুষ্ঠান পালিত হয় না। প্রব্রজ্যায় সামাজিকতার প্রভাব বেশি, আর উপসম্পদায় বিনয়ের প্রভাব বেশি। প্রব্রজ্যার সাধারণ অর্থ গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা; মুন্ডিতমস্তক হয়ে গৈরিক বসন ‘চীবর’ পরিধান করে বৌদ্ধসংঘে প্রবেশপূর্বক শ্রমণ হওয়া, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিশরণকে গ্রহণ করা। কুড়ি বছর বয়সে এই শ্রমণরা উপসম্পদা লাভ করে পূর্ণাঙ্গ ভিক্ষুরূপে স্বীকৃত হন।

বুদ্ধদেব মনে করতেন যে জরা, ব্যধি ও মৃত্যুই মানুষের দুঃখের অন্যতম কারণ। এই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অজ্ঞতাকেই চিহ্নিত করেছেন। তাই বৌদ্ধদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই এই অজ্ঞতাকে দূর করা সম্ভব। সেই মত বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে আত্মবিকাশের উপর প্রধান্য দেওয়া হয়। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার আচরণ পদ্ধতি ইত্যাদি বৌদ্ধশিক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। তাই শুরুতে বৌদ্ধদের সেই অর্থে নির্দিষ্ট কোন পাঠক্রম ছিল না। বৌদ্ধ শিক্ষার্থীরা প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় আচার্যের সামনে উপস্থিত হতেন এবং আচার্য তাদের ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু হৃদয়াঙ্গমের ব্যবস্থা করতেন। এ ভাবেই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা। পরবর্তিতে ভেষজ, বিজ্ঞান, রসায়ন, স্থাপত্য প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যবিষয় হিসাবে গৃহীত হয়। যে সমস্ত গৃহীরা শিক্ষার জন্য সংঘে আসত তাদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠ্যক্রম বৈদিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অপেক্ষা অনেক বেশী উদার ও বিস্তৃত ছিল।

বৌদ্ধিক শিক্ষা ব্যবস্থায় লিপির ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল। তাই বৌদ্ধ শিক্ষায় মৌখিকতার প্রাধান্য ছিল। আলোচনা, বিতর্ক, উপদেশ মূলক গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার রীতি ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষায় ভ্রমনের মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। উচ্চ শিক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার অন্যতম অবলম্বন ছিল। শিক্ষাকে সহজ বোধ্য করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করা হত বলে তা সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গুরু ও শিষ্যের হলেও শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াত, তেমনি শিক্ষার্থীও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য তাদের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র, জাতপাত ও বর্ণের কোন বৈষম্য না থাকায় সকল শ্রেণীর মানুষ শিক্ষায় সমান সূযোগ ও সুবিধা পেতেন। সুতরাং বলা যায় ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধদের অবদান যথেষ্ট ছিল। বৌদ্ধদের অনাড়ম্বর শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নীপীড়ণ থেকে রক্ষা পায় এবং সমাজ জীবনে জাতপাত বর্ণের ভেদ শীথিল হয়ে আসে।

অষ্টম শতকে ভারতে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম শাসক স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইসলামের শিক্ষার ধরণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা থেকে আলাদা ছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল জ্ঞানের প্রসার এবং ইসলামের প্রচার। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ধার্মিক করে তোলা। এসময়ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগের মতোই ভালো ছিল, অবশ্য ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে থাকত না। ক্যালিগ্রাফি এবং ব্যাকরণ পাঠে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। আরবি ও ফারসি সেকালে যোগাযোগের প্রধান ভাষা হওয়ায় প্রশাসনের উচ্চপদ পেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভাষাগুলি রপ্ত করত। কোরান বাধ্যতামূলক ছিল, এটি তাদের পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাথমিক বয়সে ছাত্ররা কোরানের প্রথম ১৩টি অধ্যায় কবিতা হিসেবে আবৃত্তি করতে শিখত। ইবনে সিনা লিখেছেন, চোদ্দ বছর বয়সে শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিষয়গুলি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হত সাহিত্য, চিকিৎসা, জ্যামিতি, বাণিজ্যের মত বিষয়গুলি থেকে। শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক পরীক্ষা নির্ধারিত ছিল না, তবে শিক্ষার্থীদের জীবনের ব্যবহারিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হতো।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মক্তব ছিল সাধারণ মানুষের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন, লিখন ও পাটিগণিতের মতো বিষয় শেখানো হতো। ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি চিঠি লেখা, আবেদনপত্র লেখা, হিসাববিজ্ঞান প্রভৃতি মক্তবে পড়ানো হয়। মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় যেতে হতো। মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন এবং গণিতের মতো বিষয়গুলো মাদ্রাসায় পড়ানো হতো।[৭]

মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে, ব্রিটিশরা ভারত দখল করতে শুরু করলে এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৮৩০-এর দশকে লর্ড টমাস ব্যাবিংটন মেকলে এদেশে ইংরেজি ভাষা চালুর ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার, ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো। ক্রমে সময়ের সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের যুগে শিক্ষার চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি মানুষের ঝোক বাড়ে। এভাবে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানাবিধ বিষয়ের সমন্বয়-সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে আজ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তার নিজস্ব ধাঁচটি লাভ করেছে।

অবশ্য বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সবার জন্য শিক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি মূল্যবোধ জাগ্রত করা। আধুনিক শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং শিশুর মতো করে শিক্ষাদান করার চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতির পাশাপাশি জনগণকে বোঝার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্তত একটি ন্যূনতম স্তরের শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং স্নাতক তিনটি বিভাগে সমগ্র শিক্ষণকালকে ভাগ করা হয়েছে। বিশেষকরে "জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০"তে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সংস্কার করা হয়েছে; ১৯৮৬ সালের শিক্ষা নীতির পরিবর্তে যা গৃহীত হয়েছে। এই নীতির মূল লক্ষ্য ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে তোলা, মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান এবং সমস্ত স্তরে শিক্ষার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। এতে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বেশ কিছু বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখানে শিক্ষায় সেকেন্ডারি স্তর পর্যন্ত এক নতুন কাঠামো চালু করা হয়েছে, যা ৫+৩+৩+৪ মডেল নামে পরিচিত। এই কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষাপর্যায়কে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে[৮]—

(ক) ফাউন্ডেশনাল স্টেজ (৩-৮ বছর)—৫ বছরের জন্য প্লে স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান পর্যায়।

(খ) প্রিপারেটরি স্টেজ (৮-১১ বছর)—দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার পর্যায়।

(গ) মিডল স্টেজ (১১-১৪ বছর)—ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বহুমুখী দক্ষতা অর্জনের পর্যায়।

(ঘ) সেকেন্ডারি স্টেজ (১৪-১৮ বছর)—নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান পর্যায়, যেখানে মুল লক্ষ্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীরভাবে ফোকাস করা।

ফাউন্ডেশনাল স্টেজে খেলার ছলে পাঠ নেওয়া এবং ভাষা দক্ষতার বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রিপারেটরি স্টেজে ইন্টার্‌যাক্টিভ ক্লাসরুমের ভাবনাকে কার্যকর করার প্রয়াস রয়েছে। মিডল স্টেজে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেকেন্ডারি স্টেজে বহু বিভাগীয় শিখন প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলির মাধ্যমে শৈশব শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গতিতে শিখতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময় ভাষাগত বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে পারবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে "জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০" বেশ কিছু সংস্কার এনেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১) শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মতো বিষয় নির্বাচন করতে পারবে। কোনো নির্দিষ্ট ধারার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। চার বছরের স্নাতক প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গবেষণার সুযোগ।

২) শিক্ষার্থীদের উপর নির্ভরশীল মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে তাদের সামগ্রিক দক্ষতা ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হবে।

৩) ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন কোর্স ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যা প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াবে এবং শিক্ষার মান উন্নত করবে। এই নীতিতে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। তাদের সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা, এবং নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটবে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ভারতের প্রাচীন জ্ঞান পরম্পরার গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। ভারতের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে সমর্থন করে এমন শিক্ষার উপর জোর

দেওয়া হয়েছে। একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসাবে এতে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চারটি প্রধান দিককে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—

(ক) মৌলিক জ্ঞান এবং দক্ষতার বিকাশ: এই নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষায় পড়াশোনার ভিত্তি হিসেবে গণিত, বিজ্ঞান এবং ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে তাদের শিকড়ের সাথে যুক্ত থাকে, সেই জন্য প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, দর্শন এবং ঐতিহ্যকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

(খ) নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা: জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ তে ভারতের প্রাচীন শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার চর্চা। এই নীতি তে ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নৈতিকতা, সত্যতা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গীতার শিক্ষা, বৌদ্ধ দর্শন এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যা মানবতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলিকে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতের জ্ঞানতন্ত্রের পুনরুদ্ধারেই থেমে থাকেনি, বরং আধুনিক প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে। এটি একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব দেয়, যা শিক্ষার্থীদের বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে।

ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতি হাজার বছরের প্রাচীন এক ঐতিহ্য, যা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। এটি একটি সুষম এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত, যা মানুষের মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়ক। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির প্রভাব অপরিসীম। ভারতীয় জ্ঞান পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটানোর মূল লক্ষ্য হল একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, উদ্ভাবনী এবং গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা, যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটানো।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর মাধ্যমে ভারতীয় গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দেশের বিজ্ঞান ও গণিতের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে এবং এর সঠিক প্রয়োগ শিখতে পারবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর মধ্যে যোগ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষাকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। যোগ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারবে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবন এবং পড়াশোনায় সহায়ক হবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য ভোকেশনাল শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ তে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ভোকেশনাল শিক্ষার অংশ হিসেবে বিভিন্ন কারিগরি ও ব্যবহারিক কাজ শেখার সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দসই ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র :

১. আলতেকার, ডঃ এ এস, ১৯৪৪, *এডুকেশন ইন অ্যানসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া,* নন্দকিশোর অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, পৃ. ১৫-৭০।
২. আলতেকার, ডঃ এ এস, ১৯৪৪, তদেব, পৃ. ২৬৫-৩০০।
৩. মুখার্জি, আর কে, ১৯৯৮, *অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন,* মতিলাল বানার্সিদাস, কলকাতা, পৃ. ৮০।
৪. মজুমদার, আর সি, ১৯৫২, *হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অফ ইণ্ডিয়ান পিপ্ল,* ভারতীয় বিদ্যা ভবন, পৃ. ৪৮৪।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকুল চন্দ্র, ১৯৭৬, *বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিক্ষাদীক্ষার রূপরেখা,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪৭।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অনুকুল চন্দ্র, ১৯৬৬, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম,* ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, পৃ. ১২৬-৩৩।
৭. বিশ্বাস, এ কে, ১৯৮৪ “ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দ্য মেডিয়েভ্যাল পিরিয়ড : এ হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ”, *ইন্টারন্যাশানাল জার্নাল অফ রিসার্চ অয়াণ্ড অ্যানালিটঅক্যাল রিভিউ,* ৩ (২), পৃ. ২৬০-৬৬।
৮. *ন্যাশানাল এডুকেশন পলিসি ২০২০,* মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া।

কালীপূজা : প্রান্তিক এবং গুপ্ত সাধনার স্তর থেকে জনপ্রিয়তা অর্জনের বৈচিত্র্যময় বিবর্তন

শিল্পা দেবনাথ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ
অধ্যক্ষ, ঘোলদিগরুই শিক্ষন মন্দির বি.এড বিভাগ
পুরশুরা, হুগলী

সারাংশ: ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের ধর্মীয় এবং দার্শনিক মতবাদ এর অঙ্গনে নারীশক্তির অস্তিত্ব বহু প্রাচীন, বিশেষত সভ্যতার গোড়া থেকেই ছিল। যদিও ধর্ম এবং অতিজাগতিক বিষয়বস্তুর ওপর ধারনাগুলি সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে ছিল খুবই সাধারন ও বাহুল্যবর্জিত। সাধারনত যেটুকু ধর্মীয় আচরণ দেখা যায় তা প্রাকৃতিক সমস্যার প্রতি ভীতি ও প্রকৃতি থেকে বাঁচার রশদ পাওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জ্ঞ্যাপনের উদ্দেশ্যে পালন করা হত। তবে মাতৃকা শক্তির আরাধনা ও তাৎপর্য অনুধাব দেশ এর পরিসরে শুরু থেকেই ছিল, উদাহরন স্বরূপ সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো তে একটি শীল এ নগ্ন মাতৃকা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার নাভি থেকে একটি গাছ নির্গত হয়েছে প্রত্নতাত্বিক উৎখনন এ। এই কাল্পনিক মূর্তির তাৎপর্য অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে মাতৃ শক্তি প্রকৃতির এবং জীবকুলের উর্বরতার সমার্থক রুপে কল্পিত হয়েছে। মহেঞ্জদারোতে অন্য একটি প্রত্নতাত্বিক সাক্ষ্য তে দেখা গেছে একটি শীল এ সাতজন নারী একটি অশথ্ব গাছ এর নিচে দাড়িয়ে তাদের পদতলে কিছু পশু রয়েছে। এই সাতজন নারীর মূর্তি পরবর্তী কালে দক্ষিন ভারতে সপ্ত মাতৃকা রুপে রুপান্তরিত হয়েছে বলে ইতিহাসবিদগন মনে করছেন।[১] সুতরাং সমাজ ও সংস্কৃতি তে নারী শক্তির গুরুত্ব সভ্যতার শিশুবেলা থেকেই বজায় ছিল মনে করা যায়। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শক্তিকে দেবী রুপে কল্পনার ধারনা কতটুকু ছিল তা বলা জটিল। তবে মাতৃশক্তির গুরুত্ব ছিল বলা যায়। তাছাড়া প্রত্নতাত্বিক উপকরনে উক্ত প্রাপ্ত শীল গুলি সিন্ধুবাসীদের চিন্তার ব্যাপ্তি বোঝায়। সুতরাং নারী শক্তির ধারনার শিখর উপমহাদেশের শিশুকাল থেকেই। পরবর্তীতে বৈদিক সংস্কৃতিতে এই প্রাথমিক ধারনা গুলি আরও স্পষ্ট এবং সমৃদ্ধ হয় , দেবদেবী এবং উপাসনার নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যায়। বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা এর পরিপূরণে এবং জীবনচক্র থেকে মুক্তি পেতে বহু দেবতা ও দেবীর ধারনা পরিপক্ক হয়ে উঠতে থাকে চিন্তা ও চেতনায়। বৈদিক সংস্কৃতিতেও পূর্বতন সংস্কৃতি সূত্র ধরে দেবীর ধারনা স্থান পেয়েছিল। ক্রমাগত দার্শনিক ভাবনার অভ্যাস থেকেই বৈদিক যুগে অথর্ববেদ এর অন্তর্গত পৃথিবীসুক্ত তে মধ্যে পূর্ণ বিকশিত মাতৃমূর্তির বর্ণনা রয়েছে[২]। আরও পরবর্তীতে, বহু দেবী যেমন সতী, পার্বতী, কালী বহু দেবিত্বের ধারনা এবং ভিন্ন দেবী এর একি অস্তিত্বের রুপ কল্পনা করা হয়। ভিন্ন দেবীত্বের ধারনা বাস্তব জীবনের বিচিত্র জটিলতার সাথে যুজতে এবং টানাপড়েন কে সহ্য করার শক্তির যাচনা থেকেই এসেছে। মাতৃশক্তির এই তাৎপর্য উপলব্ধি থেকেই ‘শাক্তবাদ’ এর জন্ম। শাক্তবাদী ধারনায় বৈচিত্র্যময় দেবী এর উল্লেখ থাকলেও দেবী কালী এর আরাধনার বিবর্তন অনেক বহুমাত্রিক ও চরাই উতরাই এর মধ্যে দিয়ে আজকের জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একটি সদ্য গড়ে ওঠা সমাজ প্রাথমিক স্তরের ধর্মের ধারনা অতিক্রম করে মাতৃশক্তির অনুভূতিকে কিভাবে শাক্তবাদ এর

মধ্যে প্রতিষ্ঠা করল এবং দেবী কালীর আরাধনা কিভাবে বীজ থেকে বৃক্ষ হল সীমিত পরিসরে তা তুলে ধরার প্রয়াস রইল।

সূচক শব্দ: শাক্তবাদ, দেবি কালী, নারীশক্তি, গুপ্ত সাধনা,তান্ত্রিক সাধনা, শক্তি সাধনা, জনপ্রিয় পূজা।

ভূমিকা:

যে কোন ধর্ম দর্শন একটি নিদিষ্ট ধারনাকে মূলত আশ্রয় করে প্রাথমিক ভাবে শুরু হলেও পরে বহু স্রোত তার সাথে মেলে। শাক্তবাদ ও তার বাতিক্রম না। কিন্তু তার আগে শাক্তবাদ কে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। শাক্তবাদ প্রত্যক্ষ ভাবে নারী শক্তির মূল্য কে উপলব্ধি করা এবং শক্তির বিভিন্ন রুপ কে তুলে ধরে। মাতৃ শক্তির বর্ণময় বিষয় যেমন জীবনে জাগরূক থাকার শক্তি, জ্ঞান লাভ করার শক্তি, প্রত্যেক মুহূর্তের কর্ম করার ইচ্ছা শক্তি, এবং কর্ম সম্পাদন করার শক্তি। প্রতিটি দেবীকে এমন এক একটি গুন রুপে কল্পনা করা হয়।সনাতন ধর্মের মধ্যে প্রত্যেক দেবীর রুপ কেই নিদিষ্ট গুন এর প্রকাশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। তবে এই রুপ কল্পনা করার প্রয়াস একদিনের বিষয় নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এর মধ্যে দিয়ে নানা পুরানে দেবি রুপ তার পুজার বিধি তার গুনের সমাহার প্রাকার পায়। দেবি কালীর আজকের মাহাত্ম্য বহু শতাব্দীর ফসল।

বিষয়গত উদ্দেশ্য:

প্রত্যেক দেবি রুপের যেমন ভিন্ন রুপ আছে তেমনি আছে ভিন্ন গুন এর সমাহার। দেবি কালির পূজার সমাজে বিবর্তন হওয়ারও তাই ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ের দেবিত্বের ধারনা থেকে কালক্রমে সীমিত প্রান্তিক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পূজার প্রচলন এর প্রমান স্বরুপ ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তৎপরবর্তী সময়ে তান্ত্রিক চর্চায় পুজার প্রচলন এবং তন্ত্রসিদ্ধির ক্ষেত্রে কালিসাধনার প্রসিদ্ধি, তৃতীয় পর্যায়ে সনাতন হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে কালি সাধনা বিষয়ক তত্ব এবং তাকে মূল আদিশক্তির রুপ কল্পনা করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, কালক্রমে নানা চরাই উতরাই মধ্যে দিয়ে সমাজের ধর্মপ্রান ব্যক্তির চেষ্টায় কালিমন্দির নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা এবং একটি পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী দের শক্তি রুপে পূজিতা দেবি কালির পূজা আজকের বাংলার উৎসব এ পরিনত হল তার পর্যায়গত বিবর্তন তুলে ধরাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

এতৎ বিষয়ক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পর্যালোচনা:

ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি যাবতীয় বৃত্তান্তের বেশিরভাগটি শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে রচিত পুরাণের মধ্যেই অনেক খানি উল্লেখিত হয়েছে। তা বাদেও রয়েছে বহু তাত্ত্বিক বিশ্লেষক এবং তান্ত্রিক উপাসনার রচনা। কালী সাধনার বিবর্তনের পাতা উল্টাতে গেলে ঋকবেদ এর রাত্রি সুক্ততে দেবির ধারনা থেকে শুরু করে মণ্ডুক উপনিষদে মানবসত্তার সাথে দেবির একাত্ম হওয়ার ব্যাখ্যা, আরও পরবর্তীতে বানভট্টের ‘কাদম্বরিতে’ প্রান্তিক জনজাতির মানুষদের দেবি রুপে আত্মপ্রকাশ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা একটি পর্যায়। আবার তারপরের ইতিহাসচর্চার দিকে তাকালে দেখা যাবে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী উপনিষদে দেবি মূল স্রোতের ধর্মীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছেন। আরও পরবর্তীতে ‘ব্রহ্মযামল’ গ্রন্থে বঙ্গদেশে দেবী পূজার বিবরন, ‘তন্ত্রসার’ গ্রন্থে মা কালীর তান্ত্রিক উপাসনার প্রক্রিয়ার প্রকাশ এছাড়াও কালিশপরজবিধি গ্রন্থে গৃহস্থের ঘরে পুজার বিধি দেবি কালির ক্রমাগত সমাজে তাৎপর্য হওয়ার প্রমান দেয়।

আলোচনা:
দেবী কালী এর প্রাথমিক রুপ কল্পনা প্রকাশ হয়েছে বেদ এর রাত্রি সুক্ত তে। সেখানে রাত্রিদেবী উল্লেখ রয়েছে, রাতের বন্য পশুদের থেকে রক্ষা পেতে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান হয়েছে। মনে করা হয় রাত্রিদেবী প্রথম পর্যায়ের দেবী কালী এর চিত্র বহন করে । দেবী কালী এর প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, মণ্ডূক উপনিষদ এ, সেখানে দেবী অগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা অর্থাৎ অগ্নির সপ্ত জিহ্বা জীবের পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি। সুতরাং দেবী কালী জীবনে জাগরুক থাকার তাৎপর্য বহন করে। এছাড়াও দেবিকে 'শতপথ ব্রাহ্মন' কৃষ্ণা (৭।২।৭)[৩] ঘোরা (৭।২।১১)[৩] এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মন' এ (৪।১৭)[৪] পাশহস্থা এবং কালিদাস এর কুমারসম্ভব (৭।৩৯)[৫] মহাদেব এর বিবাহ যাত্রায় সমস্ত দেবীর পশ্চাৎ এ দেবী কালী অগ্রসর হচ্ছেন এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সমাজে দেবীর অবস্থান তখনও গৌরবের স্থান লাভ করেনি। কালিদাস এর কথায়,

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভানাং
কালী কপালাভরনা চকাশে
বলাকিনী নীলপয়দরাজি
দুরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব ।।- কুমারসম্ভব, ৭।৩৯.[৫]

কালিদাস এর এই রুপক ব্যাখ্যার পরেও একটি বিষয় বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল কালিদাস এর নিজের নামটি, নাম এর ব্যাখায় বোঝা যায় কালির দাস অর্থাৎ কালির পুজারি যিনি। সুতরাং সমাজে সর্বজন মতে কালিদাস এর সমসাময়িক কালে কালীর দেবিত্বের প্রচার না থাকলেও কোন ছোট কৌম এর মাঝে কালী পূজিতা হতেন এমন মনে করা যেতে পারে। সপ্তম শতকে বানভট্ট এর কাদম্বরী তে দেবী চণ্ডী এর বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে এই দেবী শবর জাতির মধ্যে পূজিতা, তিনি রক্তললুপা , বানভট্ট এর বর্ণনায় দেবী পূজা রুধিরের প্লাবনে পূজিতা। দেবীর বর্ণনায় স্পষ্ট যে এহেন তামসিক প্রক্রিয়া এর পূজা পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য সমাজে বিশেষ মান্যতা পায়নি[৬]। দেবী চণ্ডীর এই বিশ্লেষণ এর কারন পরবর্তী কালে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পুরাণ এ দেবী চণ্ডী এবং কালী এক সত্তায় মিলিত হয়েছেন (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,৫।২৩।২-৩)[৭]। এই পর্যায়ে এসে ব্রাহ্মন্য সমাজে কালী কিছুটা মহিমান্বিত হয়েছেন তাই এই উপনিষদ এ দেবী পার্বতী এর অপর রুপ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, একই সাথে চণ্ডী ও অসুর বিনাশ এর জন্য কালীরই এক রুপ হিসেবে পুরাণকারগন এর ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে। নানা গল্প উপকথা পুরানে এই দেবির একীভূত করার যুক্তি স্বরুপ বর্ণিত। পার্বতী উচ্চ পর্যায়ের ব্রাহ্মন্য ধর্মের দেবী রুপে স্বীকৃত তার সাথে কালি ও প্রান্তিক জাতির পূজিতা দেবী চণ্ডী এক সত্তায় মিলেছেন কারন সমাজের বাস্তব জীবনে তাগিদ ও ভিরুতা থেকে দেবি শক্তির নানা দিক সমাজ স্বীকার করেছে[৬]। এই স্বীকৃতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে শিব এর সাথে কালির যোগের মাধ্যমে। আজকের দিনে আমরা মা কালীর মূর্তি তে মা এর পদতলে শিব কে দেখতে পাই। এর কারন তন্ত্রগ্রন্থ এবং পৌরাণিক গ্রন্থে গভীর ভাবে এর কারন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, সাংখ্য দর্শনে মাতৃ শক্তি ' প্রকৃতি' স্বরুপ এবং দেব শক্তি 'পুরুষ' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। সাংখ্য দর্শন মূলত সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করেছে তাত্বিক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে, এখানে পুরুষ সৃষ্টির কারক এবং প্রকৃতি সমস্ত সৃষ্টির পালিকা শক্তি, সমস্ত জীব এর রক্ষক। শিব এর ওপর কালীর আরোহণ প্রকৃতির প্রাধান্য কে ব্যক্ত করে। কালী প্রকৃতি স্বরুপ। অপর ধারনাটি হল ইহজগতের সমস্ত নেতিবাচক দিক গুলির থেকে রক্ষা করতে এ মাতৃশক্তি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ নির্লিপ্ত শিবশক্তির

তুলনায়, তাই মা এর পদতলে ‘ভোলা’। আরেকটি নতুন তত্ব কালীর পদতলে শিব নয় শব। রনাঙ্গনে অসুর বধ এর সময় কোন মৃত অসুর দেহের ওপর পা পরে যাওয়ায় মা এর পদ স্পর্শে অসুর এর শবদেহেরও শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। তাই কালী আসলে শিবারুরা নয় শবারুরা[৮]। রামপ্রসাদ একটি প্রচলিত গান,

শিব নয় মায়ের পদতলে
ওটা মিথ্যা লোকে বলে
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে
মা দাড়ায়ে তার উপরে
মায়ের পদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরুপে হয় রনস্তলে ।।[৬]

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের ওপর অধিক যুক্তি আরোপ করে সেটি প্রতিষ্ঠার প্রবনতা প্রমান করে সেই বিষয়ের উত্তরোত্তর তাৎপর্য পাওয়াকে। কালী শিব এর সংযুক্তি, কালী এর ধারনাকে পার্বতী এর সাথে একিভুত করার প্রয়াস উক্ত বিষয়টি প্রমান করে। সুতরাং বিভিন্ন গ্রন্থ এর লিখিত সূত্র থেকে কালীর দেবীত্ব অর্জন করার ধারাবাহিক পর্যায় স্পষ্ট। তবে তার পরেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় যে কোন সময়ে কালীর স্থান জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং তার কারন কি তাছাড়া ভারতবর্ষের কোন অংশে কালিপুজার প্রসার বেশি। এটাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে শাক্তবাদ এর পূজারিগন এর তাদের কালী সাধনার মাধ্যমে কত তাৎপর্যই না করে তুলেছেন বিষয়টাকে। যদি কালী পূজার প্রাচীনত্ব বিচারে যেতে হয় তবে কৃষ্ণ নন্দ আগমবাগিশ এর রচিত তন্ত্রসার বইটি অবশ্য পাঠ্য। কালি পূজার সমস্ত নিয়ম আচার সময় কাল এই গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত, তবে এটি বিতর্কের যে এই বইটি আদৌ ষষ্টদশ শতাব্দী তে লেখা নাকি তার পরের বা আগের। তবে আরও একটি গ্রন্থ ব্রহ্মানন্দের লেখা শাক্তনন্দতরঙ্গিণী এটির সময়কাল সুনিশ্চিত করা গেছে তা হল ষষ্ঠদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। এই গ্রন্থটিতেও কালী পূজার যাবতীয় নিয়মাবলী উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে কমবেশি ওই সময়েই কালী পূজিত হওয়ার স্থান লাভ করেছে কারন তা না হলে পূজার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা থাকত না। আরও একটি বিষয় কৃষ্ণ নন্দ এবং ব্রহ্মনন্দ এরা দুজনেই ছিলেন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক এবং তাদের লিখিত পুজার নিয়মাবলী গুলি তান্ত্রিক পদ্ধতির পরিচয় দেয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ষষ্টদশ শতকে তান্ত্রিক মতে কালী পূজিত হতেন, তান্ত্রিক পদ্ধতি যে সাধারন মানুষ এর আয়ত্ত করার বা আগ্রহের ক্ষেত্র নয় তা বলাই বাহুল্য। তাই সে ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে তন্ত্র সাধনার মাঝেই দেবী কালীর দেবিত্ব সীমিত ছিল, তা সাধারন মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠেনি।

আজকের দিনে দাড়িয়ে তান্ত্রিক আচার ছাড়াও আজকের বছরের নানা সময়ে মানত পূজা রুপে অথবা গৃহে বাৎসরিক পূজা হিসেবে যে কালী পুজা আমরা দেখি তার বিধি প্রথম্ উল্লেখ রয়েছে কাশীনাথ এর রচিত ‘কালিশপরজবিধি’ এই গ্রন্থে , সময়টা ১৭৬৮ সাল। পূজা এর বিধি নিয়মাবলি সবিস্তারে লেখা থাকলেও তিনি যে ভাবে এই পুজা কেন করা উচিৎ তার জন্য বহু যুক্তি আরোপ করেছেন তা থেকে সহজেই অনুমেয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেও কালী পূজা তত জনপ্রিয় হয়নি[৭]। এখন প্রশ্ন হল ভারতবর্ষের কোন অংশে মূলত কালী সাধনা হত, ব্রহ্মযামল এর আদ্যাস্তোত্রে দেবী আদ্যা কোন নামে কোন স্থানে পূজিতা তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে ‘কালিকা বঙ্গ দেশে চ’ অর্থাৎ কালী বঙ্গ দেশে

পূজিতা।[৬] দেবী কালীর তন্ত্র সাধনা থেকে জনপ্রিয় পুজা হওয়ায় এই যাত্রায় বৃহৎ ভূমিকা রয়েছে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ সাধকদের। এই জনপ্রিয়তা অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বলা যায়। এই কালী সাধকগন নানা দৃষ্টিকোন থেকে দেবী কালী কে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের ভক্তিরসে নতুন ভাবে শাক্ত পদাবলি তারা রচনা করেছেন ,রামপ্রসাদ তার পদাবলি তে মাতৃ রুপে আরাধনা করেছেন, মা কে দেখার জন্য সন্তান এর আকুতি গভীর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, জীবনকে যাপন করতে উপযুক্ত জীবন দর্শন এবং জীবনের বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে আসার শক্তির অনুপ্রেরনা তার গান গুলিতে ব্যাক্ত হয়েছে। রামপ্রসাদ এর গান গুলির আরও একটি বিশেষত্ব হল এতে রুপক শব্দের ব্যবহার যেমন মৃত্যুর সময় আগত হওয়াকে শমন বলেছেন, জীবন বেঁচে থাকা কে কৃষি কাজ এর সাথে তুলনা করেছেন, এমন ভাবেই জমিদার তহশিলদার এর তুলনা অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের বিষয়গুলিকে দিয়েই গভীর দিক গুলির ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরন স্বরুপ কিছু উল্লেখযোগ্য গান এর কথা বলা যায়,

মন রে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা
মূর্তি পূজার অসারত্ব তিনি সেই সময়ে বুজেছেন,
মিছে ঘাঁটিস মাটি নিয়ে
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই

রামপ্রসাদ সেই অষ্টাদশ শতকেই বুজেছিলেন মন্ত্র তন্ত্র সবই মিছে তাই তার কথায়,

আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা
শুধু যা জেনেছি সেটুক হল এই
তোরে ডাকার মতো ডাকতে যদি পারি
তবে আসবি নে তোর এমন সাধ্য নেই।।[১০]

গভীর জীবনবোধ এবং মা এর জন্য সন্তান এর আকুতি , জীবনের সমস্ত চরাই উতরাই এর মধ্যেও মাতৃ ভক্তি কে অটুট রাখার ক্রমাগত টানাপড়েন সাধক তার জীবনে উপলব্ধি করেছেন তা প্রতিফলিত হয়েছে তার গানে। আরও একটি বিষয় বলার অপেক্ষা রাখে না রামপ্রসাদ শুধু একজন কালী সাধক নন তিনি আগে একজন কবি তার পর সাধক কারন তার গান গুলি আর কালি সাধনার মধ্যে আটকে নেই তা শেখায় জীবনদর্শন,শেখায় মূল্যবোধকে। রামপ্রসাদের সমকালীন সময়ে কালী আরাধনা তান্ত্রিক আচার এর মধ্যেই আবদ্ধ হয়েছিল, রামপ্রসাদ তার গানের মধ্যে দিয়ে কালী সাধনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তন্ত্রের গুপ্ত সাধনার দেবী হয়ে উঠলেন স্নেহময়ি মা, চিন্তাময়ি মা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে উঠেছিলেন আরও একজন অন্যতম কালিসাধক। রামকৃষ্ণ দেব ও তার পূর্বসূরি রামপ্রসাদের ভক্তির পথই গ্রহন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ এবং রামপ্রসাদ এর মাঝে একশ বছরের ব্যাবধ্যান। এই একশ বছরে অন্যান্য কালী সাধকগন রামকৃষ্ণের পথ তৈরি করেছিলেন, বাংলায় শাক্তবাদ অনুরাগীদের মতাদর্শগত ধারাবাহিকতা ছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে দক্ষিনেশ্বর কালি মন্দিরকে ঘিরে রামকৃষ্ণ তার সাধনার জগত তৈরি করেছিলেন। যদিও তিনি নিজে মন্দির এর পুজারি হিসেবে মূর্তিপূজা করতেন কিন্তু কালী চিন্তন শুধু মূর্তিতে আবদ্ধ নেই তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ধনী দরিদ্র জাতপাত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণির মানুষকে তার উদার উপস্থিতিতে স্বাগত জানান হত। পরমহংসদেব তার পূর্বসূরি কালি

সাধকগন এর মতো কালী কে ব্রহ্ম রুপে কল্পনা করেছেন। কালীই স্রষ্টা এবং জগতের সমস্ত কিছুর কারন। তিনিই ব্রহ্মময়ী। পরমহংস বিভিন্ন ধর্মের সাথে পরিচিত ছিলেন, বহু ধর্মের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন যে আচারগত ভিন্নতা থাকলেও সব ধর্মের আভ্যন্তরীণ নির্যাস একই, তিনি সব ধর্মের নির্যাস এর সাথেই পরিচিত হতে চেয়েছেন তাই বারবার বলেছেন “আমি একঘেয়ে হব কেন?” আরও বলেছেন সকলের আরাধ্য বস্তুই এক শুধু পন্থা আলাদা স্থান কাল পাত্র ভেদে শুধু মতভেদ ঘটে। পরমহংসের ধর্মীয় দর্শন স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী সময় তার বেদান্ত দর্শন আদলে প্রসার ঘটিয়েছেন। এই ভাবে পরমহংস দেব এবং বিবেকানন্দের ভক্তির মধ্যে দিয়ে তন্ত্রে পূজিতা কালী হয়ে উঠলেন দক্ষিণেশ্বর এর মা ভবতারিণী।[৬]

দেবী কালীর পুজা জনপ্রিয় সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে বাংলার ধর্মপ্রাণ কিছু উচ্চবিত্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এক্ষেত্রে ১৮৫৫ সালে রানি রাসমনির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিনেশ্বর কালি মন্দির ছাড়াও উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটায় কালি মন্দির স্থাপন করেন, এছাড়াও ২০০ বছর প্রাচীন সতিপীঠ হিসেবে পরিচিত কালীঘাট, প্রচলিত বিশ্বাস মতে, ১৫৭০ সালে পদ্মাবতি দেবি, সাবর্ণ রায়চৌধুরি পরিবারের সদস্যা এবং লক্ষিকান্ত রায়চৌধুরির মা দৈবস্বপ্নাদেশ পান কালিকুন্ড বলে একটি জলাশয়ে সতির ডান পায়ের আঙ্গুলযুগল পতিত হয়েছে। তাই কালিঘাট আজও বিখ্যাত। বাংলায় একসময় ডাকাত সর্দাররা তাদের গুপ্ত স্থানে শক্তির আরাধনা করে মা কালির শরণাগত হতেন, যার সাক্ষ্য আজও এই মন্দির গুলি বহন করে চলেছে যেমন, কলকাতার অতিপ্রাচীন পূর্ণদাস রোড ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত ডাকাত কালি বাড়ি, এখানে মা এর মূর্তিটি কস্টিপাথর দ্বারা নির্মিত। শোনা যায়, মনোহর ডাকাত এই কালি মন্দির এ মা এর পুজা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস এ তিনি মা এর চিন্ময়ী রুপ এর পাশাপাশি ভয়ংকরি রুপও তুলে ধরেছেন, এই রুপ বাংলার তদানীন্তন অবস্থার পরিচায়ক, বাংলার বর্তমান এবং অতীত রুপের ছবি আঁকে, আবার একি সাথে ‘দেবি চৌধুরানী’ উপন্যাসে ভবানি পাঠক বাস্তব চরিত্রের রুপায়ন করেছে, বাস্তবিক ই ভবানি পাঠকের কালি মন্দির জলপাইগুড়ি অঞ্চলে শিকারপুর চা বাগানের জমিতে আজও রয়েছে। যদিও চরিত্রটির উত্তরবঙ্গের সাথে যোগাযোগ নিয়ে বিতর্ক আছে, তবুও স্থানীয় বাসিন্দারা দৈনন্দিন ভাবে এখানে পূজার প্রচলন রেখেছেন। সুতরাং বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে এমন কালী মা এর উপাখ্যান।

উপসংহার:

উনবিংশ এবং বিংশ শতক স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ ইতিহাস বহন করে। মাতৃ শক্তিকে উপলব্ধি কোরে বিপ্লবীরা তাদের গুপ্ত সংগ্রামের দিন গুলিতে মাতৃ আরাধনা করতেন। মা তাদের কাছে শক্তিস্বরুপা। সুতরাং কালী শুধু শাক্তবাদ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না সাধনার পর্যায় পেরিয়ে সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ দুঃখ প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এখানেই কালী পূজার সাথে দুর্গা পূজা সহ অন্যান্য পূজার পার্থক্য, দুর্গাপূজা বাৎসরিক ভাবে সাধারন মানুষের উৎসব এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের জমিদার শ্রেণির সামাজিক মান গৌরব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। সেখানে কালী হয়ে উঠল সাধনার দেবী জীবনযাত্রার রোজনামচা, ডাকাতের শক্তি, সাধকের ভক্তি, বিপ্লবির মনোবল। তাই দুর্গা পূজা সহ অন্যান্য, বাকি দেব দেবির পূজা গুলির মতো কালী পূজারও বছরে একটি নির্দিষ্ট সময় আছে কিন্তু তা বাদেও বছরের অন্যান্য সময়ে মানসী পূজা অথবা গৃহস্থের বাৎসরিক পুজা হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়, যেই পূজা একসময় ছিল

গুপ্তসাধনা তা আজকে জনপ্রিয় সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই রুপান্তর শুধু শাক্তবাদ এর পরিবর্তনের যাত্রা না সাধারন মানুষের চিন্তাশক্তির রুপান্তর যা কালে কালে একটি গুপ্ত ও তান্ত্রিক সাধনার ধারনা থেকে ভক্তি, আস্থা ও নির্ভরতার পূজা হিসেবে বাঙালি তথা দেশের পরিধিতে জায়গা করে নিয়েছে।[৬]

তথ্যসূত্র :

১. Upinder, Singh. 'A History of Ancient and Early Medieval India'. Noida: Pearson, 2008, pp. 158-170.

২. John Woodraff, 'Shakti & Shakta: Essays and Addresses on the Shakta Tantra Sastra', The university of Virginia,1929, pp.1-724.

৩. শতপথ ব্রাহ্মন ৭। ২। ৭, ৭। ২। ১১

৪. ঐতরেয় ব্রাহ্মন ৪।১৭

৫. কালিদাস, 'কুমারসম্ভব' ৭। ৩৯

৬. শশিভূষণ দাসগুপ্ত, 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১, পৃপৃ. ৬৩-৮৯, ২৭৫-২৮৪।

৭. 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পুরান' ৫। ২৩। ২-৩

৮. বিজয়কৃষ্ণ দেববর্মা, 'শিবের বুকে শ্যামা কেন? এবং মা আমার কালো কেন?', সসিমা লাইব্রেরি,২০২২, পৃপৃ. ১-৭০।

৯. Chintaharan, Chakrabarty. 'Shakta festivals of Bengal and their Antiquity'. *Indian historical Quarterly,* vol.25, no.2-3, 1951, pp. 255.

১০. জাহ্নবিকুমার চক্রবর্তী, *শাক্ত পদাবলী ও শাক্তসাধনা,* কলকাতাঃ ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৯৫৭, পৃপৃ. ২৭১-৩৪০।

কোভিড কাল : মন খারাপের কাল

অরুমিতা দে
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বঙ্কিম সরদার কলেজ

সারসংক্ষেপ: অনতি দূরে যে দীর্ঘ কোভিড কাল আমরা পেরিয়ে এসেছি তা আমাদের শরীরে যে কামড় বসিয়ে ছিলো তা আমরা কম বেশি সবাই জানি। কিন্তু শুধু শরীরই নয়, আমাদের মনের ওপর ও এই কালান্তক সময়ের এক ধ্বংসাত্মক প্রভাব কাজ করেছে। এই অসুখী মনের জন্য কোভিডের সরাসরি কিছু কারণ যেমন দায়ী তেমন কিছু পরোক্ষ প্রভাব ও কাজ করে গেছে। কোভিড এমন এক কাল পর্ব যা আমাদের চিরাচরিত বহু ধ্যান ধারণা কেই আমূল বদলে দিয়েছে । ওই পর্বে মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা বলা যায় পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে। ফলে হতাশা, নিরাশা, উদ্বেগ ও অবসাদ হয়েছে তার নিত্য সঙ্গী। অসুস্থতা জনিত আতঙ্ক, প্রিয়জনের জন্য উৎকণ্ঠা, পৃথিবী জুড়ে নৈরাশ্য ও হাহাকার, চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়ার জন্য মানসিক দোলাচল ছিলো মানসিক সমস্যার মূলকারণ। আবার এরই সঙ্গী হয়ে এসেছিলো লক ডাউনের অভিশাপ। কর্ম চ্যুতি, পেশা পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতা ও দীর্ঘ কালীন গৃহ বন্দী দশা তাকে আরও বেশি নিঃসঙ্গ আতঙ্কিত ও নিরাশার অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। মনের ওপর এগুলির যেমন কিছু তাৎক্ষণিক প্রভাব ছিলো তেমন স্বভাব পরিবর্তন, নেশায় আসক্তির মতো বহু দীর্ঘ স্থায়ী সমস্যা আজও আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। মনের এই অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার জন্য লাগাতার মানসিক স্বাস্থ্য চর্চাই আমাদের আশু কর্তব্য।
সূচক শব্দ: কোভিড ১৯, মানসিক স্বাস্থ্য, অবসাদ, স্বভাব পরিবর্তন, উৎকণ্ঠা, লকডাউন।

দীর্ঘ সময় ধরে এক অসুখী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে গোটা দুনিয়া। কবি জীবনানন্দ দাশের কথা ধার করে বলাই যায়, "পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন"।

গত ২০১৯ এর শেষ লগ্নে কোভিড ১৯ নামক এক মারণ ভাইরাসের কবলে পড়ে পৃথিবীর একাংশ। খুব দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। ২০২০ সালের শুরুতেই ভারতে প্রথম সন্ধান মেলে এই ভাইরাসের।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে সংক্রমিত সংখ্যা। রোগটি আসলে কী? আর উপসর্গ কী? বুঝতে না বুঝতেই হঠাৎ থমকে যায় আমাদের স্বাভাবিক জীবন ছন্দ। এত দ্রুততার সঙ্গে কোভিদ তার নখদন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষের উপর যে, সীমানা দেশ সীমানা মুছে যাচ্ছিল নিমেষেই। ফলে একের পর এক দেশ বাধ্য হয়েছিল লকডাউন এর পথে হাঁটতে। ভারতবর্ষও এর থেকে নিষ্কৃতি পাইনি। এই দীর্ঘ বন্ধ দশা আমাদের এতদিনের লালিত ধ্যান-ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রই এর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। রাতারাতি আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, লাখো লাখো মানুষের জীবন যন্ত্রণা, মৃত্যু মিছিল, কর্মহীনতা। শোক আর সীমাহীন হতাশা গ্রাস করলো আমাদের। এই মারণ ভাইরাসের ক্রমবিস্তার কেবল মানুষের শরীরকে কাবু করল না, বিদ্ধ করল তার মনকেও। জগত জুড়ে শুরু হলো, মন খারাপের অসুখ। সমস্ত বয়সের ও সমস্ত স্তরের মানুষই হতাশা ও নিরাশার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ল। জীবনের ক্রম অনিশ্চয়তা

ও মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই হয়ে উঠল মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। রোগসংক্রমণ ঠেকানোর দাওয়াই হিসাবে সামাজিক দূরত্ববিধি মানতে গিয়ে মন থেকে মনের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি মানুষ ক্রমশ হয়ে উঠছিল, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত একা ও অসামাজিক।

কোভিড ভাইরাস কিভাবে হানা দিচ্ছে আমাদের শরীরে, ক্রমশ সে কিভাবে দখল নিচ্ছে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কিভাবে আমরা ধরে পড়ছি মৃত্যুর কবলে, এইসব আলোচনা এই ক'বছরে কম- বেশি আমরা সবাই জেনে গেছি বা দেখে ফেলেছি। কিন্তু এখনো যে বিষয়টা, কিছুটা হলেও আমাদের নজর এড়িয়ে রয়েছে, তাহল এই অতিমারি পর্বে মানুষের মানসিক সমস্যার কথা। কোভিডের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও পরোক্ষ প্রভাব এইভাবে আমরা বিষয়টাকে বুঝে নিতে পারি। কভিড ভাইরাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে, আমরা যে যে মানসিক সমস্যা বা জটিলতা গুলিতে ভুগতে শুরু করেছি, আমি প্রথমে সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করছি।

কোভিড আক্রান্ত মানুষের কথা দিয়েই প্রসঙ্গটি শুরু করা যাক, - অতিমারি পর্বে বহু মানুষ মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নিভৃতবাসে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকেছে। সংক্রমণের ভয়ে আগের মত বা তার পূর্ব অভিজ্ঞতা মত, কোন আত্মীয় পরিজন বা বন্ধ তাকে সরাসরি দেখতে আসতে পারেনি। নিভৃতাবাসে থাকার ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সুস্থ লোকজন তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। এই একাকীত্ব বোধ ও পরিচিত লোকজন তাকে ব্রাত্য করেছে, এমন এক ধারণাকে তাকে ক্রমাগত উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। বিশেষত বয়স্ক আক্রান্ত ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে যথেষ্ট পীড়া ভোগ করেছে। এই উৎকণ্ঠা নৈরাশ্যজনক অবস্থা তাদের সুস্থ হতে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় অনেকেরই শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এই নৈরাশ্যর ফলে। এমনকি অনেকে মৃত্যুবরণও করেছে। শুধুমাত্র পরিবারের লোকজনই নয় তার প্রতিবেশীরাও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও তার বাড়ির লোকজনকে একঘরে করে রাখার ফলে, অতিরিক্ত মানসিক চাপ রোগীকে আরো বেশি চিন্তাগ্রস্ত ও অসুস্থ করে তুলেছে। অসুস্থতার সময় এতদিন সকলের সহানুভূতিই ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশিত, সেই জায়গায় সামাজিক দূরত্ব ও নিভৃতবাসের মতো ব্যতিক্রমী আচরণ হয়ে উঠেছে রোগমুক্তির প্রধান অন্তরায়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই পর্বে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা জনিত কারণে, এবং তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ রোগীকেই অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও হতাশার কারণে আই.সি.ইউতে স্থানান্তরিত হতে হয়েছিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কভিড সংক্রমনের শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি ও রোগ নিরাময়ে দীর্ঘসূত্রতা রোগীর মানসিক অস্থিরতা ও চাপের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বেশিরভাগ স্বাস্থ্যকর্মীর অভিজ্ঞতা হল, কোভিড সংক্রমিত হলো রোগীদের মধ্যে ৫০% রোগী মানসিক আঘাত, ২৫% রোগী অবসাদ, ২০% রোগী উদ্বেগ, ও ১৫% রোগী অনিদ্রা জনিত অসুস্থতার শিকার। শুধু রোগী নিজেই নয় তার পরিবারের অন্য সদস্য যারা তখনোও রোগাক্রান্ত হয়নি, তারাও এক অজানা ত্রাসের শিকার হয়েছে। সামগ্রিকভাবে যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে।

সরাসরি কোরনা আক্রান্ত নয়, তবে আগে থেকেই যারা অন্যান্য জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন, এই অতিমারি পর্বে তাদেরও শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, বহু মানসিক সমস্যাও শুরু হয়েছে। ক্যান্সার আক্রান্ত, নিয়মিত ডায়ালিসিস প্রয়োজন এমন রোগী, থ্যালাসেমিয়া সহ আরো বহু জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী, যাদের নিয়মিত চিকিৎসা না করালে, বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়না, এই পর্বে তাদের চলতে থাকা চিকিৎসায় ছেদ পড়েছে অথবা

অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের রোগ বৃদ্ধি ঘটায় সাথে সাথে আসন্ন মৃত্যুভয়ে তারা কাতর হয়েছে। অতিমারি পর্বে যেহেতু অন্যান্য রোগের চিকিৎসা কিছুটা থমকে গিয়েছিল, বহু শল্যচিকিৎসা নির্দিষ্ট সূচি বার বার পিছিয়ে যেতে লাগলো, বহু চিকিৎসাকর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে অনেক সময় কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে, আবার সাধারণ সমস্যার চিকিৎসা করাতে গিয়েও অনেক সময় অন্যান্য রোগীরা কোরোনায় আক্রান্ত হল, ফলে অন্যান্য রোগীদের মধ্যেও আতঙ্ক ও মানসিক অস্থিরতা অনেকটাই বেড়ে গেছে। তীব্র হতাশা থেকে বহু রোগী আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে, এইসময়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছে। হয়তো আরও কিছুদিন তারা বেঁচে থাকতে পারতো কিন্তু অতিমারির আতঙ্ক ও তীব্র মানসিক বিষাদ তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। শুধু রোগী নয়, তাদের পরিবার-পরিজনের মনেও হতাশার ছায়া ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে, করোনাকালে। শুধু কোভিডই এইসময়ে মানুষের প্রাণ কাড়েনি, সুস্থ মানুষও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে, বহুপরিচিত জনের মৃত্যু সংবাদ শুনে, বিভিন্ন গণমাধ্যম জুড়ে কেবলই রোগের খবর ও মৃত্যুর খবর দেখে ও পড়ে, অকালে প্রাণ ত্যাগ করেছে। যার কারণ হিসেবে মানসিক উৎকণ্ঠা আতঙ্ক ও হতাশা কে দায়ী করলে ভুল হবে না। এছাড়া অনেক একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মানুষ, যাদের তেমন কোনো আত্মীয় পরিজন নেই, কাছে থাকেন না, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তাদের মনেও এক বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধির ফলে তারা হয়ে পড়েছে আরও একা। একাকী মানুষরা বন্ধু বিচ্ছেদ এর ফলে আরো নিরাশ হয়ে পড়ে। এরই সাথে অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে লাগাতার কোভিডের ভয়াবহতা প্রচার, নৈরাশ্যজনক দৃশ্যাবলী ও মৃত্যু মিছিলের খবর, এমনকি কিছু কিছু জায়গায় অমানবিকভাবে মৃতদেহ সৎকারের দৃশ্যাবলী। যা গৃহবন্দী একাকী মানুষকে মানসিকভাবে অস্থির, আতঙ্কগ্রস্থ করে তোলে। দরিদ্র মানুষেরা যারা কোভিড আক্রান্ত হয়েছে, হাসপাতালে আই.সি.ইউতে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে, অথবা যাদের চিকিৎসা করানোর মতো সঙ্গতি নেই, তারা নিরাশা ও স্বজন হারানোর আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রোগাক্রান্ত হয়েও অনেকে বাধ্য হয়েছে জীবিকার প্রয়োজনে কাজে বেরোতে। আবার যেখানে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অসুস্থ, সেখানে ওই পরিবারের অন্যান্যরা যারা ওই অসুস্থ রোগীর উপর নির্ভরশীল তারাও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনের আশঙ্কায় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একইসাথে মৃত্যুভয় ও অর্থ চিন্তা বিপন্নতা কে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এইসব চেনা চিত্রগুলিই গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে আমরা ঘটতে দেখেছি, যা কমবেশি সবার উপরেই বাড়তি মানসিক চাপ তৈরি করেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেয়ার সাথে সাথে এই মানসিক অস্থিরতা কেও আবশ্যিকভাবে আমরা কখন সঙ্গী করে নিয়েছি।

কোভিড তো ক্রমাগত প্রাণ কাড়ছেই, মনকে ভারাক্রান্ত করছেই সেইসঙ্গে সংক্রমণ থেকে সেরে ওঠার পরও দীর্ঘ সময় আমাদের মনের ওপর এক কালো ছাপ রেখে যাচ্ছে। যা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। চিকিৎসার ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে পি. টি. এস. ডি বা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার, যা একটি মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা। রোগ ভোগের ফলে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরার পর ভীতিজনক ঘটনাটির দ্বারা রোগী এই মানসিক অবস্থার শিকার হয়। অতিরিক্ত উদ্বেগ, অনিদ্রা, অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা করা, এই মনোরোগের লক্ষণ। মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে ফেরার পর, রোগী যখন ট্রমার মধ্যে থাকে তখন এক বছর তারও বেশি সময় ধরে মানসিক অবস্থাটি চলতে পারে। এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে চার ধরনের

- রোগী মনে করে তার দুর্ঘটনার স্মৃতি, মানে ভীতিজনক ঘটনাটি যেন পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এরফলে সে দুঃস্বপ্ন দেখে ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়।
- বিশেষ কোনো স্থান, অতিরিক্ত জনসমাগম, বিশেষ কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারের লোকজনদের সে এড়িয়ে চলতে থাকে এবং এতেই মানসিক শান্তি পায়।
- রোগীর চিন্তারও মেজাজের নঞঃর্থক পরিবর্তন হয়।

সহজেই চমকে ওঠা, ভয় পেয়ে যাওয়া, সব সময় কোনও বিপদের আশঙ্কা করা, মনোযোগ এর অভাব, অতিরিক্ত বিরক্তি ও রাগ, আক্রমণাত্মক আচরণ, অহেতুক অপরাধবোধে ভোগা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

এবার আসছি চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কথায়। অতিমারির পরিস্থিতির মোকাবিলায় তুই ক'বছরে তারা দিনরাত এক করে রোগীর সেবা করে চলেছেন। সেক্ষেত্রে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে তাদের পরিবার-পরিজনের থেকে পৃথক থেকে তাদের সেবা কাজে ব্রতী রয়েছেন। ফলে একটা মানসিক আক্ষেপ অনেক সময় তাদের মধ্যে কাজ করছে। আবার যথাযথ চিকিৎসা ও সেবা দেওয়ার সত্বেও বহু রোগীকে বাঁচাতে না পারার গ্লানি তাদের বিষাদগ্রস্তও করেছে অনেক সময়। বহু চিকিৎসককেই এই বিষয়ে আক্ষেপ করতে শোনা গেছে। আবার চিকিৎসাকেন্দ্রে শয্যা, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ঔষধ,অক্সিজেনের অভাবে চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগটুকু না দিয়ে বহু আক্রান্তের মৃত্যুর ঘটনা চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের মানসিক হতাশা বাড়িয়েছে এই পর্বে। বিশেষত যখন রোগীর চাপ বাড়ে, অক্সিজেনের অপ্রতুলতা দেখা যায়, তখন অনেক চিকিৎসকেই একজন রোগীর মুখ থেকে অক্সিজেন সাপোর্ট খুলে নিয়ে তুলনায় কম বয়সী কোনও মুমূর্ষু রোগীকে তা প্রদান করতে হয়েছে। এই ঘটনায় তিনি যে নৈতিক দ্বন্দ্বে ভুগেছেন, তা তার মানসিক চাপকে ত্বরান্বিত করেছে। এটা কেবলমাত্র ভারত বা পিছিয়ে পড়া দেশগুলির ঘটনা নয়, আমরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কাছে বিশ্বের বহু জায়গায় চিকিৎসকদের এমন দ্বন্দ্বে ভুগে কাঁদতে দেখেছি।

এবার আসি পরোক্ষ প্রভাবের কথায়, সরাসরি কোভিড সংক্রান্ত না হলেও এই অতিমারি পর্বে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট কিছু মানসিক সমস্যার কথা এখানে তুলে ধরছি। কোভিদ পরিস্থিতির দোসর হয়ে যে নতুন একটি সংকট আমাদের দুয়ারে হাজির হয়েছিল তাহল লকডাউন। দীর্ঘ লকডাউনের জেরে বহু মানুষ নতুন করে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে অনেকেই বিশেষত: যেসব শ্রমজীবী ভিনদেশে বা ভিন রাজ্যে কর্মরত ছিল, তাদের অনেকেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আস্তানা টুকু হারিয়ে তারা নিঃসম্বল ভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে নিজ গ্রামে বা শহরে। এখনো প্রতিদিন নতুন করে বাড়ছে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা। আবার এই সময় বহু পরিবারের একমাত্র উপায়ক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের মৃত্যু ঘটেছে, ফলে গোটা পরিবারটি টিকে থাকাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। হতদরিদ্র মানুষ গুলো জীবনে এমনিতেই সংকটের শেষ নেই, তার ওপর এই পরিস্থিতিতে নতুন করে অন্ন- বস্ত্র ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা পূরণ করাই তাদের কাছে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, ফলে তাদের মানসিক যন্ত্রণা বেড়েছে কয়েক গুণ। অনেক সময় রোগ সংক্রমণ তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে, অনাহারে মরার দুশ্চিন্তার জন্য। বহু বাবা-মা ছোট সন্তানদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পূরণ করতে না পারার তীব্র মানসিক অনুশোচনায় ভুগে আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছে। অনেকে আবার, 'অন্তত না খেয়ে যাতে মরতে না হয়' এই তাড়ণায় তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে অর্থ উপার্জনের কাজে লাগিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। যেসব কাজ অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ।

ফলে সেইসব শিশুরা সংক্রামক ব্যাধির শিকার তো হচ্ছেই, সঙ্গে জীবিকার পাশে তাদের শৈশব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আহত হচ্ছে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ।

কেবলমাত্র নিম্নবিত্ত পরিবার পরিযায়ী শ্রমিকরাই নয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অনেকেই কাজ হারিয়েছে এই পর্বে। অতিরিক্ত বাজার দর, পঠন-পাঠন সহ অনেক ক্ষেত্রেই অনলাইনই একমাত্র মাধ্যম হওয়ায় ইন্টারনেটের বাড়তি খরচ, সংক্রমণের ভয়ে মাস্ক, স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশের অতিরিক্ত খরচ সামলাতে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত মানুষরা না পারছে হতদরিদ্র পরিবারগুলোর মত দানের লাইনে দাড়াতে বা ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে, ফলে নতুন পর্বের এই জীবনযাপন তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। তৈরি করছে অতিরিক্ত মানসিক চাপ। তাই এই শ্রেণীর মানসিক যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। এর ফলে অনেকেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েও মৃত্যুবরণ করছে।

দীর্ঘদিন ঘরবন্দী মানুষের একত্রে বসবাস মানুষের জীবনকে করে তুলেছে একঘেয়ে। মানসিকভাবে হয়ে পড়েছে ক্লান্ত, আর ওপর অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও সামগ্রিক চাপে বহুগুণ বেড়ে গেছে দাম্পত্যকলহ, পারিবারিক হিংসা। অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে বহু মানুষ এই পর্বে হয়ে উঠেছে মাদকাশক্ত। দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মাদকাসক্তি বেড়েছে এই সময় কালে। যার কুপ্রভাব পড়ছে পরিবারের কমবয়সী সদস্যদের মনের উপর।

লকডাউন এর ফলে আমাদের প্রায় সবার জীবনযাত্রায় কম-বেশি পাল্টে গেছে, বা বলা ভাল আমরা পাল্টে ফেলতে বাধ্য হয়েছি। ব্যবসায়ীদের ওপর এর খুব বড় প্রভাব পড়েছে। বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসা মোটামুটিভাবে সামলাতে পারলেও মাঝারি ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট ক্ষতির মুখে পড়েছে। সময় ব্যবসা বন্ধ থাকায় ও তাদের অপ্রতুল পুঁজির কারণে তারা বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অনেকে তাদের পুরনো ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে,যার প্রভাব পড়েছে তাদের পরিবারের ওপরেও। অনেকেই দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত ব্যবসা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষত: পুস্তকব্যবসায়ী ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বস্তু নির্মাণ ও সরবরাহকারী ব্যবসায়ীরা বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে দিন আনা দিন খাওয়া হকার, ফেরিওয়ালা সকলের জীবনেই হতাশা ও মানসিক চাপ বেড়েছে বহুগুণ। রোগ চিন্তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে অর্থচিন্তা ও দৈনন্দিন সংসার প্রতিপালনের চিন্তা। তাদের মধ্যে বেড়েছে অনিদ্রা ও মানসিক উদ্বেগ জনিত সমস্যা। এই শ্রেণীর মধ্যে বেড়েছে লটারি প্রতি আসক্তিও মাদকাসক্তি।

এবার আসি শিল্প-সংস্কৃতির পেশাদার কর্মীদের কথায়। বহু মানুষজন এই। পেশায় থেকে নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণ করেন। যেমন নাট্যকর্মী, যাত্রাশিল্পী, সিনেমা ও টেলিভিশনের অভিনেতা-অভিনেত্রীও কলাকুশলীবৃন্দ। সঙ্গীত ও বাচিকশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পী ইত্যাদি, এই লকডাউন এদের সবার পেশার ওপরেই থাবা বসিয়েছে। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায়, এদের জীবন-জীবিকাও একপ্রকার থমকে গেছে। মানুষ কাজ হারিয়েছেন, বহু গুণী শিল্পী পেটের দায়ে ভিন্ন পেশা এমনকি ভিন্ন রুচির পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। বহু গায়িকা-নায়িকা কে দেখেছি এই পর্বে অনলাইনে পোশাক ব্যবসা শুরু করেছেন, অনেক শিল্পী যারা যাত্রা বা টেলিভিশনে অভিনয় করতেন, বা মঞ্চে যন্ত্রসংগীত বাজাতেন তারা অটো চালাতে বা বাজারে বসে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন, প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দাবিতে। যা এতদিন তাদের শুধু পেশায় ছিলনা, ছিল ভালোবাসা ও স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার, যখন নিজেদের

ভালোবাসার ক্ষেত্র ছেড়েঅন্য কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন তাদের মনের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে, একরাশ হতাশা ও আক্ষেপ তাদের ঘিরে ধরেছে। শিল্প সত্তার গতি জোর করে রোধ করলে ব্যক্তি বা সমাজ কারো পক্ষেই মঙ্গলদায়ক হয়না। বকু শিল্পী আবার নিজের পূর্ব সুনাম ও পরিচিতি কথা মাথায় রেখে, বিকল্প কাজে মনোনিবেশ করতে পারছেন না অথচ তার দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ বিপন্ন হচ্ছে। মানসিক দ্বন্দে পড়ে তারা যেমন অবসাদে ভুগছেন, এর ফলে কেউ আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছেন আবার অনেকে নানা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির শিকার হচ্ছেন।

এই পর্বে আমূল বদল যদি কোন ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তা হল শিক্ষাব্যবস্থা। এই সময় আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি শ্রেণিকক্ষ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাকে। দূরশিক্ষার মতো কিছু সীমিত ক্ষেত্রে, যে অনলাইন শিক্ষা এতদিন প্রচলিত ছিল দেই আমরা মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় এনে ফেললাম। দীর্ঘকাল স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটাই থমকে গেছিল, পরিস্থিতি আরও কিছুদিন চলতে থাকলে অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে পঙ্গুত্বের দিকে পা বাড়াতো। ফলে অতিমারি পরিস্থিতি ও তার থেকে মুক্তির দীর্ঘসূত্রতার কথা মাথায় রেখে ও অগণন ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই অনলাইন ব্যবস্থাতেই সীলমোহর দিতে বাধ্য হয়েছে আমাদের দেশ। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়কে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা বহু ক্ষেত্রে মানসিকভাবে বিপর্যস্তও হয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকলে লস নাই দুষ্কর হয়ে ওঠেপড়েছে। এতই অতর্কিতভাবে নতুন পদ্ধতিটি চালু হয়েছে যে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ উভয়রই এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দ হতে সমস্যা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দুজনেরই যথাযথ প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থাকলে, এই ব্যবস্থাটি চালু রাখা ও তার সুফল আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এম.এস ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট ইত্যাদি সম্যক জ্ঞান না থাকলে ক্লাস চালানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। এইদিকে হঠাৎ করে এই বিষয়গুলোতে পটু হয়ে ওঠা উভয়ের ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রযুক্তিগত দিক গুলি যথাযথ না জানার ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই শিক্ষকদের সাথে সাবলীল হতে না পেরে শের অক্ষমতাকে লুকিয়ে রাখে, যার ফলে সে কেবল পিছিয়ে পড়ে না, মানসিকভাবেও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের বারেবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, মনোসংযোগের অভাব দেখা দেয়। ঠিক তেমনই প্রযুক্তিগতভাবে দড় নয় এমন শিক্ষকদের ক্লাস পরিচালনা ও পরিবেশনায় সমস্যা দেখা দেয়। শিক্ষকরাও হীনমন্যতায় ভোগে। ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে কার স্বাভাবিক সম্পর্ক নষ্ট করে এক মানসিক দূরত্বের জন্ম দিয়েছে এই রূপ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা। এছাড়া অনলাইন ব্যবস্থাটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রাম শহর ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যকে ও প্রকট করে তুলেছে। এতে শিক্ষাঙ্গনে পড়ুয়াদের একরূপতা ধারণাটি ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের দেশের বহু প্রত্যন্ত গ্রাম যেখানে এখনো ঠিকমতো বিদ্যুৎ ও পানীয় জলই পৌঁছাতে পারেনি সেখানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা আদৌ কতটা সম্ভব তা নিয়ে সংশয় তো থেকেই যায়। ফলে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা ও মেধা থাকা সত্বেও একটা সময় প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিগত পরিষেবার ঘাটতির কারণে পিছিয়ে পড়েছে শহুরে শিক্ষার্থীরদের কাছ থেকে। আর এই বাধা অতিক্রম এর উপায় ও তার আয়ত্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে। আবার অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা ইন্টারনেটের জন্য খরচ করার তেমন কষ্টকর না হলেও নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে হঠাৎ করে এই অর্থের সংস্থান করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। নিয়মিত ইন্টারনেটের খরচা সামলাতে না পেরে তারা ক্লাসে অনুপস্থিত

থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে তারা শুধু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না, উপযুক্ত মেধা ও পঠনের ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাদের এই অক্ষমতার তাদের হতাশা হীনমন্যতা দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের সংস্থান করতে না পেরে, হীনমন্যতায় ভুগে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৃহত্তর ও সমাজের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে ভাবাই যায়। শিক্ষালয় হলো নানা পরিবেশ ও অবস্থান থেকে আসা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের এক মিলনস্থল। সেখানে সবাই মিলে একসাথে দীর্ঘ সময় থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয় শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিকীকরণের জ্ঞান পায়। সমাজে চলার জন্য যে নিয়ম-শৃঙ্খলা দরকার তার জ্ঞান ও আচার আচরণগত শিক্ষাও পায়। শিক্ষালয় তাকে তার বহির্জগৎ সম্পর্কে সচেতন করে। শিক্ষার্থীকে তাদের সম্পর্কে ধারণা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তৈরি করতেও সাহায্য করে। কিন্তু গৃহবন্দি দশায় পড়ুয়ারা ধরনের. সামাজিকীকরণের পাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাদের আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা পাচ্ছে না। আবেগের ভারসাম্য মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর এর প্রভাব বিস্তার করে। তাই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন ব্যাহত হচ্ছে এই অনলাইন শিক্ষার ফলে। এই লকডাউন ছোট বাচ্চাদের ওপরে সবথেকে বেশি খারাপ প্রভাব বিস্তার করেছে। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা, খেলাধুলা বন্ধ ও সমবয়সীদের সঙ্গ না পাওয়ায় তাদের শিশু বয়সের বিভিন্ন চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে না। এযাবৎ তারা যে রুটিনে অভ্যস্ত ছিল তাতে হঠাৎ করে তাতে পড়ায় মানসিক বিকাশ যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। দুটি বছর একটি শিশুর বিকাশ ব্যাহত হওয়া মানে তার শৈশবকে কেড়ে নেওয়া। শিশুদের আচরণে অনেক অসাম্য দেখা যাচ্ছে তারা জেদি, দুরন্ত ও অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক মনোভাব সম্পন্ন হয়ে উঠছে। মা, বাবা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকায় তারা বাড়িতে বাচ্চাদের সাথে থাকলেও গুণগত সময় কাটাতে পারে না, ফলে বাচ্চারা নিঃসঙ্গতায় ভোগে, নানা বদভ্যাস আয়ত্ত করে। যেমন টেলিভিশন বা মোবাইল ফোনে আসক্তি। এর প্রভাব তাদের মনেও শরীরে দুইয়ের এর উপরেই পড়ে। আবার বিভিন্ন গণমাধ্যম ও বাড়িতে বড়দের কাছে ক্রমাগত কোভিড আতঙ্কের আলোচনা, এর ভয়াবহতা, অগণিত মৃত্যুর খবর ও দৃশ্যায়ন তাদের শিশু মনে গভীর রেখাপাত করছে। শিশুদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। বাড়ির বয়স্ক মানুষরাই এতদিন সঙ্গ দিয়ে থাকতেন, কিন্তু কভিদ কালে বয়স্করা বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায়, অনেক সচেতন পরিবারই ছোটদের বয়স্ক মানুষদের থেকে আলাদা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফল হচ্ছে হিতে বিপরীত, উভয়ই মানসিকভাবে নিঃসঙ্গতায় ভুগছে ও বিভিন্ন মনোরোগের শিকার হচ্ছে। তাছাড়া যেখানে বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য লোকেরা কোভিড আক্রান্ত হয়েছে, সেই পরিবারের শিশুটি ভয়ঙ্কর মানসিক চাপ ও ভীতির শিকার হচ্ছে। তারা এমন মানসিক আঘাত পাচ্ছে যে, তারা বহুদিন সুস্থ-স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারছে না।

আবার কিশোর-কিশোরী বা সদ্য যুবাদের মধ্যে যে, সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে তা হলো সামাজিক দূরত্ববিধির কারণে তারা সব সময় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলিত হতে পারছে না। এই বয়সে সাধারণত তারা বন্ধু-বান্ধবের সাথে তাদের নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চাপমুক্ত হয়, যে প্রক্রিয়াটি এই ক'বছরে বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। সমস্যা অনেক বেড়েছে কিন্তু চাপ মুক্তির উপায় অনেক সীমিত হয়ে গিয়েছে। গৃহবন্দি দশায় তাদের জীবন হয়ে উঠেছে একঘেয়ে, তারা যেকোনো কাজের স্বাভাবিক উৎসাহ হারাচ্ছে। তাদের মধ্যে নৈরাশ্য ও মনোসংযোগের অভাব দেখা দিচ্ছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কোভিড এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বা কোভিদকালে উদ্ভূত পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাবে আমরা বিপন্ন হয়ে পড়েছি। এই বিপন্নতা, এই অসুস্থতা যেমন শরীরের তেমন মনেরও। শরীরের অসুখ সহজেই অন্যের নজরে পড়ে,কিন্তু অসুখ যখন মনের কোণে বাসা বাঁধে তখন তা অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়। শরীরের অসুখ হলে আমরা সহজেই ছুটে যাই চিকিৎসকের কাছে। কিন্তু মনের অসুখ হলে আমরা হয় তাকে এড়িয়ে যাই নয়তো ঢাকা দিয়ে আড়াল করি। অডিও আড়াল থেকে সে তার ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়। যদিও প্রথমদিকে কিছুটা সচেতন হলে আমরা আমাদের মনকে অনেকটাই এর আওতা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। যেমন নিয়মিত যোগাভ্যাস, ঘরে বসে সহজে করা সম্ভব এমন সৃজনশীল কাজে হাত লাগানো, ইন্টারনেটে অযথা রোগ সম্পর্কিত তথ্যের পিছনে সারাক্ষণ ব্যস্ত না থাকা, সময় কাটাতে বই পড়া, গান শোনা, সরাসরি সম্ভব না হলেও ফোনালাপের মাধ্যমে বন্ধু পরিচয় এর সাথে ভাব বিনিময় করা, অসুস্থ মানুষকে একদম একা না করে দিয়ে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি। শরীরচর্চা যেমন দরকার সাথেসাথেই মনের দিকটাও যাতে ঠিক থাকে এ বিষয়ে ও সচেতন থাকতে হবে আমাদের। নাহলে যে মানসিক সমস্যাগুলিকে আমরা এই কবছর সঙ্গী করে ফেললাম তার থেকে ভবিষ্যতেও আমাদের মুক্তি মিলবে না।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অমন জিন্দাল এবং ডক্টর বি.পি এস চাহাল: চ্যালেঞ্জেস এন্ড অপর্চুনিটি ফর অনলাইন এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, প্রমান্ন রিসার্চ জার্নাল,২০২০,ইসন. NO. 2249-2976

২. সুজাতা মুখোপাধ্যায়, মানসিক চাপে কমছে রোগ প্রতিরোধ শক্তি, কী করবেন? কী করবেন না? আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, ৯, আগস্ট ২০20

৩. আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায় করোনার মানসিক চাপ, বলছে গবেষণা, এবিপি আনন্দ লাইভ, সোমবার, ৩১মে, ২০২১.

৪. পোস্ট কোভিড সিনড্রোম: মেন্টাল হেলথ. http://youtube/Rn306wjvl3g.

কমল চক্রবর্তীর ছোটগল্প ‘ইঁদুর-মানুষ’ : এক বিপরীত জীবনের উপাখ্যান

আশ্চর্য মাহাত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: কমল চক্রবর্তীর ‘ইন্দুর-মানুষ’ গল্পটি বৃদ্ধ লাবন শবরকে কেন্দ্র করে। গল্পে আধুনিক সভ্যতার প্রতিনিধি কথক আদিবাসী বন্য লাবনকে ক্ষেতের আল কেটে ইঁদুরের জমানো ধান এবং সেই সঙ্গে ইঁদুর ও সাপ ধরে নিয়ে যেতে দেখে রীতিমত অবাক হয়েছেন। কথক অনুভব করেছেন এই লাবনরা রাত্রির অন্ধকারে নদীর পাড়ে আগুন জ্বালিয়ে মাদল বাজিয়ে ইঁদুর পোড়া সাপ পোড়ার সঙ্গে দেশি মহুয়ায় মত্ত হবেন। নাগরিকতার প্রতিনিধি কথক হাজারো ধরনের দেশি বিদেশি নিত্য নতুন খাবার আস্বাদন করলেও সেই বন্যতার স্বাদ পাবেন না। তিনি আধুনিকতার জাঁতাকলে জর্জরিত, যান্ত্রিকতার ভিড়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে অস্থিরতা কাজ করছে। তাই তিনি নিজের ব্যাঙ্ক বেলেন্স, ডেবিট কার্ড, সভ্যতার যাবতীয় রঙিন মোড়ক ত্যাগ করে লাবনের মতো মুক্ত হতে চেয়েছেন। মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় লাবনকে লক্ষ্য করে কথকের আধুনিক জীবন সংকটকে চেনা ছাড়াও আদিবাসী অসহায় মানুষদের কথা এ-গল্পের উপজীব্য।

সূচক শব্দ: রহস্যময় প্যাকেজ, অনাধুনিক, শূন্যতা, প্রকৃতি, ধানক্ষেত, মহুল-জল, জঙ্গল, ইঁদুর, শবর।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্য জগতে সত্তরের দশকে কমল চক্রবর্তীর (১৯৪৪-২০২৪) আবির্ভাব। যিনি একাধারে কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, সম্পাদক ও সমাজকর্মী। তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিক নাগরিক জীবন-যন্ত্রনা, হিজড়ে, সমকাম, ইতিহাস, পুরাণ, আদিবাসী, অরণ্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়। জামশেদপুরের মাটিতে বেড়ে ওঠা কমল চক্রবর্তী টাটা মোটরস্-এ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ছেড়ে নব্বয়ের দশকে পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানের আদিবাসী সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে তোলেন ‘ভালোপাহাড়’ (১৯৯৫) সংস্থা। আর সেখানের রুক্ষ শুষ্ক এলাকায় সৃজন করেন অযান্ত্রিক সবুজের সমাহার, প্রায় তিরিশ লক্ষ গাছের অরণ্য। নাগরিক যান্ত্রিকতা থেকে দূরে গিয়ে দীর্ঘদিন আদিবাসীদের সঙ্গে থাকার সৌজন্যে তিনি অর্জন করেন আদিবাসী জীবন-সংস্কৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। তাই তাঁর অরণ্য ও আদিবাসী বিষয়ক ‘জঙ্গল’ (১৯৯৬), ‘ধান’(২০০৫), লেম্বো (২০১২), ‘অরণ্য হে’ (২০২২) ইত্যাদি লেখাগুলি পেয়েছে জীবন্তরূপ। তাঁর ‘শামু জনকো’ (১৯৯৬) গল্পগ্রন্থের তেইশটি গল্পই আদিবাসী বিষয়ক, এই গল্পগ্রন্থের ‘ইঁদুর-মানুষ’ গল্পটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

মাঠের ধান ঘরে পৌঁছে যায় শীতের শুরুতেই, তারও পনেরো-কুড়ি দিন পর শীতের মেজাজ ঘন হয়ে আসে, এরকমই শীতকালীন পরিবেশে গল্পটির সূচনা। গল্পকথকের পর্যবেক্ষণে ও কথনে মুখ্য চরিত্র লাবন শবরকে দেখা যায়। কথক ও লাবন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশের মানুষ, ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। লাবনের প্রতি কথকের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা

আমাদের বুঝতে সাহায্য করে তিনি শিক্ষিত এবং নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধি। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন অথচ অনগ্রসর উপজাতি শবর, যুগ যুগ ধরে এঁরা জঙ্গলে বাস করেন। তাঁদের জীবন-যাপন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আস্থা-অনাস্থা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সবকিছুই মূলত বনের ওপর নির্ভরশীল। বন্যতায় মোড়া এই আদিবাসী জনজাতির কাছে মনুষ্য সৃষ্ট সভ্যতার ছিটেফোঁটা টুকুও পৌঁছতে পারেনি। লাবন সেই শবর জনজাতির লোক। তিনি জানেন না তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে কত রহস্যময় প্যাকেজ, কত রঙিন মোড়ক ঘোরাফেরা করছে। লাবন শবর বয়স্ক, রুগ্ন, ভীতু, ময়লা শরীর, চুল উসকো-খুসকো, উদাসীন যেন সুস্থ নন। চেহারা দেখে মনে হয়, লোকটি অন্য গ্রহের আর বয়সও হতে পারে আনুমানিক দুশো বা পাঁচশো! প্রাচীনতায় মোড়া এই মানুষটির কাছে বার-তারিখ-বছর বা ক্যালেন্ডারের খোঁজখবর নেই। সাম্প্রতিককালে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইলেকট্রিক, ডাক্তার, ওষুধ, মেশিনারি নানান নামিদামি যন্ত্রপাতি। চাউমিন, মোমো, পিৎজা ইত্যাদি হাজারো দেশি বিদেশি লোভনীয় ফাস্টফুডের স্বাদ মানুষ নিচ্ছে। ডলার, ইয়েন, রুবেল, পাউন্ড তো দূরের কথা নিজের দেশ সম্পর্কেও লাবন জানেন না, এমনকি গরম ভাতের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয় না প্রতিদিন। আধুনিকতার উজ্জ্বলতা অন্যদিকে আদিমতার কোটরের মধ্যে যেন বিরাট উঁচু এক দেওয়াল রয়ে গেছে, যা ডিঙিয়ে পেরোতে জানেন না লাবনের মত বনবাসী মানুষেরা।

লাবন শবরেরা থাকেন সপুডেরার বনজঙ্গলে, কথকদের বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে। জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের সাথে লড়াই করে তাঁদের বসবাস। প্রয়োজনে বাণ চালিয়ে শিকার করেন। স্বভাবে জেদি একগুঁয়ে এই লাবনদের দয়া করে কেউ কাজ দিলেও করেন না। কাজ করে খেতে খুব আলসেমি। তাঁরা ভূমিহীন, চাষবাস জানেন না, শেখার ইচ্ছাও নেই। লাবন বলেন, "জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুইরে বুলি। উ যখন যা পাই উটাই আমার চাষ বটেক। ভকমানে, এত বড় চাষ বটেক। আমি কেনে কইরব?"[১] সরকারি কিছু সহায়তা পেলেও মাঠ ঘাট ঘুরে ময়ূর, তিতির, কাক, কোকিলের ডিম সংগ্রহ করে খান। শিকার করে ব্যাঙ, মেঠো ইঁদুর, ছুঁচো পুড়িয়ে সামান্য নুন দিয়ে খান। বিষাক্ত খরিস জাতীয় সাপও বাদ যায় না খাদ্য তালিকা থেকে। আমলি নদীর ধারে রাত্রে মাদল বাজিয়ে আকণ্ঠ মহুয়ার মদ পান করেন। এগুলো করেই তাঁরা আনন্দ পান, খুঁজে পান নিজেদের অস্তিত্ব। পাশাপাশি লোকজন শবরদের এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত তাই বাসু নামে একজন বলেছেন, "...উয়াদের কিছু বলার নাই। এ জাত অমনই। কন করবে নাই। এই মাঠঘাট আদাড়-পাঁদাড় ঘুইরবে, আর খাবেক। এ সকলেই শবরদের অধিকার বটে।"[২]

মানব সভ্যতা বিকাশের চারটি স্তর— ১. Hunting & Food gathering (শিকার ও খাদ্য আহরণ) ২. Shifting Cultivation (স্থানান্তর কৃষি) ৩. Cultivation (কৃষি) ৪. Civilization (নাগরিক জীবন)। নাগরিক জীবনে বসবাসকারী মানুষেরা পূর্বোক্ত তিনটি স্তর পার করে এসেছেন। কিন্তু শবর, লোধা, বীরহোড় এরকম কয়েকটি উপজাতি শিকার ও খাদ্য আহরণকারীর পর্যায়েই রয়ে গেছেন। আলোচ্য গল্পে লাবনকেও দেখা যাচ্ছে এই ভূমিকায়। মাঠে ধান থাকাকালীন রাত্রিবেলা ধানের পাকা শিষ কেটে কেটে নিয়ে যায় মেঠো ইঁদুরেরা, সারা বছরের রসদ সংগ্রহ করে রাখে ক্ষেতের আলের নীচে গর্তের ভেতর। এরপর চাষের ধান জমির মালিকের ঘরে পৌঁছে যাওয়ার পর লাবন ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে দেখেন কোন ক্ষেতের আল কেটে ইঁদুরের গর্তে জমানো ধান বার করা যায়। জমির মালিক অর্থাৎ কথক বারবার বাধা দিলেও লাবন গ্রাহ্য করেন না, একমনে আল কেটে প্রায় বারো চোদ্দ কিলো ধান বার করে

নেন। আল ভেঙে দেওয়ার পর আবার বানিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর নেই। এক একবার বস্তা ভর্তি তিরিশ কিলো ধান নিয়ে লাবন বাড়ি যান। এভাবে কুড়ি-পঁচিশটা কলোনির জমি থেকে প্রচুর ধান সংগ্রহ করেন।

বিশ্বের যা-কিছুর ওপর অধিকার ফলায় না সভ্য মানুষ, সে-সবের ওপর ভরসা অন্যান্য প্রাণীদের। আর অন্যান্য প্রাণীদের মতো এই লাবনেরও, "...এই পৃথিবীতে অধিকার। কারণ পৃথিবীর খাদ্য খাবার ওষুধ গৃহ মোটরগাড়ি হাওয়াই জাহাজ কিছু তার নয়। সে, যেমন কেঁচো, যেমন ভালুক। যেমন প্রজাপতি, জলপিপি।"[৩] আধুনিক পৃথিবীর যাবতীয় উপভোগ লাবনদের নয়, তাঁরা পশু পাখিদের মত শুধুমাত্র সংগ্রহ বা শিকার করে খান। মানুষের সহযোগিতা তাঁরা চান না, কেউ কাজ দিলেও করেন না। মানুষেরাই একমাত্র প্রাণী যারা বুদ্ধিমান, উৎপাদনশীল, সৃষ্টিশীল। কিন্তু লাবনেরা মানুষ হলেও মানুষের এই বৈশিষ্ট্যকে মানেন না, মানতেও চান না, জানেন না, জানতেও চান না। প্রজাপতি, জলপিপি, ইঁদুর ও অনান্য পশুপাখির মতো লাবনেরাও উৎপাদন করেন না। ইঁদুরেরা মানুষের ফসলের সংগ্রাহক আর লাবনেরা ইঁদুরের সংগৃহীত ফসলের সংগ্রাহক। মানুষ হয়েও তিনি কাজ করে খান না, উৎপাদন চাষাবাদ করেন না। মানুষ হয়েও একেবারে মেঠো ইঁদুরের মতো জীবন তাঁদের। ইঁদুরেরা যেমন সংগ্রাম করে ফসল সংগ্রহ করে নিশ্চিন্তে খায়, এই লাবনও তেমনি ইঁদুরের ধান বিক্রি করা টাকায় ভাত, মদ, ইঁদুর ও সাপের মাংসের মহাভোজ করবেন। যেন ইঁদুর আর লাবন এক, একই জীবন, একই সংগ্রাম তাঁদের। কিন্তু লাবন তো আসলে মানুষ, তাঁর তো মানুষের মতো সভ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। লাবনের অনিবার্যভাবে ইঁদুরের মতো হওয়া এবং সভ্য মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা এই থেকেই গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মী নামটি ইঁদুর-মানুষ। সে অর্থেই উল্লেখ্য নামশীর্ষক শব্দদুটির মাঝে একটি হাইফেন রয়েছে।

খাদ্যের জন্য পশু আর মানুষের লড়াই চিরন্তন কালের। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিড়াল' প্রবন্ধে বিড়ালের মুখ দিয়ে সেই চিরন্তন লড়াইয়ের কথা ব্যক্ত করেছিলেন— "এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে, খাইতে দাও-নহিলে চুরি করিব...কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"[৪] গরীবের চুরি করার দণ্ড থাকলে ধনীর কৃপণতারও দণ্ড থাকা উচিত একথাও বোঝাতে চেয়েছে বিড়াল। খেতে না পেলে সমাজের উন্নতি নিয়ে সে কি করবে। মহাশ্বেতা দেবীর 'নুন' গল্পেও দেখা যায় মহাজন আদিবাসীদের নুন কেনা থেকে বঞ্চিত করলে বনের হাতিদের খাবার জন্য সরকারের দেওয়া লবণ চুরি করতো সেই আদিবাসী মানুষরা, "সাবধানেই গেল ওরা। সাবধানেই নুনমাটি চুরি করল। 'গাছ থেকে নাববি না আগে। দেখে নিবি সকল হাতি চলে গেছে কিনা।'..."[৫] বৃদ্ধ হাতির নজর এড়িয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নুন চুরি করে জীবন সংগ্রাম চালায় তাঁরা। সেই অর্থে আলোচ্য গল্পটিও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। ইঁদুরও বাঁচতে চায়, সভ্য হতে না পারা আদিবাসী লাবনরাও চায় খাদ্যের অধিকার। উভয়েই সমবর্গের, উভয়েরই লড়াই সভ্য আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধে।

মানুষ আর ইঁদুর দুপক্ষই মানুষকে ফাঁকি দিয়ে ফসল নিয়ে যাচ্ছে, ইঁদুর রাতের অন্ধকারের সুযোগে আর মানুষ দুপুরে সবার অনুপস্থিতির সুযোগে। আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি জমির মালিক অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে ফসল ফলান, তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করেন সমস্ত ফসল ঘরে তুলতে। কিন্তু ইঁদুর আর এই ইঁদুর-জাতীয় মানুষদের উপদ্রবে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন, "ইঁদুর-মানুষ। বস্তা খুলে সদ্য পাওয়া ধান ঢোকাচ্ছে, যেন, তার। আমি ভাবছি, আমার।

আমাদের কষ্টে রোয়া, রক্তে বোয়া ধান।”[৬] এদিক থেকে আমরা বুঝতে পারি ইঁদুর হীন প্রাণী হলেও জমির মালিকের কাছে ইঁদুর ও লাবন জাতীয় মানুষ দু-পক্ষই একই গোত্রীয় হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক সমাজের তৎপরতা ও সরকারি সহায়তা সভ্যতার আলো দেখালেও শবর, খেড়িয়া, মুণ্ডা, লোধা এরকম উপজাতিরা বন-জঙ্গলকে অবলম্বন করে থাকাকেই নিজেদের ঐতিহ্য মনে করেন। কিন্তু দিন যত এগিয়েছে বনের পরিমান কমে এসেছে। তাছাড়া বনগুলি সরকারি বনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বন্য সম্পদ নষ্ট করা ও পশুপাখি শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলত ভূমিহীন এই উপজাতিগুলির খাদ্য ও বাসস্থানের সংকট দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে বন থেকে বেরিয়ে এসে লোকালয় থেকে দূরে সমষ্টিগতভাবে তাঁরা থাকছেন ঠিকই তবুও বন্যতা তাঁদের পিছু ছাড়েনি বলেই আজও তাঁরা মাঠে ঘাটে ঘুরে পশুপাখি শিকার করে, নদী নালাতে মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, সাপ ধরে, বনের মধু, মহুয়া সংগ্রহ করে খাবার সংগ্রহ করেন। যেমনটি দেখা যাচ্ছে আলোচ্য গল্পে লাবন শবরকে ধান সংগ্রহ করার পাশাপাশি মেঠো ইঁদুর ও সাপ নিয়ে যেতে।

চরম দারিদ্র্য পেটের খিদে দশ গুন বাড়িয়ে দেয়। খাবার ও কাজের আশায় শবররা লোকালয়ে এলে লোকজন তাঁদের সাহায্য করেন কিন্তু পাশাপাশি সন্দেহও করেন। কারণ তাঁদের পালিত হাঁস, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি তাঁরা ধরে নিয়ে যেতে পারে। আলোচ্য ইঁদুর-মানুষ গল্পের তিন নম্বর পরিচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে লাবনের গণপিটুনি হচ্ছে হাঁস চুরির অপরাধে। চোখ, ঠোঁট এরকম মুখের বিভিন্ন জায়গাতে আঘাতের চিহ্ন, রক্ত জমে ফুলে গেছে, তিন-চারটে দাঁতও নড়েছে। মারের চোটে লাবন জ্ঞান হারালে মারা গেছে ভেবে সবাই ঘটনাস্থল থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়েন। লাবন সত্যি চুরি করেনি কিন্তু লোকের গৃহপালিত পশু বা পাখি হারিয়ে গেলে প্রথমেই সন্দেহ করা হয় লাবনদের মতো বন্যদের, কেননা তাঁদেরই তো খাদ্যের অভাব। লাবনকে মারতে থাকা গুরুপদ জলধর এঁদেরই একজন, তিনি বলেন, “...এরা চোর বটেক। দিনভর জমিটমি ঘুইরবে। আর ডোবায় যদি হাঁস, ফাঁকায় পাবেক তো লিবেক। ঘুঘরা! সরকার এত দিচ্ছে তবে শালা পেট পুরছে নাই, এমন ভক। লোকের চুরাচ্ছে।[৭] এই অনাকাঙ্খিত মার লাবনকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে কারণ তিনি জানেন, এইভাবেই বিনা অপরাধে কখনো বা অপরাধে এর আগেও তাঁকে বা তাঁদেরকে মার খেতে হয়েছে, এমনকি মারা যেতে হয়েছে কাউকে কাউকে। তিনি জানেন, লোকালয়ে এসে তাঁদের জীবন এইভাবেই চলছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পাখির মা’ গল্পে বুভুক্ষু লোধা বালক ডুলুং, জমিদার জগদীশবাবুর গাছের সারস পাখি শিকারের পরিণতি জেনেও সে নিজেকে সামলাতে পারেনি, “তার পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল সকাল থেকে... এই শিকারের বিপদটাও সে জানে। কিন্তু ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে চোখের সামনে এমন লোভনীয় খাদ্য দেখে সে আর মাথাটা ঠিক রাখতে পারেনি।”[৮] এর ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি, শাবলের বাড়ি আর টাঙ্গির কোপে ডুলুংকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সেখানেও পুলিশ আসে ঘটনার আড়াই দিন পর। জগদীশবাবুর আধিপত্যে হত্যাকারীরা ছাড়া পায়। আমাদের আলোচ্য গল্পেও দেখা যায় লাবন শবরদেরও রক্ষা করতে বা মারামারি থামাতে পুলিশ প্রশাসন আসেন না তবে তাঁদের কেউ মারা গেলে দু-তিন দিন পর আসেন। তবে অবশ্য দোষীরা শাস্তি পায় না তাই শবরদেরই মুখ বুজে অপরাধী হয়ে থাকতে হয়।

লাবনদের মানসিকতা বুঝতে গেলে আমাদের পূর্বপুরুষ আদি মানবদের মানসিকতার কথা ভাবতে হবে। যেখানে গোটা পৃথিবীটায় তাঁদের ভকমানের চাষের জমিন। সমগ্র জল জঙ্গল

জমিনে তাঁদের সবার মালিকানা সমান মনে করেন। আধুনিক সভ্যতার সীমা নির্ধারণ তাঁদের মাথায় ঢোকে না। এই জন্যই লাবনরা দুর্বিনীত তাঁরা মার খায় মরে যায় কিন্তু তবু আইন কানুন নিয়মনীতি তাঁদের মাথায় ঢোকে না। তাই লাবনের শবরের মতো ডুলুং লোধাও মানতে পারেন না নদীতে চরতে আসা সারস পাখির ওপর জমিদার জগদীশবাবুর মালিকানা। আসলে আদিম মানসিকতার এই ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলিকে মেরে ধরে জেলে পুরে নয়, হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে পরম যত্ন সহকারে চলমান মানবসমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কঠিন কাজটি করার দায়িত্ব আমাদেরই। এই বার্তাটিও সাহিত্যিক কমল চক্রবর্তী আমাদের দিতে চেয়েছেন।

গল্পের শেষে দেখা যায় লাবন চোখে মুখে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছে এবং মানুষের মারের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে। এই মরণাপন্ন অবস্থা নিয়েও বারবার—"খা-তে-দে"[৯] শব্দের উচ্চারণেই বুঝিয়ে দেয় তাঁর ক্ষুধার তীব্রতা। মুরগির ঠ্যাং খাওয়ার ভঙ্গিমায় গাছের শেকড়কে আগুনে ঝলসে শালপাতায় রাখা নুনে ছুঁইয়ে খেয়েছে এই লাবন, তারপর এক কৌটো জলে পেট ভরিয়ে ঢেকুর তুলেছে যেন কত পরম তৃপ্তির খাওয়া। লাবনের পরনের জামা, চশমা এগুলো হয় দানের, নয় কুড়িয়ে পাওয়া। লাবনের সাথে থাকা বৃদ্ধা রমণীর কাপড়ের অবস্থাও গামছার মতো ছোট ও ন্যেতা, শরীরের বেশিরভাগ অংশই প্রকাশ্য। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চরম অভাব নিয়ে লাবন লুকিয়ে আছে জঙ্গলে কারণ সে মানুষের চোখে অপরাধী, তাঁকে রক্ষা করার জন্য পুলিশও নেই। এখন সভ্য মানুষের জাঁতাকলে পড়লেও তাঁরা বাঁচতে চায়। অন্যদিকে ওই জঙ্গলেই দেখা যাচ্ছে কথকের কিছু শহুরে বন্ধু মেতে উঠেছে নাচে, রবীন্দ্র গানে। নাগরিক ব্যস্ততার মধ্যে দু-দিনের অবসরে তাঁরা বন্য জীবনের স্বাদ নিচ্ছেন। শান্ত স্নিগ্ধ দুয়ারসিনির জঙ্গল, আমলি নদীকে অশান্ত করে তুলছেন আর উপভোগ করছেন গ্রাম্য পরিবেশের সাথে নানান দেশি খাবার, টটকুর দোকানের চা, গুলগুলা, চা, মুড়ি, পকড়া, চপ, সেউ, শালপাতায় ছোলাভাজা-নুন-কাঁচালঙ্কা-টমাটো। এছাড়া পাহাড়ি শীতের অনুভূতির সঙ্গে হাঁড়িয়া মহুয়া, দেশি মুরগি ভাজা। একদিকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব নিয়ে জীবনের শ্বাসটুকু বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে লাবনের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা অন্যদিকে সেই জঙ্গলেই তথাকথিত সভ্য নাগরিক লোকের উন্মত্ততায় মেতে ওঠা এ যেন দুই বিপরীত ছবি, এ যেন প্রহসন। লাবন শবরের এই ট্র্যাজিক জীবনের ছবিই ছোটগল্পের সার্থকতার পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

নগর সভ্যতার উজ্জ্বলতার মোহে পড়ে অনেক মানুষই এগিয়ে যায় কিন্তু লাবনেরা আকর্ষিত হন না। সমস্ত চাকচিক্যের প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের জগতে আনন্দে মত্ত হয়ে থাকেন। ওই সংগৃহীত ধান দু-চার টাকায় বিক্রি করে কুড়ি পঁচিশ টাকা যেটুকু পাবেন সেই দিয়ে কাপড়-চোপড়, মহুয়া-মদ ইত্যাদি কিনে উল্লাসে মেতে উঠবেন। এখানে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে যুগ যুগান্ত পরেও শিক্ষার আলো যেখানে পৌঁছতে পারেনি সেখানে বন্যতায় বজায় থাকে। আসলে এরাই জয়ী, যারা সভ্যতার আগ্রাসনকে, যান্ত্রিকতার নির্ভরতাকে সহজেই উপেক্ষা করেছেন। মহুয়া আর পোড়া মাংসের কতটা আনন্দের, মুক্তির এমনকি স্বাধীনতার তা আমরা বুঝতে পারি কথক যখন বলেন, "আজ যদি লাবনের সঙ্গে যেতে পারতাম, তবে হত। ...পৃথিবীর সব থেকে সুখী, ভারহীন মানুষ...। শুধু মাঝে মাঝেই নদীর ওপার থেকে একটা মাদল। শূন্য সঙ্গীতের তাল। সে তাল, লাবন জানে। সে ওই তালে মাটি খোঁড়ে, ওই তালে, পেয়ে যায় তার খাদ্য, সাপ, ব্যাঙ, ছুঁচো, শেকড়, ঘেঁটি, অন্ধকার, শূন্যতা, উদাসীনতা, হাহাকার। আমি লাবন হতে চাইলুম।"[১০]

কথক যিনি তাঁর কাছে রয়েছে শিক্ষা সভ্যতা, সর্বোপরি আধুনিক পৃথিবীর যাবতীয়। তিনি প্রথমে শবরদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন না বলে নিজের জমির ক্ষতির জন্য রাগ ক্রোধ প্রকাশ করলেও পরে তিনিই লাবন হতে চাইলেন। তাঁর লাবন হতে চাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রণা ও জটিলতা। কথক আদিমতায় ফিরে যেতে চেয়েছেন এবং মুহূর্তে ভুলে যেতে চেয়েছেন নিজের, "সমস্ত ইনসিওরেন্স, মেডিক্লেম, ফ্ল্যাট, পাসবুক, ব্যাঙ্ক, এ টি এম -এ আগুন। হা-হা। ওই গলি, ওই নরকের পাশের সরু বাইলেন, ওই হাসপাতালের ঠাণ্ডা সাদা নার্স, ওই ভালবাসাহীন বাস্কেটবল কোর্ট, ওই দুরন্ত ষাঁড়ের উদ্দেশে লাল রুমাল আমার নয়। আমি চাই না।"[১১] স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে গেঁয়ো লাবন তো আধুনিকতা বা নাগরিকতার ধারে কাছেও ঘেঁষতে চাননি তাহলে আপাদমস্তক আধুনিক কথক কেন নাগরিকতাকে বর্জন করে লাবনদের এই বন্যতায় মজে উঠতে চেয়েছেন? আসলে তিনি নাগরিক জীবনের জটিলতায় অতিষ্ঠ। তাই লাবনের মুক্ত জীবনের একটু স্বাদ নিতে চেয়েছেন, "আজ লাবনকে বিরাট রাজা মনে হচ্ছে। আজ ও না ডাকলেও, ওর মহাভোজে যাব। প্লিজ বাসু, আমাকে ভয় দেখাস না। দেখব, ওই ঝলসানো ইঁদুর, সাপ, ভাত কি আনন্দে!"[১২] চেয়েছেন লাবনের মতো বেপরোয়া হতে, "ওই শূন্য ডিগ্রি লোকটা, কাউকে তোয়াক্কা না করে, সারাদিনের কষ্টার্জিত ধান, মুঠো মুঠো মদওয়ালাকে দিল। আজ সারারাত ডমরু বাজবে, শিঙে। আজ শিব নাচবে, পার্বতী। ওই কি পুরাণ। হ্যাঁ, সঙ্গে কালো খরিস।"[১৩]

আমাদের ভাবতে বাধ্য করে বিশ্বের যাবতীয় সভ্য বিলাসিতা আসলে নীরস। ওপরে চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য কিন্তু আসলে শুধু অন্তঃসারশূন্য। সেখান থেকে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা মিটলেও মনের রসদ মিটে না। যাবতীয় সুখকর আয়োজন থাকলেও নাগরিক জীবন জটিলতায়, স্বার্থপরতায়, নৈরাশ্যতায় তাঁরা ভালো নেই। আর লাবনদের মতো নিরক্ষর বন্য মানুষদের যখন তারা সীমাহীন আনন্দে মেতে উঠতে দেখে তখন তাঁদেরও ইচ্ছা করে নাগরিকতার কুটিল রহস্যময়তা থেকে মুক্তি পেতে, ইচ্ছে হয় গেঁয়ো জীবনের অংশী হতে। তবে ক্রমশ সংকটাপন্ন আদিবাসী লাবনদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, কমল, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬, 'শামু জোনকো', কলকাতা, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, পৃ.২৮৬
২. তদেব, পৃ.২৮৯
৩. তদেব, পৃ.২৯০
৪. 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ.৮৭
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, প্রথম প্রকাশ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, পৃ.২৫০
৬. চক্রবর্তী, কমল, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬, 'শামু জোনকো', কলকাতা, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, পৃ.২৮৮
৭. তদেব, পৃ.২৯৩
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪, 'পাখির মা', কলকাতা, সাহিত্য সংস্থা, পৃ. ৯১
৯. চক্রবর্তী, কমল, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬, 'শামু জোনকো', কলকাতা, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, পৃ.২৯৫
১০. তদেব, পৃ.২৯১
১১. তদেব, পৃ.২৯১
১২. তদেব, পৃ.২৯২
১৩. তদেব, পৃ.২৯১-২৯২

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, ড.সুভাষচন্দ্র, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, ‘অহল্যাভূমি পুরুলিয়া’, দ্বিতীয় পর্ব, কলকাতা, দীপ প্রকাশন

২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪, ‘পাখির মা’, কলকাতা, সাহিত্য সংস্থা

৩. আর্যপত্র, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২০, কমল চক্রবর্তী ৭৫ সম্মাননা সংখ্যা, কলকাতা

আকর গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, কমল, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬, ‘শামু জোনকো’, কলকাতা, প্রকৃতি ভালোপাহাড়।

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে শিশু ও কিশোর প্রসঙ্গ : নির্বাচিত পাঠ

পূজা ভুঁঞে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ

সার-সংক্ষেপ: সমরেশ বসুর ছোটগল্প মানেই এক নীরব প্রতিবাদ। তাঁর বেশির ভাগ ছোটগল্পেই ফুটে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের কথা। চল্লিশের দশকের অসহায়, ক্ষুধার্ত মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। বস্তি, নোংরা গলি, নিষিদ্ধ পল্লি সবই স্থান পেয়েছে তাঁর কলমে। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে অভাব-অনটন তো ছিলই, এছাড়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ফার্মের চাকরি খোয়ানো অথবা পার্টির বিরোধিতা, ফলস্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করতে হয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'আদাব' (১৯৪৬) গল্পটি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে, এ এক অসাধারণ সৃষ্টি। সহজ-সুন্দর-সাবলীল ভাষায় তিনি তুলে ধরলেন এই বার্তা— ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ। শিশু ও কিশোররাও বাদ পড়েনি তাঁর কলমে। স্বাধীনতা-কালীন অথবা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সমাজ বহিষ্কৃত এক শ্রেণির শিশু-কিশোরদের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরলেন তাঁর বেশ কিছু রচনায়। যারা এক শ্রেণির সমাজ দ্বারা লাঞ্ছিত, অবহেলিত। তথাকথিত সমাজে যাদের কোনো স্থান নেই। সেই সঙ্গে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সংজ্ঞার চিরাচরিত ধারার যাঁরা আমূল পরিবর্তন ঘটালেন, তাঁদের দলে নাম লেখালেন সমরেশ বসুও। তিনি তুলে ধরলেন সেই সমস্ত শিশু ও কিশোরদের কথা, যারা সমাজে শিশু বা কিশোর হিসাবে গণ্যই নয়, মানুষ হিসাবেও নয়। তারা জন্তু-জানোয়ার অথবা কীট-পতঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। সমরেশ বসুর ছোটগল্পে শিশু ও কিশোরদের কীরূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়। সময়ের সঙ্গে শিশু ও কিশোর সাহিত্য ধারার নানান পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তনের বাঁকের অন্যতম একজন লেখক সমরেশ বসু। শিশু সাহিত্যের বিবর্তনের দিকটিকে কেন্দ্রবিন্দু করে, তৎকালীন সময়ে এক শ্রেণির শিশু ও কিশোরদের সংকটময় পরিস্থিতি কীভাবে সমরেশের ছোটগল্পে বাস্তবায়িত হয়েছে, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা হবে আলোচ্য প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ: অবহেলিত, খেলা, জন্তু-জানোয়ার, বিবর্তন, শিশু-কিশোর, সমাজ।

মূল আলোচনা:

'শিশু-কিশোর' কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ শিশুরাই যে কোনো দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, সভ্যতার অগ্রগতি তাদের দ্বারাই সম্ভব। শিশু সাহিত্যের সূত্রপাতটা লিখিত সাহিত্যে নয়, বরং বলা যায় মৌখিক গাল-গল্পে। গরমের দিনে ছাদে কিংবা উঠানে বসে ঠাকুরদা কিংবা ঠাকুমা যে গল্প শোনাত, যার শুরুটা ছিল এইরকম- 'একদা এক রাজা ছিল...।' ছোটবেলায় এই গল্প শোনার মনোভাব থেকেই শিশুর মনের ভাবনা, কল্পনা, ভাষা, সর্বোপরি রসবোধ জাগ্রত হয়। আধুনিককালে 'শিশু' কথাটির সঙ্গে 'কিশোর' সংযুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে শব্দটির প্রথম ব্যবহারকারীর নাম অনুসন্ধান করতে গিয়ে দু'জন স্বনামধন্য লেখকের নাম উঠে আসে। একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর অন্যজন রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী। তবে রবীন্দ্রনাথই এটির প্রথম ব্যবহারকারী বলে জানা যায়।[১] 'শিশু-কিশোর' ঠিক কোন বয়সি পাঠক-পাঠিকাদের বলা হবে, এ বিষয়ে বেশ কিছু সাহিত্যিক তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। যেমন- সমালোচক বাণী বসু শিশু সাহিত্য বলতে শিশু ও কিশোর উভয়কেই চিহ্নিত করেছেন।[২] অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন শিশু সাহিত্য নাবালকের জন্য লেখা হলেও, তা নাবালক ও সাবালক উভয়েরই পাঠ্য।[৩] আবার, আশা গঙ্গোপাধ্যায় শিশু বলতে কৈশোর পর্যন্ত বয়সের ছোটদের বুঝিয়েছেন।[৪] লীলা মজুমদার শিশু সাহিত্য বলতে আট থেকে ষোল বছরের পাঠককে বুঝিয়েছেন।[৫] সর্বোপরি, মনস্তাত্ত্বিকদের মতে যৌবনের পূর্ববর্তী পর্যায় তিনটি, যথা- শৈশব, বাল্য ও কৈশোর। আর্নেস্ট জোন্স (Earnest Jones)[৬] ও রুশো (Rousseau)[৭] শিশুর জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে যৌবনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের তিনটি বিভাজনের কথা বলেছেন। শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশব, পাঁচ থেকে বারো বাল্য ও বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরের সময়কাল হিসেবে বারো থেকে কুড়ির মধ্যে নির্ধারণ করেছেন। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের চরিত্রেরা পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের শিশু-কিশোর।

সময় ও সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে শিশু সাহিত্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। একদা নীতিশিক্ষা, উপদেশ ও ছোটদের আনন্দদানের জন্য শিশু সাহিত্যের সূত্রপাত হলেও ক্রমে তা পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। মোটামুটি বিশ-শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এর সংজ্ঞা পাল্টেছে। এরই মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ অথবা দেশভাগের মতো ঘটনা, যার চরম প্রভাব পড়ে বাংলা সাহিত্যে। শিশুসাহিত্যের সূত্রপাতটা হয়েছিল কল্পনা, রঙ ও আনন্দের খেলার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমাজের নানা ঘাত প্রতিঘাতে তা হয়ে উঠল সাদা-কালো অথবা ফিকে। কল্পনা থেকে সরে এসে চরম বাস্তবতায় এসে দাঁড়াল বাংলা শিশু সাহিত্য। অতঃপর শিশু সাহিত্যের সংজ্ঞা পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল। বিশেষ করে বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিকে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। বাংলা শিশুসাহিত্য রঙিন কল্পনা জগৎ থেকে চরম বাস্তবতার প্রত্যাবর্তনের দলে নাম লেখালেন সমরেশ বসুও।

ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্য ছোটরা তো পড়বেই, সঙ্গে বড়দের প্রবেশেও কোনো বাধা নেই। আবার ছোটদের বিষয় বড়রা পড়তে পারলেও, বড়দের বিষয়ে ছোটদের প্রবেশে বাধা রয়েছে, আর তাছাড়া অনেক সময় তা তাদের বোধগম্যের বাইরেও হতে পারে। আবার দুই শ্রেণির পাঠকের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, শিশু-কিশোর কেবল টুনটুনির গল্প অথবা সোনারকাঠি-রূপোরকাঠির অলৌকিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিণত বয়সের পাঠকেরা সেটির তাত্ত্বিক বিচার করে। ছোটরা কেবল প্লট বা কাহিনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বড়রা খোঁজার চেষ্টা করে তথ্যের আড়ালে তত্ত্বকে। তাই আমরা ছোটবেলায় পড়া টুনটুনির গল্পগুলির প্রকৃত ব্যঞ্জনা জানতে পারি বড় হয়ে।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বিবর্তনের ধারায় যে সকল সাহিত্যিক লেখালেখি করেছেন তাঁদের মধ্যে সমরেশ বসু একটি অন্যতম নাম। তিনি এমন এক শ্রেণির শিশু ও কিশোরদের কথা তুলে ধরলেন যারা সমাজে বসবাসের অযোগ্য, তথাকথিত এক শ্রেণির শিক্ষিত সভ্য সমাজ তাদের চায় না। এইরকমই সমাজে লাঞ্ছিত, অবহেলিত এক শ্রেণির শিশু ও কিশোর স্থান পেল তাঁর রচনায়। যাদের মধ্যে রয়েছে শিশু শ্রমিক ও ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত পথশিশু। সমরেশ বসুর লেখা ছোটগল্প 'এস্‌মালগার', 'নিষিদ্ধ ছিদ্র', 'পেলে লেগে যা' ও 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' এই

গল্পগুলির পটভূমি সেরকমই। চারটি গল্পেই তৎকালীন শিশু-কিশোর পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে। যেখানে দেখানো হয়েছে তারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ দ্বারা কীভাবে অত্যাচারিত। তিনজন বালকের তিন রকম পরিস্থিতিকে তুলে ধরা হয়েছে গল্পগুলিতে। বৃন্দাবন, গৌরাঙ্গ ও প্যাল্‌গা -এরা প্রত্যেকেই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার লড়াই লড়ে গিয়েছে। যাদের প্রত্যেকের পরিণতি অত্যন্ত ট্র্যাজিক। 'সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> **'সমরেশের প্রধান গল্পমাত্রই এস্‌টাব্‌ লিশমেন্ট্‌ বিরোধী গল্প। যে গল্প একটা কথা বারে বারে আমাদের দেখায় যে আক্রমণাত্মক না হয়েও এ গল্প কত নির্মম সমাজসমালোচক হতে পারে। সেখানে সমরেশ আপোশহীন। 'এস্‌মালগার' গল্পটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি। শিশু বা কিশোর বয়সীরা এই সমাজব্যবস্থায় পোষিত, লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হচ্ছে—এটা সমরেশের একটা প্রিয় বিষয়। আমার মনে পড়ে, আমাদের মফস্বল ইস্টিশনের সামনের রেস্তোরাঁয় বসে বসে সমরেশ কতদিন গোর্কি বা চেকভের এ জাতীয় গল্পের কথা বলেছে। 'এস্‌মালগার', 'পেলে লেগে যা', প্রভৃতি গল্পে সমরেশ রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে কোনো দম না পাওয়া—বরং পীড়িত লাঞ্ছিত কিশোর মানবতার কথা বলেছেন। এস্‌মালগার গল্পের চালের চোরাচালানকারী ছেলেটি সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের থেকে অনেক বেশী মানবিক—গল্পটি সে কথাই বলে। 'পেলে লেগে যা' গল্পে সামাজিক দৃষ্টিকে সূচিমুখ করেননি। তীব্র করে তুলেছেন পেলের সমাজ নিয়তির শোচনীয়তা।'[৮]**

'নিষিদ্ধ ছিদ্র' গল্পের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয়েছে 'পেলে লেগে যা' গল্পে। গল্প দুটির কাহিনি বারো বছরের বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে। তার বাবা মারা যাবার পর, মা দ্বিতীয় বিবাহ করে। অতঃপর বৃন্দাবন কান্ত কুণ্ডুর দোকানে শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। তবে গল্পের বাকি চরিত্রেদের কাউকেই তার সঙ্গে শিশু সুলভ আচরণ করতে দেখা যায় না। যে কারণে হয়তো গল্পে 'শিশু শ্রমিক' কথাটি কোথাও ব্যবহারও করা হয়নি, কেবলমাত্র 'কম বয়সী কর্মচারী' বলেই উল্লেখ রয়েছে। এমনিতে সে থাকে কান্ত কুণ্ডুর গুদাম ঘরে। তবে প্রতি বৃহস্পতিবার, চৈত্র সংক্রান্তি ও দশমীর দিনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে তার মায়ের কাছে যেতে হয়। তার খেলার খুব ইচ্ছে, এই ইচ্ছে সে পূরণ করে কান্ত কুণ্ডুর দোকানে রাত্রি যাপন কালীন ইঁদুর মারার মধ্য দিয়ে। তার সমবয়সি কেউ দোকানে এলে তার কাছ থেকে জেনে নেয় খেলার খবর, এতটুকুই। যেদিন সে মারা গেল, সেদিনও সে তৈরি হয়ে বসেছিল কাঁচড়াপাড়ায় তার মায়ের কাছে যাবে বলে, কিন্তু যেতে হয়েছিল কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে দশমীর মেলা কাজের শ্রমিকের অভাব পূরণ করতে। বাড়ির আর সকলের মতো তাকেও দেওয়া হয়েছিল সিদ্ধি, একাধিকবার। কল্পনাতীত খাতির-যত্ন পেয়েছিল কুণ্ডু বাড়ি থেকে। তবে সেদিনও তার শোবার জায়গা গুদাম ঘরেই হয়েছিল। যে ইঁদুর গুলোর সঙ্গে বৃন্দাবন প্রতিদিন খেলত, আর সে জয়লাভ করত। সেদিন বৃন্দা হেরে গেল, অচেতন বৃন্দাবনের শরীরের মাংস খুবলে খেলো ইঁদুরের দল। 'এস্‌মাল্‌গার' গল্পটি আবার এমন এক বালককে কেন্দ্র করে, পরিস্থিতি যাকে চালের পাচারকারী হতে বাধ্য করেছে।

গৌরাঙ্গ ওরফে গোরা এস্‌মাল্‌-গার তার পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। প্রতিদিন পনেরো কেজি করে চাল বেআইনি ভাবে, বিনা টিকিটে, প্রায় ষাট কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে গঞ্জের আড়তে বিক্রি করে। সে কেবল একা নয়, সঙ্গে রয়েছে তার সমবয়সি ও অসমবয়সি আরও অনেকে। ইতিমধ্যে গোরা আর তার সঙ্গীরা প্রত্যেকেই হাজতবাস করে এসেছে। গল্পের শেষে দেখা যায়, গোরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের চাকার কাছের ছোট্ট কোটরে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। অন্যদিকে, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' গল্পের কাহিনি পথ-শিশুদের নিয়ে। গল্পে একগুচ্ছ শিশু-কিশোরের কথা উঠে এসেছে, যাদের বয়স আট থেকে পনেরো। তাদের পরিবার অথবা পরিচয় কোনোটাই নেই। আছে শুধু নামের বৈচিত্র। টানা, কেড়ে, প্যাল্‌গা, চটা, বগ্‌গি, রাম, লুকা, জটা— এমনই সব বিচিত্র নাম, শহরে নয় শহরতলিতে তাদের বসবাস। পেশা ভিক্ষা করা। মোট কথা চেয়ে-মেগে আধপেটা খায়, যেটা পেট ভরে খায় সেটা হল জল। ফাঁক-ফোকরে দোকানদারের খাবারের বস্তা থেকে কখনো সুযোগ সুবিধা মতো চিঁড়েটা অথবা মুড়িটা মালিকের চোখের আড়াল হলে একমুঠো তুলেও নেয়। পরিবর্তে জোটে লাঠির পীড়ন ও গালাগাল। আন্তর্জাতিক শিশুদিবসের আগের দিন মুড়ি বিক্রেতা কদম সা'র নীতি-জ্ঞানহীন উদ্যত লাঠি কেড়ে নিয়েছিল প্যাল্‌গার জীবন।

গল্পগুলিতে দেখা যায়, এক শ্রেণির শিশু ও কিশোরেরা জন্তু-জানোয়ার অথবা কীটপতঙ্গের সঙ্গে তুল্য। কোনো এককালে পরিবারের দেওয়া একটা নাম তাদের ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই নাম ক্ষয়ে আজ লুপ্তপ্রায়। তাই বৃন্দাবন যখন তার প্রকৃত নাম কান্ত কুণ্ডুর বাড়ির কারো মুখে শোনে, তখন তার অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। বৃন্দাবন>বৃন্দা>বেন্দা থেকে 'মরা ভাতারের ছাঁ' (তার বিমাতা তাকে এই নামে ডাকে), 'নিষিদ্ধ ছিদ্র' গল্পের শুরুই হয়েছে বৃন্দাবনকে 'শুয়োরের বাচ্চা' শব্দদ্বয় দ্বারা সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে। শুধু তাই নয়, সমগ্র গল্প জুড়ে রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে এমন একাধিক বিশেষণ, যেমন- 'ভেড়ার বাচ্ছা', 'ভোঁদড়ের বাচ্ছা', 'গুখেগোর বেটা', 'কুত্তার বাচ্চা', 'কাকের বাচ্চা', 'বাঁদরের বাচ্চা' সহ প্রভৃতি। (এখানেই বোধ হয় শিশুসাহিত্যের চমকপ্রদ বিবর্তন, চরম বাস্তবতাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে শিশু-সুলভ ভাষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি সমরেশ বসু।) আবার মেয়ে মহলেও বৃন্দাবনের কিছু নাম রয়েছে, যেমন কান্তর বউ বলে- 'ওল কচু', বউয়ের বিধবা মাসি বলে- 'বোঁটকা পাঁঠা', আবার তার নিজের মা তাকে বলে- 'খ্যাংরামুখো', 'ষেঁড়ো', 'ভ্যাক্‌রা' ইত্যাদি। অন্যদিকে এই গল্পের পরবর্তী অংশ 'পেলে লেগে যা' গল্পেরও শুরু হয়েছে বৃন্দাবনকে 'আরশোলার বাচ্চা' সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে। এমনকি, বৃন্দাবন যখন মারা গেলো, তখনও তাকে সম্বোধন করা হয়েছে 'টিকটিকির বাচ্চা'! ঠিক একই চিত্র দেখা যায় 'এস্‌মালগার' গল্পেও। একদা পরিবারের দেওয়া গৌরাঙ্গ নাম হয়ে যায় গোরা, ক্রমে স্মাগলার অথবা এস্‌মাল্‌গার। গোরা আর তার সমবয়সি সঙ্গীরা সমাজের চোখে 'একগাদা কুকুরের ছানা'। ট্রেনের এক বৃদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছে- 'হনুমানের জার' ও 'মাথার উকুনের হদ্দ'। ট্রেনের জনৈক প্যাসেঞ্জার গোরাকে উদ্দেশ্য করে বলে- 'কুত্তার বাচ্চা', 'ডেঁপো' কিংবা 'হারামজাদা'। ব্যতিক্রম নয় 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' গল্পটিও। বেশ্যাপল্লীর আস্তানায় প্যাল্‌গা আর তার সঙ্গীদের সম্বোধন করা হয়- 'ছুঁচো হারামীর দল', 'ছিঁকোমীর মাল' ইত্যাদি নামে। শহরের দোকানদারেরা বলে- 'হারামির বাচ্চা', শহরের বাবুরা বলে- 'এঁটুলির দলা'। পুলিশের সেপাই তাদের বলে- 'কুত্তার বাচ্চা'। প্রতিটি গল্পের প্রত্যেক চরিত্রই শিশু-কিশোর বয়সি। সমাজের কেউই যেন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কোথাও কেউ ভাবেনি তাদের বয়সের মাপকাঠিকর কথা। যে কারণে এরা কেউই বয়স সুলভ আচরণও করে না।

পরিস্থিতি তাদেরকে বয়সের থেকে বড় হতে বাধ্য করেছে। 'নিষিদ্ধ ছিদ্র' ও 'পেলে লেগে যা' গল্পের বৃন্দাবনের বয়স বারো। তার সম্পর্কে গল্পে বলা হয়েছে- **"খালি গা, হাফ প্যান্ট পরা। গায়ে ময়লা থাকলেও আশ্চর্য রকমের ফরসা, গোরাচাঁদ বললেই হয়। আরও আশ্চর্য, ও মোটেই হাড় জিরজিরে রোগা না। একটু যেন থলথলে নরম শরীর।"**[৯] 'এস্‌মালগার' গল্পে গৌরাঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছ- **"বয়স বিশ কি পঞ্চাশ কি বারো, বোঝার উপায় নেই। আসল বয়স তেরো।"**[১০] তার বান্ধবীর নাম সুবলা, অন্তত সে আর তার দলের সঙ্গীরা তাই বলে। সুবলা চায় গোরার শচীমাতা হয়ে থাকতে, কারণ দুজনের বয়সের মাপকাঠি এরূপ কোনো সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। কিন্তু গোরা তাকে বিষ্ণুপ্রিয়া করে রাখতে চায়। সংসারের দায়-দায়িত্ব গোরার শিশুত্বকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। যে কারণে গল্পকার বলেছেন- **"বয়সটার কথা গোরা নিজেও ভুলে গেছে। তাই তার দাবি আর দশটা বয়স্ক পুরুষের মতোই।"**[১১] যে তেরো বছরের বালককে গোটা সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়, তার ছেলেমানুষ থাকলে চলে না বলাই বাহুল্য!

আমরা লক্ষ করবো, প্রতিটি গল্পেই 'খেলা' কথাটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গল্পগুলিতে ধ্বনিত হয়ছে 'খেলা' শব্দের গুঢ় ব্যঞ্জনা। দোকানে আসা সমবয়সি ছেলেদের কাছ থেকে কলেজ মাঠের ফুটবল খেলার খবর নেয় বৃন্দাবন। কে, কেমন খেলল, কে গোল দিল ইত্যাদি। সে বলে- **"আমার খুব খেলতে ইচ্ছে করে। ফুটবল। এয়সা গেদে শট মারতে ইচ্ছে করে যে বল ফাটিয়ে দিই।"**[১২] না, স্বাভাবিক, শিশু সুলভ কোনো খেলার অধিকার কেউ তাকে দেয়নি। পরিবর্তে বৃন্দা অন্য একটি খেলা খেলে। যে খেলা বীভৎস, বিচিত্র। ইঁদুর মারার খেলা। যে খেলায় একজন মানুষ, অন্যজন ইঁদুর নামক একটি জন্তু, যে জন্তুকে মনুষ্য জাতি ঘৃণ্য চোখে দেখে। বৃন্দাবন এই খেলাতেই খুঁজে পায় উত্তেজনা আর আনন্দ- **"জীবনে একটি মাত্র উত্তেজনা নিয়ে ও বেঁচে আছে। একটি মাত্র কারণে। ইঁদুর মারা খেলা। এই খেলার সঙ্গে আছে উত্তেজনার বাজী। জুয়ার মতো।"**[১৩] নেংটি ইঁদুর মারলে পাঁচ পয়সা, ধাড়ি পিছু দশ পয়সা পায় কান্ত কুণ্ডুর কাছ থেকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই বল প্রয়োগ করে সে- **"বেন্দার হাতের মুঠি শক্ত হল, লাঠি উঠল এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত লাঠি প্রচন্ড আঘাতে উঠল, থামল। ও লাফিয়ে দাপিয়ে লাঠির মোটা মুন্ডু দিয়ে পেটাতে লাগল।"**[১৪] একটি সামান্য ইঁদুর মারার জন্য এতটা বল প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। এ আঘাত যেন চলন্ত সমাজের চাকা ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা, যে সমাজ তথা সমাজে বসবাসকারী কান্ত কুণ্ডুর মতো জন্তুকে ইঁদুর বলে মনে করে বৃন্দাবনেরা। একই ভাবে 'এস্‌মালগার' গল্পেও আমরা দেখতে পাবো অত্যন্ত সচেতন ভাবে 'খেলা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন গল্পকার। গৌরাঙ্গরা আর পাঁচ জন সাধারণ শিশুর মতো সাধারণ খেলায় মত্ত থাকে না। তাদের খেলা বরাবরই ভয়ঙ্কর, বিচিত্র। এ যেন নিজেকে ভুলে থাকার খেলা। **"বোধ করি এই গান, মারামারি, খেলা নিজেকে আর নিজের সব কিছুকে ভুলে থাকার এ অবিশ্রান্ত উন্মাদনা না থাকলে এ দীর্ঘ পথ, সময় হত মরুভূমি ও রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা।**[১৫] 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' গল্পেও সেই আবারও 'খেলা', ধাড়ি শুয়োরের দল নর্দমার এলে প্যাল্‌গা আর তার বন্ধুরা শুয়োর মারার তাক লাগায়, কে কবে শুয়োর মারতে পেরেছিল তা নিয়ে বাদানুবাদ থেকে মারপিট পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গল্পকার বলেছেন- **"মারামারিটা আসল খেলা।"**[১৬] প্রতিটা গল্পেই খেলার সঙ্গে অসীম বলপ্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। বৃন্দাবনের অন্য ছেলেদের সঙ্গে মেশার কোনো অবকাশ নেই, তাই তার খেলার সঙ্গী ইঁদুরের দল। সারাদিনের জমে থাকা কুৎসা, গালাগাল, প্রহারের বহিঃপ্রকাশ এই খেলা। গৌরাঙ্গ তার সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে মারামারির খেলা খেলে। প্যাল্‌গারাও তাই। তারা কেউ বাল্য-কৈশোরের চিরাচরিত খেলা খেলে না। তবে

এরা সকলেই তাদের বিচিত্র খেলার মধ্যে দিয়ে নিজেদের পরিস্থিতিকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে মাত্র।

বৃন্দাবন, গৌরাঙ্গ, প্যাল্‌গা— প্রত্যেকের জীবনই অত্যন্ত ট্র্যাজিক। এখন প্রশ্ন এই ট্র্যাজিক জীবনের শেষ কোথায়? বৃন্দাবনের পালানোর কোনো উপায় নেই। দিনে কান্ত কুণ্ডুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আর রাতে বন্ধ গুদাম। এর মুক্তি যেন মৃত্যুতে। গল্পকার বলেছেন বৃন্দার মৃত্যুদিনের শুরুটা হয়েছিল অন্যভাবে। দিনটা ছিল দশমী। মা দূর্গার বিসর্জন। সেইসঙ্গে বেন্দারও। বেন্দা কান্ত কুণ্ডুর বাড়ির কাজ সমাপ্ত করে মণ্ডপে পূজা দেখতে গিয়েছিল। ভাসানের দলের সঙ্গে নাচতে নাচতে সে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল। বেন্দাকেও দেওয়া হয়েছিল সিদ্ধি, কেউ ভাবেনি তার বয়সের মাপকাঠির কথা। সে খেয়েছিল ও খাবার মেখেছিল- **"বলির মহিষ বৎসকে মদ খাইয়ে, অণ্ডকোষে খোঁচা দিয়ে যেমন ক্ষেপিয়ে তোলা হয় ওকেও সেইরকম ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল।"**[১৭] অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তার স্থান হয়েছিল গুদাম ঘরেই। কাহিনির শেষ অংশে বলা হয়েছে- **"সকালের রোদ পড়েছে বেন্দার গায়ে। চোখের রক্তাক্ত কোটর দুটোতে রোদ চিকচিক করছে। একটা খুশির দিনের ব্যতিক্রম কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে পারে, ও তা জানত? বোধহয় না।"**[১৮] 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' গল্পে মুড়ি বিক্রেতা কদম সা-এর প্রহারে প্যাল্‌গা মারা যায়। থান, পুলিশ, আইন, রাতারাতি বিক্রি হয়ে যায় কদম সা'র কাছে। একদিকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, অন্যদিকে- **"মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা দে হরিবোল—।"**[১৯] আবার 'এস্‌মালগার' গল্পের গৌরাঙ্গের পরিণতি একটু অন্যরকম। চাল পাচার করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিল সে, যেটা তার কাছে মৃত্যুর থেকেও বেশি যন্ত্রণার। কারণ উপার্জিত অর্থ বাড়ি নিয়ে যেতে না পারলে, তার সঙ্গে তার গোটা পরিবারকে উপবাসী হতে হবে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গৃহত্যাগী হয়েছিলেন কিন্তু বিশ শতকের গৌরাঙ্গদের, পরিবার বিমুখ হবার কোনো উপায় নেই।

গৌরাঙ্গ, বৃন্দাবন ও প্যাল্‌গারা সমাজের উচ্ছিষ্ট রূপে গণ্য। আলোচ্য গল্পগুলিতে তিনজন শিশু-কিশোরের জীবন সংগ্রামের চিত্র অত্যন্ত বাস্তবিক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। বৃন্দাবনকে দিয়ে শুরু করে লেখক যার উপসংহার টানলেন 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা' গল্পে এসে। যেখানে শিশু দিবসের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। গল্পে দেখা যায়, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উৎসবের আমেজ বয়ে চলেছে শহরে। দিনটা একই সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ'। তাই আলিপুর চিড়িয়াখানা শিশু উদ্যানে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খাওয়ানো, খেলাধুলা, ছবি-আঁকা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। সিনেমা হলের মাথায় লাল কাপড়ে সোনালী অক্ষরে লেখা ছিল- **"আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, ১৯৭৯! 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত' সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক ওদের জীবন।"**[২০] এটি শহরের একদিকের চিত্র, অন্যদিকের চিত্রটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেখানে একগুচ্ছ পথ শিশু, যারা তার এক বন্ধুর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক মুড়ি বিক্রেতার কঠোর প্রহারে তার মৃত্যু হয়েছে। গল্পগুলিতে সমাজে অবহেলিত এক শ্রেণির শিশু ও কিশোরদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে দেখানো হয়েছে। যাদের জীবন সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার লড়াই প্রশ্ন তোলে শিশু-কিশোরদের অবস্থা ও নিরাপত্তা নিয়ে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, মহুয়া. 'বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিবর্তন (১৯৫০-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ)'. থিসিস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫. পৃ- ২। {(http://hdl.handle.net/10603/169371), Retrieved on 10-07-2024}

২. বসু, বাণী. 'বাংলা শিশু সাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী'. কলকাতা-১৪: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ. প্রকাশনা অংশ। {এই বইয়ের প্রকাশনা অংশে বলা হয়েছে- "A bibliography of Bengali books for children and young adults compiled by BANI BASU (1924)"} {https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.457880/mode/1up?view=theater, Retrieved on 1-07-2024}

৩. বসু, বুদ্ধদেব. 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ'. শ্রীমতী বিদিশা মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক). ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলকাতা ৭০০০৫৯: নাবার্ক. প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯. পৃ- ৩০-৩১। {https://www.banglasahitya.in/book_details/615, Retrieved on 05-06-2024}

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা. 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)'. শ্রী গোপালদাস মজুমদার (প্রকাশক). ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ : ডি এম লাইব্রেরী. প্রথম মুদ্রণ, ১৩৬৬. পৃ- ১। {2015.301856.Bangla-Shishu-sahityer.pdf (archive.org), Retrieved on 15-06-2024}

৫. মজুমদার, লীলা. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক). 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন'. কলকাতা- ১২ : বসুমতী সাহিত্য মন্দির. প্রথম সংস্করণ, জুন, ১৯৮১. পৃ- ২৪২।

৬. মণ্ডল, গোপাল ও মণ্ডল, কার্তিক চন্দ্র. 'শিশু শিক্ষার অনুষঙ্গ'. ৯০/৬ এ, এম. জি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৭: টেকনো ওয়ার্ল্ড. প্রথম সংস্করণ, ২০২২. পৃ- ২১। (আর্নেস্ট জোন্স এর মতে, শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকাল; পাঁচ থেকে বারো, বাল্যকাল; বারো থেকে আঠারো পর্যন্ত সময়কালকে যৌবনাগম বা কৈশোরকাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।)

৭. ভট্টাচার্য, মানিক (প্রকাশক). 'Understanding children in Inclusive Context'. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবন, ডি. কে. ৭/১, সেক্টর- ২, সল্টলেক, বিধানগর, কলকাতা- ৭০০০৯১: পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ. দ্বিতীয় প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০১৪. পৃ- ৫। (রুশোর মতে, শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকাল, পাঁচ থেকে বারোকে বাল্যকাল, প্রাক বয়ঃসন্ধি বারো থেকে পনেরো ও বয়ঃসন্ধি পনেরো থেকে কুড়ি)

৮. বসু, সমরেশ. 'সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প'. ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭: প্রমা প্রকাশনী. প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১. পৃ- ১২।

৯. তদেব, পৃ- ১৯০

১০. তদেব, পৃ- ১২২

১১. তদেব, পৃ- ১২৭

১২. তদেব, পৃ- ১২২

১৩. তদেব, পৃ- ১৯২

১৪. তদেব, পৃ- ১৯০

১৫. তদেব, পৃ- ১২৫

১৬. তদেব, পৃ- ২০৬

১৭. তদেব, পৃ- ১৯২

১৮. তদেব, পৃ- ১৯৯

১৯. তদেব, পৃ- ২১২

২০. তদেব, পৃ- ১২১।

বোধিচর্যাবতার গ্রন্থ অবলম্বনে বোধিচিত্তের দার্শনিক বিশ্লেষণ

প্রিয়াঙ্কা দত্ত
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract): *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থটি একটি বৌদ্ধ গ্রন্থ। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়ের স্রষ্টা গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তন্মধ্যে অন্যতম মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়। আমার প্রবন্ধে আমি মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিক শান্তিদেবের রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ অবলম্বনে বোধিচিত্তের দার্শনিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। বৌদ্ধ দর্শন তথা নীতিবিদ্যায় বোধিসত্ত্বের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সেই বোধিসত্ত্বের মূল লক্ষ্য বোধিপ্রাপ্তি। এই বোধি প্রাপ্তির পূর্বে একজন বোধিসত্ত্বের যে বিশেষ চিত্তের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন তা হল বোধিচিত্ত। বোধিসত্ত্বের জীবনে মুখ্যত বৌদ্ধ দর্শনে বোধিচিত্তের এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেবল বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষুক নন, সমাজের সাধারণ মানুষও বোধিসত্ত্ব হয়ে বিশেষ নিয়মনীতি (পারমিতার সাধনা) পালনের দ্বারা বোধিচিত্তের অধিকারী হতে পারবেন। যে চিত্তের অধিকারী হলে একজন বোধিসত্ত্বের মনে লোভ, হিংসা, অজ্ঞতা দূরীভূত হয়ে নির্মল চিত্তের অধিকারী হতে পারেন সেটিই বোধিচিত্ত। বোধিচিত্তের অধিকারী ব্যক্তি (বোধিসত্ত্ব) অপরের মঙ্গলকামনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে পারেন। এর ফলে সমাজে মৈত্রী, করুণা ও ভালবাসার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মহাযান সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় যে নতুন দিকের সূচনা হয়েছিল তার স্পষ্ট পরিচয় আমরা শান্তিদেবের *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ অনুসরণে দেখতে পাব। বোধিচিত্তের প্রাপ্তি ব্যতীত বোধিলাভ এমনকি বোধিসত্ত্বের জীবনও অসম্পূর্ণ। সেকারণে আমি *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ অবলম্বনে বোধিচিত্তের দার্শনিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।
সূচক শব্দ (Keywords): স্থবিরবাদ, মহাসাঙ্ঘিক, মহাযান, বোধিসত্ত্ব, বোধিচিত্ত, পারমিতা, প্রসঙ্গ পদ্ধতি, ধর্মকায়, ভূততথতা।

মূল আলোচনা (Main Discussion):
ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত বৌদ্ধ দর্শনে বোধিচিত্তের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রূপে গণ্য হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মনে করেন, বোধি প্রাপ্তির পথে বিশেষত বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির চিত্তের উত্তরণ একান্ত প্রয়োজন। সেই চিত্তের উত্তরণই বৌদ্ধ পরিভাষায় বোধিচিত্ত নামে অভিহিত হয়েছে। বোধিসত্ত্বের জীবনে বোধিচিত্তের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কেবল বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষুকগণ বোধিসত্ত্ব হয়ে বোধিচিত্তের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পেতেন, সমাজের সাধারণ মানুষ সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষও যে বোধিচিত্তের অধিকারী হতে পারেন, তা প্রথম মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় পরিলক্ষিত হয়। হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে বোধিচিত্তের ধারণা বিষয়ে নানাভাবে আলোচিত হলেও আমি এই প্রবন্ধে মহাযান সম্প্রদায়ের বিশেষ গ্রন্থ *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থটিকে মুখ্য গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করে গ্রন্থের মূল বিষয় বোধিচিত্তের একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

আমার এই প্রবন্ধটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি –

১। প্রথম বিভাগে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেছি।

২। দ্বিতীয় বিভাগে বোধিচিত্ত বলতে কী বোঝায় সেই ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছি এবং যেহেতু বোধিচিত্তের ধারণাটি বোধিসত্ত্বের ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাই এই বিভাগে বোধিসত্ত্বের ধারণাটিও প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

৩। তৃতীয় বিভাগে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে কীভাবে বোধিচিত্তের আলোচনা করা হয়েছে তা আলোচনা করব।

বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের দার্শনিক শান্তিদেব হলেন *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের রচয়িতা। তারানাথ এবং Bu-ston – এঁর মতে, *বোধিচর্যাবতার* শাস্ত্রের রচয়িতা শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান গুজরাট) রাজা কল্যাণবর্মণের পুত্র যিনি অষ্টম শতকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার পরবর্তী সুযোগ্য রাজা হিসাবে সম্মান পেলেও স্বপ্নে মঞ্জুশ্রীর উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই পথ অনুসরণ করতে অস্বীকার করেন এবং পরবর্তীকালে নালন্দায় গিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করেন। সেই থেকেই তিনি শান্তিদেব নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর দুটি অমূল্য গ্রন্থ *বোধিচর্যাবতার* এবং *শিক্ষাসমুচ্চয়*। শান্তিদেবের *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের উপর *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* টীকা রয়েছে।

মহাযানী দার্শনিক রূপে শান্তিদেবের মূল উদ্দেশ্য মহাযান সম্প্রদায় বিশেষত মাধ্যমিক দর্শনে ব্যাখ্যাত জীবনের আদর্শকে তুলে ধরা। তাঁর *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব এবং বোধিসত্ত্বের বোধিচিত্ত প্রাপ্তির সুন্দর চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে মাধ্যমিক চিন্তাধারার দুর্বোধ্য যুক্তি তুলে ধরা হয়নি, বা সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণও করা হয়নি। বরং এই গ্রন্থে ধর্মীয় উদ্যমতা এবং আধ্যাত্মিক আন্তরিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেইসময়ে সাধারণ মানুষের কাছে ভক্তি, ভাবাবেগের প্রাধান্য বেশি থাকায় গ্রন্থটি উপস্থাপন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলা যায় মহাযানী চিন্তাধারায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্যতীত সাধারণ মানুষও যে বোধি প্রাপ্তিতে অগ্রসর হতে পারবে ও বোধিসত্ত্ব হতে পারবে, সেই বার্তা প্রথম এই গ্রন্থের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। একদিকে যেমন মাধ্যমিক দর্শনের প্রণেতা নাগার্জুন 'প্রসঙ্গ'[১] পদ্ধতির মাধ্যমে সকল আধিবিদ্যক তত্ত্বের নস্যাৎ করে দেখিয়েছিলেন যে সেখানে ধর্মীয় আবেগের কোন স্থান নেই। অন্যদিকে সেইসময়ে সেই ধর্মীয় আবেগকে শান্তিদেব তাঁর *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের মাধ্যমে সুন্দরভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিদেবের এই গ্রন্থের উপর বহু টীকাও রচিত হয়েছে। এই টীকাগুলির মধ্যে তিব্বতি সংস্করণের দশটি টীকা সংরক্ষিত হয়েছে, সেগুলি হল – ১) প্রজ্ঞাকরমতি রচিত *the dkaḥn ḥgrel by Śes – rabḥbyuṅ-gnas*, ২) *the Rnam-par bśad-paḥi dkaḥ-ḥgrel*, ৩) শুভদেব রচিত *the Legs-par sbyar-ba by Dge-ba Iha*, ৪) কৃষ্ণপাদ-এর রচিত *the Rtogs-par dkaḥ-baḥi gnas gtan-la-bdaḥ- pa*, ৫)বৈরোচনরক্ষিত রচিত *the Dkaḥ-ḥgrel*, ৬) *the Śes – rab leḥuni dkaḥ-ḥgrel*, ৭) *the Śer-leḥi sṅo-bahi dkaḥ-ḥgrel*, ৮) স্বর্ণদীপের লামা ধর্মকীর্তি রচিত *the Don Sumcu-rtsa-drug bsdus-pa by Gser-gliṅ-gi bla-ma chosskyoṅ*, ৯) লামা ধর্মকীর্তি রচিত *the Don bsdu-pa*, ১০) বিভূতিচন্দ্র রচিত *the Dgons-paḥi ḥgrel-pa khy ad-pargsal byed śes-bya-ba*।

Kate Crosby এবং Andrew Skilton তাঁদের রচনায় *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের শিরোনামের ব্যাখ্যা করেছেন। 'বোধিচর্যাবতার' পদটিকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি পদ পাওয়া যায়, যথা – 'বোধি', 'চর্যা' এবং 'অবতার'। বোধি বলতে নির্বাণকে (awakening) বোঝায়,

'চর্যা' বলতে ঐ পথের অনুশীলন বা পালন (the way to go or act) বোঝায় এবং 'অবতার' বলতে এখানে প্রবেশ করা (entrance into, introduction to) অর্থ নির্দেশিত হয়।[২] সুতরাং সামগ্রিকভাবে 'বোধিচর্যাবতার' এই পদের অর্থ হল নির্বাণ প্রাপ্তির পথের অনুশীলনে উদ্যোগী হওয়া বা প্রবেশ করা। *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের অন্তর্গত দশটি অধ্যায় কেবলমাত্র শ্লোকেই রচিত। এই শ্লোকগুলির মধ্যে দিয়ে বোধিসত্ত্বের বোধিচিত্তের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় এবং বোধিসত্ত্বের জীবনে প্রজ্ঞা লাভের ক্ষেত্রে পারমিতার ক্রমিক অনুশীলনেরও নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়।

মহাযানী ভাবাদর্শে দীক্ষিত মহাযানী সাধকেরা যে বোধিচিত্তের উল্লেখ করেন তা কী? সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষত হীনযান, মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ দর্শনে 'বোধিচিত্ত' (Thought of Enlightenment) পদের প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। হীনযানী ধারণায় 'বোধিচিত্ত' বিষয়টিকে বুদ্ধের পূর্ববর্তী জীবনপর্যায়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হলেও মহাযানী দর্শনের চিন্তাধারায় বোধিচিত্তের ধারণা নৈতিক ধারণা রূপে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।[৩] অপরদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ দর্শনে 'বোধিচিত্ত' বলতে মহাসুখ (a state of great bliss) নির্দেশিত হয়।[৪]

বোধিচিত্তের ধারণা পালি দর্শনে না থাকলেও পালি নিকায় গ্রন্থে এই ধারণার অস্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় *মজ্ঝিমনিকায়* গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে যে, সুগত বুদ্ধ সিদ্ধার্থ নামে জন্মগ্রহণকালে রোগী, অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিদের দুঃখ, রোগ নিরাময়ের উপায় অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে গৃহী জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনে অগ্রসর হন এবং অন্যের দুঃখ, যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধিই তাঁকে সাধনার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং লক্ষ্য নির্বাণের পথ প্রশস্ত করে। নির্বাণ লাভের পর তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, অপরের মঙ্গলার্থে তিনি ধর্মদেশনা করবেন। এই ধর্মদেশনাই বৌদ্ধ পরিভাষায় 'ধম্মদান' নামে অভিহিত। অপরের প্রতি এই গভীর সহানুভূতিশীল মনোভাবই পরবর্তী বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। মহাযান দর্শনে বুদ্ধদেবকে মহাকারুণিক অভিধায় ভূষিত করার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের এই পরার্থপরতার বৈশিষ্ট্যই প্রধান তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পরার্থপরতার ধারণার উপর ভিত্তি করেই বোধিসত্ত্বের ধারণার উত্তরণ ঘটে এবং অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল করুণাঘন মনোভাবই বোধিচিত্ত রূপে অভিহিত হয়।

সংস্কৃত 'বোধিচিত্ত' পদটি 'বোধি' এবং 'চিত্ত' এই দুই পদের সমন্বয়ে গঠিত যা মহাযান বৌদ্ধ শাস্ত্রকারদের শাস্ত্র ও সূত্রে উল্লেখিত রয়েছে। 'বোধি' পদের দ্বারা এমন অবস্থানের উল্লেখ করা হয় যে স্তরে উত্তীর্ণ হলে ব্যক্তির মানসিক ও জ্ঞানগত সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রান্ত হয় এবং ব্যক্তি সর্বোচ্চ স্তরে (বৌদ্ধ ভাষায় যা বুদ্ধত্ব নামে অভিহিত) উত্তীর্ণ হন। 'চিত্ত' পদের দ্বারা মন (mind), বুদ্ধিমত্তা (intelligence), চিন্তাশক্তি (thought), অভিপ্রায় (intention), ইচ্ছাশক্তি (will) নির্দেশিত হয়। অতএব বোধিসত্ত্ব যে চিত্তের বা চিন্তাশক্তির অধিকারী হলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন চিত্তের সেই অবস্থাকেই বোধিচিত্ত[৫] বলা হয়।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, যে বোধিসত্ত্বের কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে তিনি কে?

এককথায় বলা যায়, বোধি লাভে আগ্রহী বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেন বোধিসত্ত্ব। হীনযান সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের কাছে 'বোধিসত্ত্ব' হল বোধি প্রাপ্তির পূর্বে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী জীবনপর্যায়সমূহ যার উল্লেখ আমরা বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে লক্ষ্য করি।

পূর্বেই বলা হয়েছে মহাযান দর্শনের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধ দর্শনে এক নতুন আলোড়ন দেখা যায়। মহাযান চিন্তাধারায় 'বোধিসত্ত্ব' কথাটির প্রয়োগ আমরা বিশেষ লক্ষ্য করি। সাধারণত বোধিসত্ত্ব হলেন সংসারভুক্ত মানুষ যিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। এই ব্যক্তি স্থবিরবাদ সম্প্রদায় মতে কেবল বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষু হতে পারেন কিন্তু মহাযান সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় যেমন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিসত্ত্ব হতে পারেন তেমন সাধারণ গৃহী মানুষ (উপাসক) বোধিসত্ত্ব রূপে নিজ জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। তিনি নিজের নির্বাণের কথা চিন্তা না করে অপরের কল্যাণে, অপরের নির্বাণ লাভে সহায়তা করেন।

বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রথমত, চিত্তের উত্তরণ প্রয়োজন অর্থাৎ বোধিচিত্তের অধিকারী হতে হবে। আদি গ্রন্থগুলিতে 'বোধিচিত্ত' পদটির উল্লেখ না থাকলেও বিভিন্ন নিদান গ্রন্থে অন্যদের প্রতি বুদ্ধের আচরণ বোধিচিত্তেরই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। এখানে বোধিসত্ত্বের পরার্থপর মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।[৬]

পরবর্তীকালে পরার্থপরতার এই চিত্র আমরা অন্যান্য মহাযানী গ্রন্থ *মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, গণ্ডব্যূহ* গ্রন্থেও উল্লেখ করি। *মহাবস্তু, ললিতবিস্তর* দুই গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে অন্যদের মঙ্গল কামনাতেই বোধিসত্ত্ব বোধিচিত্তের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। *গণ্ডব্যূহ* গ্রন্থে বোধিচিত্তের ধারণাকে অসংখ্য রূপক ও উপমার দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৭]

আমি এখানে শান্তিদেবের *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের উপর প্রজ্ঞাকরমতির *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* টীকা অনুসরণে বোধিচিত্তের আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'বোধিচিত্তানুশংসা' অংশের নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বের প্রাপ্ত বোধিচিত্তের প্রশংসা করা হয়েছে। মহাযান সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা অনুসারে বোধিচিত্তের ধারণা সকল মানুষের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে অর্থাৎ, সকল মানুষই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কুশল কর্মের দ্বারা বোধিসত্ত্ব হয়ে বোধিচিত্তের অধিকারী হতে পারবেন। এটি বৌদ্ধ দর্শনে ধর্মকায় (body of law) অথবা ভূততথতার (suchness of existence, i.e., The Universal Spirit) প্রকাশ।[৮]

দার্শনিক শান্তিদেব 'বোধিসত্ত্ব' পদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন –

অলক্ষণমনুৎপাদমসংস্কৃতমবাংময়ং।
আকাশং বোধিচিত্তং চ বোধিরদ্বয়লক্ষণা।। ইতি।।

তত্র সত্ত্বং। অভিপ্রায়ঽস্যেতি বোধিচিত্ত[৯]।

অর্থাৎ যার লক্ষণ দেওয়া যায় না, যার উৎপত্তি নেই, যা সংস্কৃত নয়, যা বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়, যার আকাশের মত স্বরূপ, বোধির সাথে অদ্বয় লক্ষণযুক্ত তাকেই বোধিচিত্ত বলি। বোধিচিত্তের সত্ত্বা যার অভিপ্রায়, তিনিই বোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্ব তিনিই হতে পারেন যার বুদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের পরম মুক্তি কামনা করেন না। বোধিসত্ত্বের স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য ব্যক্তির উচিত বোধিচিত্তকে জাগ্রত করা। স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে আত্মদানের যে সাধনা বা সংকল্প, সেই সাধনার প্রয়াসকেই বোধিচিত্ত বলে। এ প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'বোধিচত্তানুশংসা' অংশে বলা হয় –

তস্মাচ্ছুভং দুর্বলমেব নিত্যং বলং তু পাপস্য মহৎ সুঘোরং।
তজ্জীয়তে অন্যেন শুভেন কেন সংবোধিচিত্তং যদি নাম ন স্যাৎ।।[১০]
বোধিচর্যাবতার ১.৬।।

অর্থাৎ, সর্বকালেই পুণ্য দুর্বল এবং পাপের বল মহৎ ও ভীষণ। মানুষের কর্ম যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ ফলের জন্ম দেয়। সেই বলশালী পাপের কবল থেকে তখনই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব যখন বোধিসত্ত্ব বোধিচিত্তের অধিকারী হবেন। এই বিষয়টিকে *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* টীকায় এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে শুভ অর্থাৎ পুণ্য সর্বদাই দুর্বল হওয়ায় এর সামর্থ্য থাকে না, তুলনায় পাপের সামর্থ্য বেশি থাকায় তা অতি ভয়ংকর। কারণ তা নরক যন্ত্রণার হেতু হয়ে ওঠে। এই ভয়ংকর পাপকে জয় করা কঠিন হলেও শুভ বা পুণ্য ফলের দ্বারা তাকে জয় করা যায়। এক্ষেত্রে বোধিসত্ত্বকে শুভ রূপ সম্বোধিচিত্তের অধিকারী হতে হবে যার দ্বারা সকল পাপ জয় করা সম্ভব।[১১]

এরপর প্রশ্ন হতে পারে লক্ষ্যরূপ বোধিচিত্ত কেন হিতকর বা শুভ? এ প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে –

কল্পানল্পান্ প্রবিচিন্তয়দ্ভির্দৃষ্টং ন মুনীন্দ্রৈর্হিতমেতদেব।
যতঃ সুখেনৈব সুখং প্রবৃদ্ধমুৎপ্লাবয়ত্যপ্রমিতাঞ্জনৌঘান্।।[১২]

বোধিচর্যাবতার১।৭।।

মুনি ব্যক্তিরা বহুকল্প চিন্তা করে এই হিতমার্গ দর্শন করেছেন এবং এর দ্বারা সহজেই পরাকাষ্ঠা সুখ প্রাপ্ত হতে পারে। *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* টীকাগ্রন্থে বলা হয়েছে – কল্প এবং মহাকল্পসমূহকে যে সকল সুচিত্তের বুদ্ধগণ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বিচার বিবেচনা করে গেছেন সেটাই হিত যা সর্বার্থসিদ্ধি নিশ্চিত করে। এটিই সম্বোধিচিত্ত। কেন এটি হিত? এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে – সুখ প্রকৃষ্ট হলে অপরিমিতভাবে সুখের বৃদ্ধি ঘটে যা প্রাণীসমূহকে সংসার দুঃখের মহাসাগর থেকে উত্তীর্ণ করে।[১৩]

এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই বোধিচিত্তের অধিকারী কারা হতে পারেন? এ প্রসঙ্গে বলা যায় মহাযানী আদর্শে অনুপ্রাণিত শান্তিদেবের *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে যারা সংসারের অসংখ্য দুঃখ থেকে উদ্ধার লাভ করতে চান, যারা জীবনের দুঃখ, শোক দূর করতে চান তাদের ক্ষেত্রে বোধিচিত জাগ্রত করা অপরিহার্য। অপরদিকে সংসার সমুদ্রের ভবকারাগারে বন্দী দরিদ্র ব্যক্তির কঠোর সাধনার দ্বারা বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হলেই তৎক্ষণাৎ সে বোধিসত্ত্ব বলে অভিহিত হতে পারেন।

এরপর প্রশ্ন হতে পারে বোধিচিত্তের কার্যকারিতা কী? এই প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে –

অশুচিপ্রতিমামিমাং গৃহীত্বা জিন-রত্ন-প্রতিমাং করোত্যনর্ঘাং।
রসজাতমতীব বেধনীয়ং সুদৃঢ়ং গৃহ্নত বোধিচত্ত-সংজ্ঞং।[১৪]

বোধিচর্যাবতার ১।১০।।

সুদৃঢ় কর্তনকারী মণির দ্বারা যেমন অন্য মণিরত্ন কর্তিত হয়ে রত্নপ্রতিমাদিতে পরিণত হয় তেমনই মানুষের দেহ বা কায়কে বোধিচিত্ত রত্নের কর্তনকারী শক্তির দ্বারা রত্নকায়ে পরিণত করা সম্ভব। শান্তিদেব পরবর্তী ১২ নং সূত্রে বোধিচিত্তকে কদলী বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। একটি গাছের ফল প্রদানের পর তার কর্মক্ষমতা কমে গেলেও বোধিসত্ত্বের বোধিচিত্তের অগ্রগতির নিবৃত্তি হয় না, তা উর্বর হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

কদলীব ফলং বিহায় যাতি
ক্ষয়মন্যৎ কুশলং হি সর্বমেব।
সততং ফলতি ক্ষয়ং ন যাতি

প্রসবত্যেব তু বোধিচিত্তবৃক্ষ।।[১৫]

বোধিচর্যাবতার ১।১২।।

এক্ষেত্রে কদলী বৃক্ষের ন্যায় বোধিচিত্তকে বৃক্ষসমান বলা হয়েছে কিন্ত কদলীবৃক্ষের তুলনায় বোধিচিত্তবৃক্ষ উন্নত। এ প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* টীকাগ্রন্থে বলা হয়েছে – কদলী বৃক্ষ যেমন একটি বৃক্ষ তেমন বোধিচিত্ত হল বোধিসত্ত্বের ভবিষ্যৎ জীবনের অগ্রগতির পথে মহীরূহ। কদলী বৃক্ষ একবার ফলদানের পর তার পরবর্তী ফল প্রদানের সামর্থ্য অবলুপ্ত হয় কিন্তু বোধিচিত্তবৃক্ষের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বোধিচিত্তবৃক্ষ সর্বকালেই ফল দান করে এবং সমস্তরকম কুশল ফল প্রদান করতে পারে।

বোধিচিত্তের দুটি প্রকার সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে –

বোধিপ্রণিধিচিত্তস্য সংসারেঽপি ফলং মহৎ।
ন ত্ববিচ্ছিন্ন-পুণ্যত্বং যথা প্রস্থান-চেতসঃ।।[১৬]

বোধিচর্যাবতার ১।১৭।।

বোধিপ্রণিধি চিত্ত বোধিলাভের পথ দর্শনে সহায়তা করে। বোধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প জাগ্রত করা হল বোধিপ্রণিধি চিত্ত এবং সেই পথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা হল বোধিপ্রস্থান চিত্ত। সংসারে বোধিপ্রণিধি চিত্তের ফল মহৎ। কিন্তু বোধিপ্রস্থান চিত্তের ন্যায় বোধিপ্রণিধি চিত্তের অবিচ্ছিন্ন পুণ্যত্ব নেই। এইরূপ জগতানন্দ বীজসম বোধিচিত্তকে রত্নের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং এই রত্নের অধিকারী বোধিসত্ত্ব হলেন মনুষ্যরূপী রত্ন। এই বোধিচিত্ত জগতের সকল দুঃখের ঔষধ যার উৎপত্তিতে পুণ্যফলের প্রাপ্তি ঘটে।[১৭]

Luke Perera তাঁর ‘Bodhicitta and Charity: A Comparison’[১৮] প্রবন্ধে বৌদ্ধ ধর্মের বোধিচিত্ত এবং খ্রিষ্টান ধর্মের দানশীলতা (charity) ধারণাদ্বয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে খ্রিষ্টান ধর্মের পরিভাষায় ব্যবহৃত ‘দানশীলতা’ (charity) পদটি যেমন সেই ধর্মের নীতিনিয়ম, অনুশীলন পদ্ধতির নির্দেশ দেয় তেমন বৌদ্ধ পরিভাষায় ব্যবহৃত ‘বোধিচিত্ত’ পদটি বোধিসত্ত্বের পালনীয় নীতিনিয়ম এবং পারমিতা অনুশীলনের নির্দেশ দেয়। বোধিচিত্ত এবং দানশীলতা (charity) উভয় ধারণাই নিজস্ব ধর্মের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যানবাহনের ইঞ্জিনের কাজ করে। যানবাহনটিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যানবাহনের চালককে যেমনভাবে ইঞ্জিন সাহায্য করে অনুরূপভাবে বোধিচিত্ত বোধিসত্ত্বকে বোধিলাভের সকল নীতিনিয়ম পালনের উপযুক্ত করে তোলে এবং অন্যদিকে দানশীলতা (charity) সদ্গুণ রূপে ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রিষ্টের চিন্তাধারাকে সকল মানুষের মধ্যে মৈত্রী, ভালবাসার সঞ্চার ঘটাতে সহায়তা করে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই মহাযান চিন্তাধারার আদর্শে বোধিসত্ত্বের জীবনে বোধিচিত্তের ধারণা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কেবল বৌদ্ধ ভিক্ষু নন, সাধারণ মানুষও সাধনার দ্বারা বোধিচিত্তের অধিকারী হয়ে বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারবেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের পথে অগ্রসর হতে পারবেন সেই স্পষ্ট চিত্র *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে পাওয়া যায়। *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে প্রথম থেকে অন্তিম অধ্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নৈতিকতার স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয় যেখানে বোধিসত্ত্বের চারিত্রিক শুদ্ধতার সাথে বোধিচিত্ত লাভের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়েছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ‘ছোট আমি’-র গন্ডি অতিক্রম করে ‘বড় আমি’ হয়ে ওঠা। ‘ছোট আমি’ রূপে সংসারের লোভ, বাসনার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে আত্মত্যাগী, পরার্থপরতায় নিয়োজিত ‘বড় আমি’ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা

বোধিচিত্তের অধিকারী না হলে সম্ভব হয় না। এখানেই বৌদ্ধ দর্শনের *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের অন্তর্গত বোধিচিত্তের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১। মাধ্যমিক দর্শনের প্রণেতা নাগার্জুনের দর্শনে ব্যবহৃত বিশেষ যুক্তিপদ্ধতির দুটি মূল অংশই হল চতুষ্কোটি পদ্ধতি (Method of Enumeration) এবং প্রসঙ্গ পদ্ধতি (Reductio ad Absurdum)। চতুষ্কোটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের সম্ভাব্য সকল বিকল্পকে গণনা করা হয়। পরে প্রসঙ্গ পদ্ধতির সহায়তায় প্রত্যেকটি সম্ভাব্য বিকল্প খন্ডন করা হয়। প্রসঙ্গ পদ্ধতিতে যা করা হয় তা হল প্রতিষ্ঠা করা যে কোন একটি বচন 'ক' থেকে যদি স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় তাহলে বলতে হয় 'ক' সত্য হতে পারে না বা 'ক' গ্রহণযোগ্য নয়।

২। Śāntideva, 1995, *The Bodhicaryāvatāra*, Kate Crosby and Andrew Skilton(trans), Oxford, Oxford University Press, pg – xxix.

৩। Malalasekera, G.P., 1971, *Encyclopedia of Buddhism*, vol-3, Ceylon, pg-184.

৪। Ibid, pg-184.

৫। Perera, Luke, 'Bodhicitta and Charity: A Comparison', *Buddhist Christian Studies*, vol-35, published by University of Hawai'I Press, 2015, https://www.jstor.org/stable/24801393, accessed by 16nth April, 2020, pg-121.

৬। Malalasekera, G.P., 1971, *Encyclopedia of Buddhism*, vol-3, Ceylon, pg-185.

৭। Ibid, pg-185.

৮। Ibid, pg-184.

৯। প্রজ্ঞাকরমতিকৃত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা*, ১৯১২, কলিকাতা, এশিয়াটিক সোস্যাইটি প্রকাশিত, পৃ.৪২১।

১০। *বোধিচর্যাবতার* ১।৬।।

১১। প্রজ্ঞাকরমতিকৃত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা*, পৃ.৪২১।

১২। *বোধিচর্যাবতার* ১।৭।।

১৩। প্রজ্ঞাকরমতিকৃত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা টীকা* ।

১৪। *বোধিচর্যাবতার* ১।১০।।

১৫। *বোধিচর্যাবতার* ১।১২।।

১৬। *বোধিচর্যাবতার* ১।১৭।।

১৭। জগদানন্দবীজস্য জগদ্দুঃখৌষধস্য চ।
চিত্তরত্নস্য যৎ পুণ্যং তৎকথং হি প্রমীয়তাং।।
বোধিচর্যাবতার ১।২৬।।

১৮। Perera, Luke, 'Bodhicitta and Charity: A Comparison', *Buddhist Christian Studies*, vol-35, published by University of Hawai'I Press, 2015, https://www.jstor.org/stable/24801393, accessed by 16nth April, 2020, pg-124.

ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠিত স্বাস্থ্য নীতির বিবর্তন : উনিশ শতক থেকে কুড়ি শতক

প্রদ্যুৎ মন্ডল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য নীতি ছিল অসংগঠিত। এ দেশে সংগঠিত স্বাস্থ্য বিধির সূচনা হয়েছিল ঔপনিবেশিক পর্বে। উনিশ শতকের ষাটের দশকের একেবারে শেষে রয়্যাল কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য নীতির প্রারম্ভ হয়। সম্ভবত এই কমিশনের প্রতিবেদন ছিল ব্রিটিশ ভারতের স্বাস্থ্য নীতির প্রথম দলিল। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকেই সরকার সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে ঔপনিবেশিক নীতিতে নতুন ভাবনা যোগ করেছিল। ঐ বছর কলেরা মহামারী সরকারকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন করলে, ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি 'কলেরা কমিশন' নিয়োগ করে। উনিবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন যেমন, - জন্ম-মৃত্যু-নিবন্ধীকরণ আইন (১৮৭৩ খ্রিঃ) ও গুটি বসন্ত টিকাকরণ আইন (১৮৮০ খ্রিঃ) পাশ করে। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রফেসর টি. আর. ফ্রাসরের সভাপতিত্বে 'প্লেগ কমিশন' নিয়োগ করা হয়। এই ঘটনার এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'মহামারী প্রতিরোধ আইন' পাশ করা হয়। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্লেগ কমিশন তার প্রতিবেদনে এ দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার পুনর্গঠন ও বিস্তারের সুপারিশ করেছিল। স্বাস্থ্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল অবশ্যই ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন। এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্য একটি সুবিস্তৃত ও বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করেনি। এই সময় জনস্বাস্থ্য বিষয়টিকে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। কিন্তু ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আইন সরকারের স্বাস্থ্য নীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে জনস্বাস্থ্য বিষয়টিকে সংস্কারমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংবিধানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই আইনে, বাংলার মন্ত্রী সভাকে স্বাস্থ্য নীতি ও প্রশাসনের সমগ্র দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেটি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আইনের থেকে অনেক বেশি সুবিস্তৃত ছিল। ফলস্বরূপ প্রাদেশিক সরকার এবং আইনসভাগুলি বাংলার অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য নীতির বিকাশে এবং বাস্তবায়নে অশৃঙ্খলিত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন' (National Planning Committee) তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দরকারি ব্যবস্থা নির্দেশ করার জন্য সন্তোষ সিং সোখেয়ের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি গঠন করেছিল। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ভোর কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সমগ্র দেশব্যাপী স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি হয়। ভোর কমিটি জাতির স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ প্রদান করেছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে, সরকার কর্তৃক ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে সারা দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দেশের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ড. মুদালীয়ারকে নিযুক্ত করা হয়। ভোর কমিটি যেমন চিকিৎসা পরিষেবা

সর্বস্তরে বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করেছিল; অন্যদিকে মুদালীয়ার কমিটি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সুদৃঢ় ও তার গুণগত মানকে উন্নত করার দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, গুণগত মান বজায় রাখার পরিবর্তে তার সংখ্যা বিস্তারকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশকে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্বাস্থ্য পরিষেবার অবনতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশাসকরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে পশ্চিমা-শৈলীর নিরাময়মূলক পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দেন। প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীন ভারত সরকার স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুসৃত পথেই হাঁটতে শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ ১৯৪৭-১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের উদ্যোগ সফল হতে পারেনি। এমনকি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের কোনও বিধিবদ্ধ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ছিল না। ১৯৮০-এর দশকের পরবর্তীকালে, ভারতে জনস্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটেনি। রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য নীতির অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়নি; প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবতার মধ্যে অনেক ফারাক ছিল। সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। বিশ্ব ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফ্যাণ্ড-এর বিষয়সূচি ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারীকরণকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৮০-এর দশক থেকে সরকার জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ব্যয় ভীষণভাবে সংকোচন করেছিল। ১৯৯০-এর দশক থেকে সরকারী হাসপাতালের পরিবর্তে বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি, বেসরকারি স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির সমালোচনা করা হয়েছিল।

সূচক শব্দ: স্বাস্থ্য, ঔপনিবেশিক, রাষ্ট্র, প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কমিটি, রোগী, পরিষেবা, বেসরকারী, জনকল্যাণ।

মূল আলোচনা:

ভারতবর্ষে সংগঠিত স্বাস্থ্য নীতির সূচনা ঔপনিবেশিক পর্বে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের স্বাস্থ্য-চিন্তা কয়েকটি অস্বাস্থ্যকর ভাবনা থেকে এসেছে। তবে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বাস্থ্য নীতি ছিল ন্যূনতম। যা ছিল ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখার একটি কৌশল।[১] যাঁরা ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন বা করছেন; কবিতা রায়, অনিল কুমার, দীপক কুমার, জে. সি. হিউম, ভি. আর. মুরলিধরণ-এর মতো বেশির ভাগ গবেষক পণ্ডিত মনে করেন যে, "colonial medical policy privileged the needs of Europeans and the military forces."[২] ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতীয় জনগণকে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা সুযোগ দিতে বাধ্য ছিল। রাষ্ট্র এর দ্বারা আর্থিক ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেয়েছিল।[৩] রাষ্ট্রের প্রধান করদাতা স্থানীয় কৃষককুলের অসুস্থতায় মৃত্যু হওয়া মানে রাজস্বে ঘাটতি। হাঁসকে উপবাসী রেখে সোনার ডিম আশা করা দুরাশা। তেমনি রোগাক্রান্ত প্রজাশক্তিকে কোন রকমে জিইয়ে রেখে রাজ্যপাট চালালে রাজ্য অটুট নাও থাকতে পারে। প্রজা চিরন্তন খাজনাদাতা। এদের দানসরবরাহের স্বতোৎসার অব্যাহত রাখতে হলে মানুষগুলিকে নিদেনপক্ষে সুস্থ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়াও রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উপর পড়েছিল। আবার আন্তজার্তিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও দেশীয় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ঔপনিবেশিক সরকারের উপর চাপ দিয়েছিল। কারণ বাণিজ্যিক

সংস্থাগুলি মুক্ত বাণিজ্যে আবদ্ধ ভারতবর্ষকে একটি মহামারী পূর্ণ দেশ হিসাবে বিবেচনা করেছিল।[৪]

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে মে মাসে ভারতীয় সেনাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে 'রয়্যাল আর্মি সানিটারি কমিশন' (Royal Army Sanitary Commission) নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে সানিটারি সংগঠনের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় বলে মনে করা হয়। আবার রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়। যাই হোক, ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এই কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করেছিল। সম্ভবত রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদন ছিল ব্রিটিশ ভারতের স্বাস্থ্য নীতির প্রথম দলিল।[৫] রয়্যাল কমিশন সুপারিশ করেছিল যে, "The establishment in all districts of local boards for carrying on the municipal and sanitary services, appointment of health officers and adoption of the other measures for ensuring proper supervision, throughout the country, of the sanitary condition of the people."[৬] কমিশনের প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে জনস্বাস্থ্য কমিশন স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছিল। এর সঙ্গে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও নিষ্কাশন এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে মহামারী প্রতিরোধ অপরিহার্য বলে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব বা সুপারিশ কার্যকর হয়নি। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে 'Report of the Sanitary Reorganization Committee' মন্তব্য করেছিল যে, "Strachey's scheme, though bold and farsighted in conception was perhaps in advance of times." এই প্রতিবেদনে আরও লেখা হয়েছিল যে, "Municipal Government was in its infancy and it seemed a rash policy to force on the illiterate villagers, wrapped in rigid immobility of caste and customs, those new principal of hygiene, which were only just securing allegiance in the west."[৭]

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকেই সরকার সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে ঔপনিবেশিক নীতিতে নতুন ভাবনা যোগ করেছিল। ঐ বছর কলেরা মহামারী সরকারকে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল। কারণ সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার মুখ্য স্তম্ভ। সেনাবাহিনীকে দেশীয়দের থেকে সামাজিক বিচ্ছিন্ন করাই যথেষ্ট নয়। কলেরা রোগের আসল কারণ জানা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন। তাই ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি 'কলেরা কমিশন' (Cholera Commission) নিয়োগ করেছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে 'প্রেসিডেন্সি সানিটারি কমিশন' (Presidency Sanitary Commission) গঠিত হয়। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে নেটলীর 'আর্মি মেডিক্যাল স্কুল' (Army Medical School)-এর পরামর্শক্রমে আরো গবেষণালব্ধ জ্ঞান আরহণ করার জন্য দুইজন মেডিক্যাল অফিসারকে জার্মানিতে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা ভারতে ফিরে এসে সরকারের সানিটারি কমিশনারের বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হন। তাঁরা অবশ্য কলেরা রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। তবে তাঁরা 'কন্টাজিয়ন থিওরি'র (Contagion Theory) বাইরে এই রোগের কারণ খুঁজতে হবে বলে এই সুপরামর্শটি দিয়েছিলেন।[৮]

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করেছিল। একটি ছিল ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জন্ম-মৃত্যু-নিবন্ধীকরণ আইন[৯], অপরটি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের গুটি বসন্ত টিকাকরণ আইন[১০] নামে জ্ঞাত। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রথম কারখানা

আইন চালু হয়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন পাশ হয়। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রচনা করা স্বায়ত্ব শাসনের দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মহামারীর আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে প্রচুর সংখ্যক মানুষ অকালে প্রাণ হারান। ফলত সরকার কর্তৃক এই রোগ দমনের জন্য ঐ বছর প্রফেসর টি. আর. ফ্রাসরের (T. R. Frasor) সভাপতিত্বে 'প্লেগ কমিশন' (Plague Commission) নিয়োগ করা হয়েছিল।[১১] এই কমিশন নিয়োগের এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'মহামারী প্রতিরোধ আইন' (Epidemic Disease Act) চালু করা হয়। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে 'প্লেগ কমিশন' তার প্রতিবেদন দিয়েছিল। এই কমিশনের প্রতিবেদনে এ দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার পুনগর্ঠন ও বিস্তারের সুপারিশ করা হয়েছিল।[১২] এছাড়াও গবেষণার জন্য বীক্ষণাগারের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথাও ছিল। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে 'কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া ব্যুরো' (Central Malaria Bureau) স্থাপিত হয়েছিল। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে গবেষণা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 'ভারতীয় গবেষণা তহবিল কমিটি' গঠিত হয়েছিল। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি আলাদা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছিল। সরকার এই বিভাগকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য নীতি কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছিল।

স্বাস্থ্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল অবশ্যই ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন। এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্য একটি সুবিস্তৃত ও বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করেনি। এই সময় জনস্বাস্থ্য বিষয়টিকে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। স্থানীয় স্ব-সরকারের পোর্ট ফোলিও এবং প্রাদেশিক আইনসভার দায়িত্বে থাকা দেশীয় মন্ত্রীদের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে এই ব্যবস্থাটি গোটা বাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশেও চালু করা হয়।[১৩] তবে কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আইন সরকারের স্বাস্থ্য নীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি।[১৪]

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে জনস্বাস্থ্য বিষয়টিকে সংস্কারমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংবিধানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেন্দ্রের মতো প্রাদেশিক আইন পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়।[১৫] এই আইনের অধীনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তনের সাথে সাথে, প্রদেশের মন্ত্রকগুলিকে স্বাস্থ্য প্রশাসনের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা ও ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আইনের তুলনায় প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ব শাসনের একটি বৃহত্তর ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হয়েছিল। অন্যভাবে লেখা যায় যে, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার, প্রাদেশিক সরকারকে আরও বেশি স্বাধীনতা প্রদান করে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আইনকে পুনঃরুজ্জীবিত করেছিল। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের আইনে বাংলার মন্ত্রীসভাকে স্বাস্থ্য নীতি ও প্রশাসনের সমগ্র দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেটি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আইনের থেকে অনেক বেশি সুবিস্তৃত ছিল। ফলস্বরূপ বাংলার প্রাদেশিক সরকার এবং আইনসভাগুলি বাংলার অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য নীতির বিকাশে এবং বাস্তবায়নে অশৃঙ্খলিত ছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুভাষ চন্দ্র বসু হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে দেশবাসীর রোগের সমস্যার কথা বলেছিলেন। তিনি পুনগর্ঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিলেন।[১৬] ঐ একই বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন' (National Planning Committee) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই কমিটি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের কর্নেল সন্তোষ সিং সোখেয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বা তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্দেশ করার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করেছিল।[১৭] এই কমিটি ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে তার অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল।[১৮]

১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক জোসেফ ভোর-এর নেতৃত্বে ত্রিশ থেকে একত্রিশ জন সদস্য বিশিষ্ট স্বাস্থ্য জরীপ ও উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। যা 'হেলথ সার্ভে অ্যান্ড প্ল্যানিং কমিটি' (Health Survey and Planning Committee) বা 'ভোর কমিটি' (Bhore Committee) নামে পরিচিত। এই কমিটি সারা ভারতবর্ষ সমীক্ষা করে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রতিবেদন পেশ করেছিল।[১৯] এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এটি স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রথম 'ব্লু প্রিন্ট' (Blue Print) বা পরিকল্পনা ছিল। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সমগ্র দেশব্যাপী স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি হয়। ভোর কমিটি জাতির স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ প্রদান করেছিল।[২০] সুপারিশগুলি ছিল এইরকম, - প্রথমত, জনস্বাস্থ্য; দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা পরিষেবা; তৃতীয়ত, পেশাদারী চিকিৎসা; চতুর্থত, চিকিৎসা গবেষণা; পঞ্চমত, আন্তজার্তিক স্বাস্থ্য। আবার এই কমিটি প্রস্তাবিত সুপারিশগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সমস্ত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা দানের সুপারিশ করে। এই কমিটি আরও সুপারিশ করেছিল যে, "no individual should lack access to medical care because of inability to pay for it."[২১] এই বিবরণে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য দেশব্যাপী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলে।[২২] এতে আরও বলা হয় যে, প্রসূতি, শিশু, স্কুল ছাত্র ও কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজন।[২৩] তাছাড়া ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি, কুষ্ঠ ও মানসিক ব্যাধির বিশেষ চিকিৎসার কথা বলা হয়।[২৪] জনস্বাস্থ্যের রূপরেখা হবে সহজ; এবং আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনা, গৃহ নির্মাণ, নিরাপদ ও বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা ও সাধারণভাবে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন।[২৫] ভোর কমিটি উক্ত সুপারিশগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে কিছু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি চালু করার জন্য সরকারকে আবেদন করেছিল।

এটি লক্ষণীয় যে, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন এবং ভোর কমিটির উপ-কমিটি, উভয় কমিটিই তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে, রাষ্ট্রের উচিত জনগণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা। ভোর কমিটির প্রতিবেদন ছিল স্বাধীন ভারতের স্বাস্থ্য নীতির প্রথম 'ব্লু প্রিন্ট', যা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের সম্মেলনে অনুভূত হয়েছিল।[২৬] ভোর কমিটির সুপারিশ অনুসারে, সরকার কর্তৃক ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে সারা দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন শুরু হয়েছিল।[২৭] প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (Five Years Plan) ভোর কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করা হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতবর্ষ জনকল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাই। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের ওপর স্বাস্থ্য পরিষেবার সর্বাঙ্গীণ ভার বত্যয়। তবে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশের অর্থনীতি সেই সময় ছিল সাতিশয় দুর্বল। যাই হোক, পরবর্তীকালে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দেশের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ড. মুদালীয়ারকে নিযুক্ত করা হয়।[২৮] এই কমিটির উল্লেখ করে যে, প্রতি হাজার মানুষের জন্য একটি করে শয্যা সরকারী হাসপাতাল বরাদ্দ করার কথা।[২৯] ভোর কমিটি যেমন চিকিৎসা পরিষেবা সর্বস্তরে বিস্তারের প্রতি

মনোনিবেশ করেছিল; অন্যদিকে মুদালীয়ার কমিটি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সুদৃঢ় ও তার গুণগত মানকে উন্নত করার দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, গুণগত মান বজায় রাখার পরিবর্তে তার সংখ্যা বিস্তারকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটির প্রকৃত রূপ ছিল এরকম "It found that the quality of health services provided by primary health care was inadequate and proposed for better health services networking."[৩০]

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে, ভারতের স্বাস্থ্য বিভাগ মহামারী রোগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করেছিল। এই সময় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন রোগ নির্মূলকরণে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছিল। সেই সময়কালে ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল এবং মৃত্যুর হার কমাতে সক্ষম হয়েছিল। ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত, কুষ্ঠ, ফিলারিয়াল, কলেরা ও যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক পদ্ধতির উপর পৃথকভাবে দেশব্যাপী প্রচারকার্যে জোর দেওয়া হয়েছিল।[৩১] ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার (United states of America) টেকনিক্যাল কো-অপারেশন মিশন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation) প্রযুক্তিগত পরামর্শে ও সহযোগিতায় জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি (National Malaria Eradication Programme, NMEP) গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সময় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ডিক্লোরো ডিফেনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন (Dichlorodiphenyltrichloroethane) সেচন কার্যক্রম শুরু করা হয়। আবার সরকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে, ব্যাসিলি ক্যালমেট গুয়েরিন (Bacillus Calmette Guerin) দিয়ে টিকা দেওয়ার মাধ্যমে যক্ষ্মা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করেছিল। এই সমস্ত কর্মসূচী, মানুষের অপরিহার্য রাসায়নিক এবং টিকার জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O) ও রকফেলার ফাউন্ডেশনের (Rockefeller Foundation) মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশকে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্বাস্থ্য পরিষেবার অবনতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকার ভেবেছিল যে, "the fruits of development are being eaten away by the exponential growth of population." এজন্য পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩২] প্রশাসকরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে পশ্চিমা-শৈলীর নিরাময়মূলক পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দেন। যা ছিল ব্যয়বহুল ও নগরকেন্দ্রিক। উচ্চবিত্তদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল তৈরির জন্য সরকারী তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার অনেকগুলিতে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ছিল।[৩৩]

প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীন ভারত সরকার স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুসৃত পথেই হাঁটতে শুরু করেছিল। যারা সেই জীবাণুকে বিবেচনা করেছিল; রোগের কারণ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শরীর থেকে অপসারণ করা উচিত। এইভাবে রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জীবাণু থেকে শরীরকে রক্ষা করার ব্যাপারটি উপেক্ষা করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭-১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের উদ্যোগ সফল হতে পারেনি। এমনকি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের কোনও বিধিবদ্ধ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ছিল না। বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য খাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। 'আলমা আটা'র ঘোষণার

পর ভারতীয় সরকার “২০০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য”-এর লক্ষ্য গ্রহণ করেছিল। তাই ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সরকার আলমা আটার ঘোষণা (১৯৭৮), ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ’ (Indian Council of Social Science Research) এবং ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ’ (Indian Council of Medical Research)-এর যৌথ সুপারিশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম ‘জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি’ (National Health Policy) প্রণয়ন করেছিল।[৩৪]

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মুখ্য লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে সার্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে “২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য”-এর লক্ষ্য অর্জন করা; যা আলমা আটা ঘোষণার মাধ্যমে সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘোষণায় উল্লিখিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদানগুলি তুলে ধরেছিল।[৩৫] তবে আশির দশকে, সরকার গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দানের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিমাণগত মানের উপর জোর দিয়েছিল, আর সেগুলির গুণমান উন্নত করার পরিবর্তে অনেকগুলি উপ-কেন্দ্র তৈরি করেছিল।[৩৬] জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি উল্লম্ব কর্মসূচির (Vertical Programme) বিরুদ্ধে ছিল, যা উপর থেকে জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শুরুতে পুরানো কর্মসূচির সঙ্গে অনেকগুলি নতুন ‘উল্লম্ব’ কর্মসূচি যেমন, - ‘এইডস নিয়ন্ত্রণ’ (Aids Control) ও ‘সংশোধিত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি’ (Revised Tuberculosis Control Programme; R.T.C.P) ইত্যাদি চালু করেছিল।[৩৭]

১৯৮০-এর দশকের পরবর্তীকালে, ভারতে জনস্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটেনি। রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য নীতির অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়নি; প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবতার মধ্যে অনেক ফারাক ছিল। সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। সরকারের ব্যয় স্বাস্থ্য খাতে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৯০-এর দশকে নব্য-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতি ভারতে তার পথ তৈরি করতে শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ ‘বিশ্ব ব্যাংক’ (World Bank) ও ‘আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল’ (International Monetary Fund)-এর মতো সংস্থাগুলি তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষের নীতি পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল।[৩৮]

বিশ্ব ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফ্যাণ্ড-এর বিষয়সূচি ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারীকরণকে উৎসাহিত করেছিল। ভারতীয় সরকার চিকিৎসার সরঞ্জাম আমদানির জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে ছাড় ও ভর্তুকি দিতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে অনেক বহুজাতিক কোম্পানি ভারতের বাজারে প্রবেশ করেছিল। সরকার ‘আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বীমা কোম্পানি’গুলিকে (International Health Insurance Companies) অনুমতি দিয়েছে।[৩৯] ১৯৮০-এর দশকে সরকার জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ব্যয় সংকোচন করেছিল। উপরন্তু, ১৯৯০-এর দশকে সরকার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ভয়ানকভাবে সংকুচিত করেছিল। ১৯৯০-এর দশক থেকে সরকারি হাসপাতালের পরিবর্তে বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি সরকারি খাতও বেসরকারি খাতের দখলীকৃত হয়েছিল। আমরা জানি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণের মানে মুনাফা ভিত্তিক অত্যাধুনিক নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা। আবার বেসরকারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলনা।[৪০] ঐতিহাসিক অচিন্ত্য কুমার দত্ত লিখেছেন যে, “ভারতের

মতো একটি দরিদ্র দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসে একটি সাংঘাতিক বা গুরুতর ভুল বলে মনে হয়।”[৪১] ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্দশা বর্ণনা করা হয়েছিল। বেসরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে শোষণের প্রক্রিয়ার একটি রূপরেখাও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছিল।[৪২]

২০০২ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির সমালোচনা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিকে বাস্তবসম্মত এবং ন্যায়সঙ্গত বলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ক্ষমতায় এসেছিল। তাই পূর্বের সরকারের নীতির সমালোচনা করা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি যেমন,- বেসরকারী সংস্থাগুলিকে স্বাস্থ্য পরিষেবায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল; ঠিক একইভাবে সরকার ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মাধ্যমে বেসরকারী খাতকে (Private Sector) স্বাগত জানিয়েছে।[৪৩] জনগণমুখী প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। তাই ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে, সরকারের প্রতিবেদনে আবারও দেশের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪]

এটা জানা গেল যে, সরকার নিরাময়মূলক পরিষেবার উপর জোর দিয়েছিল, যা ছিল অ-দরিদ্রদের পক্ষপাতী। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট মানুষের ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ঋণ নিতে হয়েছিল বা সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছিল। গড়ে তাদের মোট বার্ষিক পারিবারিক ব্যয়ের ৫৮ শতাংশ চিকিৎসার জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল; হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লোকের মধ্যে ২৫ শতাংশ মানুষ হাসপাতালের বিল পরিশোধ করে দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে গেছে।[৪৫] সুতরাং এটা বোঝা যায় যে, স্বাস্থ্য পরিষেবা দানে সরকারের ব্যর্থতা মুনাফা কেন্দ্রীক বেসরকারী স্বাস্থ্য সংস্থা (Private Health Sector)-কে বলিষ্ঠ করেছে।

কথা শেষ

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের স্বাস্থ্য নীতি একেবারে মানবতাবোধমূলক বা সেবামূলক কর্মের দ্বারা সংগঠিত হয়নি। এদের গৃহীত স্বাস্থ্য নীতি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোকে প্রবলভাবে শক্তপোক্ত করার প্রেক্ষিতেই পরিচালিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসন স্রেফ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিসরেই সীমায়িত ছিলনা, বরং এটি সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে পুরোপুরি চেতনার পরাধীনতায় উপনীত হয়। এই পর্বে পাশ্চাত্য চিকিৎসার সুবিধা আপামোর জনসাধারণের নিকট পৌঁছায়নি। এর একটি অনিবার্য কারণ ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিস্তার ও প্রচলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে কর্মরত ব্রিটিশ জনগণের স্বাস্থ্যকে নিরাপদ রাখা। ঔপনিবেশিক সরকার বিশেষত সৈনিকদের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে অসুস্থতা ও মৃত্যুহার লক্ষ্য করছিল। তা মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই এদেশে স্বাস্থ্য নীতি আনায়ন করেছিল। একথা স্মতব্য যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কখনোই ভারতবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য বিধি প্রবর্তন করেনি। তবে একথাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না যে, ঔপনিবেশিক সরকার দেশীয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যে যৎসামান্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই নির্মাণ করেছিল।

স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর ফলে নানান

ধরণের মারণ রোগের নিয়ন্ত্রণ করা বা বশীভূত করা সম্ভব হয়েছে। এই সময় সরকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তবুও স্বাস্থ্যের মতো অপরিহার্য একটি সামাজিক সমস্যার সুস্থ সমাধান সম্ভব হয়নি। সরকার স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়নি। সরকারী স্বাস্থ্য নীতি ও সেবার বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখলে সহজেই অবগত হওয়া যায় যে, স্বাধীনতার চুয়াত্তর বছর পরেও এখনও ভারতের গ্রামাঞ্চলের প্রচুর সংখ্যক সাধারণ দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী ও উপজাতি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত বা অবহেলিত।

তথ্যসূত্র :

১. দীপেশ চক্রবর্তী, '*শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারী ও জনসংস্কৃতি*', গৌতম ভদ্র সম্পাদিত নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রতিভাস, ১৯৯৮, পৃ. ১৬৫ – ১৬৬.

২. Biswamoy Pati and Mark Harrison, *Medicine and empire: Perspectives on Colonial India*, Orient Longman, New Delhi, 2001, p. 23.

৩. অরবিন্দ সামন্ত, *রোগ রোগী রাষ্ট্র: উনিশ শতকের বাংলা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৮.

৪. Imrana Qadeer, *Public Health in India: Critical Reflection*, Danish Book, Delhi, 2011, pp. 82-83.

৫. Nataraj Malakar, *Historicizing People's Health Movement in West Bengal (1978 - 2018)*, An Unpublished Ph.D. Thesis, Department of History, University of Kalyani, Kalyani (Nadia, West Bengal), 2023, p. 26.

৬. Royal Commission, *Royal Commission on the Sanitary State of the Army in India: Report of the Commissioners: Vol. 1*, Printed by George Edward Eyre and Willian Spottiswoode, London, 1863, p. XXXVIII.

৭. Ibid., p. 2.

৮. Deepak Kumar, *Science Policy of the Raj*, D. Phil thesis, University of Delhi, 1985, p. 185.

৯. Government of Bengal, Public Health Department, Vital Statistics, Government Press, Calcutta, 1932, p. 13.

১০. Government of Bengal, Public Health Department, Small Pox Bengal Vaccination Manual, First Edition, Calcutta District Board Areas in Bengali.

১১. Muhammad Umair Mushtag, '*Public Health in British India: A brief Account of the History of Medical Service and Disease Prevention in Colonial India*', Indian Journal of Community Medicine, Vol. 34, No. 1, Jan 2009, p. 9.

১২. George Lamb, *The etiology and epidemiology of plague: A summary of the work of the Plague Commission; issued under the authority of the Government of India by the Sanitary Commissioner with the Government of India*, Simla. Calcutta: Superintendent Government Printing India, 1908, p. 6.

১৩. Kabita Ray, *History of Public Health: Colonial Bengal (1921 - 1947)*, K. P. Bagchi and Co., Kolkata, 1998, p. 1.

১৪. Moumita Chakraborti, '*Tracing Medicine and Politics in Colonial Bengal, c. 1920- c.1940*', Journal of the Asiatic Society, Vol. LX, No. 2, 2018, Kolkata, pp. 49-68.

১৫. Kabita Ray, op. cit., p. 1.
১৬. 'Presidential address of the 51st session of the Indian National Congress at Haripura February 19, 1938,' in Selected Speech of Subhash Chandra Bose, Delhi: Publication Division, Government of India, 1962, pp. 72- 94.
১৭. অমৃতা বাগচী, *'স্বাধীনতা পরবর্তী কলকাতার স্বাস্থ্য পরিষেবাঃ একটি পর্যালোচনা'*, ইতিহাস অনুসন্ধান – ২২, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, জানুয়ারী ২০০৮, পৃ. ৯৩১.
১৮. K.T. Shah (ed.), *Report of Sub-committee on National Health (Sokhey Committee)*, National Planning Committee, Vora & Co, Bombay, 1948.
১৯. Laura Carballido, *'The Bhore Committee (1943 - 1946): Health and Colonialism'*, Darshikha: Journal of Integrative and Innovative Humanities, Vol. 2, Issue 2, November 2022, p. 49.
২০. K. Park, *Park's Textbook of Preventive and Social Medicine*, Banarsidas Bhanot, Jabalpur (Pune), 1970, p. 679.
২১. Joseph Bhore, *Report of the Health Survey and Development Committee (Bhore Committee)*, Volume I to IV, Government of India, Manager Publication, Delhi, 1946, p. 10.
২২. Joseph Bhore, *Report of the Health Survey and Development Committee: Vol. II*, The Goverment of India Press, Calcutta, 1946, pp. 17 – 22.
২৩. Ibid., pp. 35 – 37.
২৪. Ibid., pp. 137 – 203.
২৫. Ibid., pp. 231 – 271.
২৬. Alok Mukhopadhyay (ed.), *Report of the Independent Commission on Health in India*, Voluntary Health Association of India, New Delhi, 1997, p. 36.
২৭. Meera Chatterjee, *Implementing Health Policy*, Manohar, New Delhi, 1988, p. 7.
২৮. Swati Shastri, '*Public Health Policy during British India: Committees introduce by the Government*', International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 3, Issue 3, March 2014, p. 10.
২৯. L. Mudaliar, *Report of the Health Survey and Plaining committee*, Ministry of Health, Government of India, 1959.
৩০. Government of India, *Health Survey and Planning Committee (Mudaliar Committee)*, New Delhi, 1961.
৩১. Ravi Duggal, *Historical Review of Health Policy Making, in Review of Healthcare In India*, Leena V Gangolli, Ravi Duggal and Abhay Shukla edited Centre for Enquiry into Health and Allied Themes, 2005, p. 28.
৩২. Debabar Banerji, *'The People and Health Service Development in India: A Brief Overview'*, International Journal of Health Services, Volume 34, No 1, 2004, pp. 123–142.
৩৩. Debabar Banerji, *'The battle for total health care'*, India International Centre Quarterly, Vol. 14, No. 3, Forty Years, 1987, pp. 119-128.
৩৪. Health for All: an Alternative strategy, report of study group set up by ICMR & ICSSR, Indian Institute of Education, 1981.

৩৫. Government of India, *National Health Policy*, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, 1983.
৩৬. Alok Mukhopadhyay (ed.), *Report of the Independent Commission on Health in India*, op. cit., pp. 36-43.
৩৭. Ibid.
৩৮. National Coordination Committee of Jan Swasthya Sabha, *What Globalization does to People's Health!*, 2006, Delhi, pp. 12- 18.
৩৯. Rama V. Baru, *Privatisation of Health Services: A South Asian Perspective*, EPW, Vol. 38, No. 42, 18-24 October 2003, pp. 4433-4437.
৪০. National Coordination Committee of Jan Swasthya Sabha,*Health System in India: Crisis & Alternatives,* Delhi, 2006, pp. 19- 28.
৪১. Achintya Kumar Dutta, *Trauma in Public Health: Tuberculosis in Twentieth-century India*, K P Bagchi & Company, Kolkata, 2018, pp. 87-88.
৪২. Government of India, *National Health Policy-2002*, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, 2003.
৪৩. Biswanath Pariya, *'Jatiya Swasthyaniti 2002: Besarkarikaraner Joralo Padakshep'*, *Swasthya Bikshan*, January-June 2003, Kolkata, pp. 38-47.
৪৪. Government of India, *Report of the National Commission on Macroeconomics and Health*, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, 2005.
৪৫. Government of India, *National Rural Health Mission (2005- 2012), Mission document,* Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, 2012.

আখ্যানের বিষণ্নতাবোধ : প্রেক্ষিত মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের নারী

বনানী টিকাদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারাংশ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জগতে একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক তথা মানবধিকার কর্মী হলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি তাঁর সাহিত্যে অলীক কোনও কল্পকাহিনি রচনা করেননি। তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গীয় মানুষদের, বিশেষ করে নিম্নবর্গীয়; নিম্নবর্ণীয় নারীদের জীবনযাপনের বাস্তব ঘটনাই তাঁর সাহিত্যের মূল বিষয় করেছেন। তাঁর রচিত দুটি নিম্নবর্গীয় নারীকেন্দ্রিক ছোটোগল্প 'শাস্তি' ও 'বিশালাক্ষীর ঘর' এই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।
সূচক শব্দ : নিম্নবর্গ, নিম্নবর্গের নারী, বেশ্যাবৃত্তির জীবনযাপন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ।

মূল আলোচনা

শাসকের চরিত্রের কথা মাথায় রেখে প্রথমেই বলা যায়, সমাজে সকলবর্গের মানুষের অত্যাচারের ইতিহাস খোঁজ করলে খুব বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে না, বিশেষ করে এই অত্যাচার নিম্নবর্গ-নিম্নবর্ণের এবং বিশেষত তা নারীদের ক্ষেত্রে প্রকট ও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সব সময় সোচ্চার হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন। এর ফলে অত্যাচারিতের নিজস্ব যে লড়াই, তা অনেক বেশি সংগঠিত রূপ পেয়েছে।

আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই, নিম্নবর্গ কী তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুশীলন করা হল। সামাজিক ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা। এই নতুন ইতিহাস চর্চাকে ঐতিহাসিক ড. রণজিৎ গুহ ১৯৮২ সালে ভারতবর্ষে এই বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন। প্রচলিত ইতিহাস চর্চায় সমাজের উচ্চবর্গের ভূমিকার ওপর আরোপ করা হয় কিন্তু আধুনিক সময়ে ভারতের একদল সামাজিক ইতিহাসবিদ যেমন, ড. রণজিৎ গুহ, ড. জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, দীপেশ চক্রবর্তী, ড. গৌতম ভদ্র প্রমুখ ইতিহাসের আলোচনায় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গ অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, শহুরে জনতা, আদিবাসী এবং সমাজের নিম্নস্তরের নামহীন-গোত্রহীন মানুষজনদের সক্রিয়তা, তাদের তৎপরতা এবং তাদের বক্তব্যকে ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরাকে নিম্নবর্গের ইতিহাস বা Subaltern studies বলে। Subaltern studies-এর অন্যতম পথিকৃৎ ড. রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাস শীর্ষক বক্তৃতায় উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ— এই দুই শ্রেণির লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন— "উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু'ভাগে ভাগ করা যায়— বিদেশী ও দেশী। বিদেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু'ধরনের— সরকারী ও বেসরকারী। সরকারী বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই; আর বেসরকারী বলতে গণ্য বিদেশীদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি, চা-বাগান, কফি ক্ষেত বা ঐ জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লান্টেশান প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারী, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি। দেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও

একটা মোটা ভাগ ছিল সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের পার্থক্য অনুযায়ী। সর্বভারতীয়দের মধ্যে গণ্য বৃহত্তম সামন্ত প্রভুরা, শিল্পে ও বাণিজ্যে লিপ্ত সবচেয়ে শক্তিমান বুর্জোয়ারা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রের অন্যত্র যারা ছিল সবচেয়ে উচ্চপদের অধিকারী।"[১] উক্ত উল্লেখ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী ড. রণজিৎ গুহ আরও বলেছেন— "ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরীব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও প্রায় গরীব মাঝারি চাষী নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য।"[২]

এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) একজন সমাজকর্মী হিসেবে যেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন— তাদের হয়ে কথা বলেছেন। পাশাপাশি সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ভাবনা, প্রকরণচিন্তা এবং চরিত্রচিত্রণে তৎকালীন সময় এবং সমাজ-বাস্তবতার চিত্রকে তুলে ধরেছেন। এই সমাজ-বাস্তবতার মধ্য দিয়ে উপজাতি ও অস্পৃশ্য নারীরা যে প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাতে অকথ্য নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার, তাদের কথা উঠে এসেছে তাঁর রচিত ছোটোগল্পে। Mulk Raj Anand মহাশ্বেতা দেবী প্রসঙ্গে বলেছেন— "She is the most important writer of India in the last 50 years Mahasweta goes beyond me right in to the tribal areas."[৩] এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ আরও বলেছেন— "ভব্য সমাজের চালচলনের মধ্যে প্রত্যাশার একটি গণ্ডি তৈরি করে নিয়েছি আমরা অনেকদিন ধরে, মাপা একটা হিসেবের মধ্যে আমাদের স্তিমিত চলাফেরা। মহাশ্বেতাদি পারেন সেই হিসেবটাকে উল্টে দিতে, গণ্ডিটাকে উড়িয়ে দিতে চাওয়াটাই হলো মহাশ্বেতাদির ব্যক্তিজীবনের আর রচনাজীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ।"[৪]

সাহিত্য সমাজ-মানসের দর্পণ। যেকোনও কালের শিল্প-সাহিত্যে সেই কালের সমাজে কখনও প্রকট আবার কখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। এই ট্র্যাডিশন সেই চর্যাপদের যুগ থেকেই চলে আসছে। বিভিন্ন যুগে মানুষের মন ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় সমাজের মানস গঠন। সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার অন্বেষণ করতে গিয়ে উঠে আসে সমাজের মানস সংগঠন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ বিবর্তন। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর মতো একজন সমাজসচেতন সাহিত্যিক শুধুমাত্র এই কথাগুলিই বলেন না; বরং সেইসব সমাজের প্রান্তিক, অন্ত্যজ মানুষদের কথাই তুলে ধরেন— যাঁরা চিরকাল ব্রাত্য থেকেছেন বহমান ইতিহাসের ধারায়। এ প্রসঙ্গে 'অগ্নিগর্ভ'র ভূমিকায় তাঁর অবস্থান নির্দেশ করেছেন তিনি নিজেই— "... শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র স্পষ্টতর হচ্ছে। ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে, অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।"[৫] এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর রচিত নিম্নবর্গীয় নারীকেন্দ্রিক দু'টি ছোটোগল্প এ'প্রবন্ধের মূল বিষয়। গল্প দুটি হল, 'শাস্তি' ও 'বিশালাক্ষীর ঘর'।

মহাশ্বেতা দেবীর রচিত নিম্নবর্গীয় নারীকেন্দ্রিক ছোটোগল্প 'শাস্তি'। গল্পটির প্রথম প্রকাশকাল ভারতবর্ষ, ৪৮ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৭ (১৯৬০ খ্রি.)। বর্তমানে গল্পটি মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র ১ম খণ্ডের অন্তর্গত। গল্পের মূল চরিত্রে দেখানো হয়েছে চারুলতা নামক এক নিম্নবর্গীয় কইজুড়ির বিখ্যাত ঘোষাল পরিবারের এইট ক্লাস পাশ করা নারীকে। যে ভারতভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু স্রোতে খড়কুটোর মতও ভেসে এসেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর রচিত শাস্তি গল্পটিতে চারুলতার জীবনকথা ও এক সাধারণ গ্রাম্য সহজ-সরল নারী থেকে একজন পতিতা নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার হৃদয়বিদারক কাহিনিই গল্পকার তাঁর গল্পে বর্ণনা করেছেন। গল্পে আমরা দেখতে পাই সমাজের এক শ্রেণির দালালেরা সহজ-সরল নারীদের বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে নতুবা একপ্রকার জোর করেই বেশ্যাবৃত্তির জীবনযাপন করতে, তাকে সম্পূর্ণরূপে পতিতা হয়ে উঠতে বাধ্য করে। পরিবারের অস্বচ্ছলতায় দরিদ্র ঘরের মেয়েরা আত্মসম্মান টিকিয়ে রেখে সৎ ভাবে উপার্জন করে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে কিন্তু সমাজের শিক্ষিত ক্ষমতাবান পুরুষেরা তার সৎ ভাবে বেঁচে থাকার প্রয়াসকে ধ্বংস করে দেয় এবং জীবনধারণের জন্য, বেঁচে থাকার তাগিদে বেশ্যাবৃত্তির জীবন বেছে নিতে বাধ্য করে। আমাদের আলোচ্য শাস্তি গল্পে লেখিকা এমনই এক নারীর চিত্র অঙ্কন করে পাঠকের দরবারে তুলে ধরেছেন।

পুঁথিগত বিদ্যায় ক্লাস এইট পাস করা, সুন্দর হাতের লেখা, সুন্দর হাতের কাজ জানা উদ্বাস্তু স্রোতে ভেসে আসা নিম্নবর্গের নারী চারুলতা। তার দূরসম্পর্কের আত্মীয় অমর নামক এক ভদ্রলোক। যে এখন বড়লোক, সরকারের গেজেট উচ্চপদস্ত অফিসার। চারুলতা অমরের কাছে গিয়েছিল সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তার যোগ্য উপযুক্ত একটি ছোটোখাটো চাকরীর আশায় কিন্তু অমর তাকে নানা ভাবে নানা কথা বলে এই বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যায়— "শোন, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নামটা লেখাও। ওদের কাছে নানা ধরনের কাজকর্মের খোঁজ থাকে। আমিও খোঁজে থাকব বইকি! তবে কি জানো, ম্যাট্রিকটা অন্তত আজকাল সকলেই চায়। যে কোনো কাজই হোক না কেন, এমনকি কারখানার কাজে, ম্রাট্রিক পাস না করলে..."[৬]

অন্যদিকে চারুলতার মা অমরের কাছে অভিযোগ জানায়, ওষুধের দোকানে শিশিতে ওষুধ ভরানোর কাজে চারুলতা আর যায় না। আর এই জন্যই চারুলতার মায়ের ক্ষোভ। আসলে চারুলতা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, সে যেখানে কাজ করছে সেখানে কোনও মেয়েই নিজের সম্মান-শুচিতা বজায় রাখতে পারবে না। তার আশপাশে অবস্থিত মানুষেরা তাকে পারতে দেবে না। চারুলতার মায়ের মতও চারুলতারও একান্ত ইচ্ছা অমর যদি তাকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার মতও কোনও কাজ জুটিয়ে দিতে পারে কিন্তু বলাবাহুল্য অমর তাদের কোনও কথাই সেভাবে গুরুত্ব দেয় না।

আর্থিক অনটনের কারণে চারুলতা একসময় ওষুধের দোকানে আবার কাজে যোগ দিলেও অন্য মেয়েদের মতও তার অবস্থার কোনও উন্নতি হয়না। কারণ, দোকানের অন্যান্য মেয়েরা অর্থের বিনিময়ে নিজের দেহকে ব্যবহার করে। ফলত, তারা ভালো খায়, ভালো পোশাক পরিধান করে। তাদের অবস্থার উন্নতি হয় কিন্তু চারুলতা নিজের সততা ও পবিত্রতা বজায় রেখে ওষুধের দোকানে কাজ করে তাই সে তার সামান্য মাইনেতে দারিদ্রতা দূর করতে পারে না।

পরিবারের অভাব-অনটন এতটাই তীব্র হয় যে, চারুলতা আর তার শুচিতা বজায় রেখে কাজ করতে পারে না। সে বাধ্য হয় অসৎ পথে রোজগার করতে। শুধুমাত্র নিজের জীবনধারণ তো নয় পরিবারকে বাঁচানোর দায়িত্ব যখন কোনও মানুষের উপর এসে পড়ে তখন সে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। চারুলতা সৎভাবে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করার জন্য কোনও উপযুক্ত কাজ না পেয়ে অবশেষে দেহব্যাবসা শুরু করে। হোটেলে সে বড়লোক খদ্দেরদের কাছে নিজের দেহ বিক্রি করে। সেখানে ঘণ্টা

অনুযায়ী চুক্তি হয়। একশো, দেড়শো, দু'শো যা পায় তাই সে উপার্জন করে। মাঝে মধ্যে যখন পুলিশ এসে রেইট করে তখন কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে আবার নিজের কাজে ফিরে যায়। নারীকে অপমানজনক কোনও কাজই চারুলতা করতে চায়নি কিন্তু তার অর্থনৈতিক দূরাবস্থা তাকে এ পথে নামিয়েছে।

আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেখানে একাংশ মানুষ আছেন যাদের কাছে প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতা দুইই বিদ্যমান। যার দ্বারা তারা ইচ্ছা করলেই কিছু অসহায়, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের দূরাবস্থা দূর করতেই পারে কিন্তু তারা সেটা করে না। সে কারণেই, সমাজে বসবাসকারী মানুষদের যখন সম্মানের যোগ্য কোনও কাজ জোটে না, তখন তারা বেঁচে থাকার তাগিদে অসৎ কর্ম করতেও বাধ্য হয়। সেদিক থেকে সমাজে অবস্থিত নিম্নবর্গীয় মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঘটে একই ঘটনা। তারাও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পেয়েই বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তির জীবন শুরু করে। অমর চাইলেই চারুলতার দূরাবস্থা দূর করতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি। সে এখানে একজন স্বার্থপরের মতও কাজ করেছে। সে শুধু দূর থেকেই চারুলতাদের পরিবারের প্রতি মিথ্যে সহানুভূতি দেখিয়েছে, চারুলতার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কিন্তু তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার কোনও চেষ্টাই সে করেনি।

অমরের এখন প্রচুর অবসর, অর্থের অভাব নেই, ঘরের দায়িত্ব এখন সবই তার স্ত্রী সামলায়। এই অবসরে সে এখন মাঝে মাঝেই বন্ধুদের সঙ্গে বারে যায়। সেখানে গিয়ে মদ্যপান করে। অমর একদিন বারে তার বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপানরত, তখন সেখানে পুলিশ এসে রেইট মারে ও উপরের তলায় দেহব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিনজন মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আর সেই তিনজন মেয়ের মধ্যে চারুলতা একজন। এমতাবস্থায় বারে চারুলতার সঙ্গে অমরের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে। চারুলতাও সুযোগ বুঝে অমরকে শাস্তি স্বরূপ বারে থাকা অন্যান্য মানুষ ও পুলিশের সামনেই ব্যঙ্গাচ্ছলে চরম অপমান করে। সকলের সামনেই তার সঙ্গে অমরের কী সম্পর্ক? কী ভাবে চেনা পরিচয়? তা তুলে ধরে অমরকে প্রকাশ্যে চারুলতা অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে বলে— "চিনি না? চিনি বই কি! কী অমরবাবু তোমাকে চিনি, না চিনি না? সেদিন যদি চাকরিটা দিতে। লাইনে নামতাম কি?"[৭]

এক পতিতা নারীর সঙ্গে অমরের চেনা পরিচয়, এই তথ্য সামনে আসতেই অমর লজ্জায়, অপমানে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। অমরকে সকলের সামনে অপমান করে চারুলতা দরিদ্র মানুষদের প্রতি সহানুভূতিহীন ক্ষমতাবান বড়লোকদের হৃদয়হীনতাকে চরম ব্যঙ্গ করেছে। তথাকথিত ভদ্রসমাজের টাকাওয়ালা ক্ষমতাবান ভদ্রলোকেরা গোপনে লুকিয়ে পতিতা নারীদের দেহব্যবসার খরিদ্দার হলেও প্রকাশ্যে এরা কখনই এসব নারীদের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখে না। বারে চারুলতা সকলের সামনে অমরকে বুঝিয়ে দিল যে অমর একজন অমানবিক স্বার্থপর মানুষ। সমাজে মেয়েরা অমরের মতও মানুষদের কাছ থেকে নূন্যতম সাহায্য পায় না জন্যই চারুলতার মতও নিম্নবর্গীয় সহজ-সরল সৎ মনোভাবসম্পন্ন নারীদের বাধ্য হয়ে অসৎ পথে পা বাড়াতে হয়, অসৎ কর্ম করে নিজের তথা পরিবারের জীবনধারণের কাণ্ডারী হয়ে উঠতে হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর রচিত 'বিশালাক্ষীর ঘর' গল্পটির প্রথম প্রকাশ 'কথাসাহিত্য' কার্তিক ১৩৭৭/১৯৭০ খ্রি.। 'বিশালাক্ষীর ঘর' গল্পটির মূল চরিত্রে রয়েছে বিশালাক্ষী পণ্ডিত, ওরফে বিশু নামক এক নিম্নবর্গীয় নারী। বাবা ঈশ্বর পরাণচন্দ্র পণ্ডিত। জ্যাঠা হারানচন্দ্র পণ্ডিত। বিশুর ছোটোবেলাটা মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি চেপে কেটেছে। কারণ ওর জ্যাঠা ও বাবা উঠতি

জমিদারকে সব জমিজমা নেশার ঘোরে বিক্রি করে তার বেতো ঘোড়া আর ভাঙা গাড়ি কিনে এনেছিল। বড় অহংকার বেড়েছিল তার বাপ জ্যাঠার— "জাতের অহঙ্কার, হাতে কাঁচা টাকা তার অহঙ্কার,... তারপর একসঙ্গে চারজনকেই ওরা হরিধ্বনি গঙ্গাজল দিয়ে স্বর্গে পাঠাল। বিশুকে মা নিলেন না।"[৮]

বিশালাক্ষী ছোটো বেলা থেকেই তার দিদিমার কাছে মানুষ। এর পর নয় বছরের বিশু স্বামীর ঘর করতে গেল। বিশুর বর কখনও বাড়ি থাকত, কখনও থাকত না। টাকা পয়সা বিশু চোখে দেখেনি কিন্তু ধানচালের কষ্ট তেমন ছিল না। ক্রমে ধানচালের কষ্ট হল। শোনা গেল বিশুর বর ঠাকুর-ঠাকুর করে ধর্মপাগল হয়েছে— "রাজপুরে ওর শ্বশুরের একখানা খড়ের ঘর ছিল। কিন্তু স্বামী পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়তে দেওররা মা-ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।"[৯] তখন থেকে বিশুর বড় কষ্ট।

বিশুর গ্রামের মানুষ উপেন বিশুর নিজের জমির কথা শুনিয়ে যায়। একথা শুনে বিশু আশ্চর্য হয়ে ছেলে ময়েশকে নিয়ে উপেন এর কাছে গিয়ে যখন ব্যাপারটা খোলসা করে জানতে চায়, তখন উপেন বলে— "তোমার মায়ের বাপ-জ্যাঠার এখানে শেতলাথান ছিল। আর ছিল জমি।... তার শালিদের এনে এই মন্দিরে বসায়।"[১০] এসব কথা শুনে বিশু তাজ্জব বনে যায় ও মনে মনে তার বাপ-জ্যাঠাদের ধন্যবাদ জানাতে থাকে যে তার জন্য বসবাস করবার মতো জায়গা রেখে গেছে।

এরপর বিশু পাড়ার কাউন্সিলার রাখাল দত্ত এর কাছে যায়। বিশু কাউন্সিলর বাবুর কাছে নিজের একটি থাকার ঘর দাবি করে এবং বিশুর উপর কাউন্সিলর বাবুর করুণা হয়। তিনি বলেন, ঘর হবে, পাকা দালান ঘর। নিজের টেপাকল হবে। আমি দেব সব। ঘর তুলবার বাঁশ, খড়, ভিতের ইট, মিস্ত্রি মজুর সব! নিজের ঘর হবে এটা ভেবেই বিশুর মনে হচ্ছিল— "নিজের ঘর থাকা-না-থাকার সঙ্গে জাতে ওঠার কথা আছে তো।... কিন্তু সেই যে দিদিমা বলত, পর-ভেতো হওয়া ভাল, পরঘোরো হতে নেই, সে কথা তো ও ভোলেনি।"[১১]

ভাদ্রমাসে ছাতা মনসার ডাল ভেঙে বাস্তু পুজো করে বিশু। আগের রাতে রেঁধে পাঁচ রকম ভেজে পরের দিন ছেলে ময়েশকে খেতে দেয়। যাকে বলে রান্না পুজো। বিশুর বিশ্বাস বাস্তু পুজো করতে করতে যদি বিশুর নিজের একটা ঘর হয়। আর ঘর হলেই জাতে উঠবে বিশু। তারপর রাখাল দত্তের দয়ায় বিশুর নিজের একটা ঘর হল আর সেই ঘরে ওঠবার জন্য বিশু বাস্তু পুজোর জোগাড় করে। ভরদুপুরে পুকুর পাড়ে গিয়ে বিছানা মাদুর সব পরিস্কার করে নিয়ে আসে। এরপর বিশু উপেনের সঙ্গে নতুন ঘরে গিয়ে ওঠে। এসব দেখে মনিব গিন্নি বলে ওঠে— "লোকবল নেই, অর্থবল নেই, পারবে বাছা? ছেলে তো সুপুত্তুর! মা মরলে চেয়ে দেখবে না। ঘর যে ছাড়ছ বিশু, এ ঘর এখনি কিন্তু ভাড়া বসে যাবে।"[১২]

বিশুর কপালে নিজের ঘরে বাস করার সুখ সইল না। বিশুকে চক্রান্ত করে ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হল। ময়েশকে মিথ্যে মামলায় জেলে পাঠিয়ে, বিশুর ঘরে আগুন লাগিয়ে বিশুকে ঘর থেকে উচ্ছেদ করে দিল কাউন্সিলর রাখাল দত্ত। এরপর বিশুর স্থান হয় পুরনো মনিববাড়ির গোয়াল ঘরে। মনিববাড়ির গোয়ালঘরে শুয়ে বিশু গোরুটার নিঃশ্বাস শোনে আর ভাবে— "গোরু মরলে মুচি চামড়া নেয়, শিং জোড়া বিক্রি হয়।... ময়েশ তিনমাস পর জেল থেকে ফিরে এলে বিশু ভাবে ময়েশ তাকে ক্ষমা ঘেন্না করে আশ্রয় দেবে।"[১৩]

এই ভরসাতেই বিশু গিন্নিমার নাতি জটেশ্বরকে নিয়ে জেলে ময়েশের সঙ্গে দেখা করতে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারে আগের দিনই ময়েশ খালাস হয়ে গেছে। এসব কথা শুনে

তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিশু ট্রাম থেকে নেমে জটেশ্বরকে বলে, তুই যা বাবা আমি এট্টু মায়ের মন্দির হয়ে আসি। বিশু সেই যে নামলো আর সে ফিরে গেল না। মন্দির চত্বরে গিয়ে বিশু দেখে চারিদিকে ভিখিরির দল। এমন সময় একটি মেয়ে বিশুকে দেখে বলে— "নতুন বুঝি? তা এট্টা নারকেল মালা, না হোক অ্যালুমিনির বাটি আনবে তো?... তুমি আমাদের কাছে থাকো বাছা। তোমার মুখখানা বেশ ভদ্দর-ভদ্দর, কাঁদ-কাঁদ। দেখে বাবুদের মায়া হবে। চা খাবে?"[১৪]

এসব শুনে বিশুর এই প্রথম মনে হল কেউ বিশুকে আদর করে ডাকল। সমাজে নিতে চাইল— "বিশুর চোখ জলে ভেসে গেল। কত বড়ো সমাজের মানুষ সে এখন!... ভিখিরির জাত মারে কে?"[১৫] উক্ত গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই বিশালাক্ষী ওরফে বিশুর জাতে ওঠবার লোভ ও নিজের ঘর হবার লোভই তাকে ভিখিরিদের সমাজে নামিয়ে দেয়। আসলে এই লোভ বিশুর নয়। সমাজে অবস্থিত ক্ষমতাবান মানুষদের লোভ। আর তাদের কাছ থেকেই অসহায় বিশুকে প্রতারিত হতে হয় এবং বিশুর শেষ স্থান হয় বাটি হাতে মন্দির চত্বরে।

মহাশ্বেতা দেবী নিম্নবর্গীয়-নিম্নবর্ণীয় নারীদের কথা, পুরুষের কথা, সর্বোপরি মানুষের কথা তাঁর সাহিত্যে ব্যক্ত করেছেন। তিনি এই সকল অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষজনদের জীবনযাপনের বাস্তবে মোড়া দিকগুলিকেই, প্রতিনিয়ত অত্যাচারিতের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার এবং তাদের রুখে দাঁড়াবার ঘটনাগুলিকেই তাঁর প্রতিবাদী কলমের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় বাংলা সাহিত্যের দরবারে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিবনারায়ন রায় মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে বলেছেন— "বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষদের জন্য তিনি যেভাবে নিরলস সংগ্রাম করে আসছেন তাঁর জন্যই তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করি।... যে সব শিক্ষিত তরুন তরুনীরা অগ্রজদের কথা বার্তা, আচার ব্যবহার দেখে হতোদ্যম ও অভিসন্তপ্ত মহাশ্বেতার অভিক মানবতা, তেজিক করুণা, জেদী বিবেকিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তারা হয়তো নিজেদের নির্বেদ কাটিয়ে উঠতে পারবেন।"[১৬]

মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'কলম'কে। তাই তো সম্পাদক অজয় গুপ্ত মহাশয় তাঁর 'মহাশ্বেতা দেবীর কাজের জগৎ লেখার জগৎ' প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে লিখেছেন— "প্রতিটি লেখার প্রতি ওঁর এই ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করে। আসলে লেখাটাই হচ্ছে মহাশ্বেতা দেবী। উনি খুব একটা বক্তৃতা-টক্তৃতা দেন না, সভা-সমিতিতে বড় কিছু বলেন না— ওঁর যা কিছু সব লেখার মাধ্যমে।"[১৭]

তথ্যসূত্র:

১. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩২
২. ঐ, পৃ. ৩৩
৩. শিল্প ও সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-২০০৯, পৃ. ১০৯
৪. শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী: *গণ্ডিভাঙা মানুষ*, সানন্দা, কলকাতা, জানুয়ারি-১৯৯৭, পৃ. ৭৫
৫. অজয় গুপ্ত (সম্পা), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* ৮ম খণ্ড, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩২৫
৬. অজয় গুপ্ত (সম্পা) *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৫২
৭. ঐ, পৃ. ৩৫৮
৮. অজয় গুপ্ত (সম্পা) *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৭৭
৯. ঐ, পৃ. ৭৮

১০. ঐ, পৃ. ৮০
১১. ঐ, পৃ. ৮৩
১২. ঐ, পৃ. ৮৫
১৩. ঐ, পৃ. ৮৭
১৪. ঐ, পৃ. ৮৮
১৫. ঐ, পৃ. ৮৮
১৬. শিল্প ও সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-২০০৯, পৃ. ১০৯
১৭. *গল্পসরণি, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা,* ষোড়শ বর্ষ: বার্ষিক সংকলন: ১৪১৮, পৃ. ১২৭।

জলসাঘর : সামন্ততন্ত্রের মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন

মৌসুমী চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রানী ধন্যাকুমারী কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'জলসাঘর' গল্পটি এক নিঃশেষিত জমিদারের স্মৃতিভারে পড়ে থাকার কাহিনি। গল্পের আবহ থেকে মনে হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ঘটনা এটি। ব্রিটিশ আধিপত্যে ঔপনিবেশিকতা-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে ধনগর্বিত যে নাগরিক শ্রেণির উদ্ভব হয় তাদের সঙ্গে সংঘাতে সামন্ততন্ত্রকে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে। গৌরব লুপ্ত, তবু তার ছটা মোহ বিস্তার করে আছে। ফলে সমস্ত গল্পটি একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হয়। একদা পরাক্রান্ত জমিদারদের উত্তরাধিকারী বংশধরেরা যেন একটা অস্তিত্বরক্ষার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন- এই পটভূমিতে বিন্যস্ত 'জলসাঘরে'র কাহিনি। জমিদার রায় বংশের ক্ষয়িষ্ণু দশা ও বিশ্বম্ভর রায়ের তিরোধানে সে বংশের ইতি। 'জলসাঘর' ও 'রায়বাড়ি'- দুটি ভিন্ন গল্প হলেও লেখক দুটি অংশের মধ্যে যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করেছেন।
সূচক শব্দ: সামন্ততন্ত্র, বণিকতন্ত্র, বুর্জোয়া, জলসাঘর, বাঈজী, চাবুক।

মূল আলোচনা:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যাঁর সুদক্ষ হাতের লেখনীতে বাংলা সাহিত্য হয়েছে ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ। বিশেষ করে তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো যেন এক একটি রত্ন। যা স্ব স্ব মহিমায় বাংলা সাহিত্যাকাশে দেদীপ্যমান। সমকালীন জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ধারাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তারাশঙ্কর। তিনি নিজে ছিলেন জমিদার বাড়ির সন্তান। তাঁর আমলে তাঁদের জমিদারীর ভগ্নদশা হলেও জমিদারী প্রথা ও সংস্কারের ঐতিহ্য তখনও অটুট এবং জমিদারী ব্যবস্থার পুরনো কীর্তি ও গৌরবগাথার সজীবতার মধ্যেই তিনি লালিত ও বিকশিত হয়েছেন। সমকালীন জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ধারাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তারাশঙ্কর। সামন্ত্রতন্ত্রের ক্রমঅবলুপ্তি এবং শিল্পভিত্তিক নবজাত বুর্জোয়া শক্তির বিকাশের স্বরূপ তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করেছিলেন। অর্থনৈতিক-সামাজিক এই যুগপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে রচিত তাঁর একাধিক রচনার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে 'জলসাঘর' ও 'রায়বাড়ি'।

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য 'জলসাঘর' বাংলা সাহিত্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পসার্থক ছোটগল্প। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। গল্পটির রচনাকাল বিশ শতকের তিনের দশকের প্রথমার্ধ। তারাশঙ্কর পরিকল্পনা করেছিলেন জলসাঘর নিয়ে তিনটি গল্প লিখবেন। গল্পটির ভূমিকা প্রসঙ্গে 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে তারাশঙ্কর স্বয়ং জানিয়েছেন: "আরও দুটি গল্প লিখে 'জলসাঘর' নাম দিয়েই একটি বই প্রকাশ করব। প্রথম জলসাঘর গড়ে ওঠা, দ্বিতীয় জলসাঘরের পরিপূর্ণ জৌলুস, তৃতীয় এবং শেষেরটি আগেই লেখা হয়ে আছে।... জলসাঘরের মাঝের গল্প আর লেখার হয়নি। লিখিনি। এর এক বছর পরেই 'জলসাঘর' বই প্রকাশিত হল।... ওই দুটিকে এক করেই

জলসাঘরের পালা শেষ করলাম”।[১] গল্পটির লেখক-কথিত দুই খন্ডের একদিকে রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত বংশের দাপট, মধ্যাহ্ন গৌরব-দীপ্তি, প্রজাশাসন, প্রজাশোষণ, প্রতিপালন। অপরদিকে রয়েছে অস্তগামী সামন্ততন্ত্রের করুণ ছবি। গল্প দুটি যেন একে অপরের পরিপূরক। প্রকাশকালের দিক থেকে অবশ্য ‘রায়বাড়ি’ (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) গল্পটি পরবর্তী। কিন্তু জমিদার রায় পরিবারের কালানুক্রম ও ঘটনাক্রমের দিক থেকে ‘রায়বাড়ি’, ‘জলসাঘরে’র পূর্ববর্তী অধ্যায়।

‘জলসাঘর ‘গল্পটিতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং বর্ধিষ্ণু বণিকতন্ত্রের শ্রেণি সংঘাতের চিত্র বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত। গল্পের প্রধান এই চরিত্রটির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ, বংশগরিমা অটুট রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছে। সমকাল তার ঘটনাপ্রবাহ ও সমস্যার জটিলতা সহ কাহিনির অনুষঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের আভিজাত্যের গৌরব এবং ব্যক্তি ও সমাজের টানা পোড়েন-এর আঁচ পেতে হলে ‘রায়বাড়ি’ গল্পের পরিচিতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

সুনির্দিষ্ট বছরের উল্লেখে ‘রায়বাড়ি’ গল্পটির সূচনা- “১২৭০ সাল- ইংরেজি ১৮৬৩ সালের ঘটনা। সিপাহী যুদ্ধ সবে শেষ হইয়াছে। জমিদার তখনও ভুস্বামী এবং তাঁহাদের সে স্বামিত্বের আমি সত্যকার অর্থ তাহারা বজায় রাখিয়াছিলেন”।[২]

রাজারামপুরের জমিদার রায় বাড়ির তখন অসীম প্রতাপ। রায় বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায় রায় বাড়ির একক উত্তরাধিকারী- আভিজাত্যের জীবন্ত বিগ্রহ। ভোগলিপ্সার মধ্যেও অটল তাঁর ভগবদভক্তি। বিদ্রোহী প্রজাদের শাসন করবার সময় আবার নির্মম, নির্দয় তিনি। ‘গিন্নি, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের’- রাবণেশ্বরের এই উক্তির মধ্যে নিহিত আছে তিনি কিভাবে প্রজা শাসন করেন, নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখেন। হুদা-শ্যামপুর লাটের অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য কালী বাগদীর মাধ্যমে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেবার আদেশ দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না। প্রজাদের সর্বনাশের কারণ রাবণেশ্বরের ওপর অভিশাপের কালো ছায়ার অশনি সংকেতে তাঁর স্ত্রী, রায় বংশের একমাত্র জননী ব্রজরানী আশঙ্কিত হলেও রাজসিক চালে অভ্যস্ত রাবণেশ্বর কিন্তু নির্বিকার। তিনি তৈরী করেছেন জৌলুষপূর্ণ জলসাঘর। পুণ্যাহের দিন আকস্মিক এক দৈব-দুর্বিপাকে নৌকাডুবির ফলে রাবণেশ্বের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। চতুর্থ পুরুষেই রায় বংশ নির্বংশ হতে বসেছিল। রাবণেশ্বর। সংসার ত্যাগ করবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু অকস্মাৎ বাঁধ ভেঙে গঙ্গার প্রবল বন্যায় রাবণেশ্বরের জলসাঘর হয় বিপন্ন প্রজাদের আশ্রয়স্থল। এখানেই বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলীর কন্যার বিবাহের আসর বসে। চরম দুর্যোগের দিনে এই বিবাহ বাসর রাবণেশ্বরের কাছে পরম ইঙ্গিতবহ বলেই মনে হয়, তিনি আবার সংসারে ফিরে আসেন। অভিজ্ঞ সমালোচকের এই গল্পের মৌল বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য গল্পের অভ্যন্তর সত্তাটিকে চিনে নিতে সাহায্য করে। 'অভিজাত বংশের রাজসিকতাই এই গল্পের বিষয়বস্তু। দুর্বিনীত প্রজা শাসনে যেমন রাজসিক, আশ্রিত প্রতিপালনেও তেমনি রাজসিক। ছোটগল্পের সংকীর্ণ পরিধিতে রাবণেশ্বর রায় মহাকাব্যের নায়কোচিত মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। তাঁর চিত্তে আসক্তি অনাসক্তির লীলা মনস্তাত্ত্বিক আলো-আঁধারিতে অনবদ্য'।[৩]

এই রায় বংশেরই সপ্তম পুরুষ 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায়। রাবণেশ্বর চরিত্র বহু কৌণিক। বিশ্বম্ভরের চরিত্রে এই সম্ভাবনা ছিল না। রাবণেশ্বরের মধ্যে জমিদার ব্যক্তিত্বের শোষক -পালক, ত্যাগী-ভোগী, উৎপীড়ক- সেবক- এই বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপগুলিকে চিত্রিত করাই ছিল

লেখকের অভিপ্রায়। কিন্তু 'জলসাঘর' গল্পে সময় বদলে গেছে। আর্থ সামাজিক পরিবর্তন বিশ্বম্ভর রায়ের অবস্থানকেও বদলে দিয়েছে। এই পরিবর্তিত সময়পট 'জলসাঘর' গল্পে নিপুণভাবে চিত্রিত।

'রায়বাড়ি'র মতো এ-গল্পে লেখক কোনো সুনির্দিষ্ট কালকে চিহ্নিত করেননি। তবে ১৮৬৩ যদি 'রায়বাড়ি'র ঘটনাকাল হয়, এই গল্প রাবণেশ্বরের প্রপৌত্র বিশ্বম্ভর রায়ের আমলে। তাছাড়া গল্পের আবহ থেকেও মনে হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ঘটনা এটি। গল্পের নায়ক বিশ্বম্ভর রায় মধ্যযুগীয় জমিদারতন্ত্রের বিশ শতকীয় প্রতিনিধি। গল্পে তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিচয়ের সূত্র, গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা আছে। বর্তমানে তিনি নিঃস্ব ও একাকী। রোগজীর্ণ ও সম্পদহীন। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমাণ।আদি থেকে বংশানুক্রমে তিন পুরুষ সঞ্চয় করেছেন, চতুর্থ পুরুষ রাজত্ব করেছেন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষে সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে তলানিতে পৌঁছেছে। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর ঋণভারে জর্জরিত।

'জলসাঘর' গল্পে যুগান্তরের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে বিশ্বম্ভর রায়ের সমস্ত জমিদারি চলে গেছে। অবশিষ্ট রয়েছে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি। কলেরায় সাত দিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী -পুত্র- কন্যা বিয়োগ হয়েছে। কিন্তু তাঁর আভিজাত্যবোধ এবং আত্মমর্যাদা বোধ অটল। নতুন ধনী মহিম গাঙ্গুলীর শ্রেষ্ঠত্ব তিনি কিছুতেই মেনে নিতে নারাজ। পূর্বের সমৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠা থেকে নির্বাসিত বিশ্বম্ভর রায় নিজের বিশাল প্রাসাদের এক কোণে আত্মগোপন করে থাকেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় হস্তিনী মতি যার আদরের নাম 'ছোট গিন্নি' বা প্রিয় ঘোড়া তুফানের অস্তিত্ব তাঁকে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুই বিপরীত অবস্থার টানাপোড়েনে, বিশ্বম্ভরের মানসিক সংকট প্রতিফলিত। গল্পে বিশ্বম্ভর, রায় বংশের শেষ জমিদার। মহিম নতুন ধনী। মহিমের সামনে নিজের আভিজাত্য বজায় রাখতে তিনি সতর্ক। মহিমের কথা ও কার্যকলাপ, তাঁর কাছে স্পর্ধা বলে মনে হয়েছে। মহিমের আভিজাত্যহীন আড়ম্বরকে তিনি ঘৃণা করেছেন। বিশ্বম্ভরের রুচি আভিজাত্য মার্জিত রমণীয় আচরণের বিপরীতে মহিমের অনভিজাত ব্যঙ্গোক্তির মধ্যেও এক প্রকার উষ্মা ও জ্বালা প্রকাশিত। যথেষ্ট অর্থের মালিক হয়েও সে বিশ্বম্ভর রায়ের আভিজাত্যকে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু মহিমের আচরণে বারবার আত্মসম্মানে আঘাত লাগার ফলে বিশ্বম্ভরও একদিন তাঁর নির্বাসিত জীবন বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। মহিমের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল বাদে জলসাঘরে আবার বাঈজীর আসরের আয়োজন করেন। এর ফলে রায় বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাঁর পত্নীর স্মৃতি সম্বলিত শেষ অলংকারটির মায়াও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। আসর জমে ওঠে। বাঈজীর নৃত্যগীত সকলকেই মুগ্ধ করে।

বিশ্বম্ভর রায়ও যেন ক্ষণকালের জন্য হারানো মর্যাদা ও বিগত যৌবন ফিরে পান। কিন্তু শেষে এক সময় তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তুফানের পিঠে চড়ে উত্তেজনার বশে ভোরবেলায় মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করবার পর কঠোর বাস্তবের আঘাতে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। মোহভঙ্গ হতেই তিনি ফিরে আসেন প্রাসাদে। রক্তাক্ত, শ্রান্ত তুফানকে গভীর মমতায় আবেগকম্পিত স্বরে বলে ওঠেন, "ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল"। আত্মোপলব্ধিজাত সুগভীর তাঁর এই উচ্চারণ। বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত মোহকে প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কিত বিশ্বম্ভর অস্বাভাবিক কণ্ঠে অনন্তকে নির্দেশ দেন জলসাঘরের বাতি নিবিয়ে দেবার জন্য। জলসাঘর বন্ধ করে দেবার শেষ নির্দেশ দিয়ে ভূপতিত বিশ্বম্ভরের হাতের চাবুক জলসাঘরের দরজায় আছড়ে পড়ে।

সাত পুরুষ ধরে রায়দের ধারাবাহিক ভোগবিলাস, উচ্ছৃঙখলতা এবং মোহই যে রায় বংশের পতনের একমাত্র কারণ, তা কিন্তু নয়। এ এক অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি, ইতিহাসের নির্মম সত্য। জমিদারদের সরিয়ে অনিবার্যভাবে মহিমরা আসবে, বিশ্বম্ভর রায়ের তা জানা না থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তিনের দশকে বিশ্বম্ভর রায়ের স্রষ্টা তারাশঙ্কর সেই সত্য অনুধাবন করেছিলেন। তবে তিনি জমিদারী প্রথার প্রতিই আস্থা রেখেছেন। মহিম গাঙ্গুলীরা কোনদিনই তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেনি। তাই যে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা নিয়ে বিশ্বম্ভর চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে, মহিম গাঙ্গুলীর চরিত্র তা হয়নি। এ যেন অনেক স্থূল, অমার্জিত। তারাশঙ্কর হয়তো সজ্ঞানে এই যুগ প্রবাহের বিরোধীতা করতে চাননি, কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতি অবিশ্বাসী তারাশঙ্কর খানিকটা অবচেতনভাবে নূতনের নির্মমতাকেই যেন ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। বিশ্বম্ভরের মৃত্যুর মধ্যে যে অসহায়তা ও বেদনা, তার মধ্যে তারাশঙ্করের মমত্ববোধ প্রকাশিত। চরিত্রটির বিন্যাসে নাট্য রসের সফল প্রয়োগ ঘটেছে। জমিদারী-হারানো বিশ্বম্ভরের যন্ত্রণা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বোঝাতে তিনি ধাপে ধাপে একটির পর একটি ঘটনা বিন্যস্ত করেছেন। বিশ্বম্ভরের জীবনের একাধিক বিষয় গল্পে উঠে এসেছে। তবে লেখক শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখতে পেরেছেন। ছোটগল্পের একমুখীনতা, ঘটনার ক্রম-পরিণতি গল্পে বিদ্যমান। তবে যে কালে, সময়ে গল্পের ঘটনা বহমান, গল্পের ঘটনা বিন্যাস শুধু যে সেই কাল ধরে এগিয়েছে তা নয়, কালানুক্রমিক ঘটনাবিন্যাসকে সব সময় অনুসরণ করা হয়নি। লেখক সচেতনভাবেই ঘটনার কালগুলিকে ওলটপালট করে দিয়েছেন।

আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে 'জলসাঘর' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ছোটগল্পের তুলনায় বিপুলায়তন। তবে এই বিস্তৃতি সত্ত্বেও কাহিনির একমুখী গতি, কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিশেষভাব, তারই সূত্র ধরে বিশেষ একটি ঘটনার পরিণামে ইঙ্গিত ধর্মী পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গল্পের মধ্যে বিশ্বম্ভর যতই পর্যুদস্ত ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, স্নিগ্ধ, মার্জিত অভিজাত তাঁর উপস্থিতি। মহিম একালের রুচিহীন, উদ্ধত, হীন মনোবৃত্তির প্রতীক। গল্পে ঘটনা সন্নিবেশের চমৎকারিত্বে এঁদের দুজনের বৈপরীত্য প্রকট হয়ে ওঠে।

মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানব সম্পর্কের দিকটি লেখক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। জমিদারী আবেগ, আবহকে ফুটিয়ে তুলতে তুফান বা ছোট গিন্নি খন্ড খন্ড উপকরণ। গল্পে এই মূক প্রাণী দুটির সঙ্গে বিশ্বম্ভরের পারস্পরিক স্নেহ-আকর্ষণের দিকটি গল্পটির রসকেন্দ্রকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে।

আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে 'জলসাঘর' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ছোটগল্পের তুলনায় বিপুলায়তন। তবে এই বিস্তৃতি সত্ত্বেও কাহিনির একমুখী গতি, কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিশেষভাব, তারই সূত্র ধরে বিশেষ একটি ঘটনার পরিণামে ইঙ্গিত ধর্মী পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গল্পের মধ্যে বিশ্বম্ভর যতই পর্যুদস্ত ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, স্নিগ্ধ, মার্জিত অভিজাত তাঁর উপস্থিতি। মহিম একালের রুচিহীন, উদ্ধত, হীন মনোবৃত্তির প্রতীক। গল্পে ঘটনা সন্নিবেশের চমৎকারিত্বে এঁদের দুজনের বৈপরীত্য প্রকট হয়ে ওঠে।

মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানব সম্পর্কের দিকটি লেখক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। জমিদারী আবেগ, আবহকে ফুটিয়ে তুলতে তুফান বা ছোট গিন্নি খন্ড খন্ড উপকরণ। গল্পে এই মূক প্রাণী দুটির সঙ্গে বিশ্বম্ভরের পারস্পরিক স্নেহ-আকর্ষণের দিকটি গল্পটির রসকেন্দ্রকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে।

'জলসাঘর' একটি শিল্পসার্থক ছোটগল্প। এর কেন্দ্রীয় ভাব, নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। গল্পের নামকরণ 'জলসাঘর' হলেও জলসাঘর এখানে একটি ছোট প্রসঙ্গ। গল্পের প্রধান লক্ষ্য, বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র। জমিদারদের আভিজাত্য, অহমিকা, আর্থসামাজিক ক্ষমতা প্রদর্শনের আধার হল জলসাঘর। বিশ্বম্ভরের প্রপিতামহী ব্রজরাণী প্রজাদের অভিসম্পাতের আশঙ্কা করেছিলেন, সেই অভিসম্পাত যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে জলসাঘরকে। যে জলসাঘর পুরুষানুক্রমে ভাঙাগড়ার সাক্ষী, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম অভিজ্ঞান। সেই জলসাঘর চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় বংশের সর্বশেষ প্রতিনিধি উত্তরসূরীবিহীন বিশ্বম্ভরের হাতের চাবুকের সশব্দ আঘাতে, পরিশেষে মৃত্যুতে। গল্পের সূচনাতে জলসাঘর শুধু আবহরূপে এসেছে। গল্পের মধ্যপর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র সত্তা নিয়ে জলসাঘর যেন একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে।

রায় বাড়ির ধ্বংসোন্মুখ প্রতিবেশ রচনা করতে চেয়েছেন লেখক। তাই শুধু আবেগমথিত তথ্যবিবৃতি নয়, রয়েছে অলংকার প্রয়োগের অসামান্যতা। যেমন-

ক) "পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত" – তারাশঙ্কর বিভিন্ন কীটপতঙ্গ, পশু-প্রাণীকে উপমান হিসেবে উপস্থাপনে বিশেষ আগ্রহী।

খ) "মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র কয়টা বড় গাছ- মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখা- প্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ"।[৪] -সাতপুরুষের জমিদারির অযত্ন লালিত, পরিচর্যাহীন, উত্তরাধিকারবিহীন, ইতিহাসের সাক্ষী রূপে স্থবির উপস্থিতির দ্যোতনা বহন করে আনে।

গ) "দান ভোজন,বিলাস ব্যসন চলিয়াছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত"।– বুঝিয়ে দেয় অমিত আয়োজনের কথা।শুধু বিপুলতা নয়, অনিবার্য স্বাভাবিকতাও নির্দেশ করে- বিত্তশালী,প্রতাপান্বিত জমিদারীর সঙ্গে যার অঙ্গাঙ্গী যোগ।

লেখক বর্ণনার মধ্যে একাধিকবার শ্লেষ ব্যবহার করেছেন। জমিদারী হারানো বিশ্বম্ভরের পড়ন্ত আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে রায় বাড়ির নিবন্ত বাতিগুলির দিকে তাকিয়ে মহিম শ্লেষাত্মক উক্তি করেছে :

কটা বাতি নিবে গেল যে হে।...নায়েব বাবু!..... আমার ড্রাইভারকে ব'লে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক। লেখক স্বয়ং মহিম চরিত্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ব্যবহার করেছেন। বিশ্বম্ভরের আচরণের মধ্যে যে স্নিগ্ধ,মার্জিত আভিজাত্য দেখা যায় মহিমের পক্ষে সেই আভিজাত্য অনায়ত্ত।সুচতুর মহিম নানা অছিলায় সমাজের অভিজাত এবং সাহেবসুবোদের তার নিজ গৃহে আগমনের প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করে তার সামাজিক কৌলীন্য বোঝাতে বদ্ধপরিকর। মহিম যথেষ্ট অর্থের মালিক হয়েও বিশ্বম্ভর রায়ের আভিজাত্যকে স্পর্শ করতে পারেনি কারণ তারা সোনার দেউল তুলেছে মরা পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেউ তাকায় না। তাই তার উপস্থিতি, আচার-আচরণ, মন্তব্যের প্রতি লেখকেরও ব্যক্তিগত প্রবণতা অপ্রকাশ্যে থাকে না।

লেখকের সংলাপ - রচনার কৃতিত্ব, গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সংলাপে চলিত রীতির গদ্য এবং বর্ণনায় সাধু গদ্য ব্যবহৃত। যার ফলে জমিদার বংশের কাহিনিতে যথাযথ গাম্ভীর্য অটুট থেকেছে। লক্ষ্ণৌ থেকে আগত বাঈজিদের বিবরণ গল্পে উল্লিখিত হওয়ায় বেশ কিছু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

জমিদার রায় পরিবারের উত্থান, সমৃদ্ধি এবং ভাঙন নিয়ে পূর্ণাবয়ব কাহিনি রচনার যে আকাঙ্ক্ষা তারাশঙ্করের ছিল, 'রায়বাড়ি' থেকে 'জলসাঘর' গল্পে বিন্যস্ত হয়েছে তার আদ্যোপান্ত

নিটোল একটি রূপ। জমিদার জীবন নিয়ে তাঁর প্রথম গল্প 'রাজা রাণী ও প্রজা' (শ্রাবণ, ১৩৪০)। এছাড়াও জমিদার ও জমিদারীর প্রসঙ্গ এসেছে 'সমুদ্রমন্থন', 'সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার ' ইত্যাদি গল্পে এবং 'কীর্তিহাটের কড়চা' উপন্যাসে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' বা তারও আগে 'ত্রিপত্র' থেকে অল্পবিস্তর সব রচনায় রয়েছে যুগান্তর বা যুগের Transition - এর প্রসঙ্গ।

যুগ সংকটকে প্রতিনিয়ত অনুভব করেছেন তারাশঙ্কর। সতত পরিবর্তনশীল কালের অভিঘাতে ক্ষয়িষ্ণু মানুষের মর্মবেদনা, নবীন জীবনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জরাজীর্ণ প্রাচীনের পরাজয়ের ট্রাজেডি বর্ণনায় তারাশঙ্করের সাহিত্য বিশিষ্টতা লাভ করেছে। যেখানে অতীত-বর্তমানের সংঘাত, নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব-সেখানে হারানো অতীত তাঁর কাছে গৌরবোজ্জ্বল, মহিমান্বিত। এই পক্ষপাতিত্বের মূলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছে। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন, দ্বন্দ্বের অভিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। কারণ তাঁরা ছিলেন জমিদার। প্রত্যক্ষ অনুভবের এই সত্য ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সমগ্র রচনায়। 'জলসাঘর' গল্পেও লেখক তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত দিকটিরই প্রাধান্য দেখা যায়। অতীত কালের জন্য লেখকের দীর্ঘনিঃশ্বাসে গল্পটি পরিসমাপ্ত। কালের গতিতে অপ্রতিরোধ্য নিয়মে পুরনো কাল অতিক্রান্ত হয়ে নবতর কাল সম্ভাবিত হবে, সেই সত্য তারাশঙ্করের অজানা ছিল না। কিন্তু কিছুটা পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিতে বিলীয়মান কাল ও তার গৌরবময় জীবনধারা নিয়ে বিশ্বম্ভর রায়ের প্রতি তারাশঙ্করের মমত্ববোধের প্রভাবকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন সেকাল থেকে একালে। এখানেই গল্পটির শিল্পসিদ্ধি ঘটেছে।

তথ্যসূত্র:

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় -আমার সাহিত্য জীবন – দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা- এপ্রিল, ১৯৭৭- পৃঃ ১৫১-১৫২

২. জলসাঘর, রায় বাড়ি – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় –সুবর্ণরেখা, কলকাতা – অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮– পৃঃ ১

৩. ভূমিকা : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খন্ড)– সম্পাদনা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য – সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -জানুয়ারি, ১৯৯৭- পৃঃ ৪৭

৪. জলসাঘর – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – সুবর্ণরেখা,কলকাতা –অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮–পৃঃ ২০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য, - সম্পাদনা উজ্জ্বল কুমার মজুমদার – মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা –মার্চ, ১৯৭৮

২. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ – বীরেন্দ্র দত্ত- পুস্তক বিপণি,কলকাতা- জুলাই, ২০০৪

৩. বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প নবমূল্যায়ন - সম্পাদনা শম্পা চৌধুরী – রত্নাবলী, কলকাতা – মার্চ, ২০০৯

৪. ছোটগল্পে ত্রয়ী - ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য – গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা- জুন, ২০০০

৫. তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা – গৌরমোহন রায় – সাহিত্যশ্রী, কলকাতা- নভেম্বর, ১৯৯৪

৬. গল্পচর্চা - সম্পাদনা উজ্জ্বল কুমার মজুমদার – বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা – জানুয়ারি, ২০০৮।

বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের বিকাশে পত্রিকার অবদান

আঁখি সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান নিজস্ব ধারা নয়। এটির প্রথম উদ্ভব হয় পাশ্চাত্যে। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হয়। পাঠক সমাজ বিভিন্ন ভাষার কল্পবিজ্ঞানের অনুবাদের মাধ্যমে কল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে পারে।

সূচক শব্দ: সংবেদন, রূপকের ব্যবহার, কল্পনা, বিজ্ঞানের ব্যবহার।

মূল আলোচনা:

মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে যুগ যুগ ধরে, এই ধারাতেই আধুনিক যুগে এসে সাহিত্যের একটি নতুন শাখা উন্মোচিত হয়েছে, সেটি হল কল্পবিজ্ঞান। কল্পবিজ্ঞান শব্দটিকে ভাঙলে আমরা কল্পনা ও বিজ্ঞান দুটি শব্দ পাই। কল্পবিজ্ঞান মূলত কল্পনা ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন। কল্পবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে সায়েন্স ফিকশান বলা হয়। ইংরেজিতে সায়েন্স এর অর্থ সত্যসন্ধান, আর ফিক্শানের মধ্যে লুকিয়ে আছে বাস্তব জগতে যা সবসময় ঘটে না, কল্পনায় তাই ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন হুগো গানস্‌ব্যাক বিশ শতকে 'অ্যামেজিং স্টোরিজ' লিখে যার নাম দেন 'সায়েন্স ফিকশান'। ইংরেজি ভাষায় সায়েন্স ফিকশান নামটি তারই অবদান। সেই থেকেই শুরু হল সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের একটি নতুন পর্ব। বর্তমানে কল্পবিজ্ঞানের বহু উপন্যাস, গল্প ও কবিতা রচনার যাত্রা শুরু হয়।

মানুষ চিরকালই অজানাকে জানতে ও অচেনাকে চিনতে চেয়েছেন। এই অজানাকে জানবার ও চেনবার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার সৃজনশীল চিন্তনকে কাজে লাগিয়েছেন। মানুষ তার কৌতূহল মেটাবার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে চলেছে। তাদের সেইসব নব নব আবিষ্কারের উদ্ভাবন ও বাস্তবায়িত করার প্রেরণাটি কল্পবিজ্ঞানের লেখকরা জুগিয়েছেন। রূপকথাকে কল্পবিজ্ঞানের আদি উৎস বলা যেতে পারে। রূপকথার মতো কল্পবিজ্ঞান Story telling- এ সীমাবদ্ধ থাকে না। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানটি নিহিত থাকে। সেই অনুসন্ধানটি শোনায় ভবিষ্যতের বাস্তবের কথা। সাহিত্যের অন্যান্য পর্যায়ের মতো কল্পবিজ্ঞানেরও সাহিত্যমূল্য থাকে। সাহিত্যের অন্যান্য রূপভেদ যেমন ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসে কল্পনার মোড়কে ইতিহাসের সত্যতা মেলে, আর সামাজিক উপন্যাসে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। কল্পবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক সত্য ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সম্ভাব্যতার দিকটি তুলে ধরে। আসিমভের মতে-

> "Science fiction can be defined as the branch of literature which deals with reaction of human beings to changes in science and technology. .... there are several possible alternatives ; and if we twentieth century primitives can

> image them, future science will undoubtedly discover something much better.”[১]

সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। কল্পবিজ্ঞান রচনার প্রাথমিক শর্ত হল কল্পনা। তবে সেই কল্পনা বিজ্ঞানের সত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সত্যটি বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান চিন্তন নির্ভর হবে। কিন্তু সেটাই কি সব ? সে ব্যতিরেকেও রয়েছে এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা আমাদের সায়েন্স ফিকশন সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা দেয়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

- অমানবীয় চরিত্র।
- রূপকের ব্যবহার, যথা ঘটনা ও চরিত্রের প্রতীকী উপস্থাপনায় মনুষ্য জীবন নিয়ে সাধারণ এক গড়ন ও ধারণা প্রস্তুত করা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির থিম।
- ডিসটোপিয়া অর্থাৎ এক কাল্পনিক পৃথিবী যেখানে কুশীলবেরা বেঁচে থাকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে।

তবে কল্পবিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আনন্দ পাঠক তখনই পায় যখন পাঠকের বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও সূত্র সম্বন্ধে নূন্যতম জ্ঞান থাকে। বিজ্ঞানকে এক কল্পজগতের মোড়কে উপস্থিত না করে বাস্তবোচিত প্রেক্ষাপট উপস্থিত করে ও তার উত্তর খোঁজা, এটাই হল আধুনিক সায়েন্স ফিকশন। এ বিষয়ে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান’ গ্রন্থে বলেছেন-

> “সাধারণত দুধরনের কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে। একটি ধরন হল প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর কাল্পনিক রঙিন প্রলেপ, আরেকটি হল- কল্পনার প্রাধ্যনতার ওপর বিজ্ঞানের সুবাস। বিভিন্ন বিষয়ের গল্পকাহিনীতে এতে ব্যবহৃত হয় যেমন- অমনুষ্য জাতীয় জীব সভ্যতা, ভবিষত্যের পটভূমিতে বিধৃত কাহিনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প, অন্য পৃথিবীতে ঘটিত আবিষ্কারের গল্প ইত্যাদি। কিন্তু আমদের মনে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক উঠে আসে কবে থেকে সৃষ্টি হল সাহিত্যের নতুন শাখা কল্পবিজ্ঞানের।”[২]

ইম্যাজিনেশন বা কল্পনার এক গভীর সংযোগ আছে পাশাপাশি অনেকটাই তা বিজ্ঞান নির্ভর। এটি সাধারণ সাহিত্যেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ দেশ-কাল-বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কিত জ্ঞান ও বোধ এই শতাব্দীর ২৪-২৫ বছরে আমূল পরিবর্তন সাধন হয়েছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ঘটছে বিশেষ করে পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে। স্বভাবতই সায়েন্স ফিকশন সৃষ্টিশীল মানুষের হাতে একাধারে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম সাধনী হয়ে উঠেছে। Science Fiction Studies জার্নালের প্রাক্তন সম্পাদক ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সমালোচক ডারকো সুভিন কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে চেনা বাস্তবতার বাইরে অন্য বিকল্প বাস্তবের খোঁজ করতে চান যা প্রচলিত স্থিতাবস্থার বিপরীত। এই বিকল্প বাস্তবতা সুভিনের ‘জ্ঞানীয় বিচ্ছিন্নতা’ (Cognitive estrangement)-এর ধারণা সঞ্জাত। কল্পবিজ্ঞান পাঠকের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা (estrangement) যেমন রয়েছে তেমনই অন্যদিকে ভুতুড়ে (ghostly), ভয়াবহ (horror), রহস্যাবৃত (ghothic), লোককথা (folklore), রূপকথা ও ফ্যান্টাসি ইত্যাদি থেকে আলাদা করার জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান নিজস্ব ধারা নয়। এটির প্রথম উদ্ভব হয় পাশ্চাত্যে। মেরি শেলির

'ফ্রাংকেনস্টাইন' উপন্যাসের মাধ্যমে প্রথম সূত্রপাত হয়। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের লেখায় কল্পবিজ্ঞানের ছায়াপাত দেখা দিলেও জগদীশ চন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' ছোটগল্পের মাধ্যমে কল্পবিজ্ঞানের সার্থক রূপটি দেখা যায়। পরবর্তীতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ', 'ঘনাদা' চরিত্রের দ্বারা কল্পবিজ্ঞানের ধারাটি বিকশিত হয়। পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায়ের 'প্রফেসর শঙ্কু', 'অনুকূল', 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' লেখনী দ্বারা কল্পবিজ্ঞানের বিশ্বের দরবারের শিরোপা পায়। অদ্রীশ বর্ধনের 'আশ্চর্য', 'ফ্যানট্যাস্টিক', ও রণেন ঘোষের 'বিস্ময়' পত্রিকার দ্বারা বাংলা কল্পবিজ্ঞানের রূপটি সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তী লেখক অনীশ দেবের লেখনীর দ্বারা কল্পবিজ্ঞানের রূপটি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়। এই অধ্যায়ে সময়কাল ভাগ করে বিভিন্ন লেখকের গল্প নির্বাচন করে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে কল্পবিজ্ঞানের সম্প্রসারণে বিভিন্ন পত্রিকার অবদান তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন লেখক যেমন মেরি শেলি, জুলে ভার্নে, আসিমভের লেখাগুলি পত্রিকায় অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছায়। পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লেখক গোষ্ঠী জন্ম হয়। আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, অদ্রীশ বর্ধন, অনীশ দেব প্রমুখ লেখককে পাই। নিম্নে বাংলা কল্পবিজ্ঞান বিকাশে পত্রিকাগুলির অবদান আলোচনা করা হবে। সেইসঙ্গে এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে নতুন লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়।

- **প্রথম শারদীয় কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'আশ্চর্য'!:**

কল্পবিজ্ঞান থিমভিত্তিক সাহিত্য পত্রিকা প্রথম অদ্রীশ বর্ধন ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু করেন। বাংলা সহ ভারতীয় উপমহাদেশে কল্পবিজ্ঞানের ওপর কোনো পত্রিকা তখনও গড়ে ওঠেনি। পত্রিকার শুরুর দিকে প্রথম উপদেষ্টা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অদ্রীশ বর্ধনের হাত ধরে প্রথম মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য'-এর পথ চলা শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে শারদোৎসবে প্রকাশিত হয় কল্পবিজ্ঞান পত্রিকার সম্পূর্ণ সংখ্যা। অদ্রীশ বর্ধন আকাশ সেন ছদ্মনামে পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন তার দাদা ডক্টর অসীম বর্ধন। এই পত্রিকার সম্পাদক আকাশ সেন প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন-

> "বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকল্পের শারদীয়া পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে প্রথম। সেদিক দিয়ে এই বিশেষ সংখ্যাটির একটি বিশেষ মূল্য তো রইলোই- তা ছাড়াও, চিত্তাকর্ষক আয়োজন বৈচিত্র্যেও এই সংখ্যাটি 'আশ্চর্য'।"[৩ক]

এই পত্রিকায় তিনি প্রথাগত বাঙালি জীবনের ছবিকে ব্যবহার না করে কমিক্স প্যানেলকে ব্যবহার করেছেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ১৯৬৬ সালে চারজন লেখকের চারটি উপন্যাস অনুবাদ করা হয়েছিল তারা হলেন- 'এইচ জি ওয়েলস', 'বারট্রান্ড রাসেল', 'আইভান ইয়েফ্রেমভ' ও 'পিটার হারকোসের'। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশু দাস, সমরজিৎ কর প্রমুখ লেখকের লেখা পাওয়া যায়। ১৯৬৭ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মামাবাবুর অভিযান', লীলা মজুমদারের গল্প, দিলীপ রায়চৌধুরীর লেখা পাওয়া যায়। ১৯৬৭ সাল থেকেই পত্রিকার ট্যাগলাইন কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়ে যায়। সেখানে লেখা হয়েছে-

> "সায়াঙ্গ ফিকশন ও ফ্যান্টাসি গল্পকল্পের একমাত্র মাসিক পত্রিকা।"[৩খ]

১৯৬৬ সালে সায়েন্স ক্লাব-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই ক্লাবের গড়ে ওঠার পিছনে অদ্রীশ বর্ধন ও সত্যজিৎ রায়ের অবদান আছে। তাই ১৯৬৭ সালের সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশানের সিনেমা প্রকাশিত হয়। এছাড়া সত্যজিৎ রায়ের একটি অমূল্য সাক্ষাৎকার এই সংখ্যায় দেখা

যায়। এই সংখ্যার পুজো সংখ্যায় ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, লীলা মজুমদার, বিমল কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রণেন ঘোষ, মনোজ বসু লিখেছেন। তবে ১৯৬৮ সালের দেওয়ালি সংখ্যা থেকেই 'আশ্চর্য'-এর সূচি ম্রিয়মান হতে থাকে। অদ্রীশ বর্ধনের ১৯৭২ সালে স্ত্রী বিয়োগের পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

- **ক্ষণজন্মা 'বিস্ময় !' পত্রিকা:**

'আশ্চর্য' পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ায় অদ্রীশ বর্ধনের যোগ্য উত্তরসূরি রণেন ঘোষ ১৯৭১ সালে একটি নতুন পত্রিকা 'বিস্ময়' শুরু করেন। 'আশ্চর্য'-এর লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে অমিতানন্দ দাস ও সুজিত ধর এই পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৭২ সালে 'বিস্ময়'-এর পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে রণেন ঘোষ লিখেছিলেন-

> "গত দু'বছর আগে বাংলা সাহিত্যের কোনো এক অন্ধকারময় মুহূর্তে বিস্ময়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সেই থেকেই সে সমানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ের ফলশ্রুতি আজকের বিস্ময়।"[৪]

এই পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিল 'ভারতীয় ভাষায় একমাত্র সায়েন্স ফিকশান পত্রিকা'। এই পত্রিকায় কলম ধরেছিলেন- সত্যজিৎ রায়, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন, সমরজিৎ কর, অনীশ দেব প্রমুখ। এই পত্রিকার সম্পাদনায় ছিলেন রণেন ঘোষ, সুজিত ধর, সহকারী সম্পাদনায় অমিতানন্দ দাস। পূজা সংখ্যাটির দাম ধার্য করা হয়েছিল সাড়ে তিন টাকা। ১৯৭৪ সালে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলে সুজিত ধর যৌথ উদ্যোগে কেনা প্রিন্টিং মেশিনটি বিক্রি করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এভাবেই ক্ষণজীবি 'বিস্ময়' পত্রিকাটি লুপ্ত হয়।

- **'ফ্যানট্যাসটিক':**

'বিস্ময়'! পত্রিকা বন্ধ হবার পর বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল তা পূরণ করতে অদ্রীশ বর্ধন ১৯৭৫ সালে আবারও 'আশ্চর্য' পত্রিকা নিয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হলেন। তবে তিনি একটি সংখ্যার পরই নাম পাল্টে রাখেন 'ফ্যানট্যাসটিক'। তিনি এই পত্রিকাটির নাম 'অত্যাশ্চর্য' রাখতে চেয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের পরামর্শে এই পত্রিকার নাম রাখেন 'ফ্যানট্যাসটিক'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অদ্রীশ বর্ধন, সহ সম্পাদক রণেন ঘোষ। এবারে পত্রিকার পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন সত্যজিৎ রায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও প্রদীপকুমার ব্যানার্জী। ১৯৭৬ সালে পত্রিকার ট্যাগ লাইন ছিল- 'কল্পলোকের গল্প- কাহিনী-উপন্যাসের শারদীয় সম্ভার'। এই সংখ্যার দাম ছিল সাড়ে চার টাকা। ১৯৭৫-৮০ সাল পর্যন্ত 'ফ্যানট্যাসটিক' শারদীয়া নিয়মিত প্রকাশ পায়। এই পত্রিকায় সমরজিৎ করের 'একটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা', রণেন ঘোষের 'কামিনী তুমি কি মানবী', অদ্রীশ বর্ধনের 'বন্ধু', নিরঞ্জন সিংএর 'কালপুরুষের ছায়া' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রণেন ঘোষ 'দি ইনক্রেডিব্‌ল মেল্টিং ম্যান' সিনেমা অবলম্বন করে উপন্যাস লেখেন। ১৯৮১ সালে 'সবুজ মানুষ' নামক বিখ্যাত বারোয়ারি উপন্যাসের পুনঃপ্রকাশ হয়। এছাড়া এইচ জি ওয়েল্‌স, আর্থার সি ক্লার্ক, রে ব্র্যাডবেরি প্রভৃতি লেখকের গল্প অনুবাদ করা হয়। ১৯৮২ সালের পূজা বার্ষিকীতে অদ্রীশ বর্ধন লিখেছেন 'প্রফেসর নাটবল্টু' নামক সুবিশাল উপন্যাস। সত্যজিৎ রায়ের 'আশ্চর্য'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধের রিপ্রিন্ট হয়। 'ফ্যানট্যাসটিক' পত্রিকা ২০০০ সালের পরও পত্রিকার কিছু সংখ্যা বের হলেও তা মূলত আগের সংখ্যার রিপ্রিন্ট।

- **শিশু-কিশোর পত্রিকা 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান':**

এর আগে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি ছিল মূলত বয়স্ক পাঠকদের জন্য। ১৯৮০ সালে মূলত কিশোরদের কথা মাথায় রেখে কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পুজো সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন রবীন বল, প্রধান সম্পাদক ছিলেন সমরজিৎ কর। আর দুই সহ সম্পাদক ছিলেন রবীন বল ও জয়ন্ত দত্ত। এই পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য লেখা ছিল অদ্রীশ বর্ধনের ভাবানুবাদ উপন্যাস 'শার্লক হোমস', 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার' এবং 'মঙ্গল গ্রহ'। সিদ্ধার্থ ঘোষের 'গোল রহস্য', নিরঞ্জন সিংহের অনুবাদ 'টাইম পুসি' ও বিমলেনন্দু মিত্রের 'বঙ্কুবাবু' প্রমুখ গল্প প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতে সংকর্ষণ রায়ের 'জেলি', অদ্রীশ বর্ধনের 'গাছ', পার্থসারথি চক্রবর্তীর 'গ্রহের ফের' প্রমুখ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ১৯৯৪ সংখ্যার মুখপত্র ছিল-'ছোটোদের সর্বাধিক প্রচারিত বিজ্ঞান পত্রিকা'। পরবর্তীতে রবিন বলের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

- **অন্যান্য শিশু-কিশোর শারদ পত্রিকা:**

'ফ্যানট্যাসটিক' ও 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' অনিয়মিত হয়ে পড়ায় বাংলা কল্পবিজ্ঞান কয়েক দশক পিছিয়ে পড়ে। তবে এই সময়ে কল্পবিজ্ঞানের ত্রাতা হিসাবে এগিয়ে এসেছিল বাংলার শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলি। সত্যজিৎ রায় 'আনন্দ মেলা' পুজো সংখ্যায় নিয়মিত শঙ্কু কাহিনি লিখেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'বনি'-এর মতো উপন্যাস লিখছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কাকাবাবু', সমরেশ বসু 'অর্জুন' এর মতো উপন্যাস লিখেছেন। এই সময়েই উঠে আসে আরেকটি পত্রিকা নাম 'কিশোর ভারতী'। এই পত্রিকার শারদ সংখ্যায় লিখেছেন অদ্রীশ বর্ধন, অনীশ দেব, অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী প্রমুখ। 'শুকতারা' ও 'সন্দেশ' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় কল্পবিজ্ঞানের বিভিন্ন গল্প লেখা হয়েছে। এই পত্রিকাগুলি যদিও কল্পবিজ্ঞানের পত্রিকা ছিল না, তবুও কল্পবিজ্ঞানের নিভন্ত প্রদীপকে শিখায়িত করে রেখেছে।

- **নতুন যুগের কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'কল্পবিশ্ব':**

কল্পবিজ্ঞান পত্রিকার এবং ভালো গল্পের অভাব কিছু তরুণ সম্প্রদায়কে পীড়া দিয়েছিল। বহু কল্পবিজ্ঞানপ্রেমী ফেসবুকে কল্পবিজ্ঞানের গ্রুপ খুলে সেখানে আলোচনা জমাতেন। সেই সময় সাহিত্যিক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের উৎসাহে একটি নতুন কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়। ২০১৬ সালের ২৬শে জানুয়ারি অদ্রীশ বর্ধনের হাত ধরে 'কল্পবিশ্ব' পত্রিকার সূচনা হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রণেন ঘোষ, সুমিত বর্ধন, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, ত্রিদিবনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ উপন্যাস লিখেছিলেন। মৌলিক গল্প লিখেছিলেন ও অনুবাদ করেছিলেন সৌমেন চ্যাটার্জি, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অভীক সরকার, যশোধারা রায়চৌধুরী প্রমুখ।

এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছেন রণেন ঘোষ, সুমিত বর্ধন, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, ত্রিদিবনারায়ণ চৌধুরী, মল্লিকা ধর, ঋজু গাঙ্গুলি, অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকে লিখছেন। ২০২১ সালের শারদ সংখ্যা থেকে কল্পবিজ্ঞানের ইরেজি বিভাগ শুরু হয়েছে। ২০২২ সালে কল্পবিজ্ঞানের দুই বিশ্ববিখ্যাত লেখক নিল গেইম্যান এবং কেন লিউয়ের অনুমোদিত অনুবাদ গল্প প্রকাশিত হয়। 'কল্পবিশ্ব' পত্রিকা অন্যান্য কল্পবিজ্ঞান পত্রিকার মতো বাঙালি পাঠক সমাজকে মৌলিক গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ উপহার দিয়ে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

- **পত্র-পত্রিকায় পাশ্চাত্য কল্পবিজ্ঞানের বাংলা অনুবাদের সেকাল ও একাল:**

কল্পবিজ্ঞান ঘরানার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই পরিচয় হয় বাংলার মানুষের। একমাত্র অনুবাদের মাধ্যমেই বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যেই কল্পবিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা কল্পবিজ্ঞান উনিশ শতকে শুরু হলেও সায়েন্স ফিকশানের অনুবাদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো কয়েক দশক। প্রথম জুলে ভের্নের অনুবাদ করেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য। তিনি 'আশি দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ' (১৯১৩), 'পাতালে' (১৯১৬), 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ', 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' (১৯২৪)- এই চারটি বইয়ের অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সায়েন্স ফিকশানের সঙ্গে বাঙালি সমাজ পরিচিত হয়। এই অনুবাদগুলি সুকুমার রায়কে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তিনি চ্যালেঞ্জারের প্যারেডি হিসাবে 'হেশোরামের হুঁশিয়ারের ডায়ারী' (১৯২৩) রচনা করেছেন। তাঁর গল্পটি ডয়েলের অনুসরণের থেকে হিউমার ও ভাষায় সম্পূর্ণ মৌলিকতা লাভ করেছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের ভাই কুলদারঞ্জন রায় 'সন্দেশ'-এর পাতায় অনুবাদ করতেন।

তিনি ১৯৩০ সালে জুলে ভের্নের 'মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড' অবলম্বনে লেখেন 'আশ্চর্য দ্বীপ'। পরের বছর তিনি লেখেন কোনান ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্ল্ড'-এর অনুবাদ 'অজ্ঞাত জগৎ' করেন। এই দুটি বই সেইসময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আবার আমরা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাত ধরে 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' ও 'ময়নামতীর মায়াকানন' গল্প দুটি পাই। তবে গল্প দুটির মধ্যে একটি ওয়েলেসের 'ওয়ার অব দ্য ওয়াল্ডর্স', ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্ল্ড'-এর অনুকরণে সৃষ্টি। অন্যদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৩০ সালে লেখেন 'সেকালের কথা' (পরিবর্তিত নাম 'পিপড়ে পুরাণ')। এই গল্পটি ওয়েলেসের 'দি এম্পায়ার অব দি অ্যান্টস' অবলম্বনে রচিত। এরপর আমরা ওয়েলেসের উপন্যাসের অনুবাদ বিভিন্ন লেখকের লেখায় পাই যেমন- অমিয়কুমার চক্রবর্তীর লেখায় 'দি ইনভিজিব্‌ল ম্যান', নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' (১৯৫১), 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস' (১৯৫৫), সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনুবাদ করেন এইচ জি ওয়েল্‌সের 'দ্য ফুড অব দ্য গডস' (১৯৫৮)।

অদ্রীশ বর্ধন আশ্চর্য পত্রিকায় নিয়মিতভাবে জুলে ভার্নের রচনাগুলি অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৭৫ সালে 'খুনে মেশিন' মূল রচনা ফিলিপ ডিক, 'অস্ত্র প্রতিযোগিতা' অনুবাদ করেন। এই সময় সত্যজিৎ রায় অনুবাদ করেন রে ব্রাডবেরির 'মার্স ইজ সেভেন' 'মঙ্গলেই স্বর্গ' এবং আর্থার সি ক্লার্কের 'দ্য নাইন বিলিয়ন নেমস অব গড' এর অনুবাদ করে নাম দেন 'ঈশ্বরের ন লক্ষ কোটি নাম'। এই সময়েই ননী ভৌমিকের লেখনীতে রাশিয়ান লেখক আলেক্সানন্দর বেলাভয়ের অনুকরণে 'উভচর মানুষ' (১৯৭৩), 'গ্রহান্তরের আগন্তুক' লেখেন। অমিতানন্দ দাস ১৯৮০ সালে 'বাই জুপিটার' লেখেন (মূল রচনা আইজাক আসিমভ)। বিখ্যাত পোলিশ লেখক স্তানিসোয়াভ লেমের গল্পের অনুবাদ করেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুখোশ ও মৃগয়া' গল্পের মাধ্যমে। এছাড়া সৌরেন ভট্টাচার্য আইজাক আসিমভের 'কল্পবিজ্ঞানের রহস্য গল্প' অনুবাদ করেন।

বর্তমানে ২০১৬ সালে 'কল্পবিশ্ব' পত্রিকার মাধ্যমে তরুণ লেখক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের 'ফারেনহাইট ৪৫১' প্রকাশিত হয়। মূল লেখক রে ব্রাডবেরি। যশোধরা রায়চৌধুরী 'মঙ্গলগ্রহের ডায়েরি' অনুবাদ করেন। দীপ ঘোষ 'এফটিএল' সম্পাদনা করেন। সন্তু বাগ 'ফ্র্যাংকেনস্টাইন ২০০' অনুবাদ করেন।

কল্পবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই বহু লেখক তাঁদের গল্পে ভবিষ্যতের পৃথিবী অঙ্কন করতে চেয়েছেন। লেখকরা তাঁদের কল্পনা ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁরা কল্পনা করেছেন

পঞ্চাশ, একশো পাঁচশো বা হাজার বছরেরও পরের পৃথিবীর অবস্থা ঠিক কীরকম হতে পারে তার রূপরেখা করতে চেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ সঠিক হয়েছে, কেউবা ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। কল্পবিজ্ঞানের একালের জনপ্রিয় প্রতিশব্দ হল 'সংবেদন', 'চুম্বকত্ব', 'রেডিয়াম', 'তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালির অজানা রশ্মি', 'পসিওনিক্‌স', এবং 'ব্ল্যাক হোল'। তাঁরা কল্পনা করেছেন মহাকাশে বিনিয়োগ করে মানুষ লাভবান হতে পারে যেমন- সৌরশক্তি, উল্কার থেকে খনিজ আকরিক উত্তোলন, ভরশূন্য অবস্থায় আদর্শ বল বিয়ারিং তৈরি, মহাকাশে বসবাসের জন্য কলোনি তৈরি করা যাবে। কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার হল রোবট নির্মাণ। যা বাংলা সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কল্পবিজ্ঞান হল কাল্পনিক বিজ্ঞান যা আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে ভ্রমণ, অ্যান্টিগ্র্যাভিটির সময় পর্যটন করে। তাঁরা ভর, দূরত্ব এবং সময় দিয়ে মহাবিশ্বকে মাপতে চায়। কল্পবিজ্ঞান ছদ্মবিজ্ঞান নয়। কল্পনাকে ব্যবহার করে অদূর ভবিষ্যতের পৃথিবী সম্বন্ধে তুলে ধরা হয়। কল্পবিজ্ঞান শুধুমাত্র বাংলাতে সীমাবদ্ধ নয় অপার বাংলাতেও বিভিন্ন লেখক যেমন হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রমুখের লেখায় দেখা যায়। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তে যেমন মারাঠী ভাষায় (জয়ন্ত বিষ্ণু নালিকার 'রিটার্ন অফ দ্য বামন'), তামিল (সি. সুব্রামানিয়ার 'কক্কাই পার্লামেন্ট'), তেলেগু ভাষায় কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যকীর্তি দেখা যায়।

তবে কল্পবিজ্ঞান শুধুমাত্র বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পরিবেশ দূষণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানব সভ্যতার দূর্গতি বিভিন্ন লেখকের লেখায় উঠে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি ৯০ এর দশকে অক্টোভিয়া ই বাটলারের লেখা 'Parable of the Sower' উপন্যাসে উঠে এসেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও আবহাওয়ার পরিবর্তন বিষয়টি কিম স্ট্যানলি রবিনসনের লেখা 'Mars Trilogy' উপন্যাসে বিজ্ঞান, সমাজবাস্তব, রাজনৈতিক বিষয়টি কল্পনার সারথি ব্যবহার করে রচনা করা হয়েছে। কল্পবিজ্ঞান শুধুমাত্র কল্পনা নির্ভর না হয়ে বিজ্ঞানের আলোকে বাস্তবচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য, সৌরেন (অনুবাদক), 'কল্পবিজ্ঞানের রহস্যগল্প আইজ্যাক অ্যাসিমভ', কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৭, কলকাতা-০৯, পৃ-১০।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ, 'বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৯ কলকাতা-০৯, পৃ-১৫।

৩। ক) সম্পাদনা, বাগ সন্তু, ঘোষ, দীপ, 'কল্পবিজ্ঞান প্রবন্ধ সংগ্রহ', কল্পবিশ্ব পাবলিকেশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০২৩, কলকাতা-৭৪, পৃ-৭৮।

খ) তদেব পৃ-৮০।

৪। তদেব পৃ- ৮৪।

আদিবাসী মহাসভা : ঝাড়খন্ড আন্দোলনের ঊষা কাল (১৯৩৮-১৯৫০)

কৃশানু ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: দীর্ঘ কয়েক দশকের জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালের ১৫ই নভেম্বর ঝাড়খন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঝাড়খন্ড আন্দোলন মূলত ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকে শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল- উপজাতিদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাবি গুলিকে আদায় করার জন্য উপজাতিদের একত্রিত করা। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ছোটনাগপুর উন্নতি সমাজ' গঠনের মাধ্যমে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের পথচলা শুরু। পরবর্তীকালে আরো দুটি সংগঠন যথা – 'ছোটনাগপুর কৃষক সভা' ও 'ছোটনাগপুর ক্যাথলিক সভা' গঠিত হয়। কিন্তু ঝাড়খন্ড আন্দোলনকে গতিশীল ও গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি যোগ্য সংগঠন এবং নেতৃত্বের। এই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে, উপজাতি অস্মিতা কে সামনে রেখে একটি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। ঝাড়খন্ড পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে আন্দোলনকে গতিশীল ও গণভিত্তিক উপর প্রতিষ্ঠিত করে 'আদিবাসী মহাসভা'। বলা যেতে পারে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা হয় 'আদিবাসী মহাসভার' হাত ধরে।

এই গবেষণা পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো–আদিবাসী মহাসভা কিভাবে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল? ঝাড়খণ্ডের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কিভাবে এই সংগঠন ঔপনিবেশিক ও উত্তর - ঔপনিবেশিক প্রধান ধারার রাজনৈতির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল? ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৃহত্তম কাঠামোর মধ্যে একটি প্রান্তিক গোষ্ঠী অর্থাৎ উপজাতিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কিভাবে এই সংগঠন ঐতিহ্য ও আধুনিকতা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও উপজাতি অস্মিতারমধ্যে যে জটিল সম্পর্ক, তা কিভাবে মোকাবিলা করেছিল?

সূচক শব্দ: ছোটনাগপুর উন্নতি সমাজ, কৃষক সভা, ক্যাথলিক সভা, আদিবাসী মহাসভা, জয়পাল সিং মুন্ডা, মুসলিম লীগ।

মূল আলোচনা:

ঝাড়খণ্ডে আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় বিংশ শতকের গোড়াতে। রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির পেছনে অনেক গুলি কারন ছিল, যেমন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, একের পর এক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন (কোল বিদ্রোহ, ভুমিজ বিদ্রোহ, সাঁওতাল হুল, ১৮৫৭ এর বিদ্রোহ, বিরসা মুন্ডার আন্দোলন), সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। বিরসা মুন্ডার আন্দোলনের পরবর্তী সময় ঝাড়খণ্ডে ধীরে ধীরে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এতে নেতৃত্ব দেয় মূলত খ্রিষ্টান মিশনারি ও ছাত্ররা। বিংশ শতকে এই সংগঠন ভিত্তিক আন্দোলনের সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের বা আগেকার আন্দোলনের চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। পূর্বের আন্দোলনের উগ্র

চরিত্রের বদলে এখন সংগঠিত জনভিত্তির উপর আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। প্রথম দিকে যে সংগঠন গুলি গড়ে উঠে সেগুলি চারিত্রিক দিক থেকে ছিল মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক।

১৯১৫ সালে 'ছোটনাগপুর উন্নতি সমাজ' গঠন করে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের সূত্রপাত করেন খ্রিস্টান আদিবাসীরা। পরবর্তীকালে 'ছোটনাগপুর কিষান সভা', 'ছোটনাগপুর ক্যাথলিক সভা', 'মুন্ডা সভা' এবং অন্যান্য সমিতিও গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে এই সমস্ত সংগঠন একত্রিত হয়ে একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী সংগঠন নির্মাণ করে। যার নাম দেওয়া হয় 'আদিবাসী মহাসভা'। ফিওডর সুরিন এর প্রেসিডেন্ট এবং পল দয়াল এর সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এটি ছিল একটি সর্ব-উপজাতি সংগঠন, সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্যে দিকু রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। এই অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং সর্বপরি একটি পৃথক রাজ্য ঝাড়খণ্ড গঠন এর উদ্দেশ্য ছিল। 'ছোটনাগপুর উন্নতি সমাজ' মূলত একটি আঞ্চলিক নাম ছিল যা পরিবর্তন করে আদিবাসী মহাসভা রাখা হয়, আদিবাসী মূলত জাতিগত শব্দ। আদিবাসী শব্দটির প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের জনজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলে এক নতুন সমষ্টিগত পরিচিতি নির্মাণ। ১৯৩৯ সালে আদিবাসী মহাসভার সভাপতি ও পরবর্তীতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতা জয়পাল সিং লিখেছিলেন যে সংস্থাটির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে তাঁরা "আদিম", "জংলী", "অনগ্রসর", "অনার্য", "কোল" ইত্যাদি অবমাননাকর উপাধির পরিবর্তে "আদিবাসী" শব্দের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা স্থির করতে পেরেছিলেন।

ছোটনাগপুরে আদিবাসী মহাসভার তত্ত্বাবধানে পৃথক ঝাড়খন্ড প্রদেশের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার (১৯৩৭-৩৯) বিরোধিতাকারী - খ্রিস্টান মিশনারী, ব্রিটিশ কর্মকর্তা, মুসলিম লীগ এবং বিহারে বসবাসকারী বাঙালিদের একটি অংশ এই আন্দোলনকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছিল। মন্ত্রিসভায় আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণে বিহারে কংগ্রেস শাসনকে (১৯৩৭-৩৯) দিকু রাজত্ব (বহিরাগতদের শাসন) এবং আদিবাসী বিরোধী হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে বিহার প্রাদেশিক আইন সভায় ছোটনাগপুরে আদিবাসী মহাসভার পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। ডঃ সচিদানন্দ সিন্‌হা এর এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানায় যে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকায় আসার সময় থেকেই ঝাড়খণ্ড বিহারের অভিন্ন অঙ্গ। আর্থিক দিক থেকে বলা হয় যে ১৯৩৬-৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগনার আর্থিক আমদানির তুলনায় আর্থিক ঘাটতি অধিক ছিল তা ছাড়া আলাদা প্রান্ত বানাতে গেলে গভর্নর, মন্ত্রী মণ্ডল, সচিবালয়, হাইকোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় বানাবার জন্য অধিক ব্যয় করতে হবে। এটাও বলা হয় যে প্রান্তীয়, বিকাশগত এবং উপজাতীয় অনগ্রসরতার কারন হিসাবে ঝাড়খণ্ডের পৃথক রাজ্য হিসাবে উন্নতি সম্ভব নয়।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময় জয়পাল সিং এর নেতৃত্বে আদিবাসী মহাসভা দারুন প্রগতি করে। জয়পাল সিংকে সর্বোচ্চ নেতার মর্যাদা দেওয়া হয়। বলা যায় এই সময় থেকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতা হিসাবে জয়পাল সিং এর উত্থান হয়। তিনি তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা গ্রামীণ এবং শহুরে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটান। তিনি যেমন উপজাতিদের একত্রিত করে তেমনি অন্‌-উপজাতী শ্রেণীকেও কাছে টেনে নেন।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাঁচিত আদিবাসী মহাসভার ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জয়পাল সিং সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি আদিবাসী

মহাসভার সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনকে নিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার প্রায় সমস্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জয়পাল সিং যিনি বিকানিনের রাজ্য মন্ত্রী ছিলেন সেই সঙ্গে একজন ছোটনাগপুরিও ছিলেন। এই সভাতে জয়পাল সিং এর সঙ্গে এন.এন.রক্ষিত সহ অন্যান্যরাও ভাষণ দেন। সেই সভার একটি বিশেষ দিক হল এতে ভাল সংখ্যায় মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় জয়পাল সিং ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনাকে বিহার থেকে পৃথক করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব এন.এন.রক্ষিত সমর্থন করেন।

৪ ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সালে বিহার প্রাদেশিক আইনসভায় রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র সিংহ ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগনাকে পৃথক করার এক প্রস্তাব রাখেন এর উত্তরে ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এই প্রস্তাব খারিজ করেন এবং জয়পাল সিং এর ভাষণের কতিপয় অংশের বিরোধিতা করেন। এই ভাষণে তিনি বলেন যে, বিহার সরকার ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনাকে বিহার থেকে আলাদা করার দাবি কখনো স্বীকার করবে না। সরকার এর বিরোধিতা করবে এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করবে যাতে এই আন্দোলন সফল না হয়। তিনি বলেন এই ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনাকে পৃথক করার দাবি কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা আদিবাসীদের নামে চালানের চেষ্টা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি জয়পাল সিং এর ভাষণের ও বিরোধিতা করেন। ১৯৩৯ এর ২৫ শে এপ্রিল উড়িষ্যার গাংগপুর এলাকার সিমকোতে পুলিশের গুলি চালানোর ফলে ৬৫ জন আদিবাসীর মৃত্যুর ঘটনা ১৯৩৯ সালের মে মাসে যে জেলা বোর্ড নির্বাচন হয় তাতে দারুন প্রভাব ফেলে। আদিবাসী মহাসভা রাঁচি ও সিংভূম জেলা বোর্ডে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেন। মহাসভা সিংভূমে ২৫ টি আসনের মধ্যে ২২ টি তে এবং রাঁচি তে ২৫ টি আসনের মধ্যে ১৬ টি আসনে জয় লাভ করে। আদিবাসী মহাসভার এক সভাতে প্রেসিডেন্ট জয়পাল সিংহ বলেন যে, এই ভোটে জয়লাভ প্রমান করে যে জনগণ কার দিকে আছে আদিবাসী না কংগ্রেসের দিকে।

ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি আদিবাসী অসন্তোষের কারন অনুসন্ধানের দায়িত্ব ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে দেয়। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আদিবাসীদের অসন্তোষ দূর করার জন্য জয়পাল সিং এর কাছে সাহায্য চান। জয়পাল সিংহ আদিবাসী মহাসভার জন্য একজন আদিবাসী মন্ত্রী তথা একজন সংসদীয় সচিবের নিযুক্তি, জনসংখ্যার অনুপাতে আদিবাসিদের প্রশাসন, আইন সভা এবং অন্যান্য সেবায় নিয়োগ, রাঁচিতে একটি ডিগ্রি কলেজ এবং বিভিন্ন সমিতি ও বোর্ড আদিবাসীদের মনোনয়নের দাবি জানান। তিনি বলেন যে তারা ও 'পূর্ণ স্বরাজ' এর এবং কংগ্রেসের নীতির সমর্থন করবেন। তিনি ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনাকে একটি কংগ্রেস প্রভাবাধিন প্রান্ত হিসাবে দেখতে চান এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক পথে চালিত করে উপজাতীয়দের জন্য রাষ্ট্রীয় জীবনে সম্মানীয় স্থান দিতে চান।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ৫ ই জুলাই আদিবাসী মহাসভার এক প্রতিনিধি দল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সাথে দেখা করেন কিন্তু ডঃ সিংহ এই ব্যাপার নিয়ে কোন মন্তব্য করেন না। এরই মধ্যে সরকারি মদতে আন্দোলনকে কমজোর করার জন্যে অনাদিবাসীদের নিয়ে ছোটনাগপুর প্রোটেকশান লীগ স্থাপন করা হয়। সেই একই সময় টেবলে ওঁরাও এর নেতৃত্বে সনাতন আদিবাসী মহাসভা গঠিত হয়। এই মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল পৃথকবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩ রা ডিসেম্বর সুভাষ চন্দ্র বোস জামশেদপুরে আসেন। সেই সময় জয়পাল সিং তার সঙ্গে দেখা করে এক প্রস্তাব পেশ করেন যাতে বলাহয় যে, ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনাকে পৃথক কংগ্রেস প্রদেশ হিসাবে গঠন করা হোক। সুভাষ চন্দ্র বোস এই প্রস্তাব না মঞ্জুর করে জয়পাল সিং কে কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করতে বলেন। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস মন্ত্রী সভা পদত্যাগ করে। এতে আদিবাসী মহাসভা খুসি হয়। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে রামগড় কংগ্রেসে পৃথক অঞ্চল গঠনের দাবীর বিরিধিতা করা হয়। জয়পাল সিং তার প্রভাব দেখনোর জন্যে এই রামগড় কংগ্রেসের সঙ্গে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। রামগড় কংগ্রেসের মুখ্য প্রবেশদ্বারের নাম বিরসা মুণ্ডা রাখা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সাধারন আদিবাসী ও খ্রীস্টান আদিবাসী মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এই কংগ্রেসের থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে মুসলিম লীগ পৃথক আদিবাসীস্থান গঠনের পরিকল্পনার সাথে আদিবাসী মহাসভাকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেছিল। এর বিরুধে জয়পাল সিং বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রী সভার দুর্নীতির বিরুধে অনুসন্ধানের দাবি জানান।

এই সময় আরও দুটি উপাদান আদিবাসী মহাসভাকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত, বাঙালী বিহারী বিরোধ এবং দ্বিতীয়ত, মুসলিম লিগের রাজনীতি। বাঙালীরা অনুভব করতে থাকে যে বিহারে তদের স্বার্থ সুরক্ষিত নয়, তাই তারা উপজাতিদের সাথে এক জোট হয় একটি আলাদা রাজ্যের জন্যে। বাঙ্গালী বিহারী বিরোধ মূলত অর্থনৈতিক। ব্রিটিশরা যে নতুন ভূমি বন্দোবস্ত (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) তার ফলে বাঙ্গালীরা এই অঞ্চলে আসতে শুরু করে। বাঙ্গালীরা মহাজনি ও পাইকারি ব্যাবসা করত। দরিদ্র কৃষকরা তাঁদের জমি বন্দক রেখে বঙ্গালী মহাজন দের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিত। বেশির ভাগ সময় কৃষক ঋণ শোধ করতে পারতনা। তখন কৃষকের জমি বাঙালী মহাজনদের কাছে চলে যেত। কিন্তু এই এলাকার বেশির ভাগ জমিদার ছিলেন বিহারে বাঙ্গালীরা কৃষিজাত সামগ্রী দূরবর্তী এলাকায় বিক্রি করে ভাল লাভ করত। যখন এই এলাকায় শিল্পায়ন শুরু হয় তখন বাঙ্গালীরা অধিকাংশ ভাল পদের চাকুরি দখল করে নেয় তাঁদের শিক্ষা ও দক্ষতার দরুন। তাই বিহারিরা বাঙ্গালীদের এই এলাকা থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করে। তখন বঙ্গালীরা ভাবতে থকে যে তাঁদের স্বার্থ এই এলাকায় সুরক্ষিত নয় তাই তারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে উপজাতিদের সাথে একজোট হয়ে আলাদা রাজ্যের দাবি করে।

১৯৪০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম লীগ প্রস্তাবিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে সংযোগ কারি এলাকা হিসাবে উপজাতীয় অঞ্চলকে দেখতে পায় তখন তারা আদিবাসী মহাসভাকে নৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে সমর্থন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ শে অক্টোবর বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কাছে মতামত না নিয়ে এই যুদ্ধে ভারত কেউ জড়িয়ে ফেলে তাই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। জয়পাল সিং ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন এবং সরকারকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীতে এই এলাকা থেকে উপজাতীয়দের নিযুক্ত করতে সহায়তা করেন। তার আশা ছিল ব্রিটিশ সরকার এই সাহায্যের অনুদান হিসাবে তাঁদের পৃথক রাজ্যের দাবীর প্রতি সহানুভূতি শীল হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে আদিবাসী মহাসভাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এগোতে থাকলে আদিবাসী মহাসভা যুদ্ধের জন্য ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রচুর দক্ষ ও অদক্ষ লোক নিয়োগ করতে থাকে বিভিন্ন বাহিনীর জন্য। অনেক আদিবাসীকে এই সময় সেনা বাহিনীতে অফিসারের

পদে উন্নিত করা হয়। কিছু আদিবাসী বেটেলিয়ান কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বিহার রেজিমেন্টে অধিকাংশই ছিল ছোটনাগপুরের আদিবাসী। এই সময় প্রায় ৩০০ জন আদিবাসী মহিলাকে সেনাবাহিনীতে সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই মহিলাদের মধ্য থেকে অনেককে অফিসার পদে উন্নিত করা হয়। আরও প্রায় ৩০০ জন মহিলাকে নার্স হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। বার্মা রেজিমেন্ট তৈরি করারা জন্য প্রচুর সংখক আদিবাসীকে এই অঞ্চল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। জয়পাল সিং এইসময় এই অঞ্চলে অনেকগুলি সভা করেন আদিবাসীদের যুদ্ধে যোগদিতে উৎসাহিত করেন।

এই সময় কালে জয়পাল সিং প্রয়োজন মত বভিন্ন রাজনৈতিক দল যেমন মুসলিম লীগ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট ও বাঙালী শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝোতা করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে জনগণনার সময় জয়পাল সিং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন যাতে আদিবাসীদের হিন্দু হিসাবে নথিভুক্ত না করা হয়। জয়পাল সিং একটি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে জামশেদপুরে 'লেবার ফেডারেশনের' প্রেসিডেন্ট মৈনাক হমি এর সাথে হাত মেলান। আদিবাসী, বাঙালী এবং ওড়িয়া শ্রমিকদের একত্রিত করে কংগ্রেসের আব্দুল বারি এর নেতৃত্বে 'টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের' যে বন্ধ চলছিল তার বিরোধিতা করার জন্য। এতে তিনি সফল হন এবং শেষ পর্যন্ত টিস্কোতে দু'মাস ধরে যে পুরনো বন্ধ চলছিল তা রদ হয়। জুলাই ১৯৪০ শে আদিবাসী মহাসভার নতুন পত্রিকা 'আদিবাসী সাকাম' প্রথম প্রকাশিত হয় যাতে জয়পাল সিং ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন জানান। তাঁর কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব তাকে মুসলিম লিগের কাছাকাছি নিয়ে যায়। ১৯৪১ এর ৮, ৯ ও ১০ মার্চ রাঁচিতে আদিবাসীর মহাসভার যে আধিবেশন হয় তাতে মুসলিম লিগের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জয়পাল সিংহ বলেন যে মুসলমান ও আদিবাসী প্রদেশে কংগ্রেসের হিন্দু রাজকে স্বীকার করা হবে না। মুসলিম লিগ নেতা রগীব এহসান ৩ রা অক্টোবর ১৯৪২ শে জয়পাল সিংহকে একটি চিঠি লেখেন যাতে তিনি বাংলা ও বিহার আদিবাসীরা কংগ্রেস প্রভাবাধীন হয়ে যাচ্ছে বলে আপসোস করেন। ১৯৪৩ এর মার্চে আদিবাসী মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকার কে ধমকি দিয়ে বলেন যে ব্রিটিশ সরকার যদি আদিবাসীদের দাবি না মেনে নেয় তাহলে তারা কংগ্রেসে যোগদান করবে। ১৯৪৪ এর ১৫ আগস্ট বাংলার মুসলিম লিগের নেতারা এক পরিকল্পনা করেন যাতে আদিবাসীর স্থানও ছিল। এই প্রস্তাব ১৬ আগস্ট ১৯৪৪ এ বোম্বাইতে মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার কাছে পাঠান হয়। ১৯৪৫ এর মার্চ মাসে জয়পাল সিংহ এর বার্ষিক অধিবেশনে বলেন যে, মুসলিম লীগ আমাদের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং হিন্দু মহাসভা ও আমাদের প্রতিকুল নয় এবং কংগ্রেস ও আমাদের এই দাবিকে না মঞ্জুর করতে পারবে না। ১৯৪৫ এর ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর এবং ১ লা জানুয়ারি ১৯৪৬ এ রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড, ছোটনাগপুর, পাকিস্তান কংগ্রেসের আয়োজন করা হয় যাতে বিহার ও বাংলার বিশিষ্ট মুসলিম লিগ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবির সমর্থন করে আদিবাসী এবং মুসলিম লীগ ভোট প্রার্থী কে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

ছোটনাগপুর উন্নতি সমাজ ও আদিবাসী মহাসভা এই দুটি'ই ছিল রাজভক্ত। এই সংগঠন দুটি জাতীয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল। জাতীয় কংগ্রেস যেমন ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে সেখানে আদিবাসী মহাসভার প্রেসিডেন্ট জয়পাল সিংহ ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা কে সমর্থন করে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার জন্য উপজাতিদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করতে থাকেন। এই আদিবাসী মহাসভা

পরিচালিত হত সুদক্ষ রাজনৈতিক কর্মী যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত এবং সুবক্তা ছিলেন। এটি ধীরে ধীরে ছোটনাগপুর আন্দোলনে পরিণত হয় এবং শহুরে ও গ্রামীণ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। এটি রাঁচির উপজাতি ছাড়া ও অন্যান্য উপজাতিদের এতে নিয়ে আসে। এখন তারা দাবি করতে থাকে বিহার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, বিহার রাজ্যের অঙ্গ হিসাবে কোন উপজাতীয় রাজ্য নয়। এই সময়ের মধ্যে অনেক গুলি উত্তেজনা পূর্ণ ঘটনা ঘটতে থাকে এবং এই আন্দোলন অনেকটা জঙ্গি রূপ ধারণ করতে থাকলে ও জনগণের সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়। একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চায় এবং আদিবাসী মহাসভা বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব চায় কিন্তু এই দুটি দাবি কংগ্রেস নাকোচ করে দেয়। ১৯৪৬ এর মার্চ মাসে আদিবাসী মহাসভার রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে একটি স্মারক পত্র জমা দেয়। এই স্মারক পত্রে কংগ্রেস পার্টিতে উপজাতিদের স্থান দেওয়ার দাবি জানানো হয়। যখন কংগ্রেস নেতারা এই দাবি নাকজ করে দেয় তখন খুঁটি ও রাঁচিতে আদিবাসী মহাসভা ও কংগ্রেস পার্টি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, এই সংঘর্ষ ও অন্যান্য স্থানে ঝামেলার ফলে আদিবাসী মহাসভা ও কংগ্রেসের ৫ জন সমর্থক নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। ১৯৪৬ এ সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে আদিবাসী মহাসভা মাত্র ৩টি আসন পান এবং নির্দল প্রার্থীরা পায় ১২ টি আসন। স্বয়ং জয়পাল সিং খুঁটি নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস কর্মী ডাঃ মিত্রের কাছে হেরে যান। হেরে যাওয়ার পর তিনি এক স্লোগান তোলেন 'we shall take Jharkhand, Jharkhand is the land of adivasis and non adivasis exploiters will be turned out of the region even by violence'। এই সময় আদিবাসী মহাসভার আরও দাবি ছিল শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে উপজাতিদের সংরক্ষণ, প্রশাসন ও সম্মানীয় চাকরি তে ১/4 অংশ প্রতিনিধিত্ব এবং এই এলাকার শিল্প ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ছোটনাগপুরিদের নিয়োগ করতে হবে। আদিবাসী মহাসভার খারাপ ফলের কারন হল ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের দ্বারা গঠিত সমাজসংস্কার মূলক সংগঠন আদিম জাতি সেবা মণ্ডল এবং টেবলে ওঁরাও এর নেতৃত্বে গঠিত সনাতন আদিবাসী মহাসভার উত্থান। আদিম জাতি সেবা মণ্ডল সরকারের আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট একটি সেবামূলক সংগঠন যার উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান উপজাতিদের দ্বারা পরিচালিত পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া। এই সংস্থা মিশনারি প্রভাব থেকে উপজাতিদের বের করে আনার জন্য বিনামূল্যে বা দাতব্য শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিসেবা দিত। সাধারণত, সেবামণ্ডলের একটি হিন্দু পরিচিতি গড়ে ওঠে এবং খুব তাড়াতাড়ি সাধারণ ও ধর্মান্তরিত উপজাতিদের মধ্যে একটি বিভেদ রেখার সৃষ্টি হয় যেটি ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের উপর একটি বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। অন্যদিকে সনাতন আদিবাসী মহাসভার টেবলে ওঁরাও অনেকগুলি মিটিং করেন আদিবাসী মহাসভার বিরুদ্ধে। তিনি পৃথক উপজাতি প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেন এবং একটি ভূমিসত্ত্ব আইনের প্রস্তাব দেন যাতে ধর্মান্তরিত নয় এমন উপজাতিদের কাছ থেকে খ্রিস্টান উপজাতিদের কাছে ভূমি হস্তান্তরিত রোধ করা যায়। তিনি জয়পাল সিং এর নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছিল তার থেকে সরে আসার জন্য উপজাতিদের কাছে আবেদন জানান কারন এটি ছিল খ্রিস্টানদের স্বার্থে পরিচালিত একটি আন্দোলন। তিনি আরও বলেন যে জয়পাল সিং এর সহযোগী এন.এন.রক্ষিন উপজাতিদের স্বার্থে কাজ করছেন না তাঁর নিজস্ব স্বার্থ আছে। টেবলে ওঁরাও আদিবাসী মহাসভা গঠনে সুদক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৯ এ জয়পাল সিংহ এর সাথে শ্রমিক ইউনিয়ন এর আন্দোলনের জন্য জামসেদপুর গিয়েছিলেন। জয়পাল সিংহ আদিবাসী শ্রমিকদের কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠন

থেকে পৃথক হওয়ার জন্য আবেদন জানান, যদিও এই আবেদনের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। এই সময় টেবলে ওঁরাও, জয়পাল সিংহ থেকে পৃথক হয়ে যান। টেবলে ওঁরাও গোরক্ষ ও শুদ্ধি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। ইনি স্বাধীনতা আন্দোলন, কংগ্রেস ও সনাতন ধর্মের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর দাবি ছিল 'আমরা আদিবাসী, উপজাতি হিন্দু'। এই সব কারণে তিনি আদিবাসী মহাসভা আন্দোলন থেকে সরে এসে নিজে সংগঠন বানান। ১৯৪০-এ কংগ্রেসের যে রামগড় অধিবেশন হয় তাতে টেবলে ওঁরাও ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি ভারতীয় সংবিধান সভার সদস্য ও নির্বাচিত হন।

সনাতন আদিবাসী মহাসভার প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে আদিবাসী মহাসভা মূলত খ্রিস্টান উপজাতিদের সংগঠন। এই সমস্ত কারনের জন্য আদিবাসী মহাসভার জন সমর্থন কমে যায় এবং এর প্রভাব পড়ে ১৯৪৬ এর নির্বাচনে। ১৯৪৬ এর ১৬ ই আগস্ট থেকে পাকিস্তানের জন্য গণ আন্দোলন শুরু হয়। মুসলিম লীগ এই দিনটিকে 'প্রত্যক্ষ আন্দোলন দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই দিন কলকাতায় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই সময় জয়পাল সিংহ এর মুসলিম লীগ সম্পর্কে মহোভঙ্গ হয়। তিনি মুসলিম লীগের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। মহাসভার নেতৃত্বে আলাদা পৃথক উপজাতীয় রাজ্যের আন্দোলনকে সমর্থন করা মুসলিম লিগের বৃহত্তর পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল মাত্র। মুসলিম লীগের পরিকল্পনা ছিল ছোটনাগপুর ও সেন্ট্রাল প্রভিন্স কে একসাথে যুক্ত করে বৃহত্তর মুসলিম রাজ্য হায়দ্রাবাদের সাথে যুক্ত করা। এর ফলে ভারতের মধ্যে একটি ১২০০ মাইল করিডর তৈরি হবে যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবে। বাংলার মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছোটনাগপুর অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা। এরফলে আদিবাসী মহাসভা ও মুসলিম লীগের সম্পর্কে ছেদ পড়ে। কলকাতার দাঙ্গা ও বাংলা ভাগ, বিহারের বাঙ্গালীদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করে এবং এই সময় থেকে বাঙালী-বিহারী বিরোধও তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। যদিও আদিবাসী মহাসভা ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের থেকে সমর্থন পেতে থাকে। ১৯৪৭ সালের মে মাসে আদিবাসী মহাসভা নেহেরু, গাঁন্ধী এবং গণপরিষদের কাছে চিঠি লেখে বিহার থেকে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানায়। স্মারকপত্রে তারা লেখেন 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য, আমাদের প্রচলিত নিয়মকানুন কেই সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, আমাদের জমির উপর আমাদের অধিকার নিরঙ্কুশ করবার জন্য এবং সবার উপরে ক্রমাগত শোষণের হাত থেকে নিজেদের বাঁচার জন্য আমাদের চাই ঝাড়খণ্ড প্রদেশ'।

ভারত স্বাধীন হলে উপজাতিদের মধ্যে নতুন আসার সঞ্চার হয়। ভারতীয় সংবিধানে তাদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। উপজাতীয় নেতারা এই সময় থেকে উপলব্ধি করতে থাকেন যে নির্বাচনী রাজনীতিতে সাফল্য লাভের জন্য আঞ্চলিকতা ও জাতিসত্ত্বার মিলন একান্ত জরুরি। ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত আদিবাসী মহাসভার সদস্য ছিল মূলত সাধারণ ও খ্রিষ্টান উপজাতী ভিত্তিক এবং এই উপজাতি সদস্যরা মূলত ছিল দক্ষিণ বিহারের। কিন্তু এই সময় থেকে অন-উপজাতিদের এই আন্দোলনে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে এই আন্দোলনকে বিস্তৃত ও বৃহৎ জনভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করারা জন্য, সেই সঙ্গে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের জন্য এটি জরুরি ছিল। এই প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে উপজাতি ও অন-উপজাতিদের নিয়ে জাস্টিন রিচার্ড ১৯৪৮ সালে 'ইউনাইটেড ঝাড়খণ্ড ব্লক' গঠন করেন,

ফলে আন্দোলন একটি নতুন মোড় নিল। আদিবাসী মহাসভার সদস্যরাও সংগঠনের গণতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে চাইল। একই সময়ে ছোটনাগপুরের অন-উপজাতিরা ডাল্টন গঞ্জে একটি পৃথক সংস্থা খোলে আইন সভাই তাঁদের প্রতিনিধি পাঠানো এবং পৃথক রাজ্য গঠনের জন্য। এর প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডাল্টন গঞ্জের দেওকি নন্দন সিনহা।

আদিবাসী মহাসভার নেতাদের কাছে এই সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কিভাবে তারা ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা উপজাতি ও আন-উপজাতিদের স্বার্থ একসাথে রক্ষা করবে। আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের জন্য উপজাতি ও অন-উপজাতি উভয়ের স্বার্থে মেলবন্ধন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মহাসভার কিছু সদ্যস্য অন-উপজাতি বিশেষত দিকুদের চরম বিরোধী ছিল। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের সঙ্গে থাকার জন্য এই এলাকার সাদান ও অন-উপজাতির লোকেরা আদিবাসী মহাসভার উপর ক্ষুব্ধ ছিল। আদিবাসী মহাসভা এদেরকে কাছে পাওয়া জরুরি মনে করে। এদের সাথে না পেলে আলাদা রাজ্যের দাবি স্বপ্নই থেকে যাবে। আদিবাসী মহাসভার নেতারা এই সময় উপলব্ধি করেন যে আদিবাসী বলতে সমস্ত ঝাড়খণ্ডীকে বোঝায় না। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালে ৫ ই মার্চ রাঁচির কাছে হিন্দসালাতে আদিবাসী মহাসভার যে বৈঠক হয় তাতে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আদিবাসী মহাসভার নাম পরিবর্তন করে ঝাড়খণ্ড পার্টি রাখা হয় যার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন জয়পাল সিং এবং ইদসেন দেবা সেক্রেটারি হন। ঝাড়খণ্ড পার্টি একটি নতুন আঞ্চলিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। আদিবাসী মহাসভার নাম বদলে ঝাড়খণ্ড পার্টি রাখার উদ্দেশ্য ছিল তাতে অন-আদিবাসীদের টেনে এনে নির্বাচনী রাজনীতিতে সাফল্য লাভ করা।

References:

1. Dutt, Balbir,(2014). *Kahani Jharkhand AndolanKi : Rajya ki Sthapana*, Crown Publications, p.14.
2. Vidyarthi,L.P and Sahay, K.N,(1976). *Dynamics of Tribal Leadership in Bihar: Research project on Changing Leadership in a Tribal Society, 1967-71*, Kitab Mahal, p.158.
3. দাশগুপ্ত, সংযুক্তা, (২০২৪). *ভারতেরপূর্বাঞ্চলেরআদিবাসীসমাজওঅতীতচেতনা : একটিমূল্যায়ন*, পশ্চিমবঙ্গইতিহাসসংসদ, পৃ.২১।
4. Pankaj, A.K., (2017). *Adivasidom; Selected Writings and Speeches of Jaipal Singh Munda*, Pyara Kerketta Foundation, P. 88.
5. Birottam,B,(2013). *Jharkhand: Itihasevam Sanskriti*, Bihar Hindi Granth Academy, p.338.
6. Sharma, K.L.,(1976). Jharkhand Movement in Bihar, *Economic and Political Weekly*, Vol.1, Nos. 1-2, p.45.
7. Sadlan, 1939, January 22.
8. Lecture of Dr. Sri Krishna Sinha in Bihar Council, 1939, 8th February, Appendices 6 in Dutt, Balbir, (2014). *Kahani Jharkhand AndolanKi : Rajya ki Sthapana*, Crown Publications , p.507.
9. Birottam,B,(2013). *Jharkhand: Itihasevam Sanskriti*, Bihar Hindi Granth Academy, p.338.

10. Rana, L.N., (2010). *Jharkhand: Aspect of Freedom Struggle and Constitution Making*, K. K. Publications, p.140.
11. Sharma, A.P,(1988). The Jharkhand Movement: A Critique, *Social Change*, Vol. 18, No. 2, p.62.
12. Misra,K. K and G,Jayaprakasan, (2011). (Ed.). *Tribal Movement in India : Visions of Dr. K.S. Singh*, Manohar Publishers & Distributors, p.169.
13. Areeparampil,Mathew,(2002). *Struggle for Swaraj: A History of Adibasi Movement in Jharkhand,*Tribal Research and Training Center, p.237.
14. Sharma, K.L., (1976). Jharkhand Movement in Bihar, *Economic and Political Weekly*, Vol.1, Nos. 1-2, p.62.
15. L Rana, L.N., (2010). *Jharkhand: Aspect of Freedom Struggle and Constitution Making*, K. K. Publications, pp.60-61.
16. Rana, L.N., (2010). *Jharkhand: Aspect of Freedom Struggle and Constitution Making*, K. K. Publications, p.140.
17. Dutt, Balbir,(2014). *Kahani Jharkhand AndolanKi : Rajya ki Sthapana*, Crown Publications, pp.27-31.
18. Misra,K. K. and G,Jayaprakasan, (2011). (Ed.). *Tribal Movement in India: Visions of Dr. K.S. Singh*, Manohar Publishers & Distributors, pp.169-170.
19. K Sharma, K.L., (1976). Jharkhand Movement in Bihar, *Economic and Political Weekly*, Vol.1, Nos. 1-2,, pp.41-42.
20. Chatterji, Rakhahari, (1985). (Ed.). *Politics in West Bengal*, World Press, p.173.
21. Weiner, Myron,(1978). *Sons of Soil: Migration and Ethnic Conflict in India*, Princeton University Press, 1978, p.191.
22. Dutt, Balbir,(2014). *Kahani Jharkhand AndolanKi : Rajya ki Sthapana*, Crown Publications, pp.22-23.
23. Misra,K. K and G,Jayaprakasan, (2011). (Ed.). *Tribal Movement in India: Visions of Dr. K.S. Singh*, Manohar Publishers & Distributors, p.209.
24. Vidyarthi,L.P and Sahay, K.N,(1976). *Dynamics of Tribal Leadership in Bihar: Research project on Changing Leadership in a Tribal Society, 1967-71*, Kitab Mahal, p.159.
25. Singh, K. S, (2002). (Ed.). *The Tribal Situation in India*, Indian Institute of Advanced Study, p.163.
26. Areeparampil,Mathew,(2002). *Struggle for Swaraj: A History of Adibasi Movement in Jharkhand,*Tribal Research and Training Center, p.238.
27. Singh, K. S, (1982). (Ed.). *Tribal Movements in India*, Manohar Publishers & Distributors, p.67.

উনিশ শতকে শৈলশহরে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ : প্রসঙ্গ অবসরযাপন

উত্তম মেইকাপ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

সারসংক্ষেপ: সমাজে মহিলাদের সার্বিক সামাজিক অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ অধীনতার। মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় লিখেছেন, 'বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন',[১] যারা একই সাথে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সাথে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। তবে উচ্চ-মধ্যবিত্তের একান্নবর্তী পরিবারে মহিলারা ছিলেন সযত্নে রক্ষিত অলংকারের মতো। যেখানে বালিকা বধূসহ সকল বিবাহিত মহিলাদের কঠোরভাবে ঘোমটা দিয়ে অন্তঃপুরেই থাকতে হত। সেখানে মহিলাদের জীবন গতানুগতিক গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করেই কেটে যেত। যৌথ পরিবারে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশজন সদস্যদের একঘিয়েমি প্রতিপালন করতে গিয়ে মহিলাদের কাছে অবসর সময়ের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁরা নিজেদের মতো করে অবসরযাপনের উপাদান খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। অন্তঃপুরিকাগণ গল্প-গুজব করে, তাস খেলে, ধর্মগ্রন্থ শুনে কাটিয়ে দিতেন। তবে পূজাপার্বণ, বিবাহ অনুষ্ঠান জীবনে ভিন্নতার সুযোগ করে দিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্যশিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শ অন্তঃপুরিকাদের বাঁধাধরা জীবনে মুক্তির ধারনা বয়ে আনে। নারীমুক্তির ক্ষেত্রে ভ্রমণের ভূমিকা, ঘোমটার আড়ালে থাকার ফলে বাইরের জগতকে তাঁরা কীভাবে দেখছে, ঔপনিবেশিক শাসনকালে গড়ে ওঠা শৈলশহর বিশেষত দার্জিলিং এর প্রেক্ষাপটে ভ্রমণের আনন্দ কীভাবে অবসরযাপনের মাধ্যম হয়ে উঠছে তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: অন্তঃপুর, তীর্থযাত্রা, শৈলশহর, দার্জিলিং, স্বাস্থ্যনিবাস, অবসরযাপন, ভ্রমণকারী মহিলা।

মূল আলোচনা:

উনিশ শতকের ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের নিরিখে 'মহিলা'রা সমগোত্রীয় চরিত্রের ছিল না। জীবনযাত্রা ও বিত্তের বিচারে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন-এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।[২] অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের কারনে নিম্নবিত্তের মহিলাদের জীবনযাত্রায় কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও স্বাধীনতার সুযোগ ছিল।[৩] উল্টোদিকে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের যৌথ পরিবারে মহিলারা আর্থিক দিক থেকে নিশ্চিত হলেও তাদের জীবন অন্দরমহলে, ঘোমটা দিয়ে পর্দার আড়ালে বদ্ধ ছিল। মোহিতকুমারী লিখেছেন, 'ঘরে বস্ত্র, অলংকার, খাদ্যাখাদ্যের কোন বিলাস-দ্রব্যের কিছুই অভাব ছিল না তবে সর্বদা ঘরে রুদ্ধ থাকাই তাঁর ব্যবস্থা ছিল'। আবার মাত্র পাঁচ বছর বয়সী শরতকুমারী কে খেলাধূলা করতে হত বাড়ির ভেতরে, জানলা বন্ধ রেখে, ছাদে উঠার অনুমতি ছিল না।[৪] যেহেতু এটাই তাদের সম্মানের সূচক তাই তা পালনের ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা করত না।[৫] তাদের মহল স্পটতই অন্দর ও বাহির এই দুভাগে বিভক্ত থাকত। অন্দরমহলের নির্মাণশৈলী কম খোলামেলা, অনেকটা বদ্ধ।[৬] যেহেতু নারী অসূর্যস্পশ্যা তাই

বোধহয় সেমহলে সূর্যের আলোও প্রবেশের অধিকার পেত না। দিনের বেলা স্বামীর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ তো ছিলই না, উপরন্তু দৈবাত স্বামীর সাথে কিংবা বাড়ির অন্যান্য পুরুষদের সম্মুখীন হলে দূর থেকে বড়ো ঘোমটা দিয়ে মহিলাদের লুকিয়ে নিতে হত। উনিশ শতকের শেষদিকে নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রকাশ্যে জানান কঠোর পর্দাপ্রথার কারনে বঙ্গমহিলারা শুধু লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হতেন না, তাদের মানসিক বিকাশও ঘটত না।[৭] অনেক বাড়িতে তো শাশুড়ি, বয়োঃজ্যেষ্ঠ মহিলাদের সামনেও পর্দা দিয়ে থাকতে হত।[৮]

অন্তঃপুরিকাদের কাছে বাইরে বেরোনোর সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। বাপের বাড়ি এবং পূজাপার্বণ উপলক্ষে আত্মীয়দের বাড়ি যাওয়ার মাধ্যমে বাইরে যেতে পারতেন পালকির ঘেরাটোপে। সাধারণত বয়স্ক মহিলারা নিয়মিত গঙ্গাস্নানে যেতেন। আবার প্রগতিশীল ঠাকুরবাড়ির গিন্নিরা গঙ্গা স্নান করতেন পালকি সুদ্ধ ডুবে,[৯] আর মেয়েরা সারাবছরে কেবলমাত্র বিজয়া দশমীর দিন ছাদে ওঠার স্বাধীনতা পেতেন, তবে এটা নিয়েও অভিযোগ করেন মহর্ষির পিসতুতো ভাই।[১০] বিধবারা শেষবয়সে কাশী বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় পেতে তীর্থযাত্রায় বেরোতেন। 'ময়মনসিংহের বারেন্দ্র জমিদার'এ সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখেছেন, নারায়নী দেবী নয় বছর কাশীধামে থাকেন এবং ১২৪৬ সালের ২৪শে বৈশাখ ছিয়াশি বছর বয়সে কাশীপ্রাপ্তি লাভ করেন। একই ইচ্ছায় শ্যামাসুন্দরী দীর্ঘকাল কাশীতে বসবাস করেন। চন্দননগরের নৃত্যগোপাল শেঠের দ্বিতীয়া স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী স্বামী গত হওয়ার পর জীবনের দশ-বারো বছর সামান্য বেশে বিভিন্ন তীর্থে ঘুরে বেড়ান। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাশীপ্রাপ্তির আশা পূরনের জন্য ছেলেরা বাড়িও কিনে দেন সেখানে। ১৩৩৫ সালের ৬ই ফাল্গুন সামান্য রোগভোগের পর তিনি কাশীলাভ করেন।[১১] এভাবে আঠারো-উনিশ শতকের অনেক মহিলারা শেষ আশ্রয়স্থলে যাওয়ার মাধ্যমে অন্তঃপুরের পিঞ্জর থেকে বেরোনোর সুযোগ পেয়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শিক্ষাপ্রসারের ফলে মহিলাদের অন্তঃপুরে মুক্তির আলো প্রবেশ করে। ফলত তাঁরা গার্হস্থ্য দায়িত্বের বাইরেও যে একটা জীবন আছে তা উপলব্ধি করেন এবং ভ্রমণের মাধ্যমে জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেন। শিক্ষার সুবাদে মহিলাদের কাছে বাইরের জগত পরিচিত হতে থাকে এবং নিজের চোখে তার রূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীমতী মায়াসুন্দরীর গঙ্গার উপর নির্মিত পুল দেখতে না পাওয়া[১২] বা বামাসুন্দরী দেবী স্বামীর লেখা চিঠি থেকে মুঙ্গেরের বর্ণনা পড়লেও সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য চাক্ষুষ দেখতে না পাওয়ার দুঃখপ্রকাশ করেছেন পত্রিকায়।[১৩] 'বিদেশবাসিনীর পত্র' শিরোনামে এক মহিলা বামাবোধিনী পত্রিকায় লিখেছেন, 'রেলের গাড়ি, কলের জাহাজ, তারের খবর, ডাকঘর প্রভৃতি (আমাদের ভারতবাসীর জীবনে) যুগযুগান্তরের অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে... এই সকল কারনে অপরিচিত স্থান, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি দেখিবার সাধ আমার মনে বহুদিন হইতে বড়ই প্রবল। কিন্তু আমি এতদিন হাওড়ার ষ্টেশন পর্যন্ত কখনই দেখি নাই, তাই এইটুকু আসিয়াই আমার মনে বিদেশ ভ্রমণের সুখ অনুভূত হইতেছে'।[১৪] অর্থাৎ রেলপথের প্রসার তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি তাদের ভ্রমণের পথকে সুগম করে তোলে। এইসাথে প্রগতিশীল ব্রাহ্মনেতা ও শিক্ষিত শ্রেণীর প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে পর্দা প্রথার কঠোরতা হ্রাস পায়। ফলত ১৮৬৪ সালে রমাসুন্দরী দেবী কাশী দর্শনে বেরিয়েছিলেন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে।[১৫] লক্ষ্মীমণি দেবী ১৮৭০ সালে লিখেছেন, 'মাঘের প্রথম ভাগে আনন্দিত চিতে। বাষ্পরথে চলিলাম বিদেশ ভ্রমিতে'। মহিলাদের কাছে অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকাই যেখানে রীতি সেখানে কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়ায় বেড়াতে যাওয়া বিদেশ ভ্রমণের সমান মনে হয়েছে। এই স্থানগুলি চিরাচরিত ধর্মক্ষেত্র

বলে পরিচিত হলেও তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে এই স্থানগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত উল্লেখ করেছেন।[১৬] সৌদামিনী মজুমদার ও মহামায়া বসু ১৮৭২ সালে উল্লেখ করেছেন, 'আমরা বিদেশ পর্যটন করিবার মানসে এবং অন্যান্য উদ্দেশে ২৫ আষাঢ় কলিকাতা পরিত্যাগ করি'। ভ্রমণের উদ্দ্যেশে বেরিয়ে ঘাট পর্বতশ্রেণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, ভূগোল বইতে পড়া প্রকৃতির রূপ চাক্ষুষ করে ধন্য মনে করছেন নিজেকে। বোম্বাইতে পৌঁছে সান্ধ্যকালীন সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে এসে তাদের মনের সমস্ত ক্লেশ, চিন্তা দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। একই সাথে তাঁরা মারাঠি, গুজরাটি ও পার্সি মহিলাদের জীবনযাত্রার সাথে বঙ্গমহিলার জীবনকে তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।[১৭] 'পরিচারিকা' পত্রিকায় অনামা লেখিকা জব্বলপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সেখানকার শ্বেত পাহাড়ের শোভাকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[১৮] এদেশের উষ্ণ আবহাওয়া ও রোগব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য অঞ্চলে শীতকালীন রাজধানী, স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলেন। এছাড়া এই শৈলশহরগুলি ইংরেজদের অবসরযাপনের কেন্দ্রও ছিল। সিমলা, মুসৌরি, নৈনীতাল, অক্টামুন্ড, দার্জিলিং এধরনের শৈলশহরের পরিচিত নাম। ইংরেজদের দেখাদেখি এদেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার ও পেশাদারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবসরযাপন, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য নিয়মিত বেড়াতে যাওয়া শুরু করেন এই স্থান গুলিতে। তবে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। ভ্রমণকারী মহিলারা রেলপথে অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার সময় পর্বতের দৃশ্য দেখলেও প্রথম ১৮৮০ সালে অনামা লেখিকা 'পর্বত ভ্রমণ' শিরোনামে প্রত্যক্ষভাবে পর্বত তথা নৈনিতাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। নৈনিতালে সাতহাজার ফিট উঁচু পর্বত শিখরে থাকার সময় তাঁর মনে হয়েছে মেঘ সমুদ্রের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। একই সাথে পৌরানিক ঐতিহ্যকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন ত্রিষি সরোবর ও ভীমতলা জলাশয়ের সান্নিধ্যে এসে। প্রকৃতির অপূর্ব শোভা দর্শনের আকাঙ্খা এস্থানে যথার্থই পরিতৃপ্ত হয়। এই স্বভাবের রাজ্যে সর্বদা "অচল ঘন, গহন, গুণ গায় তাঁহারি"।[১৯] স্নেহলতা সেন বেড়িয়ে আসার তিন বছর পরে লিখেছেন 'মসুরি পর্বত এবং সেখানে যমুনার যে অপূর্ব রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহা চিরকালের জন্য আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত থাকিবে'। তিনি ট্রেনে বাঁকিপুর থেকে সাহারানপুর এবং সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে দেরাদুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে যাওয়ার সময় প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন দৃশ্যে তাদের পথের ক্লান্তি কমে গিয়েছিল। মসুরি পাহাড় যেন নীল আকাশের বুকে ছবি এঁকে রেখেছে।[২০] তবে এই শৈলনিবাস গুলির মধ্যে দার্জিলিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই শহরটি গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

শৈল শহর দার্জিলিং

কোম্পানির বণিক কর্মচারীরা এদেশের প্রশাসকরূপে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসার ফলে এখানকার উষ্ণ আবহাওয়া ও অজানা রোগের সাথে লড়াই করে টিকে থাকাটাই বড়ো সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। নিজেদের প্রয়োজনে তাঁরা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান চালায়। এই অঞ্চল তাদেরকে নিজের দেশের আবহাওয়ার অনুভূতি দেয়। প্রশাসনিক চাহিদা থেকে এদেশে বসবাসকারী ইংরেজ ও সেনাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং, সিমলা, অক্টামুন্ডপ্রভৃতি শৈলশহরগুলি গড়ে তোলেন। অবস্থানগত গুরুত্বের বিচারে দার্জিলিং ইংরেজদের কাছে 'পার্বত্য অঞ্চলের রানী' হয়ে ওঠে। দার্জিলিং শহরটি গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক স্বার্থের কথা ভেবে। তিব্বতের সাথে বানিজ্যিক গুরুত্বের কারনে কোম্পানীর সাথে নেপাল রাজের যুদ্ধ অবশম্ভাবী হয়ে ওঠে। এবং ১৮১৬ সালে সগৌলির সন্ধি দ্বারা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বড়ো অংশ কোম্পানীর দখলে

আসে, যেখানে সিমলা শৈলশহর গড়ে ওঠে। আবার ১৮১৭ সালে তিতলিয়ার সন্ধি অনুযায়ী কোম্পানী দার্জিলিং দখল করে সেটি সিকিমের রাজাকে প্রদান করেন, যা নেপাল ও ভারতের মধ্যে বাফার স্টেট হিসেবে কাজ করে।

১৮২৮ সালে সামরিক অধিকর্তা লয়াড ও মালদার বানিজ্যিক কর্তা গ্রান্ট তাদের সমীক্ষায় চংটং কে স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলার জন্য আদর্শ বলে চিহ্নিত করেন। ১৮২৯ সালে পুনরায় সমীক্ষার জন্য সরকার হার্বার্টকে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৫ সালে লয়াড সিকিম রাজের কাছ থেকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইজারা নিয়ে দার্জিলিংএ রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে আর্চিবোল্ড ক্যাম্পবেল এখানে চার্চ, কাছারী, বাজার ইত্যাদি নির্মাণ করে একে বসবাসের উপযোগী রূপে গড়ে তোলেন। তবে এর নির্মাণ কাঠামোর প্রতিটি ছত্রে রাজকীয় মাত্রা পরিলক্ষিত হয়, যা নগর কলকাতার শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় অঞ্চলের যে পার্থক্য তাকে স্মরণ করায়। তাছাড়া দার্জিলিং কেবলমাত্র স্বাস্থ্যনিবাস ও অবসরযাপনের কেন্দ্র নয়, এর সাথে কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল।[২১] এখানে ইংরেজদের সাথে সাথে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকেও পর্যটকেরা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেড়াতে আসা শুরু করেন।

ইংরেজদের সাথে তাল মিলিয়ে বঙ্গদেশের মহারাজা, জমিদারেরাও দার্জিলিং এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বর্ধমানের মহারাজ প্রতাপচন্দ্র মহতাব, কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ন এখানে প্রাসাদোপম আবাস গড়ে তোলেন ও গ্রীষ্মকালে সপরিবারে বেড়াতে যেতেন।[২২] এছাড়া তাজহাটের জমিদার গোবিন্দলাল রায়, চাকদিঘির মহারাজ মনিলাল সিংহ, ময়মনসিংহের জমিদার শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী, নদীয়ার মহারাজ, ত্রিপুরার মহারাজ ও পুটিয়ার জমিদার প্রমদাকান্ত রায় নিয়মিত দার্জিলিং এ যেতেন। রাজা, মহারাজা, জমিদারদের পাশাপাশি উনিশ শতকের চাকুরীজীবী শ্রেনীর কাছেও এই স্থান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ গড়ে ওঠার পর বছরে অন্তত একবার দার্জিলিং বেড়ানো নিয়মিত হয়ে ওঠে এই শ্রেণীর কাছে। সাধারণত গ্রীষ্মকালে অথবা পূজার ছুটিতে যাওয়ার চল তৈরী হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বোস, জগদীশচন্দ্র বোস, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রাহ্মনেতা রামানন্দ চট্টপাধ্যায়, বি. এন. শীল, হেমলতা সরকার, মহারানী সুনীতি দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখগণ ভ্রমণের উদ্দ্যেশে বা স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে দার্জিলিংএ বেড়াতে গিয়েছেন।[২৩] দার্জিলিঙে এদেশীয়দের বাড়বাড়ন্তের কথা বাংলার মুখ্য অধিকর্তা তার ১৯০৩ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য স্থানের মতো দার্জিলিংও মহিলাদের কাছে ভ্রমণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী থেকে মহিলাদের চোখে দার্জিলিং এর চিত্র ফুটে উঠেছে। কামিনী সেন স্বীকার করেছেন যে, যতটা শিক্ষিত হলে দার্জিলিঙের সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় তার অল্পই তিনি করতে পেরেছেন। এই স্থানকে চাক্ষুষ করে একাধারে রেলপথে যাওয়ার ক্লেশ ভুলে গিয়েছেন। অন্যদিকে অর্থাভাবে যারা এমন সুন্দর স্থান দেখে নয়ন-মনের তৃপ্তি সম্পাদন করতে পারেন না তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য যে পার্বত্য পথের মধ্যে তিনি জীবন পথের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[২৪] বঙ্গমহিলার প্রগতিতে ব্রাহ্ম আদর্শে বিশ্বাসী ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের অবদান অনস্বীকার্য। যারা সামাজিক কুপ্রথার প্রাচীর ভাঙতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই পরিবারের অন্যতম সদস্য স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৭ সালে দুই কন্যা, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী মৃনালিনী দেবী, শিশুকন্যা বেলা ও দিদি সৌদামিনী

দেবীকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যান। স্বর্ণকুমারী দেবীর দার্জিলিং ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সেখানকার প্রাকৃতিক বর্ণনার পাশাপাশি তার ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। দার্জিলিং এ গিয়ে তাঁরা কাসেলটন হাউসে ছিলেন। যেখানে প্রথমদিকে তাঁরা সবাই সান্ধ্যকালীন সাহিত্যপাঠের মজলিশে মিলিত হতেন, পরে অবশ্য বেড়ানোর আনন্দে এই আসর অনিয়মিত হয়ে পড়ে। দার্জিলিং যাওয়ার পরেই অসুস্থ হওয়ায় ঘরে বসে কাটাতে হয় স্বর্ণকুমারীকে। বেড়াতে এসে শয্যাশায়ী হওয়ার জন্য তিনি মহিলাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকাকে দায়ী করেছেন। একটু সুস্থ হলে নিয়মিত পার্ক ও মলরোডে বেড়াতে যেতেন। ধীরে ধীরে দার্জিলিং এর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যেমন ভিক্টোরিয়া ফলস, অবজারভেটরি হিল, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সিঞ্চল, টাইগার হিল ও রঙ্গিত বেড়াতে গিয়ে সেখানকার অভিজ্ঞতা জীবন্ত রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামার পর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে তাঁর কাছে স্বর্গের দৃশ্যের মতো মনে হয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে দার্জিলিং যাওয়ার সময় এতটা কাছ থেকে বনানী, পাহাড়, মেঘ, ঝরনা দেখে তাঁর মনে হয়েছে কল্পনার পরীর রাজ্যকে বাস্তবে অনুভব করতে পারছেন। সেখানে থেকে বেড়াতে যাওয়ার একটা অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়, কিন্তু অবিশ্রান্ত বর্ষায় ঘরে বন্দী হয়ে পড়াকে মেনে নিতে পারেননি। স্বর্ণকুমারী দেবী কেবল নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করেননি, দার্জিলিঙের ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। যেহেতু ইংরেজদের কাছে দার্জিলিং স্বাস্থ্যনিবাস ও অবসরযাপনের কেন্দ্র তাই সেখানকার শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চল, সরকারী ভবনের চারপাশের গঠন আলাদা রকমের। এখানে ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা হেঁটে বেড়ান, বিশ্রাম নেন, ঘোড়ায় চড়েন, বৈকালিক ব্যান্ডের আসরে মিলিত হন। এখানে বসবাসকারী দেশীয় মহারাজদের মধ্যে বর্ধমান মহারাজ অন্যতম। তাকে নিয়ে যে অতিকথা রয়েছে যেমন এখানকার দেবতা দুর্জ্জয়লিং প্রতিষ্ঠা, বোটানিক্যাল গার্ডেনে কাক ও শেয়ালের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। এছাড়া লেপচা, ভুটিয়া ও তিব্বতিদের সম্পর্কে নানান কৌতূহলদ্দীপক বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।[২৫] সপরিবারে নলিনীবালা বসু স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে আট মাস সেখানে কাটান। এসময় তিনি এখানকার বিভিন্ন জায়গা যেমন রঙ্গিত, সিঞ্চল, যুমরক প্রভৃতি স্থানের মনোরম শোভা উপভোগ করেছেন। তবে সবথেকে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ফেলুট শৃঙ্গ দেখতে গিয়ে অর্জন করেছেন। এগারো জন সদস্যের দল কেউ হেঁটে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে গল্প করতে করতে যাওয়ার সময় পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যে চমৎকৃত হয়েছেন। দার্জিলিং থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত ফেলুট যাওয়ার সময় পথে বিশ্রাম কেন্দ্রে রাত্রিযাপন করেন। যাওয়ার সময় রাশিয়ান পর্যটকের কাছে তুষারপাতের খবর শুনে মন অসীম উৎসাহে ভরে ওঠে এবং টংলু শৃঙ্গে পৌঁছে বাংলোর কাছে স্তূপাকার বরফরাশি দেখে পথের সকল শ্রান্তি ভুলে গিয়েছেন।[২৬] সরলা দেবী দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রঙ্গিত নদী দেখতে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। তবে নদীকে পাশ থেকে দেখার অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁর মনের আনন্দ ধরা পড়েছে।'... এই যে ফেণকুন্তলা, ভীষন নির্ঘোষময়ী কুপিতা সুন্দরী তটিনী এর তুল্য প্রাণময়ী কোন মানবীকে দেখা গেছে? যে মৌন পাষাণখণ্ড তার বিশাল বক্ষের উপর কল্লোলিনীর সমস্ত অত্যাচার অবিকৃত ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন করছে তার ভিতরেও চৈতন্যের প্রচ্ছন্নসঞ্চার কে না উপলব্ধি করবে? আমরা পুলকিতহৃদয়ে, অনন্যমনে এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম'।[২৭]

উপসংহার

সামাজিক আচারবিধির বেড়াজালে আবদ্ধ মহিলাদের সঙ্গে ভ্রমণের সম্পর্ক একেবারে বিপরীত। পুরুষের নিয়ন্ত্রনে অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকাটাই যেখানে তাদের কাছে স্বাভাবিক, সেখানে নিজের

ইচ্ছা, অধিকার, সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ভাববে এমন আশা করা যায় না। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সান্নিধ্যে নারীশিক্ষার সুযোগ না থাকা, সামাজিক কুপ্রথার কারনে মহিলাদের দুর্দশা এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় পত্রপত্রিকায় শিক্ষিত নারীদের লেখালেখি থেকে। সর্বোপরি বাইরের জগতকে দেখার মানসিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন অনেকে। এবং বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই সাধ পূরনের জন্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে সেখানকার মানুষজন বিশেষত নারীদের জীবনযাত্রাকে অনুধাবন করেন। তাই এই ভ্রমণ তাদের কাছে একপ্রকার মুক্তির মাধ্যম হয়ে ওঠে। তবে অন্তঃপুরটাই তাদের জগত হওয়ার ফলে যখনই এর বাইরে বেরোতে পেরেছেন তখনই সেটি তাদের কাছে বিদেশ ভ্রমণের সমান হয়ে উঠেছে। ভ্রমণের সাধ পূরণ হওয়ায় তাঁরা যে মানসিক দিক থেকে তৃপ্ত, আনন্দিত তা প্রকাশ পেয়েছে তাদের বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনার ভাষায়। গ্রীষ্মের দাবদাহ, পূজাবকাশ বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে সপরিবারে বেড়াতে যাওয়ার মাধ্যমে মহিলারা অবসরযাপনের আধুনিক ধারনার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেন। তাদের লেখা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরো বেশি সংখ্যক মহিলাকে দেশের বিভিন্ন স্থান এবং বিদেশ ভ্রমণে উৎসাহী হতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী .রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য ,প্রভাতকুমার , .৩২৬.পৃ ,১৮৯৪ ,গ্রন্থনবিভাগ

২. Girish Chandra Ghose, “Female Occupation in Bengal”, Bela Dutta Gupta (ed.) *Sociology in India,* Kolkatta: Progressive Publishers, 1972, Appendix V, pp. 52-63.

৩. মুরশিদ ,২০০০ ,কলকাতাঃ নয়া উদ্যোগ ,নারী প্রগতিঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী ,গোলাম , .৫১ .পৃ

৪. দেব .২২.পৃ ,২০২৩ ,কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ,অন্তঃপুরের আত্মকথা ,চিত্র ,

৫. T. Raychaudhuri, ‘Norms of Family Life and Personal Morality among the Bengali Hindu Elite, 1600-1850’, M. Baumer (ed.) Aspect of Bengali History and Society. University of Hawaii: The University Press of Hawaii, pp. 17-20.

৬. Borthwick, Meridith,*The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905.* Princeton: Princeton University Press,1984, p.7-10.

৭. নগেন্দ্রবালা মুস্তোফিম কল্প৫ ,বামাবোধিনী পত্রিকা ,অবরোধে হীনাবস্থা ,, ৪র্থ ভাগ-৩০ .পৃ ,১৮৯৫ , .৩১

৮. মুরশিদ .৫৩ .পৃ ,পূর্বোক্ত ,

৯. ঠাকুর,১৩৪৭,কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ,ছেলেবেলা ,রবীন্দ্রনাথ , ভাদ্র.২ .পৃ ,

১০. দেবী ,পিতৃস্মৃতি ,শ্রী সৌদামিনী ,*প্রবাসী,জ্যৈষ্ঠ,১৩১৯* , ১২শ ভাগম খন্ড১ ,, পৃ .২৩৫-২৩২ .

১১. অরিন্দম চক্রবর্তী ,“ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন বারানসীর বাঙালীরা“, *রবিবাসরীয়,আনন্দবাজার পত্রিকা* , ১৭ই মার্চ .২০২৪,

১২. শ্রীমতী মায়াসুন্দরী .১২৮২,শ্রাবণ ,“নারী জন্ম কি অধর্মম খন্ড১ ,বঙ্গমহিলা “, ৪র্থ সংখ্যা-৯৩ .পৃ , .৯৪

১৩. দাশগুপ্ত.১৩ .পৃ ,২০১৬ ,কলকাতাঃ গাঙচিল .ম খন্ড১ আমাদিগের ভ্রমণ বৃতান্ত ,দময়ন্তী ,

১৪. অজানাম কল্প৫ ,বামাবোধিনী পত্রিকা ,বিদেশবাসিনীর পত্র ,, ৩য় ভাগসংখ্যা ৩৬২ ,, পৃ .৪৯-৩৪৭ .

১৫. ঘোষরমাসুন্দরী ,,“কাশীদর্শন-”,*বামাবোধিনী পত্রিকা* , ফাল্গুন .৮২-৮১ .পৃ ,পূর্বোক্ত ,দাশগুপ্ত ,১২৭০ ,

১৬. দেবী (বসু), শ্রী লক্ষ্মীমণি. "বিদেশ ভ্রমণ" *বামাবোধিনী পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ- আষাঢ় ১২৭৭, দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৬.

১৭. অজানাআমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ ,ত ,আমাদিগের বোম্বাই ভ্রমণ ,*বামাবোধিনী পত্রিকা,* ভাদ্র ,ফাল্গুন-.৯৪-৮৭ .পৃ ,পূর্বোক্ত ,দাশগুপ্ত,১২৭৯

১৮. অজানা ,THE WHITE HILLS OF JABBALPORE,*পরিচারিকা১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ ,,*দাশগুপ্ত .পৃ ,পূর্বোক্ত , .৯৯-৯৫

১৯. অনামা ,পর্বত ভ্রমণ নৈনীতাল ,*পরিচারিকা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭,* দাশগুপ্ত.১০২-১০০ .পৃ ,পূর্বোক্ত ,

২০. সেন, স্নেহলতা, মসুরি, *সখা ও সাথী, ১৩০১,*দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১-১৮৫.

২১. Bhattacharya, Nandini. "Leisure, Economy and Colonial Urbanism: Darjeeling, 1835–1930." *Urban History*, vol. 40, no. 3, 2013, pp. 442–61. *JSTOR*,https://www.jstor.org/stable/26398227.Accessed 16 Dec. 2024.

২২. Chowdhury ,Santi P. ,The Bengali traveler, download fromhttps://www.india-seminar.com on 21 Dec.2024

২৩. Mukherjee, Suman. "Leisure and Recreation in Colonial Bengal: a Socio-Cultural Study." *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 71, 2010, pp. 764–73. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/44147545. Accessed 16 Dec. 2024.

২৪. সেন(বঙ্গমহিলা সমাজে পাঠ করেন)কুমারী কামিনী ,, দার্জিলিং ভ্রমণ ,*বামাবোধিনী পত্রিকা , য় কল্প৩,১২৯৩, ৪র্থ ভাগ,*আশ্বিন.১৭০ .পৃ,

২৫. দেবী, স্বর্ণকুমারী,দারজিলিং পত্র,*ভারতী, দ্বাদশ খণ্ড, ১২৯৫,* পৃ. ২২.

২৬. বসু,নলিনীবালা, হিমালয় ভ্রমণ, *সখা, ফাল্গুন-চৈত্র, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ন,* ১২৯৯, দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭-১২২.

২৭. চৌধুরানী, সরলা দেবী, অশ্বপৃষ্ঠে দার্জিলিং থেকে রঙ্গিত, ১৩০১, *ভারতী,* সংখ্যা ১৮, পৃ. ১৪-২৫।

থিয়েটারে সিনিক ডিজাইনের উপাদান : দৃশ্য সৃজনে নান্দনিক উপাদানের তত্ত্বগত ও শৈল্পিক গুরুত্ব অন্বেষণ

আরাফাতুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ : থিয়েটারে সিনিক ডিজাইন হলো মঞ্চে দৃশ্য-জগৎ সৃষ্টির একটি মননশীল প্রক্রিয়া। যা নাট্য পরিবেশনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। প্রায়শই দৃষ্টিগ্রাহ্য উপকরণের অন্তর্ভুক্তিতে মঞ্চে সৃজিত হয় স্থানিক বিভ্রম। যা নাট্যামোদী দর্শককে প্রতিনিয়ত বিমোহিত করে চলছে। নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠ, বিশ্লেষণ, মহড়া থেকে চূড়ান্ত প্রদর্শনী পর্যন্ত থিয়েটারে সিনিক ডিজাইন একটি সম্মিলিত ও পুনরাবর্তনমূলক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। তাই এই সম্পর্কে নাট্য শিক্ষার্থী, অনুরাগী ও অনুশীলনকারীর সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এযাবৎ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ভাষায় সিনিক ডিজাইনরে উপর রচিত কিছু প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক পাওয়া গেলেও; তার অধিকাংশই যেমন দুর্বোধ্য ও গুরুগম্ভীর ভাষায় লিখিত, তেমনই প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। যা সিনিক ডিজাইনের উপাদান সর্ম্পকে তত্ত্বগত ও শৈল্পিক ধারণা পেতে নেহাৎ যতসামান্য বলে বিবেচিত। তাই অপ্রতুল গ্রন্থ ও ভাষাগত প্রচ্ছন্নতা বিবেচনায় একটি সহজবোধ্য ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধের অবতারণা। বক্ষ্যমাণ এই প্রবন্ধে সিনিক ডিজাইনের স্বরূপ অন্বেষণের পাশাপাশি দৃশ্য সৃজনে সিনিক ডিজাইনের নান্দনিক উপাদানের তত্ত্বগত ও শৈল্পিক গুরুত্ব অন্বেষণ সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো।

সূচক শব্দ : সিনিক ডিজাইন, রেখা, আকৃতি, অবয়ব, পরিমাপ, রং, বয়নবিন্যাস, বিস্তার।

১. ভূমিকা : একটি নাটকের বিমূর্ত ও অব্যক্ত কথাগুলোর দৃষ্টিলব্ধ বাহ্যিক রূপ হলো সিনিক ডিজাইন। যা পাণ্ডুলিপিতে নাট্যকারগণ তাদের রচিত শব্দ, বাক্য, চরিত্র, চিন্তা, ঘটনা, রূপক, বর্ণনা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রযুক্ত করে থাকেন। আর সিনিক ডিজাইনারগণ মঞ্চে তাদের কারিগরি চাতুর্য ও সৃজন ক্ষমতার সমন্বয়ে নাট্যকারের লেখা বিভিন্ন শব্দ, বাক্য, চিন্তার এমন এক অ-বাচনিক চিত্রভাষা তৈরি করেন। যেখানে কাঠ আর ইট, পাথরের মঞ্চটি পরিণত হয় নৈসর্গিক ভুবনে। ফলত দর্শকমনে একটি স্থায়ী, গভীর ও অনুরণশীল অনুভূতির রেখাপাত ঘটে। তাই সিনিক ডিজাইনের নান্দনিক উপাদানের ধারণা শুধু বিমূর্ত বিষয় নয় ; বরং বাস্তবসম্মত, সৃজনশীল কর্ম-উপকরণের সন্নিবেশ। যার যথার্থ প্রয়োগে বিমূর্ত হয় মূর্ত, স্বপ্ন হয় দৃশ্যমান। সিনিক ডিজাইনারগণ যাতে উপাদান সমূহ সম্পর্কে সহজে তাত্ত্বিক ও শৈল্পিক উপলব্ধি এবং প্রায়োগিক দক্ষতা লাভ করে নাট্যপ্রযোজনার মূল ভাবনা বা আখ্যানকে দৃশ্যগতভাবে সৃজন করতে পারেন। তাই দৃশ্য সৃজনে সিনিক ডিজাইন ও তার নান্দনিক উপাদান সমূহের তত্ত্বগত ও শৈল্পিক গুরুত্ব বিষয়ক অনুসন্ধান, পাঠ ও আলোচনা সবসময় প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যময়।

২. সিনিক ডিজাইন : সাধারণভাবে সিনিক ডিজাইন বলতে একটি নাটকের ভিজ্যুয়াল জগৎ তৈরির শিল্পকে বোঝায়। যা অনেকের কাছে স্টেজ ডিজাইন বা সেট ডিজাইন নামেও বহুলভাবে পরিচিত।

> "Set design is the creation of the physical space in which the action of performed event takes place. Primarily used to describe theatre productions, it constitutes all the scenery, furniture, props, appearance, and overall of the stage. Set design is also known as scenic design, theatrical design, and stage design."[১]

সহজ করে বললে- নাট্য মুহূর্ত যে পারিপার্শ্বিকতায় সংঘটিত হয়, সেই পারিপার্শ্বিকতার দৃশ্যগত রূপায়ণই হলো সিনিক ডিজাইন।[২] সিনিক ডিজাইনে স্থানের সাথে গল্প, গল্পের সাথে মেজাজ ও সর্বোপরি চরিত্রের প্রাণবন্ত সন্নিবেশ থাকা খুবই জরুরি। কেননা-"নাট্য ঘটনার প্রেক্ষাপট দৃশ্যায়নই মঞ্চ পরিকল্পনার প্রথম উদ্দেশ্য। কোথায় হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, অর্থাৎ দর্শকের সম্মুখে সমগ্র পারিপার্শ্বিকতাকে উন্মোচন করা।"[৩] তাই সিনিক ডিজাইনাররা খালি মঞ্চে দৃশ্য উপকরণ সমূহে রং, রেখা, আকৃতির মতো বিভিন্ন উপাদানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নান্দনিক বিন্যাস নিশ্চিত করে নাটকের একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাষা তৈরি করেন। যাতে সবাই গল্প বুঝতে ও নাটকের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হন। তাই থিয়েটারে দর্শকদের অভিজ্ঞতা সৃজনে একজন দক্ষ সিনিক ডিজাইনারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সবসময় প্রাসঙ্গিক। কেননা একটা প্রযোজনার সফল সমাপ্তির জন্য নাট্য নির্দেশক, অভিনেতা এবং দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ডিজাইনারগণ সবসময় ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। যাতে চূড়ান্ত প্রদর্শনীতে নির্মিত দৃশ্য সজ্জায় বাধা-বিঘ্ন ব্যতিরেকে অভিনেতাদের গতিবিধি নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়ে সামগ্রিক পরিবেশনার সফল সমাপ্তি ঘটে। তাই বলা হয়ে থাকে সিনিক ডিজাইন একটি সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়াও বটে।

৩. উপাদান : সাধারণত কোন কিছুর উপাদান বলতে সেইসব অপরিহার্য উপকরণ বা মৌল ধারণাকে বোঝায়, যার সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট বস্তু বা বিষয় সৃষ্টি হয়। যেমন: ইট, বালি, লোহা, সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয় একটি বিল্ডিং। কেননা একটা পাকা বাড়ি নির্মাণে উল্লিখিত বস্তুসমূহ অপরিহার্য। তাই আলোচ্য নিবন্ধে সিনিক ডিজাইনের নান্দনিক উপাদান বলতে সেই সব বিষয়াবলিকে নির্দেশ করছে, যার উপস্থিতিতে মঞ্চে আরোপিত দৃশ্যগত উপকরণ বাস্তবানুগ বা শৈল্পিক আবহ প্রকাশ করতে সক্ষম। অর্থাৎ- দৃশ্যসজ্জা নির্মাণে আলোচ্য মৌল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একজন ডিজাইনার নাটকের মধ্যেকার অনুক্ত বার্তাটি দৃশ্যগত উপায়ে খুব সহজে দর্শকদের মাঝে প্রকাশ করতে পারেন। এককথায়- দর্শকদের সাথে অ-বাচনিক উপায়ে যোগাযোগের কতগুলো অনিবার্য সৃজনশীল উপকরণ হলো সিনিক ডিজাইনের নান্দনিক উপাদান। দৃশ্যসজ্জায় যার ভূমিকা কোনোভাবেই অস্বীকার করার সহজ কোনো পন্থা নেই। বহু বিদগ্ধজন সিনিক ডিজাইনের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করলেও এই প্রবন্ধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন: রং, রেখা, বয়নবিন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে তত্ত্বগত ও শৈল্পিক তাৎপর্য বিষয়ক বিশ্লেষণ তুলে ধরার প্রয়াস পাই এভাবে –

৩.১ রেখা : সিনিক ডিজাইনে বহুল ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হলো Line বা রেখা। সাধারণত রেখা বলতে বোঝায়- একটি বিন্দুর চলমান পথ বিশেষ। অন্যভাবে "Line cane be defined as a mark that connects tow points."[৪] কিংবা একাধিক বিন্দুর পারস্পরিক সংযোগের ফলে যে পথ তৈরি হয়, সেই পথ বিশেষই হলো Line বা রেখা। রেখার দৈর্ঘ্য ব্যতীত প্রস্থ ও ভেদ নেই। তাই ইউক্লিড বলেন- রেখা হলো প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য। আমরা ছোট বেলা

থেকে এই রেখার সাহায্যে লিখেছি কত সহস্র বর্ণ, শব্দ ও বাক্য। আর এঁকেছি কত অজস্র অবয়ব কিংবা গাছ, লতা, পাতা ও

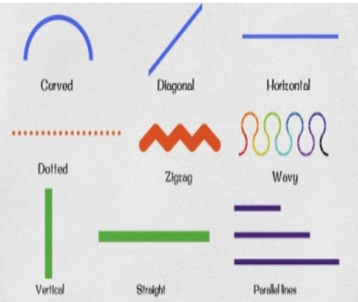

চিত্র-১, সূত্র: ইন্টারনেট

ফুলের নকশা। প্রকাশ করেছি কত শত মনের প্রগাঢ় অনুভূতি। একজন চিত্রশিল্পী একদিকে যেমন তাঁর ক্যানভাসে রেখা টেনে টেনে ফুটিয়ে তোলেন অনিন্দ্য সুন্দর চিত্রকর্ম। অন্যদিকে আবার একজন সিনিক ডিজাইনার তেমনি রেখার সাহায্যে দৃশ্য পরিকল্পনায় নিয়ে আসেন নাটকীয়তা ও অভিনবত্ব। কেননা-"রেখা তৈরী করতে পারে আকৃতি, করতে পারে দিক নির্দেশ এবং শিল্পকর্মের ভেতর সৃষ্টি করতে পারে ছন্দের। রেখা দিয়ে প্রকাশ করা যায় মনের ভাব ও অনুভূতি। যেমন- ক্রোধ, আনন্দ, উল্লাস, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি।"[৫] তাই সিনিক ডিজাইনে বিভিন্ন ধরনের রেখার বিন্যাস দেখা যায়। যা ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে সমর্থ। যেমন- উলম্ব রেখা দ্বারা শক্তি, সমতা, প্রতিপত্তি; আনুভূমিক রেখা দ্বারা স্থিতি, প্রশান্তি, নিশ্চলতা; আঁকাবাঁকা রেখা দ্বারা জটিলতা, বিপর্যস্থতা, ঝামেলা; তির্যক রেখা দ্বারা গতি, অস্থায়িত্ব, পরিবর্তন; সর্পিল রেখা দ্বারা বিভ্রান্তি, বিষণ্নতা এরূপ প্রভৃতি অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। তাছাড়া রেখার পুরুত্বের উপর অর্থাৎ সরু বা মোটা সাপেক্ষেও অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

৩.২ আকৃতি : সিনিক ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় উপাদানটি হলো Shape বা আকৃতি। একটি রেখার দুই প্রান্তের দুটি বিন্দু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যে দ্বি-মাত্রিক চিত্র বা রূপ ধারণ করে তাকেই বলে Shape বা আকৃতি। আকৃতিতে শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিদ্যমান। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় আকৃতির। বস্তুত এই বিশ্বচরাচরে সকল ডিজাইনে দুই ধরনের আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। যথা-

জ্যামিতিক আকৃতি : সাধারণত যে-সব আকৃতির মধ্যে গাণিতিক অনুপাত বিরাজমান, তাই হলো Geometric Shape বা জ্যামিতিক আকৃতি। যেমন- ষড়ভুজ, বর্গ, ত্রিভুজ প্রভৃতি। জ্যামিতিক আকৃতি আমাদের চারপাশের বিশ্বের সাথে নিজেদের বুঝতে একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ক্ষুদ্রতম কণা থেকে বিশাল মহাবিশ্বে অবস্থিত

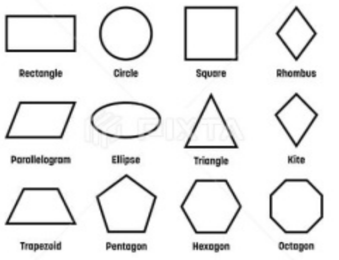

চিত্র-২, সূত্র: ইন্টারনেট

বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের একটি যুক্তির কাঠামো প্রদান করে। উল্লেখ্য জ্যামিতিক আকৃতি কেবল বিমূর্ত ধারণা নয় বরং আমাদের ভৌত ও বৌদ্ধিক জগতের বিল্ডিং ব্লক। যার গুরুত্ব গণিতের রাজ্যের বাইরে যেমন: বিজ্ঞান, প্রকৌশল, শিক্ষা এবং শিল্প বিশেষত ডিজাইনের মতো বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রগুলিতেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাকৃতিক আকৃতি : যে-সব আকৃতির মধ্যে গাণিতিক অনুপাত অনুপস্থিত, তাই হলো Organic Shape বা প্রাকৃতিক আকৃতি। যেমন- গাছ, পাতা, পাথর প্রভৃতির দ্বি-মাত্রিক আকৃতি। একজন সৃজনশীল ডিজাইনার আকৃতির উভয় ধারা বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে ব্যবহার করে নান্দনিক ও নাট্য বার্তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ দৃশ্য নির্মাণে সচেষ্ট থাকেন।

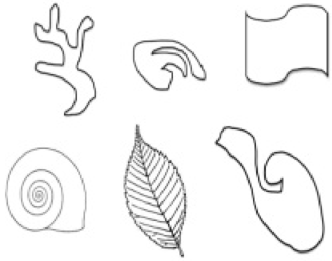

চিত্র-৩, সূত্র: ইন্টারনেট

- কেননা সিনিক ডিজাইনার জানেন-

> "Shape must reflect the intent of the message. If your message is one of tranquil feelings, the use of harsh angular shapes would confuse the viewer. A sense of tranquility is more likely to be instilled by the use of flowing organic shapes."[৬]

৩.৩ অবয়ব : সিনিক ডিজাইনের অপরিহার্য তৃতীয় উপাদানটি হলো Form বা অবয়ব। সাধারণত কোনো চিত্র বা বস্তুর ত্রিমাত্রিক আকৃতিকেই Form বা অবয়ব বলে। অর্থাৎ যে আকৃতির মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা বা উচ্চতা বিদ্যমান থাকে, তাই হলো Form বা অবয়ব। উল্লেখ্য কেউ কেউ Form কে Mass হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। "When shape takes on the added dimension of depth, in addition to width and height, it becomes mass, sometimes called "form."... We can hold a smaller mass or form in our hands, or we can stand or sit on larger masses."[৭] আকৃতি হলো দ্বি-মাত্রিক আর Form বা অবয়ব হলো ত্রিমাত্রিক। বস্তুত ত্রিমাত্রিকতাই হলো একটি বস্তুর প্রকৃত বা স্বাভাবিক গঠন। যেমন- গাড়ি, বাড়ি, পাখি ইত্যাদির ত্রিমাত্রিক অবস্থা। স্মর্তব্য কোন ক্যানভাস বা দ্বি-মাত্রিক তলের উপর অঙ্কিত ত্রিমাত্রিক চিত্রকে আবার বলে Implid Form বা

উহ্য অবয়ব। অর্থাৎ চিত্রটি দেখতে ত্রিমাত্রিক হলেও প্রকৃতপক্ষে তা দ্বি-মাত্রিক। মূলত Shape বা আকৃতির অনুরূপ Form বা অবয়বও প্রধানত দু'ধরনের। যথা-

- **জ্যামিতিক অবয়ব :** যে-সব Form এর মধ্যে গাণিতিক অনুপাত বিদ্যমান, তাই হলো Geometric Form বা জ্যামিতিক অবয়ব। যেমন- Cube, Pyramid, Sphere, Cylindrical প্রভৃতি। উল্লেখ্য জ্যামিতিক অবয়ব বহুমাত্রিক আবেগ জাগাতে সক্ষম।

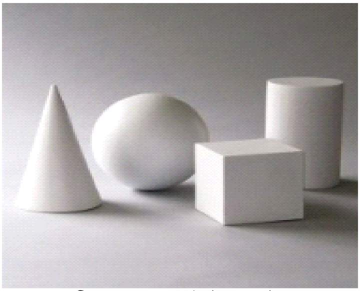

চিত্র-৪, সূত্র: ইন্টারনেট

উদাহরণস্বরূপ, তীক্ষ্ণ কোণ দ্বারা শক্তি, গতিশীলতা এবং কোমল কোণ দ্বারা প্রশান্তি ও শিথিলতা। পক্ষান্তরে বৃত্তাকার অবয়ব দ্বারা একতা ও অসীমতা এবং বর্গক্ষেত্র দ্বারা স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলার প্রগাঢ় অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যায়। তাই বলা চলে জ্যামিতিক অবয়ব ডিজাইনারদের অপরিহার্য হাতিয়ার। যা ভিজ্যুয়াল আবেদন, কার্যকারিতা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের একটি শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। জ্যামিতিক অবয়বের কুশলী ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজাইনাররা আরও কার্যকর, আকর্ষণীয় এবং অর্থপূর্ণ দৃশ্য তৈরি করতে পারেন।

প্রাকৃতিক অবয়ব : পক্ষান্তরে গাণিতিক অনুপাতহীন, অনিয়মিত অবয়বই হলো Organic Form বা প্রাকৃতিক অবয়ব। যেমন- পাহাড়, মানুষ, গাছ-পালা ইত্যাদির

চিত্র-৫, সূত্র: ইন্টারনেট

ত্রিমাত্রিক অবস্থা। ডিজাইনে জ্যামিতিক অবয়বের ন্যায় প্রাকৃতিক অবয়বগুলোও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন: প্রবহণ, অনিয়মিত প্রাকৃতিক গতি, শক্তি এবং সৃজনশীলতার অনুভূতি প্রকাশ করে। ফলে দর্শকমনে প্রকৃতিতে অবস্থান করার মত অনুপুঙ্খ ও নৈসর্গিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

৩.৪ পরিমাপ : সাধারণত অনুমান সাপেক্ষে বা যন্ত্রের সাহায্যে কোন কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাকে Measure বা পরিমাপ বলে অভিহিত করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মাপজোখ বা পরিমাপের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই

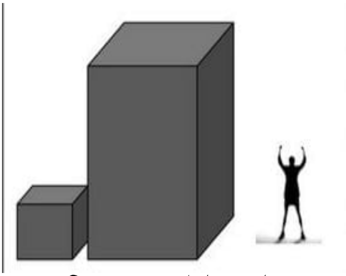

চিত্র-৬, সূত্র: ইন্টারনেট

একজন দৃশ্য পরিকল্পক মঞ্চে যে-সব দৃশ্য উপকরণ ব্যবহার করেন, সেগুলোর পরিমাপ পূর্বেই নির্ধারণ করে তৈরি করেন। কেননা মঞ্চে কোনো দৃশ্যে দরজার চেয়ে জানালা বড় কিংবা বসার চেয়ারের চেয়ে পড়ার টেবিলটি ছোট হলে ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। সুতরাং-

> "...আমি একটি ল্যান্ডস্কেপ আঁকছি যেখানে মানুষজন, ঘর-বাড়ি, আকাশ, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত এদের সকলের পরিমাণগত আকার যদি সমান হয়, তবে তারতম্য থাকেনা। তখন কেউ ছোট হবে, কেউ বা মাঝারি হবে, আবার কেউ বা খুব বড় মাপের হবে। তবেই দর্শক মনে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া হবে।"[৮]

তাই ডিজাইনারকে নাটকের বর্ণনা, মঞ্চের পরিসর, ধারণক্ষমতা, অভিনয় এলাকা, বিবিধ বস্তুর স্বাভাবিক পরিমাপ, মঞ্চ থেকে দর্শকের দূরত্ব এরূপ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে দৃশ্য উপকরণের পরিমাপ নির্ধারণ করতে হয়।

৩.৫ রং : সিনিক ডিজাইনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের মধ্যে Clour বা রং অন্যতম। "It is a powerful stimulus that can change the dimension of shape, reverse the direction of line, and alter the interval between forms."[৯] আলোচ্য প্রবন্ধে Clour বা রং বলতে (আলোক সংশ্লিষ্ট রং ব্যতীত) রঞ্জক পদার্থ বিশিষ্ট এক প্রকার তরল বা অর্ধতরল মিশ্রণকে নির্দেশ করে; যা কোন পৃষ্ঠতলের উপর অর্থাৎ কাগজ, ক্যানভাস, কাপড়, কাঠ, দেয়াল প্রভৃতির উপর পাতলা স্তরের মত প্রয়োগ করা হয়। যা পরবর্তীতে শুকিয়ে উক্ত পৃষ্ঠের উপর একটি স্থায়ী, শক্ত রঙিন প্রলেপে পরিণত হয়। এই পৃথিবীতে চারপাশে তাকালেই হরেক রঙের ক্যানভাস চোখে পড়ে। নীল আকাশে সাদা মেঘ, সবুজ প্রকৃতির মাঝে বিভিন্ন রঙের ফুল-ফল, রাতে নীল আকাশে রূপালী চাঁদ, লাল-হলুদ-কমলা রঙের সূর্যের আভা প্রাণ জুড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয় নিত্য

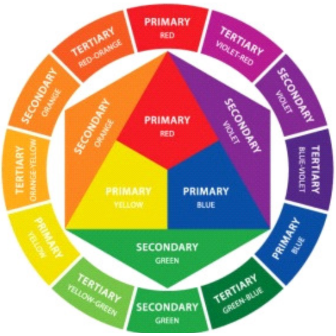

চিত্র-৭, সূত্র: ইন্টারনেট

ব্যবহার্য প্রতিটি উপকরণেই কোনো না কোনোভাবে রং ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। রং যেহেতু ব্যক্তির আবেগ অনুভূতির পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে, সেহেতু রঙের প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্পর্কে একজন শিল্পীকে ভালোভাবে ধারণা রাখতে হয়। কেননা রং হলো দৃশ্য পরিকল্পনার সবচেয়ে তাৎপর্যময় উপাদান। জগতে Primary বা প্রাথমিক রং হচ্ছে তিনটি লাল, নীল, হলুদ।

সমপরিমাণ দুটি প্রাথমিক রঙের মিশ্রণে নতুন যে রং তৈরি হয় তা Secondary বা মাধ্যমিক রং হিসেবে পরিগণিত। প্রাথমিক রঙের মতো মাধ্যমিক রং ও তিনটি। যথা- সবুজ, কমলা, বেগুনি। উল্লেখ্য সমপরিমাণ একটি প্রাথমিক রঙের সাথে অন্য একটি মাধ্যমিক রং যুক্ত করলে নতুন যে রং তৈরি হয় তাকে Tertiary বা যৌগিক বা জটিল রং বলে। একজন শিল্পী বিভিন্ন অনুপাতে রঙের সাথে রং মিশিয়ে তৈরি করতে পারেন অজস্র রকমের রং।

৩.৬ বয়নবিন্যাস : সিনিক ডিজাইনের অন্যতম সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো- Texture বা বয়নবিন্যাস। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর উপরিভাগের বাস্তব অনুভূতিই হলো Texture বা বয়নবিন্যাস। অর্থাৎ কোন বস্তুর পৃষ্ঠ দেখতে কেমন এবং স্পর্শ করলে কেমন অনুভূতির সৃষ্টি হয় সেটাই হলো উক্ত বস্তুর Texture বা বয়নবিন্যাস। কেননা-"Texture is related to our sense of touch, either literally or imaginatively."[১০] একটি মাটির ঘরের মেঝে আর পাকা ঘরের টাইলস্ লাগানো মেঝে নিশ্চয় একই অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করে না। কিংবা একটি বালুকাময় মরুভূমির ছবি এবং শুষ্ক-ফাটা জমির ছবিও অভিন্ন অনুভূতি তৈরি করবে না। বস্তুত উভয়ই মানবমনে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে। তাই দৃশ্য পরিকল্পনায় ব্যবহৃত উপকরণের Texture সম্পর্কে সম্যক ধারণা রেখে কাজ করতে হয় ডিজাইনারকে। Texture বা বয়নবিন্যাস প্রধানত দু'ধরনের। যথা-

- **স্পর্শগত বয়নবিন্যাস :** স্পর্শগত বয়নবিন্যাস বা Tactile Texture হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত ও ত্রিমাত্রিক বয়নবিন্যাস। কেননা এতে বস্তু স্পর্শ করে আমরা অনুভব করতে পারি বস্তুটি রুক্ষ, মসৃণ, আঠালো কিংবা সিল্কি কিনা। এই Tectile Texture আবার দু'ধরনের। যথা-

ক) প্রকৃত বয়নবিন্যাস : প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কোন বস্তুর বাস্তব বা প্রকৃত বয়নবিন্যাসই হল Actual Texture. যা ডিজাইনার তার শিল্পকর্মে সরাসরি ব্যবহার করেন। যেমন- গাছ, কাচ, গ্রানাইট, পাখির পালক, গাছের বাকল ইত্যাদি।

খ) সৃষ্ট বয়নবিন্যাস : অন্যদিকে শিল্পী কোনো মাধ্যমের উপর রঙের প্রলেপে ইচ্ছা মতো ব্রাশ, কাঠি প্রভৃতি দিয়ে বিভিন্ন রেখা, আকৃতি তৈরির মাধ্যমে কৃত্রিম স্পর্শনযোগ্য নতুন Texture তৈরি করেন। তাকে বলা হয় Invented Texture বা Impasto।

দৃশ্যগত বয়নবিন্যাস : দৃশ্যগত বয়নবিন্যাস বা Visual Texture হলো কোন বস্তুর দ্বি-মাত্রিক, দৃষ্টিগ্রাহ্য বয়নবিন্যাস। এতে মূলত ত্রিমাত্রিকতার বিভ্রম থাকে মাত্র। যেমন- সজারুর কাঁটাযুক্ত একটি ছবি স্পর্শ করলেই কাঁটাযুক্ত অনুভূতির বিপরীতে মসৃণ মনে হবে। কেননা এতে কাঁটাযুক্ত অভিব্যক্তির Illusion তৈরি করা হয় মাত্র। কম্পিউটার ইমেজ, আলোকচিত্র বা পেইন্টিং এ এরূপ বয়নবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা রং, রেখার প্রভৃতির সাহায্যে Visual Texture এর দর্শনানুভূতির সৃষ্টি করেন তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে। একে অনেকে Simulated Texture বলেও অভিহিত করে থাকেন।

চিত্র-৮, সূত্র: ইন্টারনেট

৩.৭ বিস্তার : থিয়েটারে বিশেষত সিনিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিস্তার তথা স্থান বা Space বলতে সেই সব ভৌত বা ধারণাগত ক্ষেত্রকে বোঝায়, যেখানে দৃশ্য উপকরণ স্থাপন ও পারফরম্যান্স

প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ- একটি মঞ্চের যে-সব জায়গায় দৃশ্যসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ রাখা হয় এবং অভিনয় করার জন্য যে-সব জায়গা নির্ধারিত থাকে তাই হলো Space বা স্থান তথা বিস্তার। উল্লেখ্য ডিজাইনে উল্লিখিত Space আবার দুই ধরনের। যথা-

- **ইতিবাচক বিস্তার :** সিনিক ডিজাইনের দৃষ্টি থেকে মঞ্চের বা প্রদশর্নী এলাকার যে-সব জায়গায় দৃশ্যসজ্জার বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রী স্থাপন করা হয় তাই হলো- Positive Space বা ইতিবাচক বিস্তার তথা ধনাত্মক স্থান। যেমন: মঞ্চে ঘর, গাছ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি বস্তু-সামগ্রী রাখার জায়গা।
- **নেতিবাচক বিস্তার :** পক্ষান্তরে সিনিক ডিজাইনের দৃষ্টিতে মঞ্চের বা প্রদশর্নী এলাকার যে-সব জায়গায় দৃশ্যসজ্জার বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রী স্থাপন করা হয় না, অর্থাৎ অভিনেতার অভিনয়ের ও সংশ্লিষ্ট মুভমেন্টের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা হলো-Negative Space বা নেতিবাচক বিস্তার তথা ঋণাত্মক স্থান। যেমন: মঞ্চে ঘর, গাছ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি বস্তু-সামগ্রী রাখার জায়গা ব্যতীত অন্য খালি জায়গাগুলো। যেখানে অভিনেতারা বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্ট ও অভিনয় করে থাকেন।

একটি সংবেদনশীল, অনুভূতি উদ্দীপক নাট্য অভিজ্ঞতা সৃষ্টিতে সিনিক ডিজাইনে বিস্তার বা স্থানের যথোপযুক্ত ও শিল্পকুশল ব্যবহারের জুড়ি মেলা ভার। কেননা এটা মঞ্চের বাস্তবতা বা ভৌত মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মাঝে নিগূঢ় মানসিক প্রতিক্রিয়া গঠনকল্পে নিঃশব্দে নেপথ্য শিল্পীর মত ভূমিকা রাখে। তাই সেট ডিজাইনারদের দৃশ্যত আকর্ষণীয় ও গতিশীল পরিবেশ তৈরিতে বিস্তার বা স্থানের তাত্ত্বিক এবং শৈল্পিক উপযোগিতা উপলব্ধি করে যুক্তিগ্রাহ্য ও সৃজনশীল ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা তারা জানেন-

> "The placement of positive and negative shapes onstage determines the actor's movement patterns around the stage. The actors' blocking is shaped by the placement of the positive shapes, the entrances and exits, the furniture, and the various scenic elements on the stage. The line of the actors' movement, whether it be diagonal, upstage to downstage, horizontal across the stage, or meandering, is determined by the negative space that is created around those shapes."[১১]

পূর্বোল্লিখিত এই পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধে দৃশ্য পরিকল্পনার তাত্ত্বিক এবং শৈল্পিক গুরুত্ব অনুসন্ধানপূর্বক নান্দনিক উপাদানগুলি তথা- রং, রেখা, আকৃতি প্রভৃতির বিস্তৃত ও প্রয়োগযোগ্য বিশ্লেষণ সাবলীলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু নাট্যকারের লেখা শব্দ-বাক্যে ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিজ্যুয়াল ভাষা তৈরি করেন সিনিক ডিজাইনারগণ। তাই নাটকের অ-বাচনিক ও ভিজ্যুয়াল ভাষা সৃজনে অপরাপর কলাকৌশলের পাশাপাশি প্রত্যেক সিনিক ডিজাইনারকে উল্লিখিত উপাদানগুলির গভীর পাঠ, বিশ্লেষণ ও অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, যে কোন নাট্য প্রযোজনায় একীভূত শৈল্পিক দৃষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নির্দেশক, অভিনেতা ও অন্যান্য সৃজনশীল দলের সদস্যদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হয় তাকে। কেননা ডিজাইনে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজতে; যেমন- সীমিত বাজেটে বাস্তবসম্মত দৃশ্য তৈরিতে বা অপ্রচলিত পারফরম্যান্স স্পেসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কিংবা একটি অনন্য বা অবিস্মরণীয়

কোন নাট্য অভিজ্ঞতা তৈরি করতে নতুন নতুন উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে উপাদান সমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরি। যাতে মঞ্চে নাট্যপ্রযোজনার অব্যক্ত অভিব্যক্তিগুলোর দৃষ্টিলব্ধ রূপায়ণ সামগ্রিকভাবে সম্ভব হয়। উপরন্তু, অধ্যয়নটি সিনিক ডিজাইনের স্বরূপ অন্বেষণের সাথে সাথে একটি নাট্য প্রযোজনাকে প্রাণবন্ত করার নিমিত্তে ডিজাইনার, নির্দেশক এবং অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার প্রেরণা যোগাবে।

৪. উপসংহার : পরিশেষে এটা প্রতীয়মান হয় যে, থিয়েটারে সিনিক ডিজাইন একটি বহুমুখী শিল্প আঙ্গিক। আর উপাদান সমূহ হলো সেই শিল্প আঙ্গিকের মেরুদন্ড সদৃশ। যা নাট্য প্রযোজনার সাফল্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যদি একজন ডিজাইনার রং, রেখা, আকৃতি, বয়নবিন্যাস, পরিমাপ প্রভৃতি অপরিহার্য উপাদানগুলির শিল্পকুশল ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন; তাহলে মঞ্চে তিনি এমন বিমোহিত পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন, যা দর্শকমনে বিশ্বচরাচরে পরিভ্রণ করার মত আবেগ অনুভূত হবে। এককথায় দৃশ্য পরিকল্পক সিনিক ডিজাইনের উপাদানগুলোর একনিষ্ঠ পাঠ, অনুধাবন ও অনুশীলন করে সুনিপুণ এবং যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করে সামগ্রিক নাট্য অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার পাশাপাশি দৃশ্যত চিত্তাকর্ষক, অর্থপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে গল্প বলার শিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবেন। যা নাটক দেখতে আসা দর্শকদের মানসপটে সৌন্দর্যবোধের একটা স্থায়ী ও গভীর ছাপ রাখতে সমর্থ হবে। আর প্রত্যাশা করি এই প্রবন্ধটি দক্ষ ডিজাইনার, নির্দেশক এবং থিয়েটার অনুরাগীদের জন্য সেইসব মূল্যবান সৃজনশীল অন্তর্দৃষ্টি প্রদানে সামান্য হলেও সহযোগিতা করবে।

সহায়ক তথ্যসূত্র :

১. https://link.springer.com/reference workentry/10.1007/978-3-7643-8140-0_245
২. আলম, আরাফাতুল; জুন ২০২৪; *সিনিক ডিজাইনের মূলনীতি: থিয়েটারে দৃশ্যমূলক গল্প বলার তত্ত্বগত ও শৈল্পিক ব্যাখ্যা;* কলকাতা; সমকাল; পৃ-৯১
৩. https://theatre wala.net/shankha/11-theaterwala-shankha-4/242-2015-02-11-18-30-26
৪. Gillette, J. Michael; 2013; *Theatrical Design and Production;* New York ; The McGraw-Hill Companies; P-79
৫. রহমান, এ কে এম আতিকুর; মে ২০১৪; *চারুকলা পরিচিতি;* ঢাকা, বাংলা প্রকাশ; পৃ- ১৭
৬. Evans, Poppy and Thomas, Mark A.; 2013; *Exploring The Elements of Design,* USA; Delmar Cengage Learning; P-19
৭. Brewster, Karen and Shafer, Melissa; 2011; *Fundamentals of theatrical Design;* New York; Allworth Press; P-92
৮. নাগ, নির্মাল্য ; ১৯৯২ ; *শিল্পচেতনা;* দীপায়ন; কলকাতা; পৃ- ৯৭
৯. Wolf, R. Craig and Block, Dick; 2014; *Scene Design and Stage Lighting;* USA; Wadsworth Cengage Learning; P-24
১০. Brewster, Karen and Shafer, Melissa; 2011; *Fundamentals of theatrical Design;* New York; Allworth Press; P-96
১১. তদেব; পৃ-৯২।

বাংলা শিশু সাহিত্যে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার : আলোচনা ও পর্যালোচনা

কৃষ্ণা মাখাল
গবেষক, রবীন্দ্রচর্চা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জোড়াসাঁকো

ছড়াসম্রাট ভবানীপ্রসাদ মজুমদার বাংলা শিশু সাহিত্যে এক স্মরণীয় ও বরণীয় নাম। ছোটদের ছড়া কবিতার জগতে তিনি সকলের কাছে পরিচিত। ভবানী প্রসাদ মজুমদার একজন বাঙালি কবি ও ছড়াকার। বাংলা ভাষায় বহু কবিতা লিখেছেন। তিনি একবিংশ শতকের বাঙালি ছড়াকারদের মধ্যে প্রথম সারির একজন। নিজের জীবনে প্রায় কুড়ি হাজারেরও বেশি ছড়া লিখেছেন। নিজের লেখায় তিনি সবসময়ই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কবি মূলত ছোটদের মজার মজার ছড়া কবিতা লেখায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর লেখা বহু ছড়া গল্প পড়ে বড় হয়েছে ছোটরা। ছোট ছেলে মেয়েরা ছিল তার প্রাণ, তাদের আনন্দ দিতেই তিনি ছড়া লিখতেন। ছোটদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বিশাল। পাশাপাশি বড়দের জন্যও তিনি লিখতেন। যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক ছড়া বানিয়ে ফেলতে জুড়ি ছিল না তাঁর।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে **৯ই** এপ্রিল হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত দাশনগর এর কাছে দক্ষিণ শানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার মাতা নিরুপমাদেবী। গ্রামের সবুজ ঘেরা পরিবেশ দেখতে দেখতেই তাঁর বেড়ে ওঠা। প্রকৃতির সৌন্দর্য, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের পরিবর্তন, দিনযাপনের আদব-কায়দা, সবটাই নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে তা প্রকাশ করে গেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে।

কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। হাওড়া জেলার সানপুর গ্রামের কালীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। প্রথমে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরে তিনি সেই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক হয়ে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর কাছের কিছু মানুষ একবার প্রশ্ন করেছিলেন---" আপনার বাংলায় যে মেধা রয়েছে আপনি তো পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে যেতে পারতেন।" তিনি উত্তরে বললেন --- " আমি অনায়াসে যেতে পারতাম সে সুযোগও আমার এসেছিল এবং একবার নয় একাধিক বার এসেছিল, কিন্তু এই শিশুদের কচিকাঁচা মুখ এইগুলো ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।" আজীবন শিশুদের মধ্যে থেকে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন।

ভবানী প্রসাদ মজুমদারের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ, তাঁর চিত্রকল্প সৃষ্টির দক্ষতা, বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা, ভাবের উদারতা, শব্দচয়নের কুশলতা, নিরন্তর নতুন নতুন চিন্তাভাবনা। তাঁর ছড়া আকার ছোট কিন্তু অসাধারণ হিউমার রয়েছে প্রত্যেকটি ছড়ায়। যেমন-

"অসুর যাবে শ্বশুর বাড়ি পরশু পায়েস খেতে
পুজোর কদিন এবার রঙিন কাটবে আনন্দেতে।
তাইতো অসুর ভুলেই কসুর খাচ্ছে লুটোপুটি।
পুজোর সময় কোনদিনও পাই না এমন ছুটি।"

(অসুর যাবে শ্বশুর বাড়ি)

অথবা,

"দেখলাম ভালো করে ইতিহাস খুঁজিয়া
শিবাজী খেতেন রোজ দেড় কেজি গুজিয়া।
বাবরের বড়দা
নাকে গুঁজে জর্দা
দিনরাত ঘুমোতেন এক চোখ বুজিয়া।"

(হিস্ট্রির হিস্টিরিয়া)

তাঁর রচনায় ভাব ও ভাষা অনন্য। মাত্রা মিল, ছন্দের জাদু রয়েছে ছড়ায় ছড়ায়। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত তিন ধরনের ছন্দেই তাঁর ছিল অনায়াস বিচরণ।

"ভালো লাগে ফুল পাখি লতাপাতা ঘাস
ভালো লাগে শরতের দুধ সাদা- কাশ।
ভালো লাগে আকাশের রং নীল নীল
পাহাড়, সাগর, নদী খুশি ঝিলমিল।"

(ভালো লাগে)

তাঁর ছড়া পাঠ করলে খুব কম সময়ে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো যায়। একদম শেষ লাইনে অপেক্ষা করে থাকে ক্লাইমেক্স, যা শ্রোতাদের নির্মল আনন্দ দেয় । তাঁর বহু ছড়া নীতিধর্মী,

"কেউ বলে না তোমরা সবাই ফুলের মত ফোটো
কেউ বলে না, সত্যি কারের মানুষ হয়েই ওঠো।
চেঁচাই সবাই, ছোটো-ছোটো, ছোটো-ছোটো- ছোটো
রাত- বারোটায় যাও শুতে আর ভোর-চারটেয় ওঠো।
একটা কথা রাখবে মনে মাস্ট
সব কিছুতে হতেই হবে ফার্স্ট!"

(ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা)

অথবা,

"কোথায় গেল লাটাই আমার, কোথায় রঙিন ঘুড়ি?
বাবা মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে হুড়োহুড়ি।
ব্যাট-রেসে রোজ ছুটে ছুটেই ক্লান্ত পুরোপুরি
স্বপ্ন গেছে চুরি আমার, স্বপ্ন গেছে চুরি!"

(স্বপ্ন চুরি)

বহু ছড়াতে আবার দুর্নীতির প্রতি জেহাদ ও তীব্র শ্লাঘা রয়েছে। দুটি নমুনা উদ্ধার করা যাক-

"যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়
যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে, পালক ছাড়ায়,
যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা-গেলাস- বাটি
যে ছেলেটা সারা জীবন খায় লাথি-কিল-চড় ও চাটি!
ওদের কাছে প্রশ্ন কোরো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে
"স্বাধীনতা" কাকে বলে, স্বাধীনতার সঠিক মানে?"

(স্বাধীনতার মানে)

অথবা,

"এক দুর্গা রিক্সা চালায় কুচবিহারের হাটে
এক দুর্গা একশো দিনের কাজে মাটি কাটে।
এক দুর্গা রাস্তা বানায় পিচ ও পাথর ঢালে
এক দুর্গা রোজ চুনো মাছ ধরছে বিলে- খালে।
এক দুর্গা করছে মাঠে দিনমজুরের কাজ
এক দুর্গা খিদেয় কাঁদে, পায়নি খেতে আজ।
সবাই জানি, এদের কারো হয় না কোনো পুজো
এরা তো মা তোমার মত নয়কো দশভুজো।
সব দুর্গার চোখে- মুখেই ফুটবে হাসি কবে?
মাগো, তোমার পুজো সেদিন সত্যি সফল হবে।"

(সব দুর্গাই থাকুক সুখে)

ছোটরা নিত্যনতুন বহু শব্দ ও মজার বিষয়কে আত্মস্থ করে তাঁর ছড়ার মধ্য দিয়ে । আর যারা তাঁর বড়দের কবিতা পড়েছেন তারা জানেন সমাজ সচেতনতা ছিল তাঁর রচনার ভিত্তি। যথা-

"তুমি বলেছিলে, জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জল সেবিছে ঈশ্বর,
কাউকে বলোনি, তোরা নীচু জাত
যা যা দূরে যা ইস্ সর্।
তুমি বলেছিলে, অজ্ঞ- মুচি -মেথর
তোমার রক্ত, তোমার ভাই,
তাই আজি এই বিপদে সবাই
তোমার প্রেমের স্পর্শ পাই।"

(আলোর দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ)

অথবা,

"সাগর! সাগর! বিদ্যাসাগর! নেই সাগরের শেষ
আজো সবাই তাই খুঁজে পাই তোমার জ্ঞানের রেশ!
সাগর! সাগর! দয়ার সাগর! বিশাল তোমার মন
বীরসিংহের সিংহ শাবক সবার আপনজন!!"

(সাগর সঙ্গমে)

তাঁর এমন কিছু ছড়া আছে যে ছড়া শুনলে মানুষ না হেসে পারবেন না। এরকম একটা ছড়া "দারোগাবাবু এবং হাবু" পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । তাঁর ছড়া কবিতার মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ছড়া কবিতা হল - "কবি রবীন্দ্রনাথ মানে বাজিমাত", "নজরুল ভাঙ্গে ভয় ভুল", "বিদ্যাসাগর জাতির জাগর", "বিশ্ববিজয়ী সত্যজিৎ", "নাম তার সুকুমার", "প্রীতির ছন্দ বিবেকানন্দ", "রামকৃষ্ণ হে জীবনানন্দ", "কলকাতার সেকাল একাল", "রক্তে রাঙা বাংলা ভাষা", "দুর্গা আসে দুর গাঁ হাসে", "সুখের শীত দুঃখের গীত", "বৃষ্টি আসে বৃষ্টি হাসে", কবিতা ছড়ার নামের সাথেও যেন ছন্দের পরশ।

ভবানী প্রসাদ মজুমদার ছিলেন একজন ভালো মনের মানুষ, নির্লোভ ও বন্ধুবৎসল। তাঁর কাছে সব ধরনের মানুষই ছিল সমান। সকলের সাথে তিনি হেসে খেলে মিশতেন। তাই তিনি সকলের কাছে অতি প্রিয়। নামী পত্রিকাতো বটেই যত অনামী পত্রিকাই হোক, তাঁর কাছে

লেখা চেয়ে পাননি এমন দুর্ঘটনা কখনো ঘটেনি। এমনই সর্বব্যাপী পরিচিত হয়েছিল তাঁর যে 'ভবানী প্রসাদ মজুমদার হাওড়া' লিখলেই চিঠি পৌঁছে যেত ঠিক ঠিকানায়। যেকোনো অনুষ্ঠানে ডাকলে পৌঁছে যেতেন সহজে। ঘাড় পর্যন্ত বড় চুল, চওড়া গোঁফ, চোখে চশমা পরতেন। এমন জনপ্রিয় কবি বেছে নিয়েছিলেন সরল জীবন যাপন। বই পূর্ণ ছোট ঘর, স্মিতহাসি আর সহজ ব্যবহার কুড়ি থেকে ২৫ হাজার ছড়া লিখেছেন, এমন এক মানুষের এমন এক জীবন চর্চা সত্যিই অভাবনীয়।

১৯৮৮ সালের ২রা এপ্রিল কলকাতার অবন হলে সুকুমার রায়ের পুত্র কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায় ছড়া সম্রাট ভবানী প্রসাদ মজুমদারের গলায় স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন। এটা ছিল "সুকুমার রায় শতবার্ষিকী পুরস্কার"। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য "পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী পুরস্কার "ভবানী প্রসাদ মজুমদারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পেয়েছিলেন" উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুরস্কার" এছাড়াও "সুকান্ত পুরস্কার", "শিশু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার", "ধুমকেতুর স্বর্ণপদক", "যোগীন্দ্রনাথ সরকার স্মৃতি পুরস্কার", "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি পুরস্কার", "নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার", "লোকসংস্কৃতি পরিষদ পুরস্কার", "জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকার প্রদত্ত "শৈবা পুরস্কার", "শিশু কিশোর একাডেমী পুরস্কার", ‘‘রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র পুরস্কার’’, ‘‘সাহিত্যরত্ন পুরস্কার’’, ‘‘কবিরত্ন পুরস্কার’’, ‘‘সুলেখা পুরস্কার’’, ‘‘অমৃত কলম পুরস্কার’’, ‘‘শিশু সাহিত্য সংসদ পুরস্কার’’, ‘‘নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার’’, ‘‘উৎসব স্বর্ণপদক’’, ‘‘ধূমকেতু স্বর্ণপদক’’, রাষ্ট্রপতির হাত থেকেও পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। শতাধিক পুরস্কারে তিনি সম্মানিত।

ভবানী প্রসাদ মজুমদারের বিখ্যাত সেই কবিতা যা আজও বাঙালির জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়ে ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি হয়ে যে পরিমাণ ভাষার প্রতি অবহেলা বা বাংলা ভাষায় কথা বলতে না পারার মধ্যে যে গর্ব তা ফুটে উঠেছে তাঁর "বাংলাটা ঠিক আসে না" কবিতায়-

> ‘‘ছেলে আমার খুব সিরিয়াস কথায় কথায় হাসে না
> জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না।
> ইংলিশে ও "রাইমস" বলে
> "ডিবেট" করে, পড়াও চলে
> আমার ছেলে খুব ''পজিটিভ", অলীক স্বপ্নে ভাসে না
> জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না।"

তাঁর এই কবিতার প্রতিটা শব্দ আজকের দিনে বাঙালি পিতামাতার দৈন্যতা তুলে ধরেছে। বাংলা ভাষার প্রতি আমরণ টান, ভালোবাসা, নতুন কিছু গড়ার স্বপ্ন, সর্বোপরি নব প্রজন্মের মধ্যে এই ভাষার জন্য আবেগ তৈরি করার প্রচেষ্টা আজীবন বাঙালি মনে রাখবে।

ভবানী প্রসাদ মজুমদার" শুকতারা", "কিশোর ভারতী", "রামধনু" থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের শত শত লিটিল ম্যাগাজিন কে প্রসাদ বিতরণ করে গেছেন। ‘সবুজ বুড়ো' ছদ্মনামে তিনি "ওভারল্যান্ড" পত্রিকায় ছোটদের পাতার সম্পাদনা করতেন। শিশুদের জন্য সবুজ আঙ্গিকে শুধু নিজের লেখা নয় আরো বিশিষ্ট ছড়াকারদের লেখা ওখানে স্থান পেত। এমনকি যে সমস্ত লেখক নতুন লিখছেন তাঁরা লেখা পাঠালেও তাঁদের হতাশ হতে হতো না অনেকেই নতুনদের উপেক্ষা করে কিন্তু ভবানী বাবু ছিলেন একেবারে অন্যরকম। তিনি তাদের ফোন নম্বর মারফত

ডেকে আনতেন এবং তাদের লেখাগুলোকে তিনি কারেকশন করতেন ।যে লাইনটা ঠিক হয়নি সেখানে কোন ছন্দ প্রযোজ্য হবে সেটা দেখিয়ে দিতেন এবং কোথাও কোথাও নিজেও করে দিতেন। এইভাবে লেখাটা ‘‘ওভারল্যান্ডে’’ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে নবীন প্রজন্মের কবিরা কবি হয়ে উঠেছেন।

সন্দেশ পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপার সময় সম্পাদকের ধারণা ছিল লেখক একজন পাকা বয়সের পোক্ত মানুষ। কিন্তু মুখোমুখি হয়ে তাঁর অল্প বয়স দেখে তাঁরা যেমন অবাক হয়েছিলেন তেমনি উল্লসিত হয়েছিলেন এমন এক প্রতিভাকে সন্দেশী লেখক হিসেবে পেয়ে। সন্দেশ এর যেকোনো অনুষ্ঠানে ভবানীপ্রসাদ ছিলেন অপরিহার্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। ছড়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা অনুষ্ঠানে এক বাড়তি মাত্রা যোগ করতো। দর্শক কুলের উল্লাস হাততালি থামতেই চাইতো না। সন্দেশের বড় সম্পাদক সত্যজিৎ রায়েরও খুব পছন্দ ছিল তাঁর লেখা। সন্দেশে আসা কিছু বিজ্ঞাপনের জন্য ছড়া লেখার দায়িত্ব তিনি সুনিপুণভাবে পালন করতেন।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের অক্লান্ত কলম তাঁকে অভাবনীয় পরিচিতি, অপরিমিত ভালোবাসা এনে দিয়েছিল। গত ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তিনি চির আনন্দের দেশে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি বিগত কয়েক বছর ধরেই ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে শ্বাসকষ্টের জন্য তাঁকে অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি অমৃত লোকে যাত্রা করলেও তাঁর সৃষ্টিশীল কাজ তাঁর কথা বারবার মনে করিয়ে দেবে আমাদের।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ছিলেন আশৈশব সাহিত্য প্রেমিক এবং সাহিত্য সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ।এক অর্থে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার হয়ে উঠেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় কিংবদন্তি। তিনি চল্লিশটার বেশি ছড়াগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রথম বই "মজার ছড়া "তারপর একে একে প্রকাশিত হয় "ভুতের ছড়া", "খেলার ছড়া" ইত্যাদি। তাঁর সমস্ত ছড়া নিয়ে প্রকাশিত সংকলন "ছড়া সমগ্র"। এছাড়াও রয়েছে "রবীন্দ্র সংগীত", "পদ্মাবতী", "মধুকর্নিকা", "জন্মভূমি", "সোনালী ছড়া", "কলকাতা তোর খোলখাতা", "ডাইনো ছড়া"। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লিখেছেন "ছড়ায় ছড়ায় সত্যজিৎ"এবং "রবীন্দ্রনাথ নইলে অনাথ"। এছাড়া "মিঠেকড়া শ্রেষ্ঠ ছড়া", " হিং টিং ছট" (ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ইত্যাদি।

ভবানী প্রসাদ মজুমদারের জীবন সন্মন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য অন্বেষণ করা যায়। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ছড়া কবিতা বাংলা সাহিত্য কে সমৃদ্ধ করেছে অনেক পরিমাণে। বাংলা ভাষার প্রতি কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের একটা গভীর অনুরাগ লক্ষিত হয়, যা তিনি তাঁর ছড়া কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ছোটদের নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন ছড়া কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর নীতি শিক্ষামূলক ভাবধারা কিভাবে ছড়া কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন সুদক্ষ কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সেই বিষয়টি আমাদের আশ্চর্য করে। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার এই বাংলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনা ছড়া কবিতা কিভাবে পত্রপত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর যে অবদান সেই বিষয়টি এখনো সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়নি। সেগুলির প্রতি আলোকপাত হওয়া প্রয়োজন। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারকে নিয়ে এযাবৎ কোন গবেষণা কর্ম শুরু হয়নি। তাঁর বিষয়ে তেমন কোন বই এখনো লেখা হয়নি। বিষয়টি একটি গবেষণার দাবী রাখে।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা:

১. সুমাল্য দাস (সম্পাদক), ভবানী প্রসাদ মজুমদার শ্রেষ্ঠ ছড়া সমগ্র, তটভূমি প্রকাশনী, ২০১২
২. ভবানী প্রসাদ মজুমদার, ছড়ার সমগ্র, সূর্য পাবলিশার্স, ২০২৪
৩. ভবানী প্রসাদ মজুমদার, স্বনির্বাচিত ছড়াসমগ্র, লতিকা প্রকাশনী, ২০২৪
৪. ভবানী প্রসাদ মজুমদার (সম্পাদক) অঞ্জন ভট্টাচার্য (সম্পাদক) ভালো ছড়ায় আলো ছড়ায়, পালক পাবলিকেশন
৫. ভবানী প্রসাদ মজুমদার, শিকরের হাসি কান্না, সহযাত্রী পাবলিকেশন, ২০১২
৬. ভবানী প্রসাদ মজুমদার, টাপুর টুপুর ছড়ায় নূপুর, নির্মল বুক এজেন্সি
৭. ভবানী প্রসাদ মজুমদার, ছড়ার হাট জমজমাট, নিউ ভৈরব গ্রন্থালয়, ২০১৪
৮. শুভদীপ বসু -"ভবানী প্রসাদ মজুমদার আবৃত্তি শিল্পের রসদ", জলদর্চি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
৯. রাহুল মজুমদার - "ভবানী প্রসাদ মজুমদারকে চিনি না ", কিশোর বার্তা, ২০২৪
১০. ভাষার প্রতি অবহেলা নিয়ে লেখেন 'আমার ছেলে বাংলাটা ঠিক আসে না' প্রয়াত কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। হিন্দুস্তান টাইমস, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১১. প্রয়াত "বাংলাটা ঠিক আসেনা" র স্রষ্টা ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১২. ভাষার জন্য আমরণ লড়াই, প্রয়াত 'আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না' খ্যাত কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার। এই সময়, ৭ ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৩. বিশিষ্ট ছড়াকার ভবানী প্রসাদ মজুমদার - আজকাল, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৪. প্রয়াত বিখ্যাত ছড়াকার ভবানী প্রসাদ মজুমদার - সংবাদ প্রতিদিন, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৫. উত্তরের সঙ্গে গভীর সখ্য ছিল ভবানী প্রসাদের - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৬. ভাষা দিবসের আগেই চলে গেলেন বিশিষ্ট ছড়া-কার ভবানী প্রসাদ মজুমদার - এই মুহূর্তে, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৭. চির ঘুমে, "বাংলাটা ঠিক আসে না"র রচয়িতা প্রয়াত শিশু সাহিত্যিক ভবানীপ্রসাদ মজুমদার - দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৮. তপন কুমার বৈরাগ্য, ছড়া সম্রাট ভবানী প্রসাদ মজুমদার, গণশক্তি, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কিত *অনুমান*-র গুরুত্ব : অসঙ্গ

গীতা রাণী জানা
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অসঙ্গের দর্শনে *প্রমাণতত্ত্বে*-র পর্যালোচনায় এক অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, প্রথমতঃ তিনি অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মতো প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেননি। এমনকি প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে পৃথক কোন গ্রন্থও রচনা করেননি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর গ্রন্থে প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা এসেছে বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় *বাদতত্ত্ব* আলোচনা প্রসঙ্গে। সুতরাং পরবর্তী দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তির দর্শনে যে জ্ঞানতত্ত্বের সম্পূর্ণ রূপ আমরা পাই, সেই রূপের উৎসমূল হল অসঙ্গের দর্শন।

মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ হলেন বোধিসত্ত্ব। যে বোধিসত্ত্ব নিজ জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন। সুতরাং যে উত্তম পুরুষ পরবর্তী সময় বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন, তাঁর অন্যান্য সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ, অনুমানাদির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ বোধিসত্ত্বের মধ্যে সর্বস্তরের জ্ঞান না থাকলে বুদ্ধজ্ঞানকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবেন না। তাই অসঙ্গ বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় হেতুশাস্ত্রের যখন আলোচনা করেছেন তখন প্রমাণাদির উল্লেখ করেছেন।

সূচক শব্দ: বোধিসত্ত্ব, প্রমাণতত্ত্ব, অনুমান, বাদতত্ত্ব, হেতুশাস্ত্র।

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত স্বতন্ত্র প্রমাণগুলোর মধ্যে অনুমান অন্যতম। কেবলমাত্র চার্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ই অর্থাৎ আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষে অনুমানের স্বতন্ত্রতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রত্যক্ষের মতো শ্রেষ্ঠ তথা জ্যেষ্ঠত্বের শিরোপা অনুমানের না থাকলেও অনুমানের গুরুত্ব প্রত্যক্ষের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। তাই বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে অনুমানের বিভিন্ন লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অনুমানের লক্ষণের দিকে আলোকপাত না করে অনুমান শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে জানা যায় – 'অনু' অর্থাৎ 'পশ্চাৎ', আর 'মান' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। সুতরাং অনুমান হল পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান। প্রশ্ন হয় – কার পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান? উত্তরে, প্রত্যক্ষের পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান। তাই অনুমান প্রত্যক্ষের পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ তথা জ্যেষ্ঠ। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু ভারতীয় তর্কবিদ্যায় বা যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় দেখা যায় অনুমানই প্রধান। আমরা জানি যে, জ্ঞাত জ্ঞানের (প্রত্যক্ষ) ভিত্তিতে অজ্ঞাত জ্ঞানকে (অনুমান) প্রতিষ্ঠা করাই হল অনুমান। আর এই জ্ঞাত জ্ঞানের ভিত্তিতে অজ্ঞাত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে যুক্তির প্রয়োজন, সেই যুক্তির প্রধান আশ্রয় হল অনুমান নামক স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাই আমরা ভারতীয় যুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন – *ন্যায়সূত্র, ন্যায় তর্কভাষা,* বৌদ্ধ গ্রন্থ যেমন *অভিধর্ম্মসমুচ্চয়, যোগাচারভূমি* প্রভৃতি গ্রন্থে অনুমানের বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করি।

অসঙ্গের পরিচয়

বৌদ্ধ তর্কবিদ্যা বা যুক্তিবিদ্যাতে অনুমানের আলোচনা লক্ষ্য করা যায় আর্য অসঙ্গের গ্রন্থে। আর্য অসঙ্গ যোগাচার দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পুরুষপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসঙ্গ মহিসাসক সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও সর্বাস্তীবাদীদের গ্রন্থের শিক্ষালাভও করেন। পরবর্তীকালে তিনি মহাযান সম্প্রদায়ে যুক্ত হন। তাঁর গুরু ছিলেন মৈত্রেয়নাথ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল – *যোগাচারভূমি, অভিসময়ালংকার, অভিধর্মসমুচ্চয়* এবং *মহাযানসংগ্রহ।*

বোধিসত্ত্ব কে?

মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ হলেন বোধিসত্ত্ব। যে বোধিসত্ত্ব নিজ জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন। সুতরাং যে উত্তম পুরুষ পরবর্তী সময় বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন, তাঁর অন্যান্য সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ, অনুমানাদির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ বোধিসত্ত্বের মধ্যে সর্বস্তরের জ্ঞান না থাকলে বুদ্ধজ্ঞানকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবেন না। তাই অসঙ্গ বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় হেতুশাস্ত্রের যখন আলোচনা করেছেন তখন প্রমাণাদির উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থ বোধ হয় না।

বোধিসত্ত্ব শব্দটি *বোধি* এবং *সত্ত্ব* এই শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। বোধিসত্ত্ব শব্দের অন্তর্ভুক্ত *সত্ত্ব* শব্দের অর্থ *ক্ষমতা, শক্তি, উৎসাহ, দক্ষতা, বীরত্ব* (strength, energy, vigour, power, courage)। সুতরাং *বোধিসত্ত্ব* শব্দের অর্থ *এমন একজন যাঁর শক্তি এবং বীরত্ব বোধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়* (one whose energy and power is directed towards bodhi)। বোধিসত্ত্ব শব্দের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি বিভিন্ন গ্রন্থে করা হলেও তাঁর চিত্ত শুদ্ধি বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ই সংশয় প্রকাশ করেননি। প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই বুদ্ধের মতন বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বকে বা প্রাণীকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

বোধিসত্ত্বদের হেতুশাস্ত্রের জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা

অসঙ্গের মতে, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের জ্ঞানও থাকা আবশ্যক। কারণ আমরা জানি যে, হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে মূলতঃ যুক্তির উপর। তাই যুক্তি অবতারণার দ্বারাই হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের 'শাস্ত্রত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বৌদ্ধ দর্শনের এই 'শাস্ত্রত্ব'কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বোধিসত্ত্বগণ উপযুক্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন। কারণ বোধিসত্ত্বদের কাছে বুদ্ধবচনের অনুশীলন তথা রক্ষা করাই একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বুদ্ধবচন যাতে ভুল পথে নির্দেশিত না হয় তারজন্য তাঁদের যথার্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে জ্ঞানের আলোকের দ্বারাই অন্যান্য ব্যক্তি যারা বুদ্ধবচনের ভুল অর্থকে জ্ঞাত হয়েছেন, সেই ভুল অর্থকে সংশোধন করবেন। এই সংশোধনের দ্বারাই বুদ্ধ দেসনার প্রতি অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়। ফলে বুদ্ধ বচনও রক্ষিত হবে এবং বোধিসত্ত্বের নিজের বিশ্বাসগুলোকে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাতে তথা যাঁরা বুদ্ধবচন সম্পর্কে অবহিত নন তাঁদের অবহিত করাতে সক্ষম হবেন। আর এইজন্যই যথাযথ যুক্তির জ্ঞান থাকা বোধিসত্ত্বদের একান্ত প্রয়োজন। এখানেই বৌদ্ধদর্শনে হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের উপযোগিতা।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়

অসঙ্গের দর্শনে উল্লিখিত হয়েছে যে, একজন বোধিসত্ত্ব তাঁর শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বাদতত্ত্বের শিক্ষাও গ্রহণ করবেন। কারণ বাদতত্ত্বের শিক্ষা ব্যতীত একজন বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ

শিক্ষাকে রক্ষা করতে পারবেন না। আর যে বাদতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন প্রমাণের আলোচনা পাই। তাই আমার প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে অনুমান প্রমাণের আলোচনা করব। যে অনুমান প্রমাণকে আলোচনা করতে গিয়ে অসঙ্গ দেখিয়েছেন কিভাবে একজন বোধিসত্ত্ব ক্রমে ক্রমে বাহ্য জগতের জ্ঞানকেও রপ্ত করেছেন! আর যে জ্ঞানকে রপ্ত করার মাধ্যমে নিজ জ্ঞান কিভাবে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন – তাও দেখিয়েছেন। সর্বোপরি এই সাধারণ স্তর থেকে কিভাবে অসাধারণ স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাও দ্রষ্টব্য বিষয়।

বাদ কি?

অসঙ্গ তাঁর দর্শনে 'প্রমাণ' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তাঁর দর্শনে প্রমাণের আলোচনা এসেছে হেতুবিদ্যা বা তর্কবিদ্যায় বাদের আলোচনা প্রসঙ্গে। আর এই হেতুবিদ্যাকে তিনি ছয় ভাগে ভাগ করেছেন – ক) বাদ, খ) বাদাধিকরণ, গ) বাদাধিষ্ঠান, ঘ) বাদালংকার, ঙ) বাদনিগ্রহ এবং চ) বাদ বহুকর বাক্য। এখানে *বাদ* হল সর্ব লোকের বচন (*বাদঃ সর্বলোকবচনম্*) কিংবা *বাদ* হল সব রকমের বাক্ ব্যবহার (*সর্বো বাগ্ ব্যবহারা*)। বাদাধিকরণ – বাদের উপযুক্ত অধিকরণ বা স্থান দুটি। রাজা অথবা যোগ্যকুলের পরিষদ এবং ধর্মার্থে নিপুণ, ব্রাহ্মণ কিংবা শ্রমণদের সভা। বাদের অধিষ্ঠান দুই প্রকার – সাধ্য এবং সাধ্যকে সিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত আট প্রকারের সাধন – প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, সারূপ্য, বৈরূপ্য, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তাগম। প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎকারী জ্ঞান যা অভ্রান্ত। অনুমান হল সাধনের উপর ভিত্তি করে সাধ্যবিষয়ক যে জ্ঞান এবং যেখানে সাধ্য এবং সাধনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান। পরবর্তীকালে *অভিধর্মসমুচ্চয়ের* টীকাকার স্থিরমতি এই সম্বন্ধকে নিয়ত সম্বন্ধ বা অবিনাভাব সম্বন্ধ বলেছেন। আগম হল বুদ্ধবচন। এখানে প্রথম পাঁচটি সাধন হল যুক্তিবিদ্যার অংশ এবং পরবর্তী তিনটি হল জ্ঞানবিদ্যা বা প্রমাণশাস্ত্র আলোচনার অঙ্গ।

মূল বিষয়ের আলোচনা

অসঙ্গ অনুমানের আলোচনা করেছেন নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিতে – *যোগাচারভূমি র বোধিসত্ত্বভূমি, শ্রুতময়ীভূমি, শ্রাবকভূমি* এবং *বোধিসত্ত্বভূমি* র অন্তর্গত *বলগোত্রটল, অভিধর্মসমুচ্চয়* গ্রন্থের *সাংকথ্যবিনিশ্চয়।*

অভিধর্মসমুচ্চয় গ্রন্থে অনুমানের লক্ষণে বলেছেন – *প্রত্যক্ষশিষ্টসংপ্রত্যয়ঃ* অর্থাৎ অনুমান হল এমন জ্ঞান যা জ্ঞানী বা শিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষের দ্বারা সংগঠিত হয়। *শ্রুতময়ীভূমি*তে অনুমান সম্পর্কে বলা হয়েছে – *অনুমানং কতমত/যৎ কেনচিত এব চিহ্ন-নিমিত্ত-সম্বন্ধেন বর্তমানেন বা পূর্বদৃষ্টেন বা বিষয়াভ্যুহনম্* অর্থাৎ অনুমান হল এমন জ্ঞান যা চিহ্ন নিমিত্ত সম্বন্ধযুক্ত এবং যে সম্বন্ধকে বর্তমানে বা পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। যেমন – ধূম থেকে বহ্নির অনুমান, কোন রাজ্য থেকে রাজার অনুমান, গাড়ি থেকে চাকার অনুমান ইত্যাদি। সুতরাং অনুমান হল প্রত্যক্ষপূর্ব এবং প্রসিদ্ধ নিয়ম বা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর যে প্রসিদ্ধ অনিবার্য সম্বন্ধকে ন্যায় দর্শনে নিয়ত সম্বন্ধ বলা হয়েছে। অসঙ্গ অনুমানের আলোচনা করেছেন বাদকে ব্যাখ্যা করার জন্য এবং যেখানে বাদী বা প্রতিবাদী নিজের বক্তব্য বিষয়কে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য এই অনুমানের প্রয়োজন। তাই সাধনকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে - প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন। সাধনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসঙ্গ নৈয়ায়িকদের পথই অনুসরণ করেছেন।

নিম্নে সাধনের ব্যাখ্যা করা হল -

প্রতিজ্ঞা: প্রতিজ্ঞা হল *সাধ্যস্য স্বরুচিতার্থস্য পরসংপ্রাপণ বিজ্ঞাপনা* অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা হল সাধ্যের বিজ্ঞাপন বা সাধ্যকে জানানো বা সাধ্যকে বিশেষভাবে অপরকে জানানো। এখানে *সাধ্যস্য*

স্বরুচিতার্থস্য বলতে বোঝানো হচ্ছে বাদীর অভিহিত যে বিষয় সেই বিষয় হল সাধ্য। এখানে প্রতিবাদীও যদি তাঁর অভিপ্রেত বিষয়কে অপরের কাছে তুলে ধরতে চান বা প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রেও সেই বিষয় হবে প্রতিবাদীর সাধ্য। কারণ বাদের ক্ষেত্রে যেহেতু বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ই অংশগ্রহণ করেন, তাই উভয়েরই অভিপ্রেত বিষয় সাধ্য বা প্রতিজ্ঞা হবে। তাই বাদী ও প্রতিবাদীর অভিপ্রেত বিষয় স্বরুচি অনুযায়ী হবে-ই – এতে কোন দ্বিমত নেই।

হেতু: প্রতিজ্ঞার পরে *অভিধর্মসমুচ্চয়* গ্রন্থে 'হেতু'র লক্ষণে বলা হয়েছে – *হেতুঃ তস্মিন্নেব সাধ্যে অপ্রতীতস্য অর্থস্য সংপ্রত্যয় নিমিত্তং প্রত্যক্ষ উপলম্ভানুপলম্ভ সমাখ্যানম্* অর্থাৎ হেতু হল সেই অপ্রতীত অর্থ বা জ্ঞানরূপ সাধ্যে (বহ্নিবিশিষ্ট সাধ্যে) তার জ্ঞানের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ, উপলম্ভ বা অন্বয় এবং অনুপলম্ভ বা ব্যতিরেকের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে হেতুর ত্রিরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমতঃ হেতুকে পক্ষে থাকতে হবে, দ্বিতীয়তঃ হেতুকে সমস্ত সপক্ষের স্থলে উপস্থিত থাকতে হবে এবং হেতু সমস্ত বিপক্ষের স্থলে থাকবে না। সপক্ষের সমস্তস্থলে উপস্থিত থাকাকে উপলম্ভ বলে। আর বিপক্ষের সমস্তস্থলে হেতুর না থাকা হল অনুপলম্ভ।

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত: হেতুর পরে উদাহরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে – হেতু সর্বদা উদাহরণের উপর আশ্রিত থাকে এবং যে উদাহরণ সারূপ্য, বৈরূপ্যবশতঃ অথবা প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান অথবা আপ্তাগম – এদের মাধ্যমে যে যুক্তি দেওয়া হয় তার উপর নির্ভর করে আছে। অথবা সারূপ্য ও বৈরূপ্যরূপ যে যুক্তি যা প্রত্যক্ষ বা অনুমান বা আপ্তাগমের উপর নির্ভর করে আছে, তাই-ই উদাহরণ। আর যে উদাহরণ অন্বয়ীরূপে ও ব্যতিরেকীরূপে গৃহীত হয়।

শ্রাবকভূমিতে উদাহরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে – *যৎ তস্যৈব প্রতিজ্ঞার্থস্য প্রসিদ্ধয়ে হেত্বাশ্রয়ো লোকোচিতপ্রসিদ্ধবসত্বাভ্রাণো প্রসংহিতো বাদঃ* অর্থাৎ যে মত বা বিষয় সেই প্রতিজ্ঞা বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত যে হেতুকে আশ্রয় করে এবং যা লোকপ্রসিদ্ধ অথবা উদাহরণ হল সেই বিষয়ের উপস্থাপনা যে বিষয় প্রসিদ্ধ, লোকচিত; যে বিষয় হেতুর তুল্য যা সেই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যবহৃত। যেমন পর্বতীয় বহ্নি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পর্বতীয় ধূম হল দষ্ট অংশ এবং যা লোকপ্রসিদ্ধ। তাই সেই লোকপ্রসিদ্ধ হেতু ও সাধ্যের দ্বারা মহানসীয় ধূমের সঙ্গে বহ্নির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে পর্বতীয় বহ্নির সমীকরণ করে পর্বতে বহ্নিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উপনয়: *অভিধর্মসমুচ্চয়* গ্রন্থ অনুযায়ী 'উপনয়' হল – *শিষ্ট তজ্জাতীয় তদ্ধর্মউপগমায় নয়ত্ব সমাখ্যানম্* অর্থাৎ মহানসীয় ধূমের সঙ্গে পর্বতীয় ধূমের সাদৃশ্য দেখে মহানসীয় বহ্নির সমীকরণ করে অনুমান করা হয় যে এখানেও বহ্নি আছে। এখানে অর্থাৎ পর্বতেও বহ্নি আছে বলে যে বচন তৈরী করা হয়, তাই উপনয়। ভাষ্যকার স্থিরমতির মতে, উপনয় হল *শিষ্টানাম্ অপি তজ্জাতীয়ানাং সাধ্যানাং সমাখ্যানম্* অর্থাৎ যখন সাধ্য অর্থ ত্রি অবয়বের অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ বা দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধিত হয়, তখন অবশিষ্ট অগ্নিরূপ সাধ্যও সাধিত হয়। মহানসীয় বহ্নিকে পর্বতে যে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাই উপনয়। এখানে যুক্তির দ্বারাই বহ্নিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, প্রত্যক্ষের দ্বারা নয়; কারণ প্রত্যক্ষীভূত বহ্নিকে এখানে অনুমান করা হচ্ছে। মহানসীয় দৃষ্ট ধূম এবং বহ্নির মধ্যে পর্বতীয় দৃষ্ট ধূমের সাদৃশ্য বর্তমান। তাই মহানসীয় দৃষ্ট বহ্নির ভিত্তিতে পর্বতেও অদৃষ্ট বহ্নি আছে বলে সমীকরণ করা হচ্ছে। সুতরাং মহানস এবং পর্বতের সাদৃশ্য হল মহানসীয় ধূম এবং পর্বতীয় ধূম এবং যা উভয়েরই দৃষ্ট অংশ। আর মহানসে দৃষ্ট বহ্নি হল পর্বতের অদৃষ্ট অংশ। মহানসের সঙ্গে পর্বতের ধূমের ব্যাপারে যেহেতু

সাদৃশ্য আছে সেহেতু বলা যায় যে, ঐ অদৃষ্ট বহ্নিও পর্বতে আছে; তাই অদৃষ্ট ধর্মে উপনীত হওয়াই উপনয়।

নিগমন: নিগমনের লক্ষণে বলা হয়েছে – *নিষ্ঠাগমনঃ সমাখ্যানম্।* স্থিরমতি এই *নিষ্ঠা* শব্দের ব্যাখ্যাতে বলেছেন *যস্মাদেবং যুক্ত্যা সুউপপন্নং তস্মাৎ* অর্থাৎ যে যুক্তি পূর্বে দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা সুউপপন্ন হয়েছে যে, 'পর্বতো বহ্নিমান্' – এই বচনকে নিগমন বলে চিনব।

উপসংহার

সুতরাং বৌদ্ধ যুক্তিবিদ্যায় অসঙ্গ প্রথম দার্শনিক যিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে অনুমানের জ্ঞান ব্যতীত উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 'বাদ' সফল হতে পারে না। এইজন্য অনুমানকে জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এবং এই যুক্তিবিদ্যা বা বাদশাস্ত্র জ্ঞানতত্ত্ব বা প্রমাণতত্ত্বের উপর নির্ভর করে আছে। আর এভাবে বাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তিবিদ্যা এবং জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন অসঙ্গ। আর যে সমন্বয় সাধনের প্রতিফলন আরো বেশি করে লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী দিঙনাগ এবং ধর্মকীর্তির দর্শনে।

অসঙ্গ কেবলমাত্র বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় বিদ্যা হিসাবে যে হেতুবিদ্যার উল্লেখ করেছেন এবং যে হেতুবিদ্যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা করেছেন; সেই আলোচনাতে শুধুই বোধিসত্ত্বদের শিক্ষাই প্রাধান্য পায়নি, সাধারণ মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে সেই প্রত্যক্ষিত বিষয়ের যথার্থতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে কোন জ্ঞান তখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যখন সেই বিষয়টিকে চোখের সামনে দেখতে পাবেন। তাই বোধিসত্ত্বদের জ্ঞান তথা বুদ্ধ উপদেশ সাধারণ মানুষের কাছে উপযোগী করে তোলার জন্য সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সমতুল্য করেই উপস্থাপিত করতে হবে। অসঙ্গ *তত্ত্বার্থ-পটলে* জাগতিক জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই তাই সাধারণ মানুষের জ্ঞানের কথা বলেছেন। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে যদি কোন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে তাদের অনুকূল করেই তুলে ধরতে হবে। আর সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রতিষ্ঠা পেলে সেই তত্ত্ব তথা বুদ্ধ উপদেশাবলী তথা বোধিসত্ত্বের জ্ঞানের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাই হেতুবিদ্যার আলোচনাতে প্রমাণের আলোচনা করেছেন। কারণ প্রমাণই কোন তত্ত্বের নিশ্চয়তা তথা যথার্থতাকে সিদ্ধ করে।

তথ্যসূত্র (References):

১। Pradhan Prahlad(ed), 1950, *Abhidharmasamuccaya of Asaṅga,* Santiniketan, Visva-Bharati.

২। Dutta Nalinaksha(ed), 1966, *Bodhisattvabhūmi: Being the XVth Section of Asaṅgapāda's Yogācārabhūmi,* Patna, K.P. Jayaswal Research Institute.

৩। Shukla Karunesh(ed), 1991, *Śrāvakabhūmi of Ācārya Asanga,* Patna, Part ii, K.P. Jayaswal Research Institute.

৪। Walpola Rahula, 2001, *Abhidharmasamuccaya: The Compendium of the Higher Teaching (Philosophy) by Asaṁga,* California, English version from the French by Sara Boin-Webb, Asian Humanities Press, Fremont.

৫। Thakur Anantalal (ed), 1976, *Abhidharmasamuccaya - Bhāṣyam,* Patna, Tibetan Sanskrit Works Series No. 17, K.P. Jayaswal Research Institute.

৬। Janice Dean Wills, 2002, *On Knowing Reality, The Tattvārtha Chapter of Asaṅga's Bodhisattvabhūmi,* Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

৭। Asaṅga, August 2014, The *Tattvārtha* Chapter of the *Yogacāra-bhūm,* Fok Tan Mei Ling(trans), University of Hong Kong.

৮। Alex Wayman, 1961, *Analysis of the Śrāvakabhūmi Manuscript,* Berkeley and Los Angeles, University of California Press.

৯। Alex Wayman, 1999, *A Millennium of Buddhist Logic,* Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

১০। Bhattacharya Vidhushekhara (ed), 1957, *The Yogācārabhūmi of Ācārya Asaṅga,* Part-1, University of Calcutta.

নাট্যজগতের অনন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ' নাট্য : মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের জটিলতায় প্রকৃত পিতৃত্ব পূরণে ব্যর্থ

চাঁদ কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বি.এড. বিভাগ
বালুরঘাট বি.এড. কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

সারসংক্ষেপ: নাটক সমাজের দর্পন। নাট্যকারদের শিল্পী সত্ত্বার মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। নৃত্যই মানুষের প্রাচীন ঐতিহ্যতম শিল্পকলা। সাধারণত একটি লিখিত পাণ্ডুলিপিকে অনুসরণ করে অভিনয় করে মঞ্চে নাটক পরিবেশিত হয়। নাটক দৃশ্য ও শ্রাব্য কাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তাঁর শিল্পনির্মাণের পিছনে অবশ্য কিছু পূর্ব পরিকল্পনা করে থাকেন। চলচ্চিত্র জগতের পরিধি ছাড়িয়ে **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের** সাহিত্য ও শিল্পকলার জগতে অবাধ বিচরণের সাক্ষর হয়ে আছেন। তাঁর নাটক, কবিতা, কখনও তুলি-কলমের চিত্ররচনায় সাহিত্য রসসম্পাদনের পাশাপাশি মঞ্চে অভিনয়, নির্দেশনায় থিয়েটার ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। তিনি চলচ্চিত্র অভিনয়ের পাশাপাশি ষাটের দশকে ভালোভাবে নাট্য জগতে পদার্পণ করেছেন। তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলি হল- 'তাপস', 'বিদেহী', 'নামজীবন', 'রাজকুমার', 'ফেরা', 'নীলকণ্ঠ', 'ঘটক বিদয়', 'দর্পণে শরৎশশী', 'চন্দনপুরের চোর', 'টিকটিকি', 'ন্যায়মূর্তি', 'প্রাণতপস্যা', 'একটি দিন', 'কুরবানি', 'আরেহন', 'আর একটি দিন', 'হোমাপাখি', 'আত্মকথা', 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব', 'রাজা লিয়ার', 'ছাড়িগঙ্গা' ইত্যাদি পঞ্চাশ বছর ধরে বহু নাটকে তিনি অভিনয় ও নির্দেশনা করে গেছেন। বলা যেতে পারে নাট্যকার **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ'** নাটকটি সমসাময়িককালে শ্রেষ্ঠ নাটক। মেয়ে অথচ মেয়ে নয়, এমন এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এ নাটকের জটিলতা যেখানে এসে পৌঁছয় তার চিত্রটি বড় করুণ। স্বীকৃতি নেই অথচ পিতৃঋণ মেটাতে রমার সেই বুকফাটা কান্নার দর্শকেরও বুকে ত্রাস লাগে। নাটকটি আরও বেশ জোরালো হয়ে ওঠে রমা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। রমার ধারণা ছিল তার পিতা বুঝি ছিলেন জমিদার। কিন্তু তার ভুল ভাঙলো। তার বাবা আসলে ছিলেন জমিদারের গরীব বন্ধু। বহু কষ্টে তরুণী রমা এই ধ্রুবসত্য মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু রমার ক্ষমতাদর্পী আইএএস স্বামীর পক্ষে সেটা হজম করা কষ্ট। এই কারণে জামাই দীপজ্যোতি, নীলকন্ঠকে টাকা-পয়সা দিয়ে বাকী জীবনটা অনত্রে কাটানোর জন্য একরকম চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু রমা, নীলকণ্ঠবাবুর কাছ থেকে যতক্ষণ সত্যিটা না জানছেন ততক্ষণ সে চিন্তামগ্ন, তার মা-র নামে তিনি কলঙ্ক রটাচ্ছেন কিনা ইত্যাদি জানার জন্য ছটপট করছে। টাকা-পয়সা আর সামাজিক প্রতিপত্তির নিরিখেই পিতা-মাতার প্রতি তাদের ভালোবাসার ওঠানামা করে। বুর্জোয়া সমাজ চলে এভাবেই। বুর্জোয়া সমাজের পচনের দিকটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ নাটকে। সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজের পুঁজিবাদে আসার পথটি এবং বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয় পচন ও দুর্নীতিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতরা সমাজের পরগাছা হলেও তাঁরা শিল্পকলার সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়ারা এ কাজে অক্ষম। তাদের একমাত্র বিনোদন হচ্ছে ধর্ষকামিতা, নিষ্ঠুর

আচার-আচরণ। নাটকের একেবারে শেষে গূঢ় ঘটনার জানাজানি। জমিদার কন্যা রমা জানতে পারেন তার প্রকৃত পিতৃপরিচয়। নীলকণ্ঠবাবু নিজের মেয়ের কাছে বাবা স্বীকৃতি পেয়ে সুখী। কিন্তু নির্মম সত্য ভাষণে বিতাড়িত নীলকণ্ঠ বেরিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে সমাজের সব কলাহল ধারণ করে। একজন মানুষ যে অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কাছে কতদূর অসহায় হতে পারে, তারই আলেখ্য যেন এই নাটক। নীলকণ্ঠ চরিত্রটির যে বিশ্লেষণ করলেন, তাতে মনে হল, সত্যিই তো, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের মধ্যে যে সত্তা জেগে ওঠে, তা মানবসত্তা। হতে পারে তা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু তা অমোঘ সত্য।

সূচক শব্দ : জমিদার. স্বেচ্ছাচারিতা, একাকীত্ব, হাস্যাস্পদ, জন্মরহস্য, ধ্রুবসত্য, ক্ষমতাদর্পী, কলঙ্ক, সামাজিক, প্রতিপত্তি, বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্র, দুর্নীতি, উপঢৌকন, বিদ্রুপ, ধর্ষকামিতা, পিতৃঋণ, প্রত্যাশা, আত্মোপলব্ধি, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়স্পর্শী, বিশেষত্বহীন, কলাহল, বঞ্চনা, অভিব্যক্তি।

মূল আলোচনা:

ঊনিশ শতকের কথাসাহিত্যের অন্যতম রাশিয়ার বিখ্যাত নাট্যকার **ইভান সার্জেইভিচ তুর্গেনেভ** মূলত নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক। যিনি স্পষ্টতই ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত জনপ্রিয় নাটক **'এ পুয়োর জেন্টলম্যান'** অবলম্বনে নট নাট্যকার **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়** বঙ্গীকরণ করেন **'নীলকণ্ঠ'** নাটকে। নাটকটি বহুরূপী পত্রিকা চুরাশি সংখ্যা, অক্টোবর **১৯৯৫**-এ প্রকাশিত হয়। শ্যামবাজারী থিয়েটারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটক মঞ্চস্থ হলেই শিল্পরসিক দর্শকের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। তাঁর **'নামজীবন', 'রাজকুমার'** ও **'ফেরা'** নাটকগুলি শিল্পরসিকবৃন্দের স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। হয়তো এইসব নাটক রচিত হয়েছে বিদেশি নাটকের কাহিনির ছায়া নিয়ে, কিন্তু দেশি রূপ দিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনো নাটকে শৈথিল্য প্রকাশ পাইনি। কিন্তু শ্যামবাজারী থিয়েটারের বাঁধা গৎ ভেঙে আধুনিক নাট্যভাবনার পরিচয় দিয়ে বানিজ্য করার সাহস তাঁর আগে একমাত্র অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেখিয়েছিলেন। **'নীলকণ্ঠ'** নাটকটি শুক্লা সেনগুপ্তের প্রযোজনায় ও স্বয়ং নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ পরিকল্পনা, সংগীত ও নির্দেশনায় প্রথম অভিনয় **১৬** জুলাই, **১৯৮৮**-তে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ রঙমহলে মঞ্চস্থ হয়। যে যাই বলুক সৌমিত্রবাবু জানতেন যে, বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এক যুগ সন্ধিক্ষণের প্রতিনিধি তিনি- যার একদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রমুখ এবং অন্যদিকে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার প্রমুখ। বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে **তন্দ্রাদেবী** লিখেছেন, - "গ্রুপ থিয়েটারের বিষয়গত বৈচিত্র্যের অভাব নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ অভিযোগ করেন, স্লোগানধর্মী অত্যাচার আর অত্যাচারীদের কাহিনি বাইরে গ্রুপ থিয়েটার কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না; আর সেই কারণেই নাকি গ্রুপ থিয়েটারগুলি মার খাচ্ছে এই অভিযোগের যৌক্তিকতা নিয়ে তবু প্রশ্ন তোলা যায় বিশেষ করে ইদানীংকালের কয়েকটি প্রযোজনার পরে এই অভিযোগকে এককথায় মেনে নেবেন না অনেকেই। কিন্তু পেশাদারি থিয়েটার আমাদের কী দিচ্ছে বস্তাপচা সেন্টিমেন্টের ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া তাদের কি আর কোনো উপজীব্য নেই? জমিদারি প্রথার নানান গল্পের বাইরে কাহিনিকে বের করে আনা কি আজও অসম্ভব, জমিদারি প্রথা বিলোপের এতদিন পরেও? রঙমহলের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত **'নীলকণ্ঠ'** নাটক দেখার পর এই সব প্রশ্নই মনে জাগে। এবং সৌমিত্রবাবু বলেই প্রত্যাশা ছিল অনেক, প্রাপ্তির ভাঁড়ার রইলো প্রায় শূন্য।"[১]

পেশাদার রঙ্গমঞ্চ রঙমহলে প্রথম অভিনয়ের অভিনেতৃবর্গরা হলেন- পরাশ্রিত দরিদ্র ভদ্রসন্তান **নীলকণ্ঠ লাহিড়ির** ভূমিকায় নাটককার স্বয়ং **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়**, পুরাতন জমিদারি এস্টেটের নায়েব কৈলাশ চক্রবর্তী ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার পুণ্যশ্লোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় গৌতম চক্রবতী, জমিদারের পত্নী অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রে দেবীকা মিত্র, জমিদারের কন্যা রমা চ্যাটার্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর ভূমিকায় সায়নী মিত্র, রমার স্বামী দীপজ্যোতি চ্যাটার্জির ভূমিকায় সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, রমার মামার কর্মচারী নগেন্দ্র চরিত্রে নির্মল ঘোষ, জোতদার, ব্যবসায়ী, গ্রামেরই প্রতিবেশী শ্রীমন্ত ঘোষের ভূমিকায় সলিল পাল, নীলকণ্ঠের বন্ধু সুখময় মিত্র চরিত্রে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্তর সহচর, মোসাহেব সুশীল নম্বরের ভূমিকায় নীহার চক্রবর্তী ও অন্যান্য প্রমুখ শিল্পীদের চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যমোদী দর্শকদের মন জয় করেছেন।

নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ' নাটকটি সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ নাটক। নাট্যনির্দেশক সৌমিত্রবাবু মঞ্চে এসে শুরুতে স্টেজ, দর্শকদের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী সাজিয়ে রেখে যখন অনুষ্ঠান শুরু করলেন তখনই ছন্দপতন হল। একজন দর্শক ও লোকটির কথোপকথনে উঠে আসে, -

> "একজন দর্শক: এসব কী হচ্ছে কী? নাটকটা আরম্ভ করে দিন না-
>
> লোকটি: আপনি দয়া করে একটু এগিয়ে আসুন তা হলে আমিও শুনতে পাই- সকলেই শুনতে পারেন আপনি কী বলতে চাইছেন। [দর্শকটি উঠে আসেন বলতে বলতে।]
>
> দর্শক: বলছি এত ধানাই পানাই করছেন কেন আপনারা। আমরা নাটক দেখতে এসেছি- আপনার ওইসব বক্তৃতা শুনতে তো আসিনি। সেট সেটিং লাগানো হয়নি তো হয়নি। আজকাল তো অনেক রকম কায়দাতেই প্রোডাকশন হয়। তাই বলে নাটক না শুরু করে আপনারা বক্তৃতা দিয়ে যাবেন- এ আবার কী কথা?
>
> একজন মহিলা দর্শক: তা ছাড়া সিনসিনারি নেই এ আবার কী নাটক? এমনিতেই তো সৌমিত্রবাবুর নাটকে নাচগান কিছু থাকে না- তাই বলে সিনসিনারি না থাকলে ভাল লাগে?"[২]

সরিফ মেজাজের জমিদার একদিকে তাঁর উদার মনোভাব, খানদানি মেজাজ, অন্যদিকে স্বেচ্ছাচার-জমিদারকে আমরা দিনদিন এই রূপেই দেখে এসেছি। নাটকটিতে নীলকণ্ঠ বেঞ্চিতে বসে জমিদারের অপেক্ষমাণ। জমিদারের নায়েব কৈলাশ চক্রবর্তী ও নীলকণ্ঠের সংলাপে পাই, -

> "কৈলাশ: আপনি আর কতক্ষণ বসে থাকবেন? বাবু কখন নামবেন কোনো ঠিক নেই।
>
> নীলকণ্ঠ: রোজ কখন নামেন?
>
> কৈলাশ: কোনও ঠিক নেই।
>
> নীলকণ্ঠ: ঠিক নেই?...
>
> নীলকণ্ঠ: তা বড় মানুষের ব্যাপার! কাজকর্মে বেরুলে কি আর তেমন সময় ঠিক থাকে।
>
> কৈলাশ: কাজ? হুঁ। বাগদি বাউরি নিয়ে ফুর্তি করাটা যদি কাজ বলেন তো কাজ।

নীলকণ্ঠ: সে কী, বাবুর সংসার নেই?...

কৈলাশ: এই বাগদি বাউরিরা হল বাবুদের কলাপাতা। ঘরে রুপোর থালায় খাচ্ছেন বলে বাইরে কলাপাতায় খাবেন না? কলাপাতায় খেয়ে ফেলে দিলেই হল।

নীলকণ্ঠ: বাবু তো শুনেছি খুব শিক্ষিত লোক।কৈলাশ: বাবুও শিক্ষিত- বাবুর স্ত্রীও শিক্ষিতা। কলকাতায় ইংরেজি কলেজ থেকে পাশ করা। সাক্ষাৎ সরস্বতী।...”[৩]

নীলকণ্ঠ লাহিড়ি মূলত জমিদার পুণ্যশ্লোকের কাছে আসার কারণ ফতেপুর থানার শ্যামরূপা গাঁয়ে তার আদি বাড়ি ছিল। সেই গ্রামটি পুণ্যশ্লোক জমিদারির এলাকার মধ্যে। মীরডাঙা মৌজায় নীলকণ্ঠের ঠাকুরদাদা ঈশ্বর যাদব যন্ত্র লাহিড়ি ওয়ারিশন হিসাবে সে সাতচল্লিশ বিঘা জমি থাকার কথা ছিল। তার ঠাকুরদাদা ঈশ্বর যাদবের আট ছেলে- শিবদাস, দুর্গাদাস, চণ্ডীদাস, গৌরদাস, রামদাস, কালীদাস, গোবিন্দদাস, বিষ্ণুদাস। নীলকণ্ঠের পিতা ছিলেন এদের সব থেকে ছোট বিষ্ণুদাস। ঠাকুরদা গত হলে সাত জ্যাঠায় তার বাবাকে ঠকিয়েছে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠ জমিদারের নিকট এসেছেন জমি উদ্ধারের জন্য। কিন্তু জমিদার পুণ্যশ্লোক বলেন সে রাস্তা এখনও আছে। জমিদার কৈলাসকে নির্দেশ দেন নীলকণ্ঠকে কাছারি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। এরপর থেকেই জমিদারের সাথে নীলকণ্ঠের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এদিকে ঘরের স্ত্রী জমিদার পুণ্যশ্লোকের মন পাইনা তার বার মহলে বহু প্রেয়সী। নিষ্ঠাবতী অলকাদেবী জমিদারের গিন্নি চোখের জলে ঠাকুর পুজো করেন আর স্বামীকে ফেরানোর চেষ্টা করেন। জমিদার পুণ্যশ্লোক ও তার স্ত্রী অলকার সংলাপে উঠে আসে, -

“অলকা: তুমি কি বেরুচ্ছ?

পুণ্যশ্লোক: হ্যাঁ।

অলকা: কখন ফিরবে?

পুণ্যশ্লোক: কেন?

অলকা: একা একা ভাল লাগে না।...

পুণ্যশ্লোক: এই মধুখালিতে- মধুখালিই বা কেন- সারা দেশে সব ঘরের বউকেই তো তোমার মতো বাড়িতে থাকতে হয়। তারা থাকে কী করে?

অলকা: তাদের ঘর-সংসারের কাজ থাকে- তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ঘরে ছেলেমেয়ে থাকে- তাদের নিয়েও সময় কেটে যায়। ভগবান তো তাও আমার কপালে লেখেনি।”[৪]

নাটকে জমিদার পুণ্যশ্লোকের বাড়ির একমাত্র মেয়ে রমা চ্যাটার্জী সে কলকাতায় বড় হয়েছে এবং বিয়ে করছেন। রমা তার স্বামী দীপজ্যোতি চ্যাটার্জীকে নিয়ে জমিদারি দেখতে আসছেন। রমা ও তার স্বামীর পাঠানো নগেন্দ্র লোকটি তদারকির নামে ভাঁড়ামো করছে, যার দাপটে বাড়ির সবাই তটস্থ। আশ্রিত নীলকণ্ঠ এ জমিদার বাড়িতে এসেছিলেন কর্তাবাবুর আমলে, সেই থেকে মোসাহেবী করার দায়িত্ব পান। কর্তাবাবু মদ খেতেন, বার-দোষ ছিল বলে গিন্নিমা-কে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিতে হত। দুর্ঘটনায় কর্তাবাবু অর্থাৎ জমিদার পুণ্যশ্লোকের মৃত্যু হয় এবং গিন্নিমা (অলকা দেবী) অসুস্থ হওয়ার জন্য তার ভাই এসে বোন ভাগ্নীকে কলকাতায় নিয়ে গেছেন।

জমিদার বাড়ির কাহিনি নিয়ে নাটক হলেও নায়ক জমিদার নন। তার বিদূষক নীলকণ্ঠই হলেন এ নাটকের নায়ক। ফ্ল্যাশব্যাকে এসেছে মৃত জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা আর নিঃসন্তান গিন্নিমার একাকীত্ব। নাটকের শুরু জমিদার বাড়ির একমাত্র বিবাহিত মেয়ে রমা আর তার স্বামীর আগমনকে কেন্দ্র করে। শিক্ষিত জামাইকে সঙ্গ দিতে এ বাড়ির আশ্রিত বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ একসময় মদের নেশায় বেসামাল হয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেলে যে, ওই জমিদার পুণ্যশ্লোকের মেয়ে রমা তাঁর নিজের মেয়ে। নাটকে নীলকণ্ঠ, দীপজ্যোতি ও শ্রীমন্ত এদের সংলাপে উঠে এসেছে, -

> "নীলকণ্ঠ: হ্যাঁ আমার বোধ হচ্ছে ভীষণ নেশা হয়ে গিয়েছে- কিন্তু কে আমাকে মাতাল করল- যাকগে সেটা কোনও বড় কথা নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, মিস্টার চ্যাটার্জি- এখানে এই সবার সামনে আপনি আমাকে হাস্যাস্পদ করেছেন আমার সম্মান- আমাকে আপনি নর্দমায় নামিয়ে দিয়েছেন। যেদিন আপনি এ বাড়িতে প্রথম এলেন। ...অথচ আমি যদি চাই- আমি যদি মুখ খুলি-
>
> দীপজ্যোতি: ওফ- একেবারে মাতাল হয়ে গেছে- কী বলছে না বলছে কোনও হুঁশ নেই।
>
> নীলকণ্ঠ: হ্যাঁ আমি মাতাল হয়ে গেছি। কিন্তু কী বলছি আমার হুঁশ আছে- এই যে- আপনি কলকাতার অফিসার- শিক্ষিত ভদ্র- সমাজের গণ্যমান্য- আর আমি? একটা ভিখিরি- পরান্নভোজী- আপনাদের পারিবারিক নাটকের বিদূষক- কিন্তু আপনি জানেন আমি কে? আপনি এই বাড়ির জামাই- কিন্তু কাকে বিয়ে করেছেন জানেন আপনি?
>
> দীপজ্যোতি: (শ্রীমন্তকে) আপনারা মজা করতে গিয়ে এ কী করলেন বলুন তো? এই ধরনের জঘন্য ব্যাপার হবে জানলে-
>
> শ্রীমন্ত: Sorry sir, আমারই দোষ- আমার জন্যেই এই সব হাঙ্গামা হল।
>
> দীপজ্যোতি: (নগেন্দ্রকে) নগেনবাবু- ওঁকে নিয়ে যান।
>
> নীলকণ্ঠ: দাঁড়ান মিস্টার চ্যাটার্জি- আপনি কিন্তু আমায় বলে গেলেন না কাকে আপনি বিয়ে করেছেন।...
>
> দীপজ্যোতি: (নগেন্দ্রকে) আরে যান না, ওঁকে নিয়ে যান।...
>
> নীলকণ্ঠ: খবরদার- আমার গায়ে হাত দেবে না। আপনি রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছেন- মধুখালির জমিদার বাড়ুজ্যেদের একমাত্র মেয়ে রমা। কিন্তু রমা কে আপনি জানেন? অ্যাঁ? জানেন? জানেন রমা কে? রমা আমার মেয়।।"[৫]

ইভান সার্জেইভিচ তুর্গেনেভ-এর **'এ পুয়োর জেন্টলম্যান'** নাটকে তাঁর জীবন ছায়াপাত লক্ষ করা যায়- তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, - "His relation with via dot usually has been considered platonic, yet some of his Letters, often as brilliant in their observation and as felicitous in their manner as anything he wrote, Suggest In the existence of a greater intimacy. Generally, though, they reveal him as the fond and devoted admirer, in which role he was for the most part content. He never married, though in 1842 he had an illegitimate

daughter by a peasant woman at Spassky; he later entrusted the upbringing of the child to viardot."[৬]

নীলকন্ঠ, দীপজ্যোতি ও শ্রীমন্ত তাদের আসরে রমার আসল জন্মদাতার কথা বৃদ্ধ নীলকন্ঠ বলে চলেছে সেই মুহূর্তে রমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। অবাক বিস্ময়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এইসব শুনছে দীপজ্যোতি রমাকে ইশারা করে চলে যেতে কিন্তু রমা বুঝতে পারে না। এর ফলে নীলকন্ঠ যে সেই সময় বলে ফেলে রমা আমার মেয়ে, রমা তা শুনে নেয়।

মেয়ে অথচ মেয়ে নয়, এমন এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এ নাটকের জটিলতা যেখানে এসে পৌঁছয় তার চিত্রটি বড় করুণ। স্বীকৃতি নেই অথচ পিতৃঋণ মেটাতে রমার সেই বুকফাটা কান্নার দর্শকেরও বুকে ত্রাস লাগে। নাটকটি আরও বেশ জোরালো হয়ে ওঠে রমা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। রমাট ধারণা ছিল তার পিতা বুঝি ছিলেন জমিদার। কিন্তু তার ভুল ভাঙলো। তার বাবা আসলে ছিলেন গরীব, জমিদারের গরীব বন্ধু। বহু কষ্টে তরুণী রমা এই ধ্রুবসত্য মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু রমার ক্ষমতাদর্পী আইএএস স্বামীর পক্ষে সেটা হজম করা কষ্ট। এই কারণে জামাই দীপজ্যোতি, নীলকন্ঠকে টাকা-পয়সা দিয়ে বাকী জীবনটা অনত্রে কাটানোর জন্য একরকম চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু রমা, নীলকন্ঠবাবুর কাছ থেকে যতক্ষণ সত্যিটা না জানছেন ততক্ষণ সে চিন্তামগ্ন, তার মা-র নামে তিনি কলঙ্ক রটাচ্ছেন কিনা ইত্যাদি জানার জন্য ছটপট করছে। রমা, নীলকন্ঠবাবুকে একা তার ঘরে জানতে চেয়েছেন আসল ঘটনাটি কী? অবশেষে বিদূষক নীলকন্ঠ, জমিদার পুণ্যশ্লোক ও তার গিন্নী সংলাপে উঠে আসে, -

> "অলকা: চোখ রাঙিয়ো না। তোমার চোখ রাঙানিতে আর আমি ভয় পাই না। ছিঃ ছি ছি! বাইরে বাইরে যা করে বেড়িয়েছ তা চোখ-কান বুজে সহ্য করেছি। তাই বলে বাড়ির ভেতরে– আমারই বোনের সঙ্গে... ছি ছি ছি ছি। বিন্দু- বিন্দু- যা, বিছানা নিয়ে গিয়ে নীচের ঘরে আমার বিছানা করে দে।...
>
> পুণ্যশ্লোক: আলাদা শোবে? মধুখালির বাড়ুজ্যে বাড়ির বউ স্বামীর ঘর ছেড়ে নীচে গিয়ে আলাদা শোবে। লোকে হাসবে না?
>
> অলকা: ...স্ত্রীকে অপমান করার জন্যে বলা হয়- স্ত্রী যে তা করতে পারে না স্বামীদেবতা তা ধরেই রাখে? আর লোক আমি হাসাইনি, হাসিয়েছ তুমি। দূর সম্পর্কের শালিকে নিয়ে দেওঘর পালিয়ে যাবার সময় লোক হাসাবার কথা মনে হয়নি।...
>
> পুণ্যশ্লোক: ওহ- কে আমার সতী সাবিত্রী এলিরে-
>
> নীলকণ্ঠ: কর্তা এত রাত্তিরে ঘোড়া জুততে বলছেন- আপনি...শুনুন, আপনি কাঁদবেন না- আপনি একটু শান্ত হোন। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলেই কর্তা ফিরে আসবেন।...
>
> অলকা: (সে যেন আর স্বাভাবিক নেই) ফিরুন না ফিরুন আর আমার কিছু যায় আসে না। ভগবান জানেন কত সহ্য করেছি। ...কিন্তু কার জন্যে করেছি। তার কি কিছু এসেছে গেছে? সে কী আমার এই... এই ভালবাসার দাম দিয়েছে? এক মুহূর্তের জন্যে ফিরে তাকিয়েছে? দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। উহ কী অপমান- কী যন্ত্রণা...
>
> নীলকণ্ঠ: শুনুন আপনি শান্ত হোন। আর কেউ না হোক আমি তো জানি আপনি কত সহ্য করেছেন-

অলকা: হ্যাঁ, আপনি জানেন- আপনিই দেখেছেন- দিনের পর দিন আপনিই চুপ করে পাশে দাড়িয়েছেন। কেন- কেন নীলকণ্ঠবাবু (অলকা উঠে এসে নীলকণ্ঠর হাত দুটো ধরে) আপনি কি আমায় ভালবাসেন নীলকণ্ঠবাবু (হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে) ভালবাসা... (হাসির সঙ্গে) কথাটা কী অর্থহীন। না- কথাটা কী একতরফা...! কিন্তু না না- আমি জানতে চাই আমার ভালবাসা একতরফা নয়- অর্থহীন নয়- আমার জানা দরকার আমাকেও কেউ ভালবাসে... নীলকণ্ঠবাবু আপনি কি আমাকে ভালবাসেন? (অলকা নীলকণ্ঠকে আলিঙ্গন করে।...)"[৭]

টাকা-পয়সা আর সামাজিক প্রতিপত্তির নিরিখেই পিতা-মাতার প্রতি তাদের ভালোবাসার ওঠানামা করে। বুর্জোয়া সমাজ চলে এভাবেই। বুর্জোয়া সমাজের পচনের দিকটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ নাটকে। সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজের পুঁজিবাদে আসার পথটি এবং বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয় পচন ও দুর্নীতিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ঘুষের জোরে গড়ে ওঠে ভাব ভালবাসার বন্ধুত্ব। এক ব্যবসায়ী বিদেশী মদ উপঢৌকন দিয়ে বেশি সখ্যতা গড়ে তুললো ঐ আইএএস অফিসার দীপজ্যোতির সঙ্গে। এরা ঐ অসহায় বৃদ্ধকে (নীলকন্ঠ ওরফে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) নানা বিদ্রুপ করতেও ছাড়তো না। এটা মনে রাখতে হবে, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতরা সমাজের পরগাছা হলেও তাঁরা শিল্পকলার সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়ারা এ কাজে অক্ষম। তাদের একমাত্র বিনোদন হচ্ছে ধর্ষকামিতা, নিষ্ঠুর আচার-আচরণ।

নাটকের একেবারে শেষে গূঢ় ঘটনার জানাজানি। জমিদার কন্যা রমা জানতে পারেন তার প্রকৃত পিতৃপরিচয়। নীলকন্ঠবাবু নিজের মেয়ের কাছে বাবা স্বীকৃতি পেয়ে সুখী। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **পবিত্রবাবু** লিখেছেন, - "নীলকণ্ঠ সৌমিত্রর শ্রেষ্ঠ নাটক, ইদানীংকালের বাংলা মঞ্চেরও একটি শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে। জমিদারের এক 'বয়স্য' হিসেবে, অবশ্য বয়স্যের সম্মান না পেয়ে, নীলকণ্ঠ আশ্রয় পেয়েছিল। সে জমিদারের নাম পুণ্যশ্লোক, কিন্তু কাজে সে সার্থকনামা নয়। তার বাগদি বা ডোমের মেয়ে বউদের চোখে সময় কাটে, তার শিক্ষিতা স্ত্রী পড়ে থাকে ঘরে, একা। নাটকে ইঙ্গিত আছে যে এই নীলকণ্ঠ এক সময় তাকে সঙ্গ দিয়েছিল, আর তারই ফলে পুণ্যশ্লোকের মেয়ে বলে পরিচিতা রমার সে জন্মদাতা। এই গোপন কথা এক সময় ব্যঙ্গে পীড়নে আর নেশার ঝোঁকে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। এই কথা তাকে ধ্বংস করে দিতে পারত, কিন্তু রমার গোপন স্বীকৃতি তাকে মুক্তি দেয়, সে জীবনে এই প্রথম মানুষ আর পিতার মর্যাদা পায়।"[৮]

কিন্তু রমা একটা cheque এবং কিছু টাকা খামের মধ্যে নীলকন্ঠবাবুকে দিয়েছেন। নীলকন্ঠ ও তার মেয়ে রমাদেবী কথোপকথনে পাই, -

"নীলকণ্ঠ: চেক.... টাকা?

রমা: হ্যাঁ, আমরা আপনাকে এই টাকাটা দিতে চাই যাতে আপনি আপনার বাকি জীবনটার জন্যে একটা কোনও ভাল বন্দোবস্ত করতে পারেন।...

নীলকণ্ঠ: রমা, তুমিও? তুমিও আমাকে অপমান করতে চাইছ?...

রমা: সে কী? কোথায়?

নীলকণ্: তুমি আমাকে কিনতে চাইছ। কিন্তু আমি তো বলেচি তার কোনও দরকার নেই। আমার তো কোনও প্রমাণ নেই। তা ছাড়া আমি যে আসলে সবটা ভাঁওতা দিইনি তা কী করে বুঝছ? সত্যিই তো- [রমা নীলকণ্ঠের হাত চেপে ধরে।]

রমা: না- আপনি সে মানুষ নন- আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আপনি যা যা বলেছেন প্রত্যেকটি কথা আমি বিশ্বাস করেছি।

নীলকণ্ঠ: ...সংসারে আমার দরকার কতটুকু? দুটো ভাত-কাপড় আর একটু মাথা গোঁজার ঠাই। সে জুটে যাবে। টাকা দিয়ে আমি কী করব? তুমি যদি আমায় বিশ্বাস করো তা হলেই তো এই ছন্নছাড়া জীবনটার একটা অর্থ হয়ে যায় মা!...

রমা: বিশ্বাস করেছি বলেই তো আপনাকে আমি...আমি দেখতে চাই আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আপনি সুখে আছেন, আপনি ভাল আছেন। তাই তো এইটুকু আপনাকে দিতে চাই। আপনি আমার স্বামীকে না বলতে পারেন- অচেনা অজানা কাউকে না বলতে পারেন- কিন্তু আমাকে? আপনার মেয়েকে— আপনার নিজের মেয়েকে আপনি না বলতে পারেন? পারেন না- পারবেন না- কিছুতেই পারবেন না।

নীলকণ্ঠ: দাও- যা দেবে দাও। তোমাকে আমি না বলব না। তুমি যখন দিতে চাইছ, দাও। আমি নেব। মানুষের সব থেকে বড় পাওয়া হল সন্তানের কাছ থেকে পাওয়া। আর কী চাই? এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব।”[৯]

নির্মম সত্য ভাষণে বিতাড়িত নীলকণ্ঠ বেরিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে সমাজের সব কলাহল ধারণ করে। একজন মানুষ যে অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কাছে কতদূর অসহায় হতে পারে, তারই আলেখ্য যেন এই নাটক। চরম ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর নীলকন্ঠর বোধদয় হয় আত্মোপলব্ধির, -

> “এত কথা কেন বলতে গেলাম? আচ্ছা এরা আমাকে মেরেটেরে ফেলবে না তো? যেভাবে ভয় দেখাল- যে ভাবে কথা বলল- যেন আমি একটা রাস্তার কুকুর! বড়লোক- ক্ষমতাবান-”[১০]

নাটকের শেষে নীলকন্ঠের মন আত্মধিক্কারে ভরে ওঠে। সে অনুভব করে, এমন এক সমাজে তার বসবাস, যেখানে সত্য কথা বলা তার মতো গরীব, ‘ব্যয়যোগ্য’ মানুষের কাছে অপরাধ। **পৃথাবাবু** লিখেছেন- ‘নীলকণ্ঠ’ নাটক সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারপ **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়** জানিয়েছিলেন, - “...‘ফেরা’-র মতন ‘নীলকণ্ঠ’ নাটক ফ্যান্টাস বসে দেখা যায়। মাতাল অবস্থায়, হাতে মদের গ্লাস নিয়ে প্রায় মিনিট পনেরো অভিনয় করে সৌমিত্র বুঝিয়ে দেন অভিনয়কে কোন পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায়, বুঝিয়ে দিলেন বাংলা মঞ্চে এক শক্তিশালী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এটাই এই নাটকের সবচেয়ে বড়, বা বলা যায় একমাত্র প্রাপ্তি- এটুকুও অবশ্যই কম নয়।”[১২]

বঙ্গের প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিজীবী **পবিত্রবাবু ‘নীলকন্ঠ’** নাটক-এর (বহুরূপী, ৮৪’, অক্টোবর **১৯৯৫**) গঠন শৈলী প্রসঙ্গে লিখেছেন, - “এ নাটকটিকে সৌমিত্র ‘পিরেনদেল্লোর নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র’ বা অন্যান্য নাটকের ধরনে ‘প্লে উইদিন আ প্লে’ প্রকরণে সাজিয়েছেন। নাটক সাজাচ্ছে কিছু লোক, দর্শকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, দর্শকরাও নানা প্রশ্ন ছুঁড়ছে- তারই মধ্য থেকে গড়ে উঠছে মানবিক আবেগের এই নাটক। বোঝাই যায় যে, নাট্যকর্মের ওই ফ্রেম এই নাটকের পক্ষে তত জরুরি ছিল না। কারণ, নাটকের শেষে নীলকণ্ঠ দর্শকদের সঙ্গে কথা বলে একেবারে শেষ সংলাপে- কিন্তু আর দর্শকেরা নাটকে ঢোকে না। অর্থাৎ নাট্যকর্মের আলগা ফ্রেমটা সম্পূর্ণ হয় না। ফলে নীলকণ্ঠ চরিত্রের অসহায়তা, আপাত হাস্যকরতার সঙ্গে তার অন্তর্গত মনুষ্যত্বের বিরোধ, সেই সঙ্গে তার সঙ্গে প্রতিবেশের নিষ্ঠুরতার নাটকই শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় হয়ে থাকে।”[১৩]

প্রখ্যাত আলো নির্মাণে **তাপসবাবু** 'নীলকণ্ঠ' নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন, - "'নীলকণ্ঠ' নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনা, অভিনয় সব কিছুর অভিনবত্বের মধ্যে সৌমিত্রর মৌলিক কল্পনার পরিচয় পেয়েছি আর সে কারণেই ওই নাটকে আমিও অন্যরকম করে আলোর বিন্যাস করতে মজা পেয়েছি দৃশ্যান্তরে স্টেজ ঘুরিয়ে ব্যবহার তো ছিলই। তা ছাড়া নাটকের মাঝখানে সাঙ্গোপাঙ্গদের প্ররোচনায় মদ্যপানে বাধ্য হওয়া ও উত্তরোত্তর মদ খেতে বাধ্য হয়ে যে অসহায় বেহেড মাতলামিতে রূপান্তর হবার সংযত অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাবান্তর- মঞ্চে তা আমি খুব কমই দেখেছি। অল্প স্তিমিত নীচু কোণ থেকে আসা আলোয় সেই আর্ত বিধ্বস্ত মানসিকতার যে অভিব্যক্তি ওই নাটকে সে প্রকাশ করতে পেরেছিল আজও আমার মনে সে স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।..."[১৪]

অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক **চন্দন সেন**, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ' নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন, -

"শিকড়ের অভিমান ছাড়া মানুষের কী বা থাকে
কী বা থাকে গাছে?
কিছু কাঁটার আয়ুধ
অবীজ শশির কিছু ঘুমন্ত বারুদ
আর কিছু নয়-
এই নিয়ে মানুষ এখানে আছে
কে ছিন্ন হ'ল তার মৌলিক গ্রন্থনা
কেন যে শিকড় নেই
অভ্যন্তরীণ গূঢ় মমতা কেন নেই
মানুষ কি এখনও জানে না?

(সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ঃ 'পড়ে আছে চন্দনের চিতা'।)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কবিতার মতোই নাটক রচনার কিংবা নাট্যভাবনার ক্ষেত্রে শিকড়ের অভিমানটুকু ছাড়েননি। দেশ-বিদেশের নানান নাট্য কাহিনি নির্বাচন করে তা থেকে নিজস্ব নাটক নির্মাণের ভাবনার এই অভিসারের লক্ষ্য। তাঁর অভিনয়বিদ্যার আচার্য শিশিরকুমারের অনুপ্রেরণায় তাঁর সঙ্গে ব্রখটের নাটকে পরিচয়।"[১৫]

জনপ্রিয় অভিনেতা **কৌশিক সেন** তাঁর 'এখনও তো নই!'-এ 'নীলকণ্ঠ' নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন, - "...নেশায় ও নারীসঙ্গে চুর হয়ে থাকা জমিদারের নিঃসঙ্গ স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এই বিশেষত্বহীন পুরুষটির। বন্ধুত্ব থেকে ভালোলাগা, শারীরিক সম্পর্ক। জমিদার গিন্নি জন্ম দেন এক কন্যাসন্তানের। কেউ জানে না তার পিতৃপরিচয়। বহু বহু কাল পর জমিদার ও তাঁর স্ত্রী যখন পরপারে, খাঁ খাঁ করা দেশের ভিটেয় ফিরে এসেছে সেই কন্যা, সঙ্গে সম্ভ্রান্ত স্বামী ও তার চাটুকার বন্ধুরা- সেই জমিদার বাড়িতে তখনও আছে সেই মেরুদণ্ডহীন, অপ্রয়োজনীয় নীলকণ্ঠ। গোটা নাটক জুড়ে নিজেকে তো বটেই, 'চরিত্র'টিকেও একেবারে আড়াল করে রাখতেন সৌমিত্রকাকু। সকলের ছায়ায় লুকিয়ে ফেলতেন। এটা করতেন সেই দৃশ্যটা মাথায় রেখে- যে দৃশ্যে মেয়েটির স্বামী ও তাঁর চাটুকাররা মদ্যপান করে নীলকণ্ঠকে তাদের আসরের খোরাক করে তুলত, আর অনভ্যস্ত নীলকণ্ঠ মদের নেশায় ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, ঠাট্টায় বিদ্ধ হতে হতে বলে ফেলত যে জমিদার- গৃহে জন্ম নেওয়া কন্যাটির প্রকৃত পিতা সে। এই দৃশ্যটিতে সৌমিত্রকাকু অভিনীত নীলকণ্ঠ তার বহু বছরের চেপে রাখা অপমান, হীনমন্যতার খোলস

ছাড়িয়ে হয়ে উঠত অনেক 'বড়ো', একটা বৈশাখী মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ত নীলকণ্ঠ মঞ্চ জুড়ে। এই তীব্রতার কোনও আঁচ বোঝা যেত না গোড়ায়।"[১৬]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **অগ্নি পাণ্ডে** মুম্বাইয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ' নাটক অভিনীত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, - "প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'জাগৃতি'-র আয়োজনে। এক মহৎ উদ্দেশ্যে সৌমিত্র ও লোপামুদ্রা মুম্বইয়ে সৌমিত্রর নাটক লোপার গান নিতের মুম্বইয়ে আসা। 'জাগৃতি' মুম্বইয়ে বাংলা থেকে আসা ক্যান্সার রোগীদের বাসস্থানের জন্য ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে অনুষ্ঠান থেকে। সেই অর্থ শিগগিরই শুরু হবে বাসস্থান তৈরির কাজ। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ' নাটকটি দেখার জন্য এখানকার বাঙালিদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রায় ৩০ বছর পরে মুম্বইয়ে নাটক করলেন সৌমিত্র। অনুষ্ঠানের দিন বললেন, সত্তর দশকে আয়ন্দার হয়ে একটি নাটক করে গিয়েছিলাম। বছর তিরিশেক পরে আবার এলাম। ভাল লাগছে। জাগৃতির এমন ভাল উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত। অনুষ্ঠানের দিন নেহরু সেন্টারের প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।"[১৭]

ঝুমাদবী নীলকণ্ঠ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অভিনেতা কৌশিক সেনের বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি লিখেছেন, - "অভিনীত নীলকণ্ঠ নাটকটি আমিও দেখেছি। এত দিন আমার উপলব্ধি ছিল, নীলকণ্ঠ চরিত্রটি মেরুদণ্ডহীন। কারণ, সে অপমানে বিদ্ধ হতে হতে, হীনম্মন্যতায় ভুগতে ভুগতে, ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় হিসেবে বেছে নেয় নিজের সন্তানের জন্মরহস্য। এটা না ভেবেই যে, এই প্রকাশিত জন্মরহস্য তার সন্তানের দুর্ভোগের, মরণাবধি লাঞ্ছনার কারণ হয়ে উঠবে। কিন্তু কৌশিক সেন নীলকণ্ঠ চরিত্রটির যে বিশ্লেষণ করলেন, তাতে মনে হল, সত্যিই তো, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের মধ্যে যে সত্তা জেগে ওঠে, তা মানবসত্তা। হতে পারে তা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু তা অমোঘ সত্য। সৌমিত্রবাবু এই সত্যটিকেই শেষ দৃশ্যে 'বৈশাখী মেঘের মতো' ছড়িয়ে দিতেন।"[১৮]

গ্রন্থপঞ্জি:

১) চক্রবর্তী তন্দ্রা, 'নীলকণ্ঠঃ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ', বর্তমান পত্রিকা, ৮ নভেম্বর ১৯৮৮, কলকাতা।

২) চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৪৭৩-৭৪

৩) তদেব, পৃ. ৪৭৫-৭৬

৪) তদেব, পৃ. ৪৮১

৫) তদেব, পৃ. ৫১৫-১৬

৬) https://www.britannica.com/topic/A-poor-Gentleman

৭) চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫৩০-৩১

৮) সরকার পবিত্র, 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ', দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৫১১

৯) চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫৪১-৪২

১০) তদেব, পৃ. ৫৪০

১১) সর্বাধিকারী পৃথা, 'নাটক তৈরি, অপেক্ষা দর্শক সমাগমের', বর্তমান পত্রিকা, ১২ জুলাই ১৯৮৮, কলকাতা।

১২) চক্রবর্তী তন্দ্রা, 'নীলকণ্ঠ: প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ', বর্তমান পত্রিকা, ৮ নভেম্বর ১৯৮৮, কলকাতা।

১৩) সরকার পবিত্র, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ', দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৫১১

১৪) চট্টোপাধ্যায় অলক ও চক্রবর্তী মানস (যুগ্ম সম্পাদক), 'সৌমিত্র', প্রতিভাস পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ বইমেলা ২৭ জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা, পৃ. ১৪৯
১৫) দাস ডা. তপনজ্যোতি (সম্পাদক), 'সৌমিত্র শঙ্খর স্মরণ সংখ্যা', রঙ্গপট, অষ্টাদশ সংখ্যা, নাট্যপত্র ২০২১, কলকাতা।
১৬) মৈত্র দেবাশিস (সংকলন, সম্পাদনা ও ভাষ্যরচনা), 'অপরাজিত অপু', তুহিন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯ ডিসেম্বর ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১০৪
১৭) পাণ্ডে অগ্নি, 'মুম্বইয়ে সৌমিত্রর নাটক লোপার গান', আজকাল পত্রিকা, ১৬ এপ্রিল ২০০৩, কলকাতা।
১৮) মজুমদার ঝুমা, 'নীলকণ্ঠ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ নভেম্বর ২০২০, কলকাতা।

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে আফসার আমেদ-এর ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ : জীবনবৃত্তের জীবন্ত দর্পণ

চৈতালী দাস
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ (Abstract): আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতের একজন অন্যতম খ্যাতনামা লেখক হলেন আফসার আমেদ। তাঁর ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসের অন্যতম মূল চরিত্র আবিদকে ঘিরেই সমগ্র কাহিনি বিবৃত হয়েছে। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের ফলে খুব ছোটবেলা থেকেই নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাওয়া এক চরিত্র হল আবিদ। বিয়ের দুইদিন পূর্বে জুলেখা নামক নারীকে ত্যাগ করে আবিদ নিখোঁজ হয়। আবার একসময় সে তার পূর্বপরিচিত গ্রামে ফিরে আসে। সেখানকার মানুষজনকে সে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেয়, তাদের নতুন করে বাঁচার রসদ জোগায়। গ্রামের মানুষদের সাথে আবিদের দেখা-সাক্ষাৎ, কথোপকথনের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজের অন্দরমহলের চিত্র, তাদের সংস্কৃতি, দরিদ্রতা ছাপিয়ে গিয়ে তাদের নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম ফুটে উঠেছে, যা মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার নানা চিত্রকে খুব স্বচ্ছভাবে উপন্যাসটিতে তুলে ধরে। সেই সাথে আবিদের পুনর্বার নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে তার জুলেখার সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে কি না, এই নিয়ে সমগ্র উপন্যাসে আলো আঁধারির খেলা পরিলক্ষিত হয়েছে, ফলে রোমান্টিকতাও উপন্যাসটিতে পরিদৃষ্ট হয়েছে।
সূচক/মূল শব্দ (Keyword): অভিসার, চাকলি, দাওয়াত, সম্প্রীতি, তালাক, নিম্নবর্গ।

মূল আলোচনা (Discussion):

বাংলা সাহিত্য জগতে একজন অন্যতম লেখক হলেন আফসার আমেদ। তাঁর লেখায় প্রামাণিকতার সত্যে ও আখ্যান শিল্পের সজীবতায় সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অনন্য মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে। ‘ঘরগেরস্থি’ (১৯৮২) উপন্যাস দিয়ে তাঁর প্রথম প্রবেশ। ২০১০ সালে রাজ্য সরকারের বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ‘হিরে ও ভিখারিনী সুন্দরী রমণী কিস্সা’ (২০০৭) উপন্যাসের জন্য। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে তিনি ফেলোশিপ (১৯৯৫) পেয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য পুরস্কার হিসেবে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (২০০০), সোপান পুরস্কার (১৯৯৩), নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার (১৯৯৭), মঞ্জুষ দাশগুপ্ত পুরস্কার (২০০৪), ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী পুরস্কার (২০০৬), নতুন গতি পুরস্কার (২০০৮), লোককৃতি পুরস্কার (২০০৭), ইস্ক্রা পুরস্কারে (২০০৯) ভূষিত হন। তাঁর ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ ২০১৭ সালে অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।এই উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ঘটে জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭। উক্ত উপন্যাস পাঠক সমাজকে আর এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে, যেখানে লেখকের লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি-অবস্থান সম্পর্কে গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

দু-এক ক্ষেত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এর সাথে ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’র তুলনা করা যেতে পারে। আবিদের পাঁচ বছর বয়সে তার বাবা মার মৃত্যু হলে সে কাকাতো ভাই বোনদের সাথে বড় হতে থাকে। মায়ের মতো ডেকে তাকে কেউ খাওয়াত না, অবহেলা করত সকলে। আবিদ কৈশোরে রূপনারায়ণ নদে নৌকার মাঝির সঙ্গে

থেকেছে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে ছোট্ট অনন্তও তার পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, খুব ছোট বয়সে মাতৃহারা হলে তারও জীবন ভেসে গিয়েছে তিতাসের অনন্ত কূলের কিনারায়। নানা অবহেলায় অবহেলিত হয়েও অনন্তও আশ্রিতা মাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সত্তাকে খুঁজে চলার চেষ্টা করেছে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অনন্তও নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে কাউকে না জানিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। মূলত অনগ্রসর হওয়ায় আবিদের জীবন সংগ্রাম আরো বেশি লাঞ্ছিত ও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে তার নিজস্ব মনোবলে সবকিছু কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছে।

‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসের মূল কাহিনির সাথে সাথে আলোচিত উপকাহিনিগুলিকে লেখক অত্যন্ত সুচারুরূপে অঙ্কিত করেছেন। নিখোঁজ মানুষ আবিদের গ্রামে আসার আগে প্রথমে দেখা হয় বিলাল ও দিলজানের সাথে। তারা স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে। আবিদ দিলজানের পাশে তার স্বামীকে শুয়ে থাকতে দেখে,আড়াইটায় উঠে মোট বইবে মাছের। এরূপ তাদের জীবন সংগ্রাম। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবিম্ব একপ্রকার তাদের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়। মূলত আবিদের তাগিদেই তারা পুনরায় নিজের গ্রামে ফিরে মূল জীবনস্রোতে বহমান হয়ে যায়।

এছাড়াও ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসে 'অধীর মাস্টার' চরিত্রটির সাথে পাঠকের পরিচিতি ঘটে। এই অধীর চক্রবর্তী আবিদকে দিল্লী নিয়ে যায়, পুরস্কার নিয়ে আসতে। অধীর চক্রবর্তী অত্যন্ত সৎ ও ভালো লোক। অধীর চক্রবর্তী না থাকলে আবিদের সেই সময় সাফল্যের সোপান চড়াটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত। মূলত এখানে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দিকটিকে খুঁজে পাওয়া যায়, অধীরের সাথে আবিদের সম্পর্ক যার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

উপন্যাসে ‘স্যাকরা বৌদি’ অন্যতম একটি চরিত্র। স্যাকরা বৌদি অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল একজন নারী। খুব মিশুকে প্রকৃতির, ডেকে ডেকে সে সকলের সাথে কথা বলত, মনের মধ্যে কোনো কথা লুকিয়ে রেখে চলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথাগত বিদ্যা তার না থাকলেও মানুষকে ভালোবেসে কাছে করে নেওয়ার বিদ্যায় সে গরীয়সী। বহুদিন বাদে দেখা হওয়া আবিদকে সে অত্যন্ত স্নেহ-মমতার সাথে আপন করে নেয়।

এই আবিদ একসময় জুলেখা নামক এক নারীর সাথে প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন আগেই আবিদ নিখোঁজ হয়। তার এই নিখোঁজ হওয়ার মূলে কিন্তু সৎ উদ্দেশ্যই ছিল। আবিদ নিজেকে আরো পরিণত করে জুলেখার কাছে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সময় বহমান। জুলেখার অন্যত্র বিয়ে হয়, এমনকি আবিদেরও। পরবর্তীতে আবিদ তার গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামের বহু মানুষ আবিদের সাথে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এমনকি জুলেখাও তার স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে আবিদের সাথে দেখা করতে যায়। প্রারম্ভিকভাবে জুলেখা তার সন্তানের জন্য ‘দোয়া’ চাইতেই আবিদের কাছে যেতে চাইছে কিন্তু মনে মনে রয়েছে তাকে না পাওয়ার বেদনা। জুলেখা যেন কোনোমতেই তার গৃহকর্মের কাজে মন দিতে পারছে না। খুব সরলতার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখক আফসার আমেদ সেই বিষয়গুলিকে উক্ত উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ জুলেখার মুরগিদের কপাট বন্ধ না করা থেকে ছাগলের ঘরে দোর না আটকানো, মশারি গুঁজতে ভুলে যাওয়া, সারারাত না ঘুমিয়ে কাটানোর নানা ঘটনাকে অত্যন্ত সুচারুরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

“নিখোঁজ মানুষটা কি কখনও তার কথা ভাবে? তাকে নিয়ে কারো সঙ্গে তার কথা কয়? সে সব খবর কিছু পায় না। শুধু তার বাসনা, খোকাকে আশীর্বাদ করতে একদিন তাদের বাড়িতে

আসুক। সেই খায়েশের কথা দিলজানকে বলেছে, দিলজানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নিখোঁজ মানুষটার, সে খবর পেয়ে যাবে সে। আর অপেক্ষা করে বসে থাকবে জুলেখা মানুষটার তার বাড়িতে আসার। ...সেই উত্তেজনায় মরে সে।"[১]

এখানে জুলেখার মধ্যে দিয়ে শ্রীরাধিকার অভিসারই যেন ভিন্নভাবে প্রকটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রেম চিরন্তন, শাশ্বত। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যেমন শ্রীরাধিকা প্রবল দুঃখ-কষ্টে অভিসারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তেমনিভাবে জুলেখাও বিরহ-বেদনায় নিমজ্জিত। ভালোবাসার ক্ষেত্রে দৈবী কী মানবে কোনোপ্রকার ভেদাভেদ হয় না।

"কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই ন পারই গেহ।
গুরু-দুরুজন-ভয় কিছু নাহি মানয়
চীর নহি সম্বরু দেহ।"[২]

[জ্ঞানদাসের পদ]

আবিদকে ঘিরে জুলেখার অতিথি সৎকারের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে লেখক নিম্নবিত্ত সমাজের এক ঝলক পরিস্ফুট করেছেন। জুলেখা মনে করে আবিদের আসার দিন সে ভোরে উঠে ঘর-বাড়ি ন্যাতা দিবে। এছাড়া গাছের থেকে পাকা পেঁপে পাড়বে। চালের থেকে লাউ পাড়বে। চাল কুটে সরু চাকলি বানাবে। নানাপ্রকার তরকারি বানিয়ে আবিদকে খেতে দিবে। যার মধ্যে দিয়ে জুলেখার হৃদ্যতাই বারে বারে ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে আবিদকে ঘিরে চারিপাশের পরিবেশের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক আফসার আমেদ এক সহজ সরল গ্রাম্য চিত্রকে অতি নিপুণতার সাথে সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন। চারিপাশের কলুষতা, যান্ত্রিকতা এমন সহজ-সরল-অনাড়ম্বরহীন মানুষগুলিকে কোনোভাবে স্পর্শ করতে পারে না। মালিয়া গ্রামে আর তার সন্নিহিত আট-দশটা গ্রামে আবিদ আসার পর থেকেই তার আসার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই তার সাথে দেখা করতে চায়, তাকে দাওয়াত দিতে চায়।

> "বাড়ি ঘরদোর সামলে অবরে সবরে সে দেখা করা যাবে। কিংবা সংবাদ পাঠালেই আবিদ পৌঁছে যাবে তার ঘরে-দোরে। দাওয়াত দাও, ভিন্ন জায়গায় থাকা মানুষকে, ঘরে দোরে এসে দু মুঠো খাক। এখানে তো সংসার নেই। আর শুনে যাক বুকের কথা। কত কিছু তো নেই, কত কিছুর তো অভাব, সে-কথা শুনলে তবে বুকের ঘর হালকা হয়। সেই নিখোঁজ মানুষটা এসেছে, সেই আশ্চর্য মানুষটা এসেছে।"[৩]

আবিদের আসার সংবাদে তাদের ভিজে জামা-কাপড় রোদে শুকোতে দেওয়া থেকে শুরু করে কই শিঙি জিওল মাছগুলিকে মাটির কলসিতে রেখে-তাদের আওয়াজ শোনার অনাবিল আনন্দকে লেখক তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে আনন্দ যে সহজলভ্য বিষয় নয়, অতি ছোট থেকে ছোট বিষয়ের মধ্যে আনন্দকে চাইলেই অনুভব করা যেতে পারে— এই শিক্ষাই লেখক আফসার আমেদ তাঁর 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসে এই সহজ-সরল মানুষগুলির নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সেই আনন্দেরই আরো বহিঃপ্রকাশ ঘটে কোনো 'বউড়ির' তার পড়শিকে 'দু কুনকে চাল' ধার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। কেউ বা একবাটি কচি আমড়ার টক প্রতিবেশীকে দিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে আনন্দ অনুভব করে। এছাড়াও "কেউ বাসি করা শাড়ির পাট ভেঙে পরে। কোনো পুরুষ দু হাতা ভাত বেশি খেয়ে নেয়। কোনো বউ দুবার

নুন দিয়ে তরকারিতে নিজের বোকামির কথা ভেবে হাসে। কেউ কেউ বার বার বিড়ি ধরায়। মুদি দোকানি পুনর্বার ধারে সওদা দিয়ে বসে খদ্দেরকে।

বউ ঝি-রা কপালের টিপ কোথায় কোন্ দেওয়ালে, কোন্ ক্যালেন্ডারে এঁটে রেখেছে, দেখে নেয়, সেগুলো যে প্রয়োজনে লাগবে, তার আসন্ন বাস্তবতায় এসব করে।"[৪] এছাড়া চাষের মজুররা নতুন গামছা কোমরে বেঁধে নতুন করে কাজ করার জন্যে উদ্যমী হয়ে ওঠে। কতদিনের ফেলে রাখা কাজগুলো আনন্দের সাথে তারা পুনরায় করতে শুরু করে। হ্যারিকেনের ভাঙা কাচ পালটানো থেকে শুরু করে, শিলনোড়া কাটিয়ে নেওয়া, উনুন ভেঙে নতুন করে গড়া, কাটারিতে ডাঁপ লাগানো, আলগা কোদাল সাঁটা-সবকিছুই গ্রামবাসীরা মনের আনন্দে করতে থাকে। এর সাথে কারও কারও গান গাওয়ার প্রসঙ্গকেও লেখক তুলে ধরেছেন। এছাড়া অনতিদূরের প্রতিবেশীর সাথে কথোপকথনের মধ্যে আবেগের রং মিশে থাকে। সেইকথায় একদিকে যেমন কারো জ্বর, পেট খারাপের উচ্চারণ নিহিত থাকে, নিহিত থাকে সমবেদনার ভাব, অপরদিকে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয় ফসলের গন্ধ, আসন্ন বীজ বোনার বাতাস মাখা আনন্দ, 'বিয়ে-সাদি'র উৎসব মুখরতা, সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা, সাধ খাওয়ানো ও মোছলমানি দেওয়ার আগাম খবরেও ভরে ওঠে বাতাসের গন্ধ-যা এইসব মানুষের সংস্কৃতিকেই আহ্বান করে। এছাড়া গ্রামে গ্রামে মসজিদের ইমামের সঙ্গে আবিদের দেখা করার প্রসঙ্গকে লেখক তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। শুধু দেখা করাই নয়, তার সাথে করমর্দন করা থেকে শুরু করে, দোয়া পড়া— যা তার মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অভূতপূর্বভাবে তুলে ধরেছে।

'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসের প্রচ্ছদ অংশে একটি মানুষের মুখাবয়ব দেখতে পাওয়া যায়। মুখটি নিশ্চুপ হয়ে থাকা একটি মানুষের, কিন্তু তার নিশ্চুপতার মধ্যে দিয়ে পাঠক সমাজের কাছে নানা প্রশ্ন সে উদ্ভাসিত করে। মূলত অনগ্রসর সমাজের প্রতিনিধি এই মুখাবয়বের আত্ম-জিজ্ঞাসা পাঠকসমাজকে ভাবিত করে। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র আবিদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কাহিনিকে কেন্দ্র করেই সম্পূর্ণ উপন্যাসটি বিবৃত হয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকার ঘ্রাণ লেগে আছে উপন্যাসের অক্ষরে অক্ষরে। মূলত উক্ত উপন্যাসটিতে আবিদের অতীত স্মরণের মাধ্যমে খুব সুচারু ও সুন্দর রূপে পূর্বের কাহিনিকেই লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। গ্রাম্য জীবনের নানা দিক ব্যক্ত করার মধ্যে দিয়ে মুসলিম সমাজ জীবনের দিকগুলিকেও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গ্রামীণ মুসলিম মানুষেরা নানারকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও কোথাও যেন এক নির্মল আনন্দ তাদের মধ্যে বিরাজ করে, যা উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামীণ মানুষগুলির সহজ জীবন-যাপনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। পূর্বে বর্ণিত উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র জুলেখার মাধ্যমে লেখক রোমান্টিকতার দিকটিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া জুলেখার প্রতি আবিদকে নিয়ে তার স্বামীর সন্দেহ নিতান্তই মনুষ্য স্বভাবকে তুলে ধরেছে। আর মুসলিম সমাজে 'তিন তালাক' ব্যবস্থাপনায় বিবাহ বিচ্ছেদ যেন অতি সহজলভ্য একটি বিষয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটিতে স্বামী দেখতে সুন্দর না হওয়ায় নিতান্ত অছিলায় ফুলবানু তার স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করিয়ে সুন্দর মোতালেফকে বিয়ে করে নেয়। এছাড়া এই উপন্যাসে কোনো চরিত্রের গান ধরা, কোনো চরিত্রের বেদনাকে ভুলে যেতে বাঁশি বাজানো, আবার কখনো কখনো নিতান্তই খেলার ছলে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের নেচে গেয়ে ওঠা ছোট ছোট সংস্কৃতিকেই তুলে ধরেছে। উপন্যাসটির পাত্র-পাত্রীর মুখের ভাষাতে সাধারণ মুসলমান সমাজের একটি ভাষাগত দিক অতি সহজ-সরল রূপে ফুটে উঠেছে। মুসলিম সমাজে আজও স্ত্রীরা শিক্ষার বিষয়ে বহুলাংশে অধোগামী। সেইকারণে উক্ত উপন্যাসেও মুসলিম শিক্ষিত কোনো স্ত্রী চরিত্র পরিলক্ষিত

হয় না। কেবলমাত্র মুকুন্দ ও মালতীর মেয়েদের পড়াশুনা করতে দেখা যায়। অনন্যসাধারণ সমস্ত দিক বিচারে উপন্যাসটি পাঠকালে পাঠকেরা নতুন জীবনের রসদ খুঁজে পাবে। মূলত আফসার আমেদ 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গ মুসলিম সমাজের ভাষ্য, তাঁদের জীবন আখ্যান তথা জীবন যন্ত্রণাকে তুলে ধরার পাশাপাশি সমাজের অন্দরমহলের কাহিনিকে নিজস্ব লেখনীর গুণে সমাজ বাস্তবতার মোড়কে অতুলনীয় করে তুলেছেন, যার রসদ পরিস্ফুট হয়েছে উপন্যাসটির প্রতিটি কোণায়।

তথ্যসূত্র/সহায়ক গ্রন্থের উল্লেখ (References):

ক. আমেদ, আফসার, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, মাঘ ১৪২৪, 'সেই নিখোঁজ মানুষটা', কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, [১-পৃ: ৩৪], [৩-পৃ: ২৫, ২৬], [৪- পৃ: ২৬]।

খ. মিত্র, খগেন্দ্র নাথ, সেন, সুকুমার, চৌধুরী, বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী, শ্যামাপদ (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, 'বৈষ্ণব পদাবলী', কলকাতা-৭৩, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, [২-পৃ: ৫৫]।

গ. মোল্লা, মহঃ কুতুবুদ্দিন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, 'বাদল সরকারের এবং ইন্দ্রজিৎ অভিনব অন্বেষা,' কলকাতা-০৯, গ্রন্থ বিকাশ।

ঘ. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত, বইমেলা ২০১৬, 'তিতাস একটি নদীর নাম', কলকাতা-৭৩, সুন্দর প্রকাশনী।

ঙ. নবম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, 'গল্পমালা নরেন্দ্রনাথ মিত্র', কলকাতা-০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

চ. সরকার, বাদল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৯, 'নাটক সমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ছ. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, পঞ্চম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মাঘ ১৪২২, 'কালের প্রতিমা', কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং।

জ. রায়, দেবেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬, শ্রাবণ ১৪২৩, 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে', কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং।

ঝ. আমেদ, আফসার, প্রকাশকাল, ২০১১, 'মুসলিম সমাজ : নানাদিক', কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং।

ঞ. খাতুন, আফরোজা, প্রকাশকাল, ২০১১, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভগিনী নিবেদিতা

পৌলমী চক্রবর্ত্তী
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিবেদিতার কার্যকালের মেয়াদ **১৯০২** সাল থেকে **১৯১১** সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এইসময়টি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ। এই কালপর্বে লক্ষণীয় বঙ্গভঙ্গ, বয়কট, স্বদেশী আন্দোলন; শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা। এই গৌরবময় যুগের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা (**১৮৬৭-১৯১১**), যিনি ছিলেন একাধারে একজন সুলেখিকা, বাগ্মী, সাংবাদিক, বিপ্লবী, সংগঠক ও সর্বোপরি স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যা। সূচীকর্ম থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্পকলা, অর্থনীতি-তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহের পরিধি ছিল বহুধাবিস্তৃত। তাঁর এই বহুমুখী কর্মকান্ড ভারতের উন্নতির ভাবনাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল থেকে নিবেদিতায় রূপান্তর আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের স্মরণীয় গাথাগুলির মধ্যে অন্যতম। জন্মসূত্রে আইরিশ, ইংল্যান্ডে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা নিবেদিতা কিভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তায় পরিণত হয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

সূচকশব্দ: জাতীয়তাবাদ, চরমপন্থী, বয়কট, ছদ্মবেশ, আত্মনির্ভরতা, বঙ্গভঙ্গ।

মূল আলোচনা:

"আমার জীবনতরী নিমজ্জিত হচ্ছে, কিন্তু আমি সূর্যোদয় দেখব"-এটাই ছিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে নিবেদিতার শেষ কথা। বিবেকানন্দের পরিকল্পিত মহান ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রধান রূপকার ছিলেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষে আসার আগে নিবেদিতা তাঁর মাতৃভূমি বৃটিশ উপনিবেশ আয়ারল্যান্ডের আইরিশ বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিলেন ও লন্ডনে আইরিশ হোমরুলের জন্য সংগ্রামরত 'ফ্রি আয়ারল্যান্ড' দলেও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর এই বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ভারতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল-এই ধারণা সঠিক নয়। ১৮৯৮ সালে একজন রাজভক্ত বৃটিশ হিসাবেই ভারতে এসেছিলেন, যিনি মনে করতেন "ইংল্যান্ড ও ভারত পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে-এই আমার জীবনের স্বপ্ন।"[১] এমনকি ২৫শে মার্চ দীক্ষালাভের পরেরদিন স্বামীজী যখন নিবেদিতা নিজেকে কোন জাতিভুক্ত মনে করেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন একজন হিন্দুনারীর তার ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তির মতই বৃটিশ পতাকার প্রতি নিবেদিতার আনুগত্য ও ভক্তি স্বামীজীকে হতাশ করেছিল। নিবেদিতার ইংরেজদের প্রতি প্রবল পক্ষপাতিত্বকে তিরস্কার করে তিনি বলেছিলেন, "সত্যই তোমার মতো দেশপ্রেম পাপ...এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অজ্ঞতা হল নীতিবিগর্হিত।"[২]

নিবেদিতার এই স্বদেশপ্রেম থেকে কালক্রমে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান,বৃটিশ প্রশাসনের সমালোচক ও কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রু হয়ে ওঠার পেছনে ছিল স্বামীজীর প্রভাব ও বৃটিশদের জাতিবিদ্বেষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পাশ্চাত্যে স্বামীজী নিবেদিতার নিকট কেবল ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে প্রতিভাত হলেও এদেশে এসে দেখেছিলেন

স্বদেশপ্রেমিক স্বামীজীকে,যার নিকট "ভারতের ভাবনা ছিল শ্বাসবায়ুর মতো।...তিনি জন্মগতভাবেই একজন দেশপ্রেমিক ও মাতৃভূমিই তাঁর আরাধ্য দেবী।"[৩] ১৮৯৮ সালে স্বামীজীর সাথে উত্তর ভারত ভ্রমণকালে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও মানসিক সংঘর্ষের মাধ্যমে মার্গারেট নোবেলের নিবেদিতায় উত্তরণ ঘটেছিল। কাশ্মীরের মহারাজ স্বামীজীকে সেখানে একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য জমি দিতে মনস্থ করলেও বৃটিশ সরকার তথা তৎকালীন রেসিডেন্টের নির্দেশে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই ঘটনায় নিবেদিতা অত্যন্ত আহত হন ও স্বামীজীর অজ্ঞাতে রেসিডেন্টের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন,কারণ "একজন ইংরেজ মহিলা কিভাবে ইংল্যান্ডের এইরূপ নীচ কাজ সহ্য করতে পারে?"[৪] স্বামীজীর ওপর সরকারের নজরদারির জন্য গুপ্তচর নিয়োগের সংবাদ শুনে নিবেদিতার প্রতিক্রিয়া ছিল,"সরকার অবশ্যই উন্মাদ হয়ে গেছে-অথবা তাঁর (স্বামীজীর) কার্যে হস্তক্ষেপ করলে তাই প্রমাণিত হবে। সরকারের এই কাজ সমগ্র দেশকে অগ্নিগর্ভ করে তুলবে আর আমি সর্বাপেক্ষা রাজভক্ত ইংরেজ নারী (এদেশে আসার আগে পর্যন্ত আনুগত্যের গভীরতা সম্পর্কে সংশয় ছিল না) হয়েও সর্বপ্রথম এর বিরোধিতা করব।"[৫] আবার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানচর্চায় বৃটিশ আধিকারিকদের ক্রমাগত অসহযোগিতা সম্পর্কে জানার পর মিসেস বুলকে নিবেদিতা বলেছিলেন,"আমি আমার দেশবাসীকে ঘৃণা করি। তারা এতই কাপুরুষ!...আপনার কি মনে আছে,আমি স্বামীজীকে বলেছিলাম কখনোই আমি ইংল্যান্ডের পতাকাকে অবনমিত করতে পারব না? কিন্তু এখন আকাশে ওড়ার মতোই ইংরেজ পতাকার সাথে একাত্মবোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"[৬]

১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি স্বামীজীর সাথে পাশ্চাত্য যাত্রার পর থেকেই নিবেদিতার চিন্তাভাবনা নতুন খাতে বইতে শুরু করেছিল। পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতার বিষয়টি তাকে বিচলিত না করলেও ক্রমশ উপলব্ধি করেন বিদেশী রাজনৈতিক আধিপত্যে থাকা একটি দেশ পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখতে পারেনা। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে বহুসংখ্যক ভারতীয়দের সাথে তার যোগাযোগ হয়, যাদের মধ্যে অন্যতম রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর থেকে নিবেদিতা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের বিষয়ে জানেন। তাছাড়া এইসময়েই রাশিয়ার বিপ্লবীনেতা প্রিন্স ক্রপটকিনের সাথে নিবেদিতার সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা তাঁর বৃটিশ-বিদ্বেষকে আরও বৃদ্ধি করে। ক্রপটকিনের প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "তিনি ভারতের প্রয়োজন সম্পর্কে অন্যকোন ব্যক্তির অপেক্ষা বেশী জানেন। সরকারগুলোর অপ্রয়োজনীয়তার কথাই বিশেষভাবে বলতে চাইছি।...ভারতের সিংহাসনে কে বসলেন-ইংল্যান্ডের সপ্তম এডওয়ার্ড বা রাশিয়ার জার-তাতে কিছুই এসে যায়না-তার প্রকৃত আশা-ভরসা নির্ভর করে জনগণের শিক্ষার ওপর।"[৭]

নিবেদিতার এইসময়ের একাধিক পত্রে মানসিকতার ক্রমপরিবর্তন লক্ষণীয়। মিসেস বুলকে ১৯০১ সালের ১০ই জুন নিবেদিতা লিখেছিলেন, "আমি আগের থেকেও বেশি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেইসাথেই স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনও দেখতে পাচ্ছি!...এখন আমি বিশ্বাস করি যে নবজাগ্রত ভারত ও ভারতবাসীর জন্য আমার কিছু করার আছে।"[৮] ১৯শে জুলাই মিসেস ম্যাকলাউডকে লিখিত পত্রে নিবেদিতার তীব্র বৃটিশ বিদ্বেষ দেখা যায়-"...ভারতের জন্য সরকারের কার্যকলাপে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আমার মতে কোনো কাজ মানুষ নিজে না করলে,তা যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন,তার ফল মন্দই হয়।...ভারতবর্ষ অধ্যয়নে রত ছিল। একদল ডাকাত তাকে আক্রমণ করে ভূসম্পত্তি ধ্বংস করেছে।...দস্যুদল কিছু শেখাতে

পারবে কি? না, তাদের তাড়িয়ে ভারতকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরতে হবে। এটাই এখন ভারতের যথার্থ কর্মসূচী।"[৯]

নতুন সংকল্প নিয়ে ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিবেদিতার কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর মার্চমাস নাগাদ জাপানের শিল্প-বিশেষজ্ঞ কাকুজো ওকাকুরার সাথে তার সাক্ষাত হয়। তাঁর লেখা *Ideals of the East* বইটি ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি ওকাকুরাকে তাঁর পরিচিত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। নিবেদিতা তৎকালীন বাংলার ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক কার্যকলাপে ওকাকুরার সাহায্যগ্রহণের পরিকল্পনা করেছিলেন। বিদেশী সাহায্যগ্রহণের পরিপন্থী স্বামীজী এবিষয়ে নিবেদিতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতাও স্বামীজীর মতকে সমর্থন জানিয়েছিলেন- "আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি নিগু(ওকাকুরা)-কে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। তার ওপর কোনরকম দাবি রাখা উচিত নয়। তার জন্য আমার ভালবাসা ও স্নেহ সর্বদা থাকলেও,আমার মতে ভারতের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।"[১০]

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর প্রয়াণের পর নিবেদিতা তার কর্মকান্ডকে কেবলমাত্র একটি বালিকা বিদ্যালয়ের গন্ডীতে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত হতে চলেছিলেন, অন্যদিকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাথে নীতিগতভাবে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক থাকতে পারেনা। তাই ১৮ই জুলাই এক পত্রের দ্বারা নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন, যদিও এই বিচ্ছেদ ছিল বাহ্যিক, আজীবন নিজেকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলেই পরিচয় দিয়েছেন।

পরাধীন ভারতবাসীর আত্মোপলব্ধি ও সংহতির জন্য জাতীয়তাতত্ত্বকে জনমানসে প্রবেশ করানোই ছিল নিবেদিতার প্রধান কর্মসূচী- "...প্রাচ্যে নারীর জীবন বিপুলধারায় বয়ে চলেছে। আমি কে যে তার গতি বদলে দেব? নাহয় দশ-বারোটি মেয়ের মনে আমার ভাবনা সঞ্চারিত করেই দিলাম। সেটা এমন বেশি কি লাভের হবে? তার চেয়ে এদেশের পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের মনেও যদি জাতীয়-চেতনা জাগিয়ে তোলা যায়, জীবনের বৃহত্তর সমস্যা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করা যায়, তাতেই কি ওদের কাজ করা হবেনা?"[১১] ১৯০৩ সালের এক পত্রেও নিবেদিতা লিখেছিলেন, "এখন ভারতবর্ষে জাতীয়তা শব্দটিকে তার সর্বাধিক ব্যাপকতা ও তাৎপর্যসহ ধরিয়ে দেওয়াই মূল কাজ।"[১২]

নিবেদিতার মতে ইংরেজ শাসনকালেই ভারত প্রথম 'জাতি' হয়ে উঠেছিল একথা ঠিক নয়। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, আকবর-প্রমুখদের সময়েও জাতীয়তার ধারণা ছিল, তবে সেইসময় জাতীয়তাবোধ ছিল কেবল রাজাদের মধ্যে। কিন্তু বর্তমানে আপামর জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে। "এখন আমাদের অনুধাবন করতে হবে ভারত যখন নিজেকে একটি জাতি বলে চিন্তা করবে তখনই সে জাতি হয়ে উঠতে পারবে। বর্তমানে তার প্রয়োজন এই ধারণাটি উপলব্ধি করা। 'ভারতবর্ষ অবিচ্ছিন্ন' এটাই এখন তার জন্য জাতীয়তার সূত্র।"[১৩] ভারতের ঐক্যবদ্ধতার ওপর জোর দিয়ে নিবেদিতা বলেন,"হয় এখনই ভারতে একতা আছে,নয় কোনদিনই আমাদের মধ্যে একতা সম্ভবপর হবেনা। একতা নেই, একথা কাউকে উচ্চারণ করতে দেবেন না।"[১৪]

অসাধারণ বাগ্মী নিবেদিতা স্বামীজীর আদর্শের পতাকা বহন করে ভারতব্যাপী বক্তৃতা সফরের মাধ্যমে ভারতবাসীকে জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হওয়ার যে আবেদন জানান, তা ভারতবাসীর হৃদয়স্পর্শ করে। যুবসম্প্রদায়ের ওপর নিবেদিতার প্রভাব ছিল

সর্বাধিক। তাদের প্রতি নিবেদিতার উপদেশ ছিল-"তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। সর্বদা মনে রেখো সারা ভারতই তোমার দেশ ও এদেশের বর্তমান প্রয়োজন কর্ম। জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও ঐশ্বর্যলাভের জন্যে চেষ্টা করো। ঐগুলিই যেন তোমাদের লক্ষ্য হয়, আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে তখন যেন নিদ্রায় মগ্ন থেকোনা।"[১৫] স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য তাদের নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করে 'সক্রিয়' ও 'কর্মী' হয়ে উঠতে বলেছিলেন। "আমি এমন মানুষ চাই যারা দৃঢ়তার সাথে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুঁজে পায়। তোমাদের আরাধ্য দেবী ভারতমাতা। বেদীতে ফুল, ধূপ-ধুনো দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না, তিনি দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের মধ্যেই থাকেন। যেখানে তোমার আত্মত্যাগ সেখানেই তিনি।"[১৬] যদুনাথ সরকার নিবেদিতাকে 'Nationalist of Nationalists' বলেছিলেন।[১৭] বিপ্লবী রাসবিহারী ঘোষ বলেন, "যদি আমাদের ভগিনী ভারতের সম্মোহনে পড়ে থাকেন, তাহলে আমরাও তার দ্বারা সম্মোহিত হয়েছিলাম ও তার সম্মোহনকারী ব্যক্তিত্ব আমাদের হাজার হাজার তরুণ যুবককে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।"[১৮]

নিবেদিতা যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হতে বলেছিলেন। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে নাগপুরে গিয়ে নিবেদিতা স্থানীয় ছাত্রদের বলেন তারা পড়াশোনা করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রীলাভ করছেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে নিজেদেরই তারা রক্ষা করতে পারেন না; মা-বোনেদের সম্মানরক্ষা তো দূরের কথা। দেশের প্রয়োজন দেহে-মনে বলিষ্ঠ প্রকৃত দেশপ্রেমিক। ১৯০৪ সালে পাটনাতেও বক্তৃতা দিতে গিয়ে একই কথা বলেন, "...ছাত্রদের মুখে অপরিসীম প্রশান্তি দেখলে আমি দুঃখিত হব...আমি তোমাদের শান্তশিষ্ট দেখার বদলে কুস্তি,মুষ্টিযুদ্ধ,তরোয়াল চালনা করতে দেখতে চাই। আমাদের প্রয়োজন শক্তিশালী মানুষ।"[১৯] হেমচন্দ্র কানুনগো জানিয়েছেন ১৯০৩ সালে নিবেদিতা মেদিনীপুরে বক্তৃতা দিতে এসে স্থানীয় যুবকদের জন্য একটি আখড়ার উদ্বোধন করেন,শুধু তাই নয় তিনি স্বয়ং তরোয়াল খেলে, মুগুর ভেঁজে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

১৯০২ সালে কার্জনের নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিরুদ্ধে নিবেদিতা লেখেন, "সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন হয়েছে,যেটি সমস্ত শিক্ষা বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষাকে ধ্বংস করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ভারতের ওপর হওয়া এই অন্যায়গুলি আমাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে,ভারতের ভারত হওয়ার অধিকার, নিজের জন্য চিন্তার অধিকার, জ্ঞানের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"[২০] ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে কার্জন ভারতীয়দের মিথ্যাবাদী বলেন। সভায় উপস্থিত কোনো ব্যক্তি এই অপমানজনক উক্তির প্রতিবাদ না করলেও ক্ষুব্ধ নিবেদিতা কার্জনের *Problems of the Far East* বইটি জোগাড় করে এর একটা যোগ্য প্রত্যুত্তর লেখেন, যেটি ১৩ই ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকায় ও পরেরদিন স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা পুনরায় স্টেটসম্যানে 'সত্যের উচ্চতম আদর্শ' নামে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন,যেখানে তিনি পূর্বোক্ত সভায় উপস্থিত ছাত্রদের 'প্রশংসনীয় নীরবতা'কেও কটাক্ষ করেছিলেন।

পরাধীন ভারতে তরুণদের নিয়ে বহু বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠেছিল, যারমধ্যে অনুশীলন সমিতি ও ডন সোসাইটি ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতাকে এইসব সমিতিগুলিতে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হত,যেখানে তিনি জাতীয়তাবোধ, হিন্দুধর্ম নিয়ে বক্তৃতা দিতেন; গীতার বাণী ও স্বামীজীর লেখা পড়ে শোনাতেন। বিনয় সরকার, যিনি ডন সোসাইটিতে

নিবেদিতার বক্তৃতা শুনেছিলেন, লিখেছেন, "নিবেদিতাই প্রথম শ্বেতাঙ্গ মানুষ যার কথায় ভারতীয় স্বাধীনতার অকপট বাণী শুনতে পেলাম।...মনে হয়েছিল তাঁকে ভগ্নী বলা যেতে পারে। অধিকন্তু তাঁকে দেখে মেমসাহেব মনে হয়নি। কেননা তাঁর চেহারায় বা চোখে বজ্জাতিভাব ছিল না। মনে হয়েছিল যে, মেয়েটা একটা হৃদয়ওয়ালা সত্যিকার মানুষ।...নিবেদিতা বললেন-যুবক ভারত স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্য তৈয়ের হচ্ছে মাত্র। এখনও দৌড় সুরু করেনি।"[২১] সোসাইটির মুখপত্র ডন ম্যাগাজিনেও নিবেদিতার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের নভেম্বরে ডন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সম্পাদক ভারতের জাতীয়তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছয়টি বিষয় উল্লেখ করে দিয়ে যেকোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দেওয়ার আবেদন জানান, সেরা প্রবন্ধকারের জন্য নিবেদিতা 'বিবেকানন্দ গোল্ড মেডাল' পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৯০৭ সালের মার্চে পুনরায় ডন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরসহ প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রবন্ধের আহ্বান জানান হয় ও পুরস্কার হিসাবে বিবেকানন্দ গোল্ড মেডেলের কথাও বলা হয়েছিল।[২২]

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিবেদিতা দেশের সব রাজনৈতিক শক্তিকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে,রমেশচন্দ্র দত্তের মত নরমপন্থী নেতাদের পাশাপাশি অরবিন্দ ঘোষ,ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মত চরমপন্থীদের সাথেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। ১৯০২ সালে নিবেদিতা যখন বরোদায় বক্তৃতা দিতে যান তখন শ্রীঅরবিন্দের সাথে সাক্ষাত হয়। ইতিপূর্বে নিবেদিতার সাথে অরবিন্দের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও তারা পরস্পরের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। অরবিন্দের নিকট নিবেদিতার পরিচয় ছিল *Kali the Mother* গ্রন্থের রচয়িতা। পরবর্তীকালে অরবিন্দ বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন,যেখানে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে নিবেদিতাও ছিলেন। অরবিন্দ যখন জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস শুরু করেন,তখন নিবেদিতার সাথে খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না। অরবিন্দ লিখেছেন, "তার সাথে আমার সহযোগিতা সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে। আমি আমার কাজে ও তিনি তার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার কোন উপলক্ষ ছিল না।"[২৩]

আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ গ্রেফতার হন। ১৯০৯ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নিবেদিতার সাথে তার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এইসময় অরবিন্দ 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগীন' নামক দুটি পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের প্রচার করায় পুনরায় গ্রেফতারের সম্ভাবনা তৈরী হলে সেবিষয়ে নিবেদিতা তাকে অবহিত করেন ও আত্মগোপন করার বা ভারতের বাইরে থেকে কাজ করার পরামর্শও দেন। অরবিন্দ এতে অসম্মতি জানান, "...আমি কর্মযোগীনে একটি খোলা চিঠি লিখব, যা আমার ধারণা সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করবে।"[২৪] এটি করা হয়েছিল ও সাময়িকভাবে নির্বাসনের ভাবনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ১৯১০ সালে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট শামসুর আলম খুনের পর পুনরায় অরবিন্দের গ্রেফতারের পরিস্থিতি তৈরী হলে অরবিন্দ চন্দননগরে আত্মগোপন করেন। অনেক ঐতিহাসিক ও অরবিন্দের সহকর্মীরা এর পিছনে নিবেদিতার ভূমিকা আছে মনে করলেও অরবিন্দ জানিয়েছেন "ঐশ্বরিক আদেশপ্রাপ্ত" হয়ে চন্দননগরে গিয়েছিলেন, তিনি চন্দননগরে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত নিবেদিতা কিছুই জানতেন না। অরবিন্দ তার অনুপস্থিতিতে নিবেদিতাকে কর্মযোগীন সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে যান।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, বিদেশী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে ঘিরে বাংলায় এক অদ্ভুতপূর্ব পুনর্জাগরণ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পর ৭ই আগস্ট টাউন হলে এক প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেপ্রসঙ্গে নিবেদিতা তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, "Partition of Bengal Meeting. The Black Shadow."[২৫] সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৬ই অক্টোবর, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন, একটি ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন, যা প্রয়াত স্যার তারকনাথ পালিত ও নিবেদিতা সমর্থন করেন। বঙ্গভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ছিল স্বদেশী ও বয়কট। নিবেদিতার নিকট স্বদেশী ছিল একটি 'তপস্যা' ও এর ফলাফল সম্পর্কে তিনি বলেন, "পূর্ব বাংলায় যে সংগ্রাম চলছে তা সারা ভারত দেখছে। সংবাদপত্রে এই নিয়ে কোন শব্দ প্রকাশিত হয় না বললেই চলে, যদিও এবিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। দুর্দান্ত বীর যে মানুষগুলি স্বদেশী পণ্যের জন্য মরণপণ লড়াই চালাচ্ছেন তাদের প্রতি প্রত্যাশা, সহমর্মিতা, গর্বে আকাশ-বাতাস উত্তেজনাপূর্ণ। সমগ্র ভারত নিঃশব্দে তাদের শক্তিকে একত্রিত করছে।"[২৬]

এসময় বাংলায় গড়ে ওঠা বহু শিল্পোদ্যোগে নিবেদিতার উদ্যম, অর্থনৈতিক সহায়তা ছিল। তিনি কাঁচামাল সরবরাহ ও বিতরণ কেন্দ্রগুলিকে সংগঠিত করেছিলেন; কারিগর, পাইকারি বিক্রেতাদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছিলেন। বিনাসুদে টাকা ধার দেওয়ার জন্য একটি সাহায্য তহবিল খুলেছিলেন। বাজারের কোন দোকানে বিদেশী পণ্য দেখলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। যেকোন স্বদেশী বস্তু,তুচ্ছ হলেও নিবেদিতার নিকট ছিল অমূল্য। তিনি বলতেন ভারতবাসীর কর্তব্য হল ব্যবসায়ীমহলের যে ষড়যন্ত্রে স্বদেশ ও স্বজাতি আজ ক্রমশ সর্বস্বান্ত হতে বসেছে, তার যতদূর সম্ভব প্রতিবাদ করা। "স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা হল সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরতা। সেখানে সাহায্যলাভের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি বা সুবিধালাভের জন্য তোষামোদ করা নেই। ভারত নিজের জন্য যতটা করতে পারে ততটাই করবে।"[২৭]

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে বারাণসীতে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নরমপন্থী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে। নিবেদিতার সাথে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই ছিল। বারাণসী কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন। অধিবেশনের কিছুদিন পূর্বে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "...কংগ্রেসের প্রকৃত কাজ হল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের; এটি সদস্যদের এক নতুন পদ্ধতিতে চিন্তাভাবনার প্রশিক্ষণ দেবে যা জাতীয়তাবোধ গঠন করবে, তাদের তাৎক্ষণিক ও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শেখাবে, রাজনৈতিক বিশ্বস্ততা,সাম্প্রদায়িক উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি পারস্পরিক সহানুভূতির শিক্ষা দেবে যা হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, মণিপুর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের অধিবাসীদের একসূত্রে আবদ্ধ করে রাখবে।"[২৮] বারাণসী অধিবেশনে স্টেটসম্যানের সাংবাদিক হিসাবে নিবেদিতা যোগ দিয়েছিলেন ও কাশীর তিলভান্ডেশ্বরের যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেটি অধিবেশন চলাকালীন নেতাদের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছিল।

১৯০৬ সালে কলকাতা অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখদের নেতৃত্বে চরমপন্থীরা এক নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। নিবেদিতা কংগ্রেসের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান মতবিরোধ দেখে মর্মাহত হয়ে *The Indian National Congress* নামক প্রবন্ধে লেখেন, "তরুণ ভারত আজ ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজনৈতিক কার্যকলাপে মুগ্ধ,সম্ভবত সম্মোহিতও বটে। সে মনে করে বিভিন্ন দলের কোলাহলের স্থানে পরিণত না হলে পাশ্চাত্য দেশপ্রেমের বলিষ্ঠতা ও কর্মশক্তির অনুকরণ সম্ভবপর নয়। আমাদের মধ্যে যে পারস্পরিক

দোষারোপ ও আক্রমণ শুরু হয়েছে এটাই তার কারণ।...বস্তুত তরুণ ভারত এখনও বোঝেনি যে তার আন্দোলন দলীয় রাজনীতির আন্দোলন নয় বরং একটি জাতীয় আন্দোলন।”[২৯]

ভারতের ঐক্যবদ্ধতার প্রতীকস্বরূপ নিবেদিতা একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা বহুদিন ধরেই করেছিলেন। ১৯০৫ সালে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন- “আমরা জাতীয় পতাকার জন্য একটি নকশা বেছেছি-বজ্র এবং ইতিমধ্যেই একটি তৈরিও করেছি। দুর্ভাগ্যবশত চীনের যুদ্ধপতাকাকে আমার আদর্শ করেছিলাম ও লালের ওপর কালোর কাজ করেছি। এটি ভারতবাসীর হৃদয়স্পর্শ করবেনা-সুতরাং পরেরটা হবে লালের ওপর হলুদ নকশাবিশিষ্ট।”[৩০] নিবেদিতা তাঁর শিক্ষার্থীদের দ্বারা তৈরী লাল-হলুদ বর্ণের একটি পতাকা ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বজ্রকে জাতীয় প্রতীক করার চিন্তাভাবনা করেছিলেন, কারণ “এটি বুদ্ধের চিহ্ন। এটি শিবের ত্রিশূলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। স্বামীজীও প্রায়ই নিজেকে বজ্র বলতেন। সর্বোপরি এটি কোন মূর্তি নয় যে মুসলিমরা এটি প্রত্যাখ্যান করবে।”[৩১]

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পরিবর্তে প্রকাশ্য বিদ্রোহের প্রস্তুতিস্বরূপ যে গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল তার প্রতি নিবেদিতার সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বাংলার প্রথম দিকের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সাথে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন- “নিবেদিতা বাংলার গুপ্তচক্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। একাধিকবার তাঁর কাছে গুপ্তচক্রের কাজে গিয়ে বাগবাজারের স্কুল-বাড়িতে দেখা করেছি। ...নিবেদিতার প্রদত্ত লাইব্রেরিই ১০৮নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎসমূল। তাঁর সঙ্গে যতীনদার কথাই ছিল, এই বইগুলি অবলম্বনে সেখানে রাজনীতি শেখাবার ও কর্মী গড়বার স্কুল করতে হবে।”[৩২]

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, “জোসেফ মাৎসিনীর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি ভগিনী বাংলার বিপ্লবসমিতিতে দিয়েছিলেন। এটি সারাদেশে প্রচারিত হয়েছিল। এতে গেরিলা যুদ্ধকৌশল লিপিবদ্ধ ছিল। এইসব বইগুলি লেখক কেশবচন্দ্র গুপ্ত নামক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন...কেশব আলিপুর বোমার মামলায় আত্মগোপনের পূর্বে অন্যান্যদের কাছে বইগুলো রেখে দিয়েছিলেন। সারাদেশে পুলিশের অনুসন্ধানের সময় বইগুলি একে-একে আবিষ্কৃত হয়েছিল। নিবেদিতা বলতেন, “এক-এক করে আমার বইগুলো আত্মপ্রকাশ করছে।”[৩৩] তিনি ১৯০৭ সালে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ভূপেন্দ্রনাথের জামিনের জন্য ২০,০০০টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইংলিশম্যান পত্রিকা এর জন্য নিবেদিতাকে ‘a traitor to her race’ বলে অভিহিত করেছিল। নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মিসেস বুলকে লিখেছিলেন, “স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার মনে থাকবে, রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য বর্তমানে তিনি বিচারাধীন।...৬মাস থেকে ৩বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সে এতটাই সাহসী যে এই নিয়েও হাসি-তামাশা করছে,আবার বলছে ‘এটি একজন ভদ্রলোকের পক্ষে অপ্রীতিকর এবং জানেনই তো আমি একজন গর্বিত দত্ত!’ একদম স্বামীজীর মতো!”[৩৪] জেল থেকে মুক্তিলাভের পর ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় যান। জগদীশচন্দ্র বসু ও নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথের জন্য নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আন্ডার গ্রাজুয়েট শ্রেণীর পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

মানিকতলা বোমার মামলায় ধৃত কানাইলাল দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাহায্যে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে ফাঁসি যান। নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে জেলে কানাইলালের সাথে হওয়া বৈষম্যমূলক আচরণের কথা লিখেছিলেন- “বৃদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফাঁসির পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আধ্যাত্মিক প্রবোধদানের জন্য...কাজটি করতে হয়েছিল

গরাদের বাইরে থেকে, সাথে ৫-৬জন ইউরোপীয় ও ভারতীয় ওয়ার্ডেন ও গার্ড তাদের ঘিরে ছিল ও কথাবার্তা শুনেছিল বলে আমার ধারণা। কানাইলাল দত্তের ক্ষেত্রেও একই কাজ করার অনুরোধ করা হয়েছিল...কিন্তু তাঁকে কানাইলালকে দেখতে দেওয়া হয়নি। তোমাকে একথা বলছি কারণ পুনরায় এই ঘটনা ঘটতে পারে। একজন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যাজকের দেখা করতে না দেওয়া নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়!"[৩৫]

নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেমঁ জানিয়েছেন মুরারীপুকুর রোড ল্যাবরেটরীতে বোমা তৈরির সাথে নিবেদিতার যোগসূত্র ছিল ও এবিষয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বন্ধুদের সাহায্যও করতেন। এমনকি তাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরীতে জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহকারী হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, যদিও উভয়ের কেউই নিবেদিতার এই দুঃসাহসিকতার সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কেউ যদি নিবেদিতাকে বলত, "আমরা ভারতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত", তাদের তিনি বলতেন, "অস্ত্রচালনা করতে জানো? গুলি ছুঁড়তে? জানো না, তাহলে যাও, শিখে এসো!" ইংরেজদের থেকে সম্মান পাওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করলে তাঁর উত্তর ছিল, "এক্ষেত্রে ওরা যেমন লড়ত, তোমরাও তেমনই লড়াই করো ও এর পরিণতি দেখার জন্য প্রস্তুত থাকো। এটা কিন্তু একটা কঠিন পরীক্ষা!" জাতীয়তাবাদী নেতাদের বলতেন, "কিসের জন্য প্রতীক্ষা করছো? কাজে লেগে পড়ো। অসংখ্য শত্রুর মতই যুদ্ধেরও অনেক উপায় আছে। আয়ারল্যান্ডের প্রচলিত কথা 'বোমা না ফাটালে ইংরেজ কিছুই দেবে না।' প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সংস্কার সর্বদা সরকারের থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়েছে ও মুষ্টিমেয় মানুষকে এর দাম দিতে হয়েছে। আয়ারল্যান্ড তার বীরদের জন্য গর্বিত। তোমাদের প্রজন্মের বীরেরা কোথায়?"[৩৬]

১৯০৬ সালে বরিশাল সম্মেলনের পর কোলকাতা তথা বাংলায় ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গৃহীত দমনমূলক নীতির প্রতিবাদস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছিল সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা। নিবেদিতা যে এইসবের বিরোধী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। একবার বিপ্লবী দলের দুজন যুবক তারকেশ্বরের এক বাড়িতে ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন। তারা নিবেদিতার থেকে রিভলভার চাইতে গেলে নিবেদিতা ক্রুদ্ধ হন ও তাদের নেতা যতীন্দ্রনাথকে সবকিছু জানিয়ে এই তরুণদের বেআইনী ও নিষ্ঠুর কাজ থেকে বিরত রাখতে বলেন।[৩৭]

নিবেদিতা তাঁর লেখক সত্ত্বাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সেবায় নিয়োজিত করেন। **১৯০৩** সাল থেকেই তিনি কলকাতার 'দ্য স্টেটসম্যান', 'নিউ ইন্ডিয়া', 'মডার্ন রিভিউ', 'প্রবুদ্ধ ভারত', পাটনার 'হিন্দুস্থান রিভিউ', মাদ্রাজের 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' ইত্যাদি নানা পত্র-পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের আদর্শ, দেশের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। স্টেটসম্যানের সম্পাদক স্যামুয়েল র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা ভারতপ্রেমী করে তুলেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল স্টেটসম্যানের মত প্রভাবশালী কাগজে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল মতামত প্রকাশের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে দেশে-বিদেশে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা। **১৯০৪-১৯০৬** সালের কালপর্বে স্টেটসম্যান ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতি এতটাই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল, যে তা শাসকসম্প্রদায়কে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। নিবেদিতা এক পত্রে লিখেছিলেন,"র‍্যাটক্লিফ ভারতের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের উদ্দেশ্যপূরণে স্টেটসম্যানের সম্পাদকরূপে প্রভূত সাহায্য করেছেন।"[৩৮]

১৯০৭-১৯০৯ সালের জুলাই পর্যন্ত নিবেদিতা পাশ্চাত্যে অবস্থান করেন। এইসময়ে গোখলে, কুমারস্বামী, আর.সি.দত্ত প্রমুখরা ইংল্যান্ডেই ছিলেন। নিবেদিতা সাংবাদিক মিঃ

নেভিনসন, উইলিয়াম স্টেড, মিঃ র‍্যাটক্লিফ, জন পেজ হপ, কমন্সসভার সদস্য হেনরী কটন, ফ্রেডারিক ম্যাকারনেস, ডক্টর রদারফোর্ড, মিঃ ও-ডনেল, মিঃ জে.হার্ট-ডেভিস প্রমুখদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন যারা ইংল্যান্ডে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে প্রচার চালাতে নিবেদিতাকে সাহায্য করেছিলেন। পাশাপাশি বিপ্লবীনেতা ক্রুপটকিনের সাথে আলোচনায় নিবেদিতা উপলব্ধি করেন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবীভাব জাগ্রত না হলে গুপ্ত আন্দোলন বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ কোনটাই সাফল্যলাভ করেনা।

১৯০৯ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে নিবেদিতা ছদ্মবেশও ধারণ করেছিলেন। তার একাধিক পত্রে এর উল্লেখ আছে। মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন- “তোমার পরিচ্ছদগুলি একেবারে ঈশ্বরপ্রেরিত যেন। এখানকার কাজ শেষের পরমুহূর্ত থেকে কলকাতা পৌঁছানো পর্যন্ত আমাকে সেকুলার পোশাক পরতে হবে। এমন অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে হবে-আমি মিস বা মিসেস বুল।” কয়েকদিন পর পুনরায় লেখেন-“আমার ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ-তোমার পোশাকের কারণে।”[৩৯] কলকাতায় ফিরেও বেশকিছুদিন নিবেদিতা আত্মগোপন করেছিলেন। এইসময় অনেকে সিস্টার দেবমাতাকে নিবেদিতা বলে মনে করতেন, তাতে নিবেদিতার সুবিধাই হয়েছিল। ১৯১০ সালে পুনরায় আমেরিকায় যাত্রাকালে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। এক পত্রে লিখেছিলেন- “আমি মিসেস থেটা মার্গট নাম নিয়ে ছদ্মপরিচয়ে ভ্রমণ করছি-নতুন নামস্বাক্ষরে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।”[৪০]

১৯০৯ সালে নিবেদিতার প্রত্যাবর্তনের সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল পরিবর্তিত। সরকারের দমননীতির কারণে বৈপ্লবিক আন্দোলন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই হয় জেলে নয়ত নির্বাসনে ছিলেন। নিবেদিতার একাধিক পত্রে সরকারের দমননীতির সমালোচনা পাওয়া যায়। ১৯০৯ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় বোম্বাই বন্দরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন- “উপকূলে অবতরণ ছিল বিভিন্নদিক থেকে একটি শিক্ষা। আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদের ওপর শুল্কসংক্রান্ত বিস্ময়কর নিয়মগুলি থেকে আপনার ধারণা হবে ভবিষ্যতে গুরুতর নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল না পেরিয়ে বা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া ভারতে কোনরকম অস্ত্র প্রবেশ করবে না। আইনগুলি ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে অকার্যকর হলেও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এমনভাবে প্রয়োগ হয় যা নৈতিক নির্যাতনের সমান।”[৪১] স্বদেশী আন্দোলনের সময় মিস ম্যাকলাউডকে সরকারী দমননীতির প্রসঙ্গে লিখেছিলেন- “...আপনি কল্পনা করতে পারবেন না সরকারের ভারতবিরোধী নীতি কতটা সুস্পষ্ট। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত, আগামী ৫বছরের মধ্যেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তাদের নিজেদের জন্যই।”[৪২] নিবেদিতা সরকারের শিক্ষানীতিরও সমালোচনা করেন-“কৃষ্ণনগরের নাম শুনেছো? বাংলার চার-পাঁচটি সরকারী কলেজের অন্যতম-যখন প্রাইভেট কলেজের বিজ্ঞানবিভাগগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল তখন এগুলোই আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, এদেরও এখন একে-একে নিভিয়ে দেওয়া হবে। কৃষ্ণনগর ও হুগলী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল কৃষ্ণনগর। এটির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অর্ধেক সরকারের, অর্ধেক জনগণের ছিল। বর্তমানে শর্ত দেওয়া হয়েছে-জনগণ কলেজটির সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ, নির্মাণ ও সম্প্রসারণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে না পারলে এটি বন্ধ হয়ে যাবে। জনগণ জানিয়েছেন-তারা এইসবই করবেন কিন্তু ভবিষ্যতে পরিচালনার ও নিয়োগের অধিকারও তাদেরই থাকবে। সরকার এপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের আস্পর্ধা দেখিয়েছে।”[৪৩]

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধে সরকারের দমননীতির উল্লেখও নিবেদিতার একাধিক পত্রে আছে। ১৯১০ সালে কর্মযোগীন পত্রিকাটি রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের কারণে সরকারের রোষানলে পড়েছিল, সেপ্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছিলেন- "ওরা কোন বিরোধী কণ্ঠস্বর থাকতে দেবেনা। যদি কোন সংবাদপত্র সামান্যতমও স্বাধীনতা দেখায়, তাকে অবশ্যই ভেঙ্গে দিতে হবে। স্পষ্টতই সরকার সেইদিনের আকাঙ্খা পোষণ করে, যখন দেশের জন্য জীবনদানে প্রস্তুত মানুষের কাছে গুপ্তহত্যার প্রচারই হবে দেশসেবার একমাত্র উপায়।...এই পরিস্থিতিতে জনগণের একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হবে গোপন সংবাদপত্র। ইতিমধ্যেই আমি ইংরাজী ও স্থানীয় ভাষায় এমনকিছু সংবাদপত্রের কথা শুনেছি।"[৪৪] অপর একপত্রে পুনরায় লিখেছিলেন- "সংবাদপত্রগুলি নীরব। এমনকি তাদের শিরোনামগুলিও সতর্ক ও কম তীব্রতাসম্পন্ন হবে। সমগ্র দেশ দুর্দশাপূর্ণ। গত ১২-১৪ দিনে শুধুমাত্র কলকাতাতেই ২০টি গ্রেফতার হয়েছে ডাকাতি ও রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য- আবার কয়েকটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্বেষের জন্য- কিন্তু একটা শব্দও শোনা যায়নি।...তারা কি ভাবছেন শব্দ শোনা যাচ্ছেনা বলে চিন্তাভাবনাও বন্ধ?"[৪৫]

নিবেদিতার সরকার-বিরোধী নানা কাজকর্মের জন্য সরকারের সন্দেহভাজনের তালিকায় তার নাম ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন- "ভারতে নিবেদিতার কাজকর্ম, বক্তৃতা বৃটিশ-ভারতীয় পুলিশের সন্দেহ জাগ্রত করেছিল। মিঃ কার্লাইল, কুখ্যাত বাংলা গভর্নমেন্ট অফিসার, ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে একবার জিজ্ঞাসা করেন, নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডের ফেনিয়ান দলের সদস্য কিনা।"[৪৬] নিয়মিতভাবে নিবেদিতার চিঠিপত্র পরীক্ষা করা হত, ফলে প্রায়ই সেগুলি খোলা অথবা ছেঁড়া অবস্থায় তার কাছে আসত। ১৯১০ সালে এবিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে পোস্টমাস্টার জেনারেলকে নিবেদিতা চিঠিও লিখেছিলেন। নানাসময়ে একাধিক ঘটনায় বৃটিশ পুলিশের সন্দেহের তীর গেছে নিবেদিতার দিকে, কখনো বিপ্লববাদ প্রচারকারী যুগান্তর পত্রিকার প্রেরণাদাত্রী হিসাবে কখনো রাজনৈতিক ডাকাতিতে জড়িত থাকার জন্য। প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তব্য ছিল- "শুনলাম যুগান্তরের প্রেরণাদাত্রী হিসাবে আমি সি.আই.ডি-র তালিকায় ছিলাম-এটি একটি মজাদার অভিযোগ কারণ আমি জানিনা এতে কি আছে বা কারা এটি পরিচালনা করে! কিন্তু আমি সম্মানিতবোধ করি, যদিও মাঝেমধ্যেই সম্মানগুলি অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে।"[৪৭] দ্বিতীয় অভিযোগটি সম্পর্কে র‍্যাটক্লিফকে লেখেন- "মনে হয় আপনাকে কয়েকদিন আগেই বলেছিলাম গোয়েন্দা বিভাগের (CID-র) প্রধান ডেনহ্যাম আমাকে এইসব ডাকাতির পেছনে অনুপ্রেরণার উৎস অনুমান করে সম্মানিত করেছিলেন। বর্তমানে কেউ (এমনকি তিনিও) এটা সত্য ভাবেন বলে মনে হয়না। আমার মতে প্রয়োজন পড়লে তারা আমাকেও দমন করতে পারেন।"[৪৮] তাঁর গ্রেফতারের সম্ভবনা সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আমি মনে করি লেখালেখির জন্য সাড়ে পাঁচ বছরের বেশিসময় আমার কাছে নেই, যদি তার পরেও বেঁচে থাকি তাহলে কারাগারে থাকব। শীঘ্রই এমনসময় আসছে যখন ভারতে কোন মতামত প্রকাশের জন্য ইউরোপীয়দেরও গ্রেফতার করা হবে..."[৪৯]

নিবেদিতা উপলব্ধি করেন জাতীয় আন্দোলনকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, সর্বাত্মক হতে হবে। ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য-প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটাতে হবে। তাঁর অনুপ্রেরণায় নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখদের নিয়ে একদল জাতীয়তাবাদী শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। নিবেদিতা ইংল্যান্ডের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সদস্য লেডি হেরিংহামের সহকারী হিসাবে অজন্তার গুহাচিত্র নকল করতে অসিত হালদার ও নন্দলাল বসুকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী, মডার্ন রিভিউতে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করতেন, যাতে সাধারণ মানুষ সেইবিষয়ে অবহিত হয়। তিনি বলতেন, "জাতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ আমার সর্বপ্রিয় স্বপ্ন। ভারত যখন তার পুরাতন শিল্পকে ফিরে পাবে তখন সে শক্তিশালী জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।"[৫০] শিল্পের পাশাপাশি ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণায় সহায়তাদানের মাধ্যমে নিবেদিতা বৃটিশ সরকার, বৈজ্ঞানিকদের অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্র ইংরাজীতে অনুবাদে সাহায্য করা, বিভিন্ন লেখার সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করে বিদগ্ধজনের মনোগ্রাহী করে তোলা, মিসেস বুলকে অনুরোধ করে গবেষণাকার্যের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, কাউন্সিলের সদস্য গোখলেকে লেখা একাধিক পত্রের মাধ্যমে সরকারী মহলে জগদীশচন্দ্রের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ জানানো-জগদীশচন্দ্রের কর্মকান্ডে নিবেদিতার অবদান বহুবিধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত, সাংবাদিক মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরাও নিজ-নিজ ক্ষেত্রে নিবেদিতার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত যশস্বী ব্যক্তিরাই নয় উদীয়মান লেখক, শিল্পী, ঐতিহাসিক, তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদেরও নানাভাবে নিবেদিতা সাহায্য করতেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। তারকনাথ দাস তার বই *Japan and Asia* নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী তার আধ্যাত্মিক গুরু নিবেদিতাকে *'স্বদেশ গীতঙ্গল'* ও *'জন্মভূমি'* নামক দুটি কবিতার বই উৎসর্গ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন- "এই বৃটিশ নারী ভারতের জন্য যেপ্রকার সর্বগ্রাসী ভালবাসায় উদ্দীপ্ত ছিলেন, তার তুল্য ভালবাসা খুব কমসংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে দেখা যায়। নিবেদিতা আমাদের কাছে যেভাবে এসেছিলেন, অন্য কোনো ইউরোপীয় সেভাবে আসেননি...।"[৫১]

তথ্যসূত্র:

১) Basu SankariPrasad, *letters of Sister Nivedita,* Nababharat Publishers, Calcutta, 1960, পৃষ্ঠা-১৪।

২) *The Complete Works Of Sister Nivedita,* volume1, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1967, পৃষ্ঠা-২৮৯-২৯০।

৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।

৪) Basu SankariPrasad, *letters of Sister Nivedita,* Volume1, Nababharat Publishers, Calcutta, 1960, পৃষ্ঠা-২১।

৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১।

৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৬।

৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮১।

৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩২।

৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩৫।

১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫২৫।

১১) ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য, *ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী,* অশোক প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২২৫।

১২) বসু শঙ্করীপ্রসাদ, *লোকমাতা নিবেদিতা,* দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪৩০, পৃষ্ঠা-১৫৯।

১৩) *The Complete Works Of Sister Nivedita,* volume-4, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1955, পৃষ্ঠা-২৯০।
১৪) প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা,* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা-২৫২।
১৫) ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য, *ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী,* অশোক প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৫২।
১৬) Reymond lizelle, *The Dedicated,* The John Day Company, NewYork, 1953, পৃষ্ঠা-২৮৬।
১৭) বাগল যোগেশচন্দ্র, *ভারতের মুক্তি-সন্ধানী,* পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা-২৬৭।
১৮) Rangarajan V, Sister Nivedita : The 'Dedicated' Daughter of MotherIndia, *Prabuddha Bharata,* জানুয়ারি, 2017, volume-122, পৃষ্ঠা-২২৫।
১৯) *Nivedita of India,* The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, 2007, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩।
২০) Pravrajika Atmaprana, *Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda,* Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 2017, পৃষ্ঠা-১৭৮-১৭৯।
২১) *বিনয় সরকারের বৈঠকে,* প্রথম খণ্ড, ছাতিম বুকস, কলকাতা, 2000, পৃষ্ঠা-১৯৬-১৯৭।
২২) Mukherjee Haridas & Mukherjee Uma, *The Origins of the National Education Movement,* Jadavpur University, 1957, পৃষ্ঠা-২৭৩-২৭৪।
২৩) Sri Aurobindo, *Sri Aurobindo On Himself And On The Mother,* Volume-1, SriAurobindo Ashram, পন্ডিচেরী, 1953, পৃষ্ঠা-১১৬।
২৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৭।
২৫) Pravrajika Atmaprana, *Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda,* Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 2017, পৃষ্ঠা-১৮৯।
২৬) *The Complete Works Of Sister Nivedita,* volume-4, Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1955, পৃষ্ঠা-২৮১।
২৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৬।
২৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭২।
২৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭১।
৩০) Basu SankariPrasad, *letters of Sister Nivedita,* Volume-2, Nababharat Publishers, Calcutta, 1960, পৃষ্ঠা-১৭৯।
৩১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২২।
৩২) বসু শঙ্করীপ্রসাদ, *লোকমাতা নিবেদিতা,* দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪৩০, পৃষ্ঠা-১৮৭।
৩৩) Dutta Bhupendranath, *Swami Vivekananda Patriot-Prophet,* Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, পৃষ্ঠা-১১৯।
৩৪) Basu SankariPrasad, *letters of Sister Nivedita,* Volume-2, Nababharat Publishers, Calcutta, 1960, পৃষ্ঠা-৮৬৮।
৩৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯৩।
৩৬) Reymond lizelle, *The Dedicated,* The John Day Company, New York, 1953, পৃষ্ঠা-৩২৬-৩২৭।
৩৭) Pravrajika Atmaprana, *Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda,* SisterNivedita Girls' School, Calcutta, 2017, পৃষ্ঠা-১৯৮।
৩৮) বসু শঙ্করীপ্রসাদ, *লোকমাতা নিবেদিতা,* তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৪, পৃষ্ঠা-১৬৪।

৩৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১।
৪০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩।
৪১) Basu Sankari Prasad, *letters of Sister Nivedita,* Volume-2, Nababharat Publishers, Calcutta, 1960, পৃষ্ঠা-৯৮৪-৯৮৫।
৪২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬৫।
৪৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৩৪।
৪৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৮৭।
৪৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১১৮।
৪৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১১৮।
৪৭) Basu SankariPrasad, letters of Sister Nivedita, Volume-2, Nababharat Publishers, Calcutta, 1960, পৃষ্ঠা-১০১৬।
৪৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১১৯।
৪৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬৫।
৫০) বসু শঙ্করীপ্রসাদ, লোকমাতা নিবেদিতা, চতুর্থ খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৪, পৃষ্ঠা-১০৩।
৫১) Pal BipinChandra, The Sole of India, Choudhury & Choudhury, Calcutta, 1911, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।

ভারতবর্ষের কৃষি সমাজ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রভাস মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
নেতাজি নগর ডে কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের কৃষি সমাজের উন্নয়ন হাজার হাজার বছর ধরে ঘটে চলা এক জটিল এবং সমৃদ্ধ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ। সেই প্রাচীনকাল থেকে কৃষি ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের মেরুদন্ড। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক কাঠামো গঠনে কৃষি ব্যবস্থা অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি ব্যবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। বিশেষত যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে সাথে এই ব্যবস্থা ক্রমশ অগ্রসরও হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হওয়ার পর অর্থাৎ স্বাধীন ভারতবর্ষে কৃষি ব্যবস্থার সাথে রাজনীতির যোগসূত্র অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতি, কৃষি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে কৃষি ব্যবস্থার জন্য অনুপযুক্ত বা অনুপযোগী সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। যদিও সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কৃষক সমাজ চুপ করে থাকেনি। অনেক সময় সক্রিয় প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। সব ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের পিছু হটতে বাধ্য হতে হয়েছে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত ভারতীয় রাজনীতিতে বা ভারতীয় কৃষি সমাজ ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়।
সূচক শব্দ: কৃষি ব্যবস্থা, গ্রামীণ, জনকল্যাণ, দারিদ্র, জনসংখ্যা, পরিচলন ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ন্যূনতম মূল্য।

মূল আলোচনা:

ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার মূল সেই প্রাচীন কালে প্রোথিত। সাত হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতীয় ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উৎপাদনে সক্ষম গোষ্ঠীর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। মূলত, সিন্ধু উপত্যকার উর্বরশীল অঞ্চলে কৃষক সমাজের পথ চলা শুরু হয়। বর্তমানে যে অংশটি মূলত পাকিস্তানে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমান। এই অঞ্চলটি মূলত নদী পার্শ্ববর্তী উর্বর ভূমি এবং উপযোগী আবহাওয়ার দরুন বিশ্ব সভ্যতায় একটি আদর্শ প্রাচীন এবং উন্নত সভ্যতা হিসেবে পরিচিত। সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা, বিশ্বের প্রাচীনতম একটি কৃষি সভ্যতা হিসেবে পরিচিত। এই সভ্যতায় পরিকল্পিত শহর, জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, সংগঠনিক উচ্চমানের ব্যবস্থা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ ছিলো। সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন প্রকারের দানাশস্য, তুলো প্রভৃতি জিনিস উৎপাদিত হতো। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের গবাদি পশু, ছাগল, ভেড়া, প্রভৃতি প্রতিপালনও লক্ষ্য করা গেছে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর মত শহর এই সভ্যতার উন্নয়নের পরিচয় রাখে। এই সভ্যতায় বিনিময় ব্যবস্থারও ভালো রকম উন্নয়ন ঘটেছিল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, মেসোপটেমিয়ার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পরবর্তীকালে বৈদিক যুগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার আলোচনায় বৈদিক যুগের কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর অংশে আর্যদের প্রবেশ ঘটে। গঙ্গা, যমুনা নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে তারা বসবাস স্থাপন করে। বৈদিক যুগের সাহিত্য, যেমন বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ঋগবেদের কথা,

সেখানে কৃষিকাজ পরিচালনার বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। সে সময়, বিভিন্ন ধরনের দানা শস্যের উৎপাদনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া পশু প্রতিপালনের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয় কৃষি সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন হয়েছিল। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষি কাজ। সেই কৃষি ব্যবস্থা, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় গৃহীত নীতির দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের নীতি প্রণয়ন করেছিল, যেগুলি শুধুমাত্র অর্থ সংক্রান্ত বা রাজনৈতিক বিষয়ে নয়, তা ভারতবর্ষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব রাখে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বিশেষ করে মুঘল এবং অন্যান্য উপনিবেশিক-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অনেকটাই নমনীয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন এবং পরিচালন প্রক্রিয়াকে মান্যতা দেওয়া হয়েছিলো। গ্রামীন সম্প্রদায় সম্পূর্ণ একটি পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে বিরাজ করত, তাদের স্বকীয়তা বজায় থাকতো। ভূমির মালিক সাধারণত কোন সম্প্রদায়ের প্রধান বা বংশগত ভাবে নির্ধারিত হতো। উৎপাদক বা কৃষকদের সাথে জমির মালিক বিশেষকরে জমিরদারদের সাথে সম্পর্কের একটি বাতাবরণ গড়ে উঠতো। তাছাড়া জমি থেকে যে কর আদায় হতো তা বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে আসতো, যেমন জমিদার, জায়গীরদার বা বিভিন্ন স্থানীয় শাসকদের মাধ্যমে। এই ভাবে সম্পদ সংগৃহীত হতো বলে অনেক সময় একটা সামাজিক সমন্বয় বা সমতা লক্ষ্য করা গেছে। আবার উল্টোটাও অনেক সময় লক্ষ্য করা যেতো। এই সমস্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা সম্পদ সংগৃহীত হওয়ার কারণে অনেক সময় নৃশংস অত্যাচার বা অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টাও চলতো। তবে ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার পর ভারতের কৃষি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমুল পরিবর্তন সাধন হয়। বিভিন্ন ধরনের চুক্তি বা নীতি গৃহীত হয়, যা কৃষি ব্যবস্থাকে অনেকটাই প্রভাবিত করে। উল্লেখযোগ্য তেমন কয়েকটি বিষয় হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা, মহলওয়ারি ব্যবস্থা প্রভৃতি। ব্রিটিশ শাসনকালে কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে তার বাণিজ্যিকীকরণটা অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে যুক্ত হয়। যেখানে ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের নীতি গ্রহণ করে। তাদের স্বার্থ সমৃদ্ধ করবে এমন ধরনের চাষ-আবাদের বিষয়ে উৎসাহী হয় এবং বাধ্য করে। যেমন নীল চাষে বাধ্য করা, সুতো এবং পাটের চাষে গুরুত্ব দেওয়া, চা-কফি উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রভৃতি। এ সমস্ত উপনিবেশিক নীতি ভারতীয় কৃষি সমাজ ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যেমন কৃষকদের ওপর ভূমি রাজস্বের মাত্রা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা তাদের রাজস্ব পূরণ করতে না পেরে বাধ্য হয় নিজেদের পছন্দের বিরুদ্ধে গিয়ে কৃষি কাজে নিযুক্ত হতে। তারা বাধ্য হয় ঋণ দাতাদের কাছে থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে এবং সেই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মাফিক খাদ্যের সংকটের মুখোমুখি হয়। তারা তাদের পছন্দমত জীবন যাপন ব্যর্থ হয়। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে বাধা-বিগ্রহের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়, যা তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। খাদ্য সংকট, উপযুক্ত বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব, তার ওপর ব্রিটিশরা কৃষিকাজের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা না ভেবে রেল লাইন বিকাশে ব্যস্ত হওয়াতে সংকট আরো চরমে পৌঁছয়। যার ফলস্বরূপ দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর। সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা নিজস্বতার জায়গা ছিলো, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভূস্বামী, প্রজা এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকে। তার ওপর গ্রামীণ এলিট বা জমিদার এবং সাধারণ গরিব কৃষকদের

মধ্যে বিভেদ নীতি, অবস্থাকে আরো বিপর্যয় করে তোলে। যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৃষকবিদ্রোহ, বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। যেমন নীল বিদ্রোহ, মাপিল্লা বিদ্রোহ, বারদৌলি সত্যাগ্রহ প্রভৃতি। এই সমস্ত কৃষক বিদ্রোহ, উপনিবেশিক শাসনকালে কৃষকদের ওপর শোষণের পরিচয় তুলে ধরে। ব্রিটিশরা তাদের সুবিধামতো পরিকাঠামো গড়ে তোলে। যেমন রেল ব্যবস্থার বিকাশ তাদের পন্য আমদানি- রপ্তানিতে অনেক সাহায্য করে, বিশেষ করে, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তাদের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য এদেশে রপ্তানির মধ্য দিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে আরও বেশি বিকশিত হতে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে বা সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা তাদের স্বার্থ মতো, তাদের সুবিধা জনক দিক সামনে রেখে পরিকাঠামো গড়ে তোলে, যা এখানকার কৃষক সমাজকে আরো বিপদমুখী করে তোলে। ব্রিটিশদের এইরূপ স্বার্থ ভিত্তিক নীতির কারণে অসমতা বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা গড়ে তোলে, তবে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তা অনেকটা সহায়কের ভূমিকা পালন করে। কারণ মহাত্মা গান্ধীর মত জাতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দের জন্ম হয়, যারা সমগ্র দেশে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। যেমন চম্পারন সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী কৃষি ক্ষেত্রে তার লড়াই দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করে তোলেন। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে কিছু কিছু কাজ তাদের স্বার্থে সংগঠিত করলেও ভারতবর্ষের পরিকাঠামগত উন্নয়নে সেগুলি সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

উপনিবেশিক শাসন অবসানের পর অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর কৃষি ব্যবস্থাতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে বা সংস্কার সাধন হয় যা ভারতীয় কৃষি সমাজকে নতুন রূপে তুলে ধরে। যেহেতু ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং এটি একটি কৃষি প্রধান দেশ, তাই কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। মূলত কাঠামো ও জমিকে কেন্দ্র করে সম্পর্ক এবং গ্রামীণ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তন গুলির সহজে লক্ষ্যণীয়। সামাজিক অসাম্য, শোষণ, কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার এবং কৃষি ক্ষেত্রের পুনর্গঠন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিশেষ করে জমিদারি ব্যবস্থার অবসান এবং বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী গোষ্ঠীর গুরুত্বের ক্রমশও হ্রাস কৃষি ক্ষেত্রে উপর এক পরিবর্তন নিয়ে আসে। জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং অতিরিক্ত জমি উদ্ধার করে তা সাধারণ ভূমিহীন মানুষের মধ্যে বিলি করে দেওয়া, কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান এবং ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমির বিতরণ কৃষি সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। সবুজ বিপ্লব এবং কৃষি ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ, ভারতীয় কৃষি সমাজের জন্য এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যান্ত্রিক ক্ষেত্রের অগ্রসরতা এবং উচ্চ ফলনশীল বীজের সৃষ্টি, রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ভারতীয় কৃষি সমাজকে অনেকটাই এগিয়ে দেয়, যা খাদ্য সংকট এবং আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমিয়ে দেয়, কৃষি ক্ষেত্রকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে সহায়তার ভূমিকা পালন করে। এখানে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যদিও কৃষি উন্নয়ন খাদ্য সংকটকে সংকুচিত করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে তথাপি বৃহৎ কৃষক এবং যারা মার্জিনাল বা ক্ষুদ্র কৃষক তাদের মধ্যে এক দূরত্ব নির্মাণ করে। যারা বড় চাষী তারা অনেক বেশি লাভবান হয়, তুলনামূলকভাবে যারা ছোট বা মাঝারি চাষী তাদের মধ্যে এক সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। যারা ছোট বা মাঝারি চাষী তারা তেমনভাবে সাফল্য তুলে ধরতে পারেনা যদিও পরিবেশগত প্রভাব এবং জল সরবরাহ প্রভৃতি একটা অন্যতম কারণ হিসেবে রয়ে যায়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা

পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা যতটা লাভবান হয়, সেই তুলনায় পূর্ব ভারতের ছোট বা মাঝারি চাষীরা ততটা লাভবান হতে পারে না।

১৯৯২ সালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার মধ্য দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। যেখানে প্রতিটা গ্রামীণ ক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গঠন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশি হারে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, মতামত, ইচ্ছা, পছন্দের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার এই সফলতার মধ্য দিয়ে আগেকার বা সাবেকি ক্ষমতার যে বিভাজন বা স্তরবিন্যাস তার একটা আমূল পরিবর্তন আসে। সাধারণ কৃষকরা অনেক বেশি ক্ষমতাবান হয় বা ক্ষমতা হাতে পায়। স্থানীয় স্তরের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের মতামত, বক্তব্য বা দাবি উপস্থাপনের সুযোগ পায়, যা ভারতীয় কৃষক সমাজের জন্য এক আমুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সাফল্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের সামনে একটি রোল মডেল হয়ে দাঁড়ায়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সময়োযোগী নীতি গ্রহণের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং রাসায়নিক সারের উপযুক্ত ব্যবহারের ফলে কৃষি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ তথা উন্নয়ন অনেকাংশে সংঘটিত হয়েছে। তথাপি বেশ কিছু সংকট কৃষি সমাজের উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। যেমন **১৯৯১** সালের উদার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের ফলে কৃষি ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই উপেক্ষিত হতে শুরু করে। সে তুলনায় শহুরে এলাকা তথা শিল্প ক্ষেত্র অনেক বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। কারণ কৃষি ক্ষেত্রের উপর উপর সরকারি অনুদানের পরিমাণ কমতে শুরু করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকীর পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র বা মাঝারি কৃষকদের উপর অনেক বেশি চাপ তৈরি হতে থাকে। ফলস্বরূপ মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যা এবং নানান ধরনের প্রতিকূলতা ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। এছাড়া ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক কাঠামোগত যে ভিন্নতা বিশেষ করে জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির ভিত্তিতে, তা গ্রামীণ ক্ষেত্রকে অনেকটাই পিছিয়ে রাখে। দলিত এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে এবং সরকারি বিভিন্ন সাহায্যের ক্ষেত্র থেকে তাদের বাইরে রাখা হয়েছে। যা সামগ্রিকভাবে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়। এছাড়া ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় মহিলাদের অন্যতম অবদান বা অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা অসমতার শিকার হতে বাধ্য হতে হচ্ছেন। যা কৃষি ক্ষেত্রকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিচ্ছে। দুঃখের বিষয় এটা যে, রাজনৈতিকভাবে এই সমস্ত অসমতা প্রসঙ্গে যে ধরনের দায়িত্বশীলতার দরকার ছিল তা অনেকাংশে দেখা যাচ্ছে না বা খামতি রয়েছে। যদিও বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, নানান ধরনের সামাজিক আন্দোলন যা দলিত এবং উপজাতিদের দ্বারা গঠিত সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে কিন্তু সেই সমস্ত আন্দোলন নানান ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারিভাবে যে ধরনের বন্দোবস্ত বা সহযোগিতা করা উচিত ছিল তা অনেকাংশে দেখা যাচ্ছে না। সরকারিভাবে প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং যারা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে, সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের সহযোগিতা না থাকার কারণে এই সমস্ত আন্দোলন তেমনভাবে সফল হতে পারছে না। যা কৃষি ক্ষেত্রের জন্য প্রতিকূলতার বিষয় হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যা আজকের কৃষি ক্ষেত্রকে সংকটের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিশেষ করে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা বন্যা কৃষি ক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারিভাবে সাময়িক বিপর্যয় মোকাবিলার

থেকে দীর্ঘকালীন পদক্ষেপ গ্রহণটা খুবই প্রয়োজনীয়। তার কারণ সমস্যাকে যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত না করা যায় তাহলে এই সমস্ত সমস্যা নিবারণ করা এত সহজ কাজ হবে না। তাই কৃষি ক্ষেত্রে স্থায়ী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় রাজনীতিতে কৃষক আন্দোলন, কৃষি ব্যবস্থার একটা অন্যতম অংশ হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরপর তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ভাগচাষী এবং ভূমিহীনদের আন্দোলনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে নীতি প্রণয়ন এবং কৃষক সমাজের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রিয়া-কলাপ এবং প্রচারের অন্যতম একটা বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আশির দশকে নতুন ধরনের কৃষক আন্দোলন, যেমন ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন (BKU) যা বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি, ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ এবং ঋণ মুকুবের বিষয়ে দাবি জানায়। এই সমস্ত আন্দোলন আঞ্চলিক ভিত্তিক এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজিত হওয়ার ফলে জাতীয় পর্যায়ের আন্দোলন এবং দাবী দাওয়া উপস্থাপনে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমসাময়িক সময়ে ২০২০-২০২১ সালের কৃষক আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম প্রভাব রাখতে পেরেছে। মূলত তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ তথা আন্দোলন। স্বাধীন ভারতে কৃষকদের সমবেত হওয়া এবং বিক্ষোভ দেখানোর মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ন্যূনতম মূল্য (Minimum Support Price) নীতির বাতিলের ভয় কে উপেক্ষা করে দিল্লির রাজপথে একত্রিত হওয়া, যেখানে নারী, পুরুষ নির্বিশেষে বিশেষত যুবসমাজ এবং মার্জিনালাইজড গোষ্ঠীও খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলো। জাতপাত নির্বিশেষে, শ্রেণীবিভাজন কে উপেক্ষা করে সমস্ত কৃষক সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে এই দাবি উপস্থাপন করেছিলো। যার ফলস্বরূপ ২০২১ সালে সরকার বাধ্য হয়, এই কৃষি আইন বাতিল করে দিতে। উল্লেখ্য এই যে দাবী দাওয়া বা আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ হিংসা বর্জিত, যা অন্যতম প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়া জমির অধিকারের দাবিতে যে আন্দোলন মূলত উপজাতি এবং দলিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ছত্তিশগড়ে এই ধরনের আন্দোলন লক্ষ্য করা গেছে। এই আন্দোলন সমূহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প-প্রকল্প এবং জমি বন্টনের যে উদ্যোগ তাকে চ্যালেঞ্জ করে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে পরিবেশ দূষণকে সামনে রেখে যে কৃষক আন্দোলন, যে প্রতিবাদ তা প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার, নারীদের দাবি বিষয়েও খুবই উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের কথা বলা যায়। এ বিষয়ে মহিলা কিষাণ অধিকার মঞ্চ (MAKAAM) এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। যদিও এই সমস্ত কৃষি আন্দোলন বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সহযোগিতা থাকছে না, এছাড়া আঞ্চলিক বা শ্রেণী ভিত্তিক যে বিভাজন তা আন্দোলনকে আরো জোরালো করতে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকা একটা অন্যতম সমস্যা এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে গণমাধ্যমের পক্ষপাতিত্ব মূলক ভূমিকা আন্দোলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদি এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ কে অতিক্রম করা যায়, বিভিন্ন ধরনের বিভাজনকে সরিয়ে যদি একত্রিত হয়ে দাবি উপস্থাপন করা যায়, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নজরদারি রাখা যায় এবং স্থানীয় লেভেলে যদি নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়া যায় তাহলে অনেকটাই এগোনো সম্ভব হবে। আর আজকের দিনে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল মাধ্যমের সহযোগিতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন, এবং

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে আরো সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। Andre Beteille - Studies in Agrarian Social Structure (1974)
২। Ashutosh Varshney - Democracy, Development, and the Countryside: Urban-Rural Struggles in India (1995)
৩। Bardhan, Pranab - The Political Economy of Development in India (1984)
৪। B. B. Chaudhuri - Peasant History of Late Pre-Colonial and Colonial India (1994)
৫। Daniel Thorner - The Agrarian Prospect in India (1956)
৬। Dharma Kumar (Ed.) - The Cambridge Economic History of India, Vol. 2 (c.1757–2003) (1982)
৭। Francine R. Frankel - India's Political Economy 1947–2004: The Gradual Revolution (2005)
৮। Gail Omvedt - Reinventing Revolution: New Social Movements and the Socialist Tradition in India (1993)
৯। R. B. Bhagat - Dynamics of Rural Transformation in India (2013)
১০। Vikas Rawal and Madhura Swaminathan - Agrarian Studies: Essays on Agrarian Relations in Less-Developed Countries (2011).

জেলে সমাজ ও মৎস শিকারের ইতিবৃত্ত

মিঠুন পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়

জেলে জাতিদের প্রধান জাত ব্যবসা হল মৎস শিকার। যেসব মাঝিদের জাল নৌকা নেই তারা অপরের জাল নৌকার উপর ভরসা করে দিন মজুরের কাজ নিয়ে জীবিকা অর্জন করে। কোনো মাঝি পরের পুকুর জমা নিয়ে মাছ চাষের কাজে যুক্ত থাকে সারা বছর। বাংলা সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলির কাহিনী থেকে জানা যায় যে, নদী তীরবর্তী দরিদ্র জেলে পাড়ার মানুষ গুলি সারাবছর অর্থের অভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণার শিকার হয়। সারা বছর দুঃখ কষ্টের পর বর্ষার মরশুমে তাদের সংসারে একটু স্বচ্ছল অবস্থা ফিরে আসে। এই দুই মাসই তাদের সারা বছরের অর্থ সংস্থানের একমাত্র সহায় সম্বল। তাই বর্ষার মরশুমে জেলে পাড়ার মাঝি-মোল্লারা এক দ্বন্ডও শান্তিতে ঘরে থাকতে পারে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-ব্যাধি ভুলে তারা কঠোর পরিশ্রম করে চলে। তবে এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল মহাজন-জোতদার সম্প্রদায় ভুক্ত ধ্বনি মানুষেরাই বেশি সুবিধা করে নেয়। কারন ঋনের দ্বায়ে মাথা বিকিয়ে থাকে জেলেদের। সুদ-আসলের ঘোরপ্যাঁচে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। মহাজনের এই ফন্দিতে ঘরে বাইরে তাদের শান্তি নেই। এমনকি সন্তান সন্ততিরাও রেহায় পায় না এই প্রথা থেকে।

যাই হোক বর্ষার মরশুমে মাঝিরা ঘর ছেড়ে দুর প্রদেশে চলে যায় মৎস শিকারের সন্ধানে। বাড়ির প্রীয়জনদের জন্য মন কাঁদে, রক্তে নেশা লাগে, শিরায় শিরায় টান ধরে, তবুও তারা নিরুপায়। কোনো কোনো মাঝির অভাবে স্বভাব হয় নষ্ট। মাছের মন্দা বাজার দেখা দেয় উভয় দিক থেকে। শাপ লাগে মা গঙ্গার। ওদিকে বাড়িতে বাড়িতে ভেসে ওঠে আর্তনাদের রোল।

নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলিতে জেলেদের মৎস শিকারের বেশ কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। যেমন-

১) জাল ফেলার কৌশল।
2) নৌকা চালানোর কৌশল।
৩) জলের গতিপ্রকৃতি, জোয়ার-ভাটা ও আবহাওয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।
৪) আহারের ব্যবস্থা ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন।
৫) জেলে মাঝিদের রোগ-ব্যধি।
৬) গানের ব্যবহার।
৭) ধূর্ত লোকের শিকার।
৪) ঝগড়া বিবাদ।
৯) পরকীয়া ও প্রেম।
১০) মাছ বিক্রির সমস্যা।
১১) প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি।

এই সব অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানতে পারি একজন পাকা সাইদার অর্থাৎ ওস্তাদ জেলের কাছ থেকে। এই সব কাহিনী শোনা যায় বাংলা সাহিত্যের দুই বিখ্যাত নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ এবং সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’।

জেলেদের মাছ ধরার একমাত্র হাতিয়ার জাল। জেলেরা যখন নদী সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তখন তাদের নানা ধরনের জাল ব্যবহার করতে দেখা গেছে। সেমন- সাংলো জাল, পানসা জাল, বিন জাল, খুঁটে জাল, টানা ছাঁদি, বাঁধা ছাঁদি, খেয়া জাল, পাটাজাল প্রভৃতি। জলের গভীরতা ও গতি অনুমান করে মাঝিরা এই জালের ব্যবহার করতো। সঠিক স্থানে সঠিক জালের ব্যবহার করতে না জানলে মৎস সংগ্রহে ব্যার্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। তাই মাঝিরা দল বেঁধে সাইদার অর্থাৎ পাকা মেছেল এর সঙ্গে মৎস অহোরনের কাজে বের হতো। সাইদারের নির্দেশ মতো ছোটো খাটো মাঝিরা মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকতো। এই সব জালে ইলিশ, খয়রা, বাটা, রসনা চিংড়ি, ভেটকী, চাকুন্দে, ভোলা মাছ, ইত্যাদি মাছ উঠতে দেখা গেছে। সাংলো জাল দিয়ে কেবল ইলিশ মাছ ধরা যায়। গোল বাঁশের বেড়িতে মুখ খোলা অবস্থায় জলের নিচে আড়া থাকে। যার একমুখ বন্ধ। মুখের দড়ি সরকার মতো আলগা ভাবে বেঁধে জেলের হাত পর্যন্ত লম্বা দড়ি থাকে। ভেতরে মাছ প্রবেশ করলে দড়ি নাড়া দিয়ে জেলের হাতে খবর আসে। তখন জেলে নৌকার উপর থেকে জলের নিচে জালের মুখ সরকার সুতো টেনে বন্ধ করে উপরে তুলতো। আর বাঁধা ছাঁদি হল একশো দুইশো হাত লম্বা জাল। নদী, পুকুরে লম্বালম্বি ভাবে মেলে মাছ ধরা হতো। মাছ ছাড়াও নদী সমুদ্রে কাঁকড়া ও কচ্ছপের দেখা পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে। জেলেদের ভাষায় একে ‘মেকো’ বলে। জলে মাছ থাকার নিশানা হল এই মেকোর দল। ঘোলা জলের নিচে মা গঙ্গার মীন সন্তানদের লীলা খেলা বোঝা দুঃসাধ্য ব্যাপার। "গঙ্গা- উপন্যাসে পাঁচু কাকা তার ভাইপো বিলাসকে মাছ ধরা ও জালের ব্যবহার শিখিয়েছে। অনভিজ্ঞ ও নবাগত বিলাস কে পাকা মাঝি করে তুলতে পাঁচু নানা জ্ঞান দান করেছে; জল জাল ও মাছ সম্বন্ধে। পাঁচু খুড়া সাবধান করে বলেছে-

“এখন না। যা করে টানা ছাঁদি। সাংলোর দিন এখনও অনেক পড়ে আছে।”

এতো গেল জাল ব্যবহারের কৌশল। এরপর দেখা যায় নৌকা চালানোর কলা কৌশল। যুদ্ধে হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বাহনেরও গুরুত্ব অপরিসীম। দরিদ্র জেলে মাঝিদের জীবন সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে তাদের একমাত্র হাতিয়ার হল জাল আর বাহন হল নৌকা। বর্ষার মরশুমে ঐ কয়মাস তাদের জেলেরা অষ্টপ্রহর নৌকায় বসতি স্থাপন করে। দিবা নিশি ভেসে বেড়ায় নৌকার পাটাতনে বসে। অথৈ জলের নীচে লুকিয়ে আছে তাদের ভবিষ্যতের চাবিখাটি। জলের ঢেউয়ে শরীরে দোলা লাগে, দোলা লাগে মাঝির মনে আর কত নেশা ধরে রক্তে। এই নৌকা চালানোর ব্যবহার সর্ব প্রথমে জানা প্রয়োজন। নয়তো নৌকা মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি হতে সময় নেয় না বেশিক্ষন। গঙ্গা উপন্যাসে পাঁচু নৌকা চালানো শিখেছিল তার দাদা নিবারনের কাছ থেকে। এখন তার উত্তর সুরি বিলাসকে নৌকা চালানোর জ্ঞান দেয় পাঁচু খুড়া। সাবধানের মান নেই, তাই পূর্ব অভিজ্ঞতায় পাঁচু, বিলাসকে সাবধান করে বলেছে-

“সামলে! পাল গুটো বিলেস। উল্টো শ্রোত দেখা যায়।”

-(গঙ্গা-২৪৬)

অর্থাৎ শান্ত শ্রোতের উজানি জলে দ্রুত নৌকা চালানোর এটা একটা কৌশল। সামনে দহ অথবা ঘুর্নি 'দেখা দিলে শক্ত করে দাঁড় ধরে নৌকার দিক পরিবর্তনের কথাও শুনিয়েছে পাঁচু। আবার ভাটার টান হল মৃত্যুমুখী টান। নৌকা একেবারে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে বলে জানা যায়।–

> "ভাটার টান বড় টান। বড় সাবধানে রাখতে হবে নৌকা। একটিও যদি ফাঁক পেয়ে ভাটার টানে ভাসে তবে একেবারে সাগরে। আর ফিরবে না।"
>
> -(গঙ্গা-২০৬)

রাতের অন্ধকারে নৌকা চালানোর এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছে পাঁচু। তা হল-

> "খুব সাবধান! রাতের অন্ধকারে অঘাটে গিয়ে পড়ো না। নৌকার হ্যারিকেন খালি রাখো ঠিক ছইয়ের মুখ ছাটের কাছে ঝুলিয়ে। ওইটি তোমার অন্ধকারের চিহ্ন। নইলে লঞ্চ-স্টিমারে ধাক্কা লাগতে পারে। পরের নৌকা ঠোক্কর দিতে পারে।"
>
> -(গঙ্গা-২৭৮)

একজন পাকা মেছেল বছরের পর বছর বিভিন্ন স্থানে মাছ ধরার তাগিদে ঘরে ঘুরে না অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাই তার সঙ্গে ভরসা করে বিশ পঞ্চাশ জন মাঝি বের হয় মৎস শিকারে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে পাঁচুর এক উক্তিতে ধরা পড়ে তার গুরু জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। যথা-

> "জেটি ছাড়িয়ে বেশি দূরে নয়। এই মাইল খানেক। তারপর আছে দহ। জাল সুদ হঠাৎ তোমাকেই হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে নামাতে পারে।"
>
> -(গঙ্গা-২৭৮)

এইভাবে চোখ কান খোলা রেখে পাশাপাশি-উপর নিচ খেয়াল রেখে নৌকা পরিচালনা করতো।

নৌকা চালানো এবং নিজের প্রাণের দায় ভার মাঝির নিজের। তাই জোয়ার-ভাটা, জলের গতি প্রকৃতি এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা মাঝির একান্ত প্রয়োজন। মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে এইসব খোঁজ খবর নেওয়া সাইদারের প্রধান কাজ। অমাবস্যা পূর্ণিমা, ভরা কোটাল, মরা কোটাল, সেই সঙ্গে আবহাওয়া ও বাতাসের গতি এসব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকলে জীবন সংকটের ভয় থাকতে পারে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের পার্থক্য বোঝাতে পাঁচু বলেছে-

> "আজ অষ্টমী। কিন্তু আষাঢ়ের পূর্ণিমা-কোটালের কাল কেটে গেছে আগেই। এখন মরা কোটাল যাচ্ছে বলা যায়। অমাবস্যায় আবার ভারী কোটাল আসছে।। তবে সে পূর্ণিমা কোটালের মতো তেজি নয়। অমাবস্যা তার তেজ দেখাবে টানের দিনে।" -(গঙ্গা-২৫৯)

অমাবস্যার দিনে যে জোয়ার আসে তাকে ভরা কোটাল বলে। এই জোয়ারে জলের টান বেশি থাকে বলে একে ভরা কোটাল বলে। পূর্ণিমার দিনে জোয়ারের টান তুলনা মূলক কম থাকে, তাই একে মরা কোটাল বলে। বর্ষার শুরুতেই যে জল আসে, তাতে তেমন মাছ থাকে না। এই নতুন জল বয়ে যখন শ্রাবন মাস আসে তখন নদীতে ঘোর বর্ষার জল উত্তাল হয়ে দুকুল ছাপিয়ে বইতে থাকে। এটাই হল মাছের আসল মরশুম। দিনে রাতে মাঝিদের বিশ্রামের অবকাশ নেই। মরনের ভয় উপেক্ষা করে সারা বছরের খোরাকি জোগাড় করতে থাকে। সমুদ্রের নোনা জল ছেড়ে বর্ষার মিষ্টি জলে ইলিশের ঝাঁক প্রবেশ করে। একে উজানী ইলিশ বলে। নদী ভর্তি বয়ে আসা ঘোলা জলে ডিম ছাড়ার জন্য ইলিশ মাছ উজান ঠেলে মোহনা থেকে মাঝ নদীতে এসে পড়ে। আর এই সুযোগ হাত ছাড়া করে না মাছ মারার দল। পাঁচু এই উজানী ইলিশের সুন্দর এক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন-

> "সন্তানের আয়ু নিয়ে আসে। তুমি তোমার ছা পোনাকে আগলে রাখো শত্রুর হাত থেকে। এও তেমনি তার রুপালী পেট জুড়ে আছে সোনা

মানিকেরা। গঙ্গার ঘোলা জলের অতল আঁধারে শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এসে পেট থেকে ছেড়ে দিয়ে যায় তার সোনা মানিকদের। আর নোনা জলের চেয়ে মিঠে জলে ফোটে ভাল।"

-(গঙ্গা-২৭২)

মরশুমের সময় অতিক্রান্ত হলে পাহাড় থেকে ঠান্ডা ও শিতল জল নদীতে আসে। ঐ জলে মাছ তেমন থাকে না। তবে কাঁকড়া দেখা যায় অনেক। পাঁচু মাঝি বলেছে-

"এই জল হল আসল পাহাড়ে জল। অম্বুবাচীতে আসে পশ্চিমের গাঙে জমা জল। এখানকার জল ঠান্ডা। মাছ আসতে চায় না। দেখছো না, মেকো মরেছে বিস্তর তারাও চলে যায়।" -(গঙ্গা-২৭৭)

পাঁচু খুড়ো বিলাসকে জোয়ান কোটাল এবং মরা কোটাল সম্পর্কে বলেছে-

"বর্ষার পূর্ণিমাতে, যখন আকাশে সোনার চাঁদ থাকে, রাতে পূর্ণিমার নিশিথে ভাটিতে হবে ভরা কোটাল। ... এই হল জোয়ান কোটাল।"

- (গঙ্গা-২৭১)

অমাবস্যাতে জোয়ান কোটাল হল, তবে বর্ষাকালে পূর্নিমার কোটালের জোর বেশি। এই শ্রোতের টান দ্বিতীয়া পর্যন্ত থাকে। ধীরে ধীরে অষ্টমীর দিন পর্যন্ত শ্রোতের টান কমতে সময় লাগে। আর দশমিতে একে বারে টান কম। এই জোয়ান কোটালের একটা আসে আর একটা যায়। এর মাঝে হয় মরা কোটাল। এছাড়া ও ভারি গোন সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতার কথা এখানে জানা যায়, যেমন-

"সমুদ্রের বান যখন চেপে ওঠে। ফুলে ফেঁপে হাঁক পেড়ে যখন আসে। সে গঙ্গার চোরা বান নয়। মাথা উঁচু ঢেউ নিয়ে আসে। সমুদ্রের বান যত বেশি উঠবে, তাকে বলে ভরা গোন।"

- (গঙ্গা-২৭১)

এই গোন চলার সময় নদীতে মাছ আসে না। গোন কমলে মাছ পাওয়া যায়। জল যত নিচের দিকে কমতে থাকে তখন মাছ মারাদের খোল ভরে মাছ ওঠে। একে চলন্তা জল, মুকড়া জল বলে। একে একড়ি টানও বলে।

"কিন্তু মাছ বানে নয়। জলটা যখন নামবে তখন। এইটা নিয়ম জলটা যত বেগে উঠবে নামবে তার চেয়ে অনেক বেশি আগে। তাকে বলে চলন্তা জল, মুকড়া জল, বলে একড়ি টান।" -(গঙ্গা-২১৭)

অষ্টমী, নবমী, দশমীতে কিছু মাছ পাওয়া যায়। মরা কোটালে তেমন মাছ পাওয়া যায় না। তবুও কেউ বসে থাকে না। জাল নিয়ে গঙ্গায় ঘোরার শেষ নেই। মাঝিরা দিন গুনে অমাবস্যা কবে আসবে। জলের গতির সাথে সাথে আকাশের নানা গতির প্রতি দৃষ্টি রাখতো মাঝিরা। যেদিন ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতো সেদিন মাঝিরা মাছ ধরার কাজ বন্ধ রাখতো।

জেলেরা বর্ষার মরশুমে ঘর সংসার আপন জন ছেড়ে দূর প্রদেশে মৎস শিকারের কাজে বের হয়। তাই এ দীর্ঘ সময় তারা জলে ভেসে ভেসেই দিন রাত কাটায়। এই সময় প্রত্যেক নৌকার উপর আহারের বন্দোবস্ত করতে হয় তাদের নিজেদেরই। নৌকার উপর তাদের রান্নার সরঞ্জাম থাকতো। চাল, ডাল, বাসন পত্র আর এক ছোট্টো উনান। একে তিবড়ি বলে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিলাসকে নৌকার উপর তিবড়ি জালিয়ে রান্না করতে দেখা যায়। এই দুর্দিনে তাদের

শুধু ডাল ভাত ছাড়া আর তেমন কিছু জুটতো না। তবে কোনো কোনো দিন, দৈবাৎ পিঁয়াজ, আলু আর কাঁচালঙ্কা জুটতো। নৌকার উপর আহারের এক চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হল। যথা-

> "নেও বস সে। কলায়ের থালায় ভাত বেড়ে দিল বিলাস পাঁচুকে। চুড়চুড় করে বেড়েছে ভাত। গঙ্গার জলে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল পাঁচু। ভাতের মাঝ খানে গর্ত করে মুসুরি ডাল ঢেলে দিয়েছে।"

-(গঙ্গা-২১৭)

এই দুর্দিনে তাদের পেট ভরে খেতেও ভয় লাগে। তাই বেশি ভাত বাড়া দেখে চেঁচাতে থাকে কেউ কেউ। হিসাব কষতে থাকে বার বার।

> "পাঁচ পো। ওর কমে হয় না দুটো মানুষের।
> কুল্যে আর বিশ দিনের ভাত আছে নৌকায়।" -(গঙ্গা-২১৭)

একথা শুনে মাঝির মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে যায়। কারন পেটের ক্ষুধা লুকিয়ে রাখা যায় না। ঋণের উপর আরও ঋনের বোঝা চাপে, মহাজনের খাতায় ওঠে মোটা অঙ্কের সুদের হিসাব। এরা হল জলের মহাজন। ওদিকে বাড়িতে ডাঙার মহাজনের চোখ রাঙানী। জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ এর পরিস্থিতির মতন মাঝিদের দুরাবস্থা। 'গঙ্গা''- উপন্যাসে পাঁচুর মহাজনের কাছ হইতে টাকা ধারের দৃষ্টান্তটি ছিল এরূপ-

> "এই দিয়েছে দুমন চাল। দাম ধরেছে ষোলো ট্যাকা মন। ...আটসের মোটা লাল চাল দিয়েছে। ...বাজারে দাম হল বারোর মধ্যে। এর উপরে সুদটা ধরো। তাপরে আছে, পাঁচপো সরসের তেল, আড়াই সের মুসুরি আর পাঁচপো কলাই। ...ওতেই মহাজনের লাভ রেখেছে আবার সুদ।"

- (গঙ্গা-২২৯-৩০)

অথবা-

> "দেনার উপর আবার নতুন মুচলেখা দিয়ে নৌকা ছাড়ানো হল। আজ পাঁচ বছর ধরে, ফি বছরের নৌকা বাঁধা পড়েছে। চক্রাকারে বাড়ছে মাল দেনা।"

-(গঙ্গা-২০৪)

মরার উপর খাড়ার ঘা। নিজের জাল নৌকা সুদ করে আনতে হল মহাজনের কাছ থেকে। মাঝিকে ধরে মহাজন ভুতে আর বাড়ির লোককে ধরে দুর্ভিক্ষে। বিধাতার এই পরিহাস। কোনো কোনো মাঝি নগদ টাকা ধার নিত মহাজনের কাছ থেকে। অর্ধেক দিন যেতে না যেতেই মহাজনের কাছে নগদ টাকা ধার নিতে তাদের মন চায় না। তবুও কিছু করার নেই। নৌকার খাবার শেষ হওয়া শুনে সকলের মুখে আশঙ্কার ছাপ দেখা যায়। কোনো কোনো মাঝি দিনের পর দিন না খেয়ে মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে রাতারাতি লুকিয়ে পালিয়ে আসতো। 'গঙ্গা' উপন্যাসে ঠান্ডারাম মাঝির এক উক্তিতে এর প্রমান মেলে। যেমন-

> "আজ এই পর্যন্ত সারাদিন কিছু খাইনি পাঁচ দা। মহাজন বলেছে রাতে কয়েকটা টাকা দেবে। দিক আমি পালাবো তোমাকে বলে রাখলুম।"

- (গঙ্গা-২৯৬)

মাছ ধরতে গিয়ে যদি খাবারের টান পড়ে তাহলে মাঝিদের চিন্তার অন্ত নেই। কারন চাল, ডাল শেষ মানেই মহাজনের চক্রে বাঁধা পড়া। এমন ভয়ানক অকল্যানকে তারা মনে প্রানে মেনে নিতে পারেনি।

"চুপ চুপ চুপ। ওই একটি কথা পাঁচু অষ্ট প্রহর গুন গুন করছে মনে মনে। মুখ ফুটে বলেনি, শুনতেও চায়না। কুড়ি দিনের চাল এনেছিল পাঁচু তেরো দিন কাটল তার মধ্যে।" -(গঙ্গা-২৯৬)

কোনো কোনো জেলেরা ভাত রাঁধার অভাবে শুকনো চিড়া, আর নদীর জল খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে দেখা যায় গনেশ ও ধনঞ্জয় শুকনো চিড়া, গুড় খেয়েই করে চলেছে কঠোর পরিশ্রম। যথা-

"গনেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁচলা নদীর জল পান করিল।"

-(পদ্মা নদীর মাঝি-১২)

এই ভাবে মাঝিরা খাবারের সংস্থান ঘটিয়েছে মাছ ধরতে গিয়ে।

নদী সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মাছমারাদের একটি বড় সমস্যা হল তাদের রোগ ব্যধি। দিন রাত জলে ভিজে জাল টেনে টেনে তাদের শরীরের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে আসতো। এই অসুস্থতার মধ্যে দিয়েই তারা কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতো। সব সময় জলে ভেজা নরম হাতে জাল টেনে আর নৌকার হাল বেয়ে তাদের হাতে পায়ের চামড়ায় ফাঁপ ধরে যায়, হাজা; ঘা দেখা দেয়। হাজার ঘা-এ পোকা কামড় দেয়। ঠান্ডায় মাঝিদের শরীর এলিয়ে ওঠে। হাতে পায়ে শেওলা ধরে যায়। তবুও এক দ্বন্ডও বিরাম নেই। আঙুলের ফাঁকে সাদা পাঙাস বর্ন রং ধরে। চামড়া কুঁকড়ে খস খস করে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে এর প্রমান মেলে। যথা-

"আ! কী জ্বালা গো হাতে পায়ে। বড় ব্যাথা। পোকা বিড় বিড় করছে দগদগে হাজায়। দাঁড় বৈঠা ধরা যায় না। সাংলোর কাছি যায় না ধরে রাখা, কাঁচা দগদগে মাংসে কেটে বসতে চায়।"

- (গঙ্গা-২৯০)

পোকা বিড়বিড়ে রক্তঝড়া হাজার ঘা-এ প্রাথমিক চিকিৎসা স্বরূপ গাবের আঠা, লেবুর রস প্রভতি লাগায়। তবুও পোকার কামড়ে শরীর অস্থির হয়ে ওঠে। কাঁচা দগদগে ঘা রোদে শুকিয়ে জ্বালা করে। জলে ডুবালে আচমকা টনটন করে। তা সত্তেও অসহায় ভাবে মাছমারার দল হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। কারন এই রোগের থেকেও বেশি জ্বালা ধরায় তাদের দারিদ্র-দুর্ভিক্ষ। আর এক রোগ জেলেদের আক্রান্ত করে তা হল আমাশয় রোগ। বর্ষার নদীর জল পান করার ফলে কখনো কখনো আমাশয় রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সেই সঙ্গে একবেলা খেয়ে তাদের শরীর দুর্বল হয়ে ওঠে। উপন্যাসের কাহিনী অংশে এর নিখুত বর্ণনা মেলে। যেমন-

"শরীর টলে কিম্বা নৌকা দলে ঠাহর পাওয়া যায় না। জল পাক খায় না মাথা ঘোরে অনুমান করতে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে। ভয়ঙ্কর রক্ত আমাশা দেখা দেয়। কাঁদতে চায় কান্না আসে না।" -(গঙ্গা-২৯১)

রোগের দায়ে ঋন পরিশোধের জমানো টাকা খরচ করতে বাধ্য হয় তারা।

এতো কিছু বাধা বিপত্তি পার করে মাঝিরা মাছ বিক্রির জন্য যখন মহাজন বা আড়ত দারের কাছে যায়, তখন আর এক বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয় আর সেটা হল মাছ বিক্রির সমস্যা। মাছের দর অনেক কমিয়ে রাখে ক্রেতার দল। মাছের আমদানি বেশি হলে তো আর কথাই নেই। আড়তদারের পুরোটাই লাভ। মাঝিরাও অসহায় ভাবে অত্যন্ত কম মূলে তাদের পরিশ্রমের ফল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। নয়তো মাছ বেশিক্ষর রাখলে পচে নষ্ট হবে। এর জ্বলন্ত প্রমান মেলে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলিতে। যথা-

> "ঘোরাঘুরি যেখানে, সেখানে মেহনতের দাম ওঠে না। সবাই দয়া করে। দয়া নিয়ে তুমি কাপড়ের খুঁটে চোখের কোন মুছতে পারো তার বেশি কিছু নয়।" -(গঙ্গা-২৩১)

জেলেদের অসহায়তার সুয়োগ নিয়ে তাদের ঠকাতে থাকে। গরজভরা মন নিয়ে মাঝিদের উপহাস করে বলে-

> "কত করে মন হে? পাইকারি দর বল। মাছমারারা বলে, তিরিশ টাকা দেন। আড়তদার চালানদার মুখখানি শক্ত করে থাকে, থাকবেই, মাছ যে বড় বেশি দেখা যায়। তবে পঁচিশ দেন? তাও নয়। কুড়ি পনেরো? ...তখন পাঁচে নামে।" -(গঙ্গা-২৮৩)

হতভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায়। নদী কেন্দ্রিক জন জীবনের মাছমারাদের ঠিক একই পরিস্থিতি। মাছের আমদানি দেখে আড়তদাদের লোভের সীমা থাকে না। লাভের ঘরের সংখ্যা চর্তুগুন হয়। জেলেদের কপাল পুড়ে আর ব্যবসাদারের বরাৎ খুলে। আড়তদারের দেমাকে পা পড়ে না। মাঝিরা তাদের মান ভাঙিয়ে খোসামোদ করে মাছ বিক্রি করে। তাই 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে শোনা যায় ধনঞ্জয় মাঝির হতাসা বাক্য।–

> "সন্ধাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামবো। হালার মাছ ধইরা জুত নাই।" - (পদ্মা নদীর মাঝি-৮)

তবুও তাদের মাছ ধরার বিরাম নেই। রাগে ও ঘৃনায় ধিক্কারের আগুন জ্বলে ওঠে বুকে। বুকে এই জ্বালা নিয়ে ভেসে বেড়া অথৈ জলে। কখনো দেখা গেছে যেদিন মহাজন মাছ কেনা বেচা বন্ধ রাখে সেদিন মাছ পচে নষ্ট হয়ে ফেলা গেছে। কারন দরিদ্র মাছমারাদের কোনো বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। শহরের মাছ চালানের জন্য বরফ, আর মোটর গাড়ির প্রয়োজন। এদের কোনোটার সঙ্গেও যোগাযোগ নেই অর্থহীন দরিদ্র জেলে মাঝিদের। কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে একথা জেলেদের ক্ষেত্রে খাটে না, তা উপন্যাসের কাহিনী পাঠে বোঝা যায়।

নদী সমুদ্রে মাছ ধরতে এসে জেলেরা অনেক সময় ধূর্ত ও ঠক লোকেদের খপ্পরে পড়তে হয়। মাছ বিক্রির সময় বেপারীরা জেলেদের ঠকায়। চালান বাবু একশোটা মাছ পিছু একটা করে মাছ ফ্রি নেয়।

> "একশো মাছ গোনা হইবা মাত্র তার চাকরটি ছোঁ মারিয়া চালান বাবুর চাঁদা পাঁচটা মাছ মস্ত এক কেরোসিন কাঠে বাকসে ভরিয়া ফেলিতেছে।"
> -(পদ্মা নদীর মাঝি- ১০)

অথবা-

> "বেপারীরা বড় মিছা কথা কয়। সাত পাঁচ বারো কতা কইয়া লোকের ঠকায়। কিনবার সময় বাকি, আর বেচবার সময় নগদ, আর যে পাল্লা দিয়া জিনিস মাপে তারে কিনবার সময় রাখে কাত কইরা, আর বেচার সময় ধরে চিত কইরা।"
> -(তিতাস একটি নদীর নাম-৫২০)

জেলেদের সুখের ঠিকানা বয়ে চলেছে নদীর শ্রোতের টানে। আর তা নেমে যায় মহাজনের দাঁড়িপালায়, হিসাব খাতায়।

নদীতে মাছ ধরতে এসে জেলেদের সঙ্গে ভিন দেশী জেলেদের মারপিঠ, দাঙ্গা হতে দেখা যায় কোনো কোনো সময়। নদীতে জাল পাতা নিয়ে দ্বন্ড করতে দেখা গেছে দাঙ্গা, রক্তারক্তি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিলাস ও রসিকের মারপিঠ হতে দেখা যায়। যেমন-

"খবরদার জালে হাত দিলে রক্তারক্তি হবে।"

-(গঙ্গা-৩০১)

"রসিক বিলাসের চোখে মুখে প্রচন্ড আঘাত করেছে। ...নাকে মুখে তার রক্তের দাগ। কিন্তু কালো কুচকুচে বিলাসের সর্বাঙ্গে যেন মুর্তি ধরেছে স্বয়ং রুদ্র। রসিককে জাপটে ধরে সে জলে নামল। বুক দিয়ে চেপে ঠেসে ধরল জলে।" - (গঙ্গা-৩০২)

এছাড়াও মাছ বিক্রি নিয়ে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। মাঝিদের নির্দিষ্ট মহাজন ধরা থাকে। রোজ সেই মহাজনকেই মাছ বেচে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় অন্য মহাজনের ফড়েদার এসে জোর করে মাছ কিনে নিয়ে যায়। তখন ঝগড়ার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন-

"আরে বাপ্পু ইসরে, অ্যাঁ, মনে নেয় কি য্যানো হুকুমের লৌকো ডাঙায় চলে?
লাতিনের মাছ জোর করে নেবে।"

- (গঙ্গা-২৬০)

এই দ্বন্দ বিবাদ ছাড়াও আর এক বিপত্তি মাঝিদের মাছ ধরার কাজে বাধা দেয়, তা হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে মাঝিদের প্রায় সময়ই অনেক ক্ষতি হতে দেখা যায়। জেলে মাঝিদের মুখে প্রকৃতির নানা দৃশ্য বর্ণনা করতে দেখা যায়। যথা-

"অগতির গতি। যাবৎ জীবনের জীবন-মরন, ধ্বন দৌলত সব কিছু নিয়ে
মা ঠাকুরুন বসে আছেন গাঙের তলায়।" - (গঙ্গা - ১৯৬)

মৎস শিকারে গিয়ে জেলেদের মহাবিপদের একটি দৃশ্য ছিল এরূপ-

"সামনা হইতে হু হু করিয়া জোরালো বাতাস আসিতেছে। মেঘনার বুক জুড়িয়া ঢেউ এর তোলপাড় চলিয়াছে। নৌকা একহাত আগায় তো আর একহাত পিছাইয়া যায়। দুইটি প্রাণী গলুইয়ে বসিয়া দাঁড় টানিতেছে। বড় বড় ঢেউয়ের মুখে পড়িয়া নৌকা একবার শুন্যে উঠিতেছে, আবার ধপাস ধপাস আছরাইয়া পড়িতেছে। গলুইয়ে দাঁড় হাতে প্রানী দুইটি এক একবার কোমর অবধি ডুবিয়া যাইতেছে। ঝলকে ঝলকে নৌকায় জল উঠিতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া কিশোর সে জল সেঁউতিতে করিয়া সেচিয়া ফেলিতেছে।" - (তিয়াস একটি নদীর নাম-৪৩৭)

এছাড়াও প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ রূপের নানা চিত্র পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। প্রকৃতির এই রূপ সৌন্দর্য প্রত্যেক ঋতুতে পরিবর্তন হয়েছে। যেমন - এখন বর্ষাকাল। নদীর বুক ভরা প্রান আর কুলজোড়া ঢেউ। যেন কুমারী মেয়ের উত্তাল ভরা যৌবনের বেহায়াপনা। যেমন ভয়ঙ্কর ঠিক তেমনই সকলের প্রীয়। নীল, সাদা আকাশের নিচে ঘলাটে জলের অবিরাম বয়ে চলা ঢেউ। নদীর দুই তীরে সবুজের ভিড়। সাথে দেখা যায় কৃষ্ণ-পক্ষের পুর্নিমার চাঁদ-আর মেঘের লুকো চুড়ি খেলা। চারিদিক পুলকে ভরে ওঠে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় এর একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা-

"তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুল জোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রান ভরা উচ্ছাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে,

দিনের সূর্য তাকে ঢাকায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।”

-(তিতাস একটি নদীর নদীর নাম-৩৯৯)

প্রকৃতির এত রূপ মাধুর্য দুর্ভিক্ষ জেলেদের কাছে সবই বাহুল্য। রঙিন আকাশে ভাস মান পাখি সবুজ বনানী, কাশঝোপ, এসব যদি নাও থাকে, তবুও মাঝিদের চলে যাবে। কেবল নদীতে মাছ আর জল যেন সারাবছর থাকে। তাই লেখক বলেছেন-

“এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একমুখি জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে। মানবী প্রীয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চির যৌবনা। বৈচিত্র? কী তার প্রয়োজন? নতুন পৃথিবী কে খোঁজে কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন। শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ।”

- (পদ্মানদীর মাঝি-৭৬)

বর্ষার মরশুমে এই ভাবে নানা প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র দেখতে দেখতে ভেসে চলে শতশত মাছমারার দল।

নদীতে খেয়া বাইতে বাইতে জেলেদের মুখে নানা সুখ দুঃখের গান শোনা গেছে। এই গান হল দরিদ্র, হতভাগ্য মাঝির সুখ-দুঃখের প্রকাশ। মাছ ধরে আর আপন মনে সুর তোলে ভাটিয়ালির সুর। যথা-

“নাদেখে তোমারে, আমার নয়নে নাই সুখ-হে
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।
টানা ছাঁদি টেনে চলি, পাখালি লৌকোর বুক হে
ওই আওড়ের ঘুর্নি জলে দেখব তোমার মুখ।
বড় উথালি পানালি আমার বুক।”

-(গঙ্গা-২২৪)

নির্জন আঁধারে নৌকার উপর ভাসতে ভাসতে দরিদ্র গৃহহারা, সুজন ছাড়া জেলেরা তাদের চাপা দুঃখকে নদীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চেয়েছে। গৃহ ছাড়া সকল মাঝিদের একই মনের অবস্থা। অসহায় ভাবে নিরবে দুঃখকে চেপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভেসে বেড়ায় নদী-সমুদ্রে। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে হৃদয়ের চাপা বেদনা গান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যথা-

“আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।

পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির-
মাঝি কত ঘুমাইবা।”

- (পদ্মা নদীর মাঝি-৩৫)

অথবা এই দুঃখের দিনে মনের মানুষের কথা মনে করে গেয়ে ওঠে এই গানটি-

“পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ-লো সই!
আওন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ! আলো সই!

থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন
বিদেশ গেলি মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ।
আলো সই।”

-(পদ্মা নদীর মাঝি- ৭২)

এছাড়াও আরও অনেক গান ব্যবহার করতে দেখা গেছে জেলে মাঝিদের মুখে।

নদী-সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় মাঝিরা বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশী প্রভৃতি মানুষদের সঙ্গে যেতো। যেমন-‘পদ্মানদীর মাঝি’-তে কুবের ও গনেশ, ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে বিলাস ও সায়ারাম, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এই উপন্যাসে সুবল ও কিশোর। উপন্যাসের কাহিনীতে উঠে এসেছে বন্ধুত্ব প্রীতির নানা দৃষ্টান্ত। একে অপরকে সুখ দুঃখের কথা বলতে শোনা গেছে। একে অন্যের বিপদের সাহায্য করেছে। আবার কখনো কখনো হাঁসি রসিকতা করতেও শোনা যায়। ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে বিলাস ও সায়ারামের কথপোকথনে এই বন্ধুত্ব প্রীতির চরম দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। যথা-

> “তোকে দেখলে আর স্থিত থাকতে পারবে না। তোকে দেখলে নাকি চোখে মুখে তার বেজায় হাসি দেখা যায়। ওখানে তবে তোর মন বসেছে?”

- (গঙ্গা-২২১)

অথবা-

> “বলি, বল না, চুপ করে রইলি কেন? কালামুখী আবার কী তুক করল, সেটা দেখতে হবে তো। নইলে শেষে প্রাণে মরতে হবে। গুনিন ওঝা দেখতে হবে তাড়াতাড়ি।” -(গঙ্গা-২২১)

‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কুবের ও গনেশের দৃঢ়বন্ধুত্ব প্রীতির চিত্রকে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা-

> “কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটো বড়ো সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে-আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এক পক্ষের এই অনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠই বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাসা আছে, সুখ দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলন ও আছে।”

- (পদ্মা নদীর মাঝি - ৯)

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এই উপন্যাসের কাহিনীতেও সহপাটির চিত্রটি সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। যেমন-

> “অ দাদা, বউ তুমি মনের মত পাইছ ত?” “কি কইয়া কইরে ভাই। ভালো কইরা দেখলাম না, জানলাম না। কোন দিন দেখছিলাম, মনে ও নাই। বিস্মরণ হইয়া গেছে। অখন আর চেহারা নবুনা মনেই পড়ে না, কেউ বদলাইয়া দিয়া গেলেও চিনতে পারুম না।”

-(তিতাস একটি নদীর নাম-৪৩৬)

নদী সমুদ্রে মৎস শিকারে এসে জেলেদের আর এক কীর্তির কথা জানা যায় তা হল পরকীয়া প্রেম। এই প্রেমের বৈচিত্রও ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা পড়েছে উপন্যাসের কাহিনীতে। জেলেরা বাড়ির প্রিয়জনদের ছেড়ে এসেছে পেটের দায়ে, দু পয়সা রোজগারের আশায়। কঠোর পরিশ্রমে সবসময় মন বসতে চায় না তাদের। ভাই মনের মানুষের কথা মনে পড়ে ক্ষনে ক্ষনে। এই নেশার মায়াজানে বদ্ধ হয়ে কেউ কেউ অকাজ কু-কাজ করে বসে। মাঝিদের তখন

দারিদ্রতা, প্রিয়জন এসব কিছুই মাথায় থাকে না। নদী তীরবর্তী জেলে পাড়া গুলিতে পতিতালয় আছে, সেখানে তারা ছুটে চলে। হাটে বাজারে মেয়েরা জেলেদের ঈশারা করে। নদীর তীর থেকে তাদের কামনার বান ছুঁড়ে। জলের মাঝিকে জাল নৌকা ছেড়ে ডাঙায় আসতে বাধ্য করে। এই বেহায়াপনার একটি চিত্র হল এরূপ-

> "ঘরে যার বউ নেই, তার রক্ত ধরে বেশি। টাকার চেয়ে মাছের লেনদেনেই চলে। মাছমারাকেউ তার ঘরে যেতে হয় না। গঙ্গার পাড়েই, একটু ফাঁকা নিরালায় নগদ বিদায় হয়।" -(গঙ্গা-২৪৮)

এছাড়াও 'গঙ্গা'- উপন্যাসে বিলাস-হিমির প্রনয় চিত্র এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম'- উপন্যাসে কিশোর ও অনন্তর মায়ের প্রনয় চিত্রে মুখরিত হয়ে উঠেছে কাহিনী।

এই ভাবে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের কাহিনী গুলি বিচার বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে যে, জেলেদের মৎস শিকার করতে যাওয়ার নানা ইতিবৃত। সেখানে নদী ও মাঝি একাত্ম হয়ে উঠেছে। মাছ ধরার সঙ্গে সঙ্গে তারা নদী মাতাকে আপন করে নিয়েছে। কারন এই নদীই তাদের সুখ-দুঃখের কারন। নদীমাতা যেন তাদের আপন সন্তানের ন্যায় পালন করে চলেছে। আর তাইতো এত বাধা বিপত্তির সত্ত্বেও দরিদ্র-দুর্ভিক্ষ জেলেরা তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গা - সমরেশ বসু সম্পাদনা-সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু রচনা বলী-২ আনন্দ পাবলিসার্স, প্রথম সংস্করন - জানুয়ারী ১৯৯৮, তৃতীয় মুদ্রন - আগষ্ট-২০০৬, কোলকাতা- ৭০০০০৯

২. পদ্মা নদীর মাঝি - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিসার্স, প্রকাশক - মনীষ বসু, কোলকাতা- ৭০০০৭৩

৩. তিতাস একটি নদীর নাম - অদ্বৈত্য মল্লবর্মন, দ্বেজ পাবলিশিং, সম্পাদনা-অচিন্ত বিশ্বাস, পূর্ণমুদ্রন- ফেব্রুয়ারী ২০১১, মাঘ ১৪১৭।

৪. ইছামতী - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা - বিভূতি স্মারক সমিতি: প্রকাশন উপসমিতি, পাবলিশার্স- মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা-৭৩।

৫. গহিন গাঙ – সাধন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৪১৮, করুনা প্রকাশনীর পক্ষে ১৮ এ টেমার লেন, কোলকাতা- ৭০০০০৯ থেকে বামাচরন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

মনুবর্ণিত সমাজে বর্ণবৈষম্য ও ন্যায়বিচার : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

মৌমিতা হালদার
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আমরা যদি ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি, সেখানে বর্ণবিদ্বেষ, ঈর্ষা, কলহ, দ্বন্দ্ব, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক বিষ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। মানুষের মধ্যে বিভেদমূলক মনোভাব ও আচরণ বর্তমানেও আমরা বহু দৃষ্টান্তে লক্ষ্য করি। এই বৈষম্যর অবসান না করলে মানব সমাজ অরাজকতার আগুনে ভস্মিভূত হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা মনু প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার আলোচনা করব, কারণ ইতিহাস পাঠে যতদূর জানা যায় এবং খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিকদূত মেগাস্থিনিসের ব্যাখ্যায় তৎকালীন ভারত ও ভারতবাসীর যে মনোহর চিত্রের হদিস পাওয়া যায় এবং সাক্ষ্য সংগৃহিত হয়েছে তা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রীক,সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যাপক উন্নতির হেতু ছিল সমাজে মনু প্রবর্তিত নিয়মের বা বিধির অনুসরণ। এই সমাজ ব্যবস্থায় মূল স্তম্ভ হল বর্ণাশ্রমধর্ম। অপরদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, বহু ব্যাখ্যাকার মনুসংহিতাকে বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যতার আকর গ্রন্থ বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র সমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কিত এবং নিন্দিত নিঃসন্দেহে মনুসংহিতা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকরগণের মতানুসারে চরম জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার সাথে সাথে এই শাস্ত্রের অসংখ্য শ্লোকে প্রতিফলিত হয়েছে নির্মম ও অমানবিক বিধান। মানুষে মানুষে ঐক্যের সুর বজায় রাখার পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি করতে এই গ্রন্থ শুধু উৎসাহ দেয় তাই নয় কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশও দেয়। এই মনুসংহিতার পুনর্বিচার করা জরুরি, কারণ এটি কেবল অতীতের সমাজের চিত্র তুলে ধরে না, বরং বর্তমান সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। সুতরাং একপক্ষের ব্যাখ্যা অনুসারে মনু প্রবর্তিত বর্ণ বিভেদ বা বৈষম্যর মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বোচ্চ উন্নতির শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। অপরপক্ষে মতানুসারে, বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যর মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব সমাজ যে ধ্বংসের অবলীলায় উপনীত হয়েছে তারই শেকড় গাঁথা এই মনুসংহিতায় তাই তা অবশ্যই বর্জনীয়। উভয়মতের মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ণয় করার পূর্বে মনুসংহিতায় উল্লেখিত বৈষম্যের স্বরূপ কি তা আলোচনার সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এটি আলোচনা পূর্বক আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব যে, মনু প্রবর্তিত সমাজের উল্লিখিত বৈষম্য ন্যায়সঙ্গত সমাজ সাধনের পরিপূরক অথবা পরস্পরবিরোধী। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল মনুস্মৃতিতে বর্ণবৈষম্যর চিত্রায়ন যাচাই ও পুনর্মূল্যায়ন করে আধুনিক সামাজিক ন্যায়নীতির সাথে ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমন্বয় করা।
সূচক শব্দ: মনুসংহিতা, শূদ্র, শাস্ত্রবিধি, বর্ণবৈষম্য, সামাজিক ন্যায়।

মূল আলোচনা: মনুসংহিতা গ্রন্থটিকে তৎকালীন বৈদিক আর্য সমাজ ও প্রচলিত হিন্দু সমাজের অবশ্যপালনীয় সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ জীবনাচরণবিধি বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। মনুস্মৃতিতে বিধিসমূহ যে সামাজিক নিয়ম এবং মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে সেই প্রথা আজকের দিনে উপযুক্ত না বা তার আলোচনা নিরর্থক বলে মনে হতে পারে কিন্তু আধুনিক ভারতীয় হিন্দু সমাজে এই প্রথা

অনেকাংশেই অব্যাহত রয়েছে, যেমন মনুর মতানুসারে একজন শূদ্র বা ভিন্ন দুই বর্ণের নারী ও পুরুষ বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে তা হিন্দু আদর্শের পরিপন্থী বলে পরিগণিত হয়, ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব হলেও এই সবর্ণবিবাহ ব্যবস্থার আদর্শে আদর্শিত হয়ে আজও সমাজে পাত্র পাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধিত বিজ্ঞাপনে তার প্রতিফলন ফুটে ওঠে যথা- "W.B 30/ 5'4", কুলীন ব্রাহ্মণ, মালদা MA (Eng), B.Ed, সঃ প্রাইমারী শিক্ষিকা। অনূর্ধ্ব 35 নূন্যতম 5'5" সঃ চাঃ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ইত্যাদি, রবিবার, ২৯ শে জানুয়ারি, ২০২৩)।

বিভিন্ন আইনগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদানের পরেও বর্তমান সমাজে কিছু যাত্রা অভিমানী ব্যক্তিগণ নির্বিচারে জাতপাত, সামাজিক বিভিন্ন অমানবিক বৈষম্যকে জীবন্ত রেখেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার ভোগ করার সুবিধার্থে আইন স্বীকৃত হলেও কার্যত সেই অধিকার ভোগ করা সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরেও অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, সাম্প্রতিককালেও তার ধারাবাহিকতা চলমান। ভারতের 'National crime record bureau' এর একটি সমীক্ষা থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে ভারতে 'প্রতিদিন তিনজন দলিত নারী ধর্ষিত হচ্ছেন দুজন দলিত নিহত হচ্ছেন ও দুটি দলিতদের বাড়ি পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে'।[১] এছাড়াও বহু উদাহরণ মেলে যেমন উচ্চ বর্ণীয়দের কূপ থেকে জল পানের নিষেধাজ্ঞা, উচ্চবর্ণীয়দের মন্দিরের নিম্নবর্ণীয়দের প্রবেশ নিষেধ প্রভৃতি।

এছাড়াও সরকারি ক্ষেত্র বা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলিতে মানসিক জাতপাতের প্রবণতা ক্রমশ প্রবাহমান। তপশিলি জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনীর ছাত্র, শিক্ষক, সরকারি বিভিন্ন পদে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে মানসিক জাতপাত মূলক বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা স্তর পর্যন্ত নিম্নবর্নীয় ছাত্র- ছাত্রীদের মানসিক বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার ঘটানাটি (২০১৬) স্মরণযোগ্য।[2] এছাড়াও অধ্যাপক মহীতোষ মন্ডলের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।[৩] সমাজতান্ত্রিক গভীর স্তরে মানুষের মনোভাবকে পরিবর্তন করতে না পারলে ব্যক্তিভিত্তিক সাম্য আসবে না, স্বাধীন ও উদারপন্থীদের একাংশের মতানুসারে ভারতের মানুষের মনোভাবকে কলুষিত করে রেখেছে বর্ণব্যবস্থা বা জাতি ব্যবস্থা, যে বর্ণবাদের উৎস মনুসংহিতা, সমাজে বৈষম্য বা বিভিন্ন বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণের সূচনা এই মনুসংহিতায় তাই বর্ণব্যবস্থা বা বৈষম্যের স্বরূপ কি তা আলোচনার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পুরুষার্থ

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মানুষের মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে মানুষের আকাঙ্খিত বা অভিলাষিত চার প্রকার পুরুষার্থ নির্ণয় করেছেন, যথা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বিশেষত আস্তিক দর্শনে উল্লেখ করা হয় যে মোক্ষলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। মোক্ষ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো মুক্তি। পুরুষার্থ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো পুরুষের প্রার্থনা বা কাম্য বিষয়। মানুষের কাম্য চরম ও পরম বিষয় হল দুঃখ থেকে নিস্তার বা দুঃখভাব। প্রবৃত্তি মার্গের শুরুতে মানুষ কাম ও অর্থের যুগপৎ সেবা করে, এমতাবস্থায় অহংবোধ বা স্বার্থপরতাই প্রেরক। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি বিবিধ সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে বা সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতির জন্য এই সম্পর্কগুলি দৃঢ় ও দ্বন্দ্বহীন হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু মানুষ যদি অসংযত কাম ও অর্থের দ্বারা চালিত হয়ে সকলের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থের মধ্যে সমতা বজায় না রাখতে পারে সেইরূপ স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রবাহমান সমাজে মানুষের সুখপ্রাপ্তি দূরহ ব্যাপার এবং টিকে থাকাই আশঙ্কাজনক। ব্রহ্মচক্রের

(জীবের সংসার চক্রের আরম্ভ ব্রহ্ম হতে এবং তিরোভাব ও ব্রহ্মে, তাই এই চক্র হলো বহ্মচক্র) প্রবৃত্তি মার্গে জীবের পুরুষার্থ কাম হলেও এবং কামরূপ সুখের জন্য যতই অর্থ উপার্জন করা হোক তা চিরন্তন সত্য বা চিরসুখ নয়, তাই অবিনাশী সুখ তথা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্ত রূপ মোক্ষ জীবের পরম পুরুষার্থ বা প্রার্থনা বা কাম্য। ধর্ম এই অবিনাশী সুখের উপায়।[৪] ভারতীয় চিন্তাধারায় উল্লেখিত সমগ্র মানব সমাজকে ধারণ করতে সমর্থ ধর্ম, তাই মানুষ ও সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিরিখে ও প্রবাহমানতা সচল রাখার জন্য ধর্ম পালন অত্যাবশ্যক কর্তব্য। মেধাতিথি ভাষ্যে ধর্ম কর্তব্যতা অর্থে উল্লিখিত হয়েছে। মনু বলেছেন, যার যা কর্তব্য তা পালন করাই ধর্ম। মনু কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে যে কোন কিছুর মূল্যই ধর্মরূপ কর্তব্য থেকে বিরূপ হওয়া যায় না। মনুর মতে ধর্ম হল এমন কর্তব্য কর্ম অবশ্য পালনীয়, এই ধর্মরূপ কর্তব্য কর্মের স্বগত মূল্যের উল্লেখ করেছেন যার উৎস ব্রহ্মা ও বেদাদি শাস্ত্র। এই স্বগত মূল্য হেতু ধর্ম সংযত ও পরিমিত কাম ও অর্থের মধ্য দিয়ে অবিনাশী সুখ ও আত্যন্তিক দুঃখভাব অবস্থা যা জীবের শ্রেয় সেই মোক্ষাবস্থাতে উপনীত হতে সক্ষম করে তোলে। এই প্রসঙ্গে ভগবান দাস বলেছেন- "after the turning point between the two parths of (Pravritti and Nivritti), the two acrs of descent and ascent, God, who had forgotten himself into Men, begins to remember himself again in the body-temple of the soul, that has arrived at the stage"।[৫] মনুশাস্ত্র অনুসারে এই সিদ্ধিপথের সুনির্দিষ্ট পথ মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম।

মনুবর্ণিত বর্ণধর্ম

মনু উল্লেখ করেছেন পৃথিবীতে চারটি বর্ণ আছে 'বর্ণ নাস্তি তু পঞ্চমঃ'। মনু বলেছে গুন ত্রিবিধ সত্ত্ব, রজঃ, তম। তিনি আরো বলেছেন যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলেই দেখতে পাই যে শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সকল জাতি বা শ্রেণীর মধ্যেই গুণত্রয় ক্রিয়াশীল। এছাড়াও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এই গুণোত্রয় দেশ, কাল, পাত্র, জাতি, লিঙ্গ ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বিদ্যমান। সত্ত্ব, রজঃ, তম হল আত্মার গুন বা ধর্ম। সত্ত্ব গুণের লক্ষণ জ্ঞান, অজ্ঞান তমোগুণের লক্ষণ এবং রাগ, দ্বেষ রজগুণের লক্ষণ। এই গুনোত্রয় সর্বভূতে আশ্রিত শরীরে বিদ্যমান, এই গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণটি যখন শরীরের মধ্যে সমগ্রভাবে অভিব্যক্ত হয় তখন সেই শরীরযুক্ত ব্যক্তিকে নিজ ক্রিয়া বা ধর্মে যুক্ত করে থাকে। এ কথা আমাদের অনুভব বিরুদ্ধ নয় যে সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়, প্রাচীনকালে যার প্রকৃতি সত্ত্ব প্রধান তাকে ব্রাহ্মণ, যার প্রকৃতি রজঃ প্রধান তাকে ক্ষত্রিয়, যার প্রকৃতি তমোবিদ্ধ রজঃপ্রধান তাকে বৈশ্য এবং যার প্রকৃতি তম প্রধান তাকে শূদ্র বলা হত। মনু কর্তৃক বিভিন্ন শ্লোকে উল্লিখিত আছে শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণসুলভ আচরণ লক্ষিত হয় সে ও ব্রাহ্মণ হয়ে উঠতে পারে। মনু বর্নিত সমাজে যে বর্ণবৈষম্য তা সমাজে কোন অসাম্যতাকে তোষামোদ করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং মানুষে মানুষে যে প্রকৃতগত বিভিন্নতা তাকে মান্যতা দিয়ে, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্বভাবের বিরুদ্ধাচারণ না করে, কর্ম কুশলতা, আচরণ ও অবস্থানের ভিত্তিতে কর্তব্যকর্ম নির্দিষ্ট করে বর্ণ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে, প্রত্যেক ব্যক্তির সুষম বিকাশের মধ্যে দিয়ে সমাজের সামগ্রিক বিকাশের শিখরে পৌঁছানোর পথ নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। মনু বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থায় জন্মকে বর্ণ বিভাজনের ক্ষেত্রে গৌণ কারণ, এই মতে তাৎপর্য এই যে, 'জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হতে পারে কিন্তু জন্ম কখনোই বর্ণবৈষম্যের মানদন্ড নয় সেক্ষেত্রে গুণ কর্মই প্রধান কারণ'।[৬] এই প্রসঙ্গে ভগবান দাস লিখেছেন, 'শাস্ত্রের অধিকার, সস্ত্রের অধিকার, ধনের অধিকার এবং শ্রমের অধিকার যদি কোন

এক ব্যক্তি বা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর অধীন থাকে। তাহলে রাষ্ট্রে ও সমাজে বিভিন্ন সমস্যা বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে তা অনিবার্য। তাই মনু সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্বেদ শক্তির অধিকার চতুরবর্ণের মধ্যে সুবিভক্ত ছিল'।[৭]

মনুবর্ণিত সমাজে শূদ্রের স্থান

মনু বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থায় গুণ কর্মভিত্তিক বর্ণবৈষম্য স্থাপিত হলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের কর্মের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ভিন্নতা রয়েছে এমন নয়, তাদের সকলের সামাজিক অবস্থান ও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ হতে শূদ্র পর্যন্ত সামাজিক মর্যাদা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে দেখা যায়। বর্ণ ব্যবস্থায় শূদ্রকে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হতে বহুবার দেখা যায়।

সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায্যতা প্রাপ্তির অপ্রতিরোধ্য অধিকার বর্তমান, কোনো আদর্শের আশ্রয় নিয়ে বা জন্মভিত্তিক কারণে বা বিশেষ কোনো বর্ণ গোষ্ঠীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা সামাজিক ন্যায়ের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধতম বিধি তাত্বিক মনু বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায্যতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও শূদ্রের চরম অবিচার করা হয়। সামাজিক কোনো অপরাধের দণ্ডের ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষ্য করা, আর এই দন্ডরূপে যে নির্মম বিধি মনুশাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে বোধ হয় শূদ্র যে মানবিক সত্তাধিকারী কোনো প্রাণী মনুশাস্ত্র তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত বোধ করেছে। যেমন – "শূদ্র যদি দ্বিজাতি কে গালি দেয় তাহলে তার জ্বিহাচ্ছেন কর্তব্য, কারণ সে নিকৃষ্ট স্থান থেকে উৎপন্ন হয়েছে" (মনুসংহিতা ৮/২৭০)। শূদ্র যদি বর্ণত্রয়ের নাম এবং জাতি তুলে গালি দেয় তাহলে সেই শূদ্রের মুখের মধ্যে দশ আঙ্গুল পরিমাণ জ্বলন্ত লৌহকিলক প্রবেশ করে দেবে (মনুসংহিতা ৮/২৭১)।

মনুশাস্ত্রে শূদ্রদের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণের রূপটি প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। উচ্চবর্ণীয় বা ত্রিবর্ণের শেষে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভিন্ন জীবিকা গ্রহণের সুযোগ এই এই শাস্ত্রে বিশদভাবে দেওয়া হলেও শূদ্রকে তার নিজ কর্মের (অর্থাৎ সেবা) বাইরে বিকল্প কোনো জীবিকা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি, এমনকি শূদ্রের কোনোরুপ সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ ছিল। যেমন– "ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া যাবে না। কেননা শাস্ত্রজ্ঞান হীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা না করে অবমাননা করতে পারে" (মনুসংহিতা১০/১২৯)।

মনুশাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যে, মনু শূদ্রদের সকল প্রকার শিক্ষা ও ধর্মচরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। প্রথম জন্ম হয় মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলে, আর দ্বিতীয় জন্ম থেকে যখন তাদের উপনয়ন সংস্কার হয়। এই উপনয়ন সংস্কারের মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ দ্বিজাতি তাদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করে। যেহেতু শূদ্রের দ্বিজত্ব বা উপনয়ন সংস্কারের অধিকার ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনুর বিধি ছিল – "শূদ্রের উপনয়ন প্রভৃতি দ্বিজাতি সংস্কার নেই, অগ্নিহত্র প্রভৃতি যজ্ঞের অধিকার নেই, (মনুসংহিতা ১০/৪, ১০/১২৬-১২৭)। শূদ্রের সন্নিধানে বেদ পাঠ করিবে না" (মনুসংহিতা৪/৯৯)। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্বয়ং উপদেশ দান করেন অথবা কোনো ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন তিনি সেই শূদ্রের সঙ্গে অসংবৃত নরকে গমন করেন (মনুসংহিতা৪/৮১)।

এছাড়াও মনুর মতে শূদ্র কখনোই শাসক হতে পারে না এই প্রসঙ্গে মনুর বিধান- "যে রাজার রাজ্যে শূদ্র ন্যায়, অন্যায় ধর্ম বিষয়ক বিচার করে, পঙ্কে পতিত গোত্র যেমন

আত্মত্যাগ অক্ষম হয়ে পঙ্কে মগ্ন হয়, সেইরূপ এই রাজার রাষ্ট্র অধর্মে অবসন্ন হয়" (মনুসংহিতা ৮/২১)।

অপরদিকে দেখা যায়, একই মনুবর্ণিত বিধানের মধ্যেই আপাত বিরোধের উদাহরণ বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন –'বিদ্বান ব্রাহ্মণ পাকযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানবিহীন শূদ্রের পক্কান্ন ভোজন করবে না' (মনুসংহিতা ৪/২১১)। অন্যত্র এই প্রসঙ্গে একই মনুসংহিতাতে পেয়ে থাকি "যাহারা নিজেকে নিবেদন করিয়া সেবাব্রত লইয়াছে এমন খেতচাষী কুলবন্ধু, গোপাল এবং দাস নাপিতেরা শূদ্র হলেও অন্নভোজ্য"(মনুসংহিতা ৪/২৫৩)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কোন স্থলে শূদ্রান্ন ভোজ্য আবার কোথাও কোথাও অভোজ্য।শূদ্রের শিক্ষকতা করাকে (যাজন ও অধ্যাপনকে) অত্যন্ত পাপজনক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (মনুসংহিতা ১০/১১১), অন্যত্র আবার উল্লেখিত, "শ্রদ্ধালু ব্যক্তি হীন জাতীয় লোকের নিকট হইতেও শোভার সামগ্রীস্বরূপ যেসব বিদ্যা তাহা গ্রহণ করিতে পারে, লৌকিক ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য উপদেশ অন্ত্যজের নিকট হইত গ্রহণ করতে পারে" (মনুসংহিতা ২/২৩৭)। "স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, সুন্দর কথা এবং নানা জাতীয় শিল্প এগুলি সকলের নিকট হইতি গ্রহণ করা যায়" (মনুসংহিতা ২/২৪০)।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে মনুশাস্ত্রে বহু বিধানে মানবিকতার সুর লক্ষ্য করা যায় আবার একইসাথে বিপরীতধর্মী বহু বিধান রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল একই গ্রন্থে এমনচরম স্ববিরোধিতা কেন? শাস্ত্রকার কেনই বা আত্মবিরোধীতাকে প্রকাশ করেছেন। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় স্বার্থান্বেষী পুরোহিতগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ধর্মকে নিজেদের পক্ষে টানার জন্য বিভিন্ন ঐশী স্পৃহামূলক গ্রন্থে নিজেদের মনগড়া কাহিনীকে ব্রহ্ম বাক্য হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করেছেন। শ্লোকগুলিতে জাতি বৈষম্যমূলক অমানবিক বিধানগুলি রয়েছে আসলে বিকৃত যা মনুশাস্ত্র বা মানবশাস্ত্রে তা প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে।[৮] কিন্তু আমার মনে হয় এভাবে যে বিধান অপছন্দ বা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না তা প্রক্ষিপ্ত এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমরা মনুসংহিতার যথাযথ ভাব অনুধাবন করতে সক্ষম হব না।

শূদ্র সম্পর্কিত শব্দ বা বাক্যে যা আমাদের অত্যন্ত নিন্দাসূচক বা আপাত বিরোধী বলে মনে হয় সেই শব্দ বা বাক্য গুলির শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে গ্রহণ না করে সামগ্রিক মনুসংহিতার প্রেক্ষিতে বা বিচার পূর্বক সঠিক ভাবার্থ অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য "লঘুবিষ্ণু স্মৃতিতে আছে শূদ্র দ্বিবিধ"।[৯] শ্রাদ্ধী এবং অশ্রাদ্ধী। শ্রাদ্ধী অর্থ বিশ্বাসভাজন শ্রাদ্ধীরা ভোজ্য এবং অশ্রাদ্ধীরা অভোজ্য। অশ্রাদ্ধী শূদ্র অবিশ্বাসী, অশুচি। তাদের এই অশুচিত্ব জন্মগত নয়, তা ঘটে অসৎকর্মে, অসৎ বাক্যে, অসৎ চিন্তায়। সুতরাং সমাজে শ্রাদ্ধী শূদ্র সম্মানিত হতেন। কারণ বেদে সমস্ত সৎকর্মই সম্মানিত। যারা কর্মের দ্বারা অসৎ বা অশ্রাদ্ধী শূদ্র রূপে পরিগণিত হত তারা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। তাদের অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল, তবে তা জন্মভিত্তিক নয়, কর্মভিত্তিক। একজন ব্রাহ্মণও যদি অসৎ কর্মে লিপ্ত হত তবে সেও এই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে সমাজে নিন্দনীয় হত।

উপনয়নে শূদ্রের অধিকার না থাকাই প্রমাণ করে, জন্মগতভাবে শূদ্র জাতি নেই। এই প্রসঙ্গে আর্যসমাজ দার্শনিক দর্শনানন্দ সরস্বতীর মত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন- ব্রাহ্মণ পদের যোগ্য বালকের উপনয়ন সংস্কার অষ্টম বর্ষে হওয়া উচিত এই রূপ মন্ত্র বেদ মন্ত্রের অনুকূল অথচ যুক্তিসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ বালক বলতে ব্রাহ্মণের বীর্যোৎপন্ন বালক নয়, পড়ন্ত ব্রাহ্মণ পদ লাভের যোগ্য যে ভালো তাকেই বুঝতে হবে। বালক যদি শূদ্র সন্তান হয়েও মেধাবী হয় তাহলে ব্রাহ্মণ পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হলে তার উপনয়ন সংস্কার অষ্টম বর্ষে ক্ষত্রিয় পদের যোগ্য হলে

একাদশ বছরে এবং যোগ্য হলে দ্বাদশ বর্ষে হবে। অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হবার জন্যই উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে থাকে শূদ্র হওয়ার জন্য উপনয়নের আবশ্যক হয় না। উপনয়নের পূর্বে সকলেই শূদ্র থাকে তৎকালে কারও দ্বিজ্ পরিচয় হয় না। উপনয়ন নিয়ে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে মানুষের দ্বিতীয়বার জন্ম লাভ হয় এবং তখন সে দ্বিজ আখ্যা পেয়ে থাকে।[১০]

উপসংহার

যে উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম প্রবর্তিত হয় তার সঙ্গে উচ্চ সামাজিক আদর্শবান ব্যক্তিত্বকে মাথায় রাখা হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণে স্থান হলো উচ্চ এবং তার দায়িত্ব ছিল অপরিসীম, এই আদর্শনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সবাই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত মান্য করলে তপস্বী ব্রাহ্মণেরা সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীর জ্ঞান উচ্চ আদর্শ কঠোর তপস্যা সমন্বয় ঘটিয়ে স্বল্প ব্যয় এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে যাতে সমাজের সামগ্রিক বিকাশ ঘটে, গুনকর্ম অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেও কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে সমাজকে সফলতার চরম শিখরে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বর্ণ বিভাগের লক্ষ্য। মনু তাঁর বর্ণিত সমাজব্যবস্থায় চারটি ভাগ করলেন এবং সেই প্রত্যেকটি ভাগের তিনি 'লক্ষণ' প্রদান করলেন এবং যে ব্যক্তি যে লক্ষণে যথাযথভাবে মানানসই হয় সে সেই বর্ণের অধিকারী। এই যে চর্তুবর্ণ লক্ষণ বা ধর্মব্যবস্থা তা কিন্তু করা হয়েছ সমগ্র সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে। একটি সাইকেলের ক্ষেত্রে যেমন তার চাকা, হ্যান্ডেল, বডি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঠিক ঠিক অবস্থানে তাদের নিজেদের কাজ সম্পাদনের মাধ্যমেই সাইকেলটি গতিশীল হয়, ঠিক তেমনি সমাজে অবস্থিত ব্রাহ্মনাদি স্ব-স্ব নির্ধারিত কর্তব্য কর্ম পালনের মাধ্যমে সমাজকে গতিশীল এবং পরিপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা ও তপস্যার পতন ঘটতে থাকে। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব অবস্থান বজায় রাখা নিরিখে এবং সমগ্র সমাজের উপর তাদের নিরঙ্কুস আধিপত্য টিকিয়ে রাখার তাগিদেই ক্রমে ক্রমেই বর্ণব্যবস্থা পরিণত হল জন্মভিত্তিক জাতিব্যবস্থা। এই শ্রেষ্ঠত্বকে নিশ্চিত করতে গিয়েই শুরু হল অন্যের প্রতি শোষণ ও দমনমূলক আচরণ এবং তা ধীরে ধীরে চূড়ান্ত বর্ণবিদ্বেষে পরিণত হল।

মনুসংহিতা একটি বৈদিক ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদানুমোদিত সমাজ পরিচালন ব্যবস্থার কর্তব্যবিধি। ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ধারণা এবং সেই অনুযায়ী যে কর্তব্য কর্ম স্মৃতিতে বিধান রূপে উল্লেখ থাকবে তা বেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বেদে উল্লেখিত মহাকাব্য (তত্ত্বমসি, অহম ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি) সবই ব্রহ্ম (all in one) ধারণার জ্ঞাপক, তাই উচ্চনীচ বিভাজনকে মান্যতা দেওয়া বেদের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হল গুনকর্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা ও সামাজিক বৈষম্যহীনতা। মানুষের মধ্যে যে গুনকর্মভিত্তিক বৈষম্য তা প্রাকৃতিক বিষয়। এই প্রাকৃতিক বৈষম্য থাকবেই, কিন্তু অধিকারে সাম্য আবশ্যক। একজন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণত্ব সঠিক ভাবে পালন করে তবে সে যেমন প্রশংসা প্রাপ্ত হয় বা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তেমনি যদি একজন শূদ্র তার শূদ্রত্ব নিপুনভাবে পালন করে সেও ঠিক ততটাই সম্মান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বৈষম্য বা বৈচিত্র্য যখন প্রাকৃতিক তখন সেই বৈচিত্র অনুসারে স্ব স্ব কর্ম নিপুনভাবে সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা অত্যাবশ্যক। ঘন কুয়াশায় আবৃত শাস্ত্রসমূহকে যুক্তির আলোকে বিচারপুর্বক প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করে, প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নতুন প্রজন্মকে এমন মানসিকতার অধিকারী করে তুলতে হবে, যেখানে কোন উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাব নেই, স্ব-স্ব দক্ষতা-যোগ্যতা অনুসারে কর্ম

সম্পাদনে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে তবেই সম্ভবত সমতাভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার পথটি সুগম হবে।

তথ্যসূত্র:

১। House of representative subcommittee on Africa global human rights and international operations committee on international relations, (October 6, 2005), "India's unfinished Agenda: Equality and justice for 200 million Victims of the caste System", Washington: U.S. Government printing office, https://chrissmith.house.gov/uploadedfiles/2005.10.06_indias_unfinished_agenda_-_equality_and_justice_for_200_million_victims_of_the_caste_system.pdf

২। Vajpeyi, Ananya, (January 20,2016), "Ancient prejudice Modern inequality", The Hindu. https://www.thehindu.com/opinion/lead/Dalit-student-Rohith-Vemula-suicide-Ancient-prejudice-modern-inequality/article62116053.ece

৩। মণ্ডল, মহীতোশ, (জানুয়ারি ২৪, ২০১৬), "আমি দলিত". আনন্দবাজার অনলাইন। https://www.anandabazar.com/topic/mohitosh-mondal

৪। গুপ্ত, দীক্ষিত, (২০১৭), *নীতিশাস্ত্র*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, পৃ-৩৮।

৫। Das, Bhagava,. (1938), *The Science of Self*, Benares: The Indian Book Shop.

৬। দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, (১৯৪২). *মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম*, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ- ৮৮।

৭। তদৈব, পৃ- ১১৬।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, (সম্পা ও অনু), (১৪১০), *মনুসংহিতা*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পৃ- ৭৭।

৯। সেন, ক্ষিতিমোহন. (১৩৫৩). *জাতিভেদ*, বোলপুর: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ- ১১৮।

১০। অরিন্দম. (জুলাই ২০,২০২১). "বৈদিক বর্ণব্যবস্থা". বাংলাদেশ অগ্নিবীর. Accessed on 8th november, 2024, 8pm https://www.agniveerbangla.org/2021/07/blog-post_20.html?m=1 .

তন্ত্র ও পুরাণে পশুবলি প্রথা

মৌসুমী সাঁপুই
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে উল্লিখিত পশুবলি বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দান, উপহার প্রভৃতি অর্থে বলি পদের প্রয়োগ করা হয়। *অষ্টাধ্যায়ী*তে বলি পদের অর্থ ‘দান’ প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে- ‘বল্যতে দীয়তে ইতি। বল দানে + সার্ব ধাতুভ্য ইন্’[১] দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগাদি পশুর দানরূপ কর্মকেও বলি বলা হয়। বলিদানের বিধি, প্রশংসার সাথে বলিদানের নিন্দাও বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রমূলক গ্রন্থে পাওয়া যায়। *ভাগবদগীতায়* পশুবলি নিষিদ্ধ কর্মরূপে বিবেচিত। বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে বলি দানের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। এখানে বলা হয়েছে দেবী দুর্গার আরাধনা করে তবেই বলি দেওয়া উচিত। সাধারণত তিনটি পুরাণে দুর্গোৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়- *কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ* ও *দেবীপুরাণ*। এগুলির মধ্যে *কালিকাপুরাণে* বলির বিবিধপ্রকার লক্ষ্য করা যায়। *বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে* মাষকলাই বলির উল্লেখ আছে অন্যদিকে *দেবীপুরাণে* দুর্গোৎসবের উল্লেখ থাকলেও বলির প্রাধান্য তেমন পাওয়া যায় না। তন্ত্রে শিব-শক্তির আরাধনায় নৈবেদ্য উপাচার বা বলি-প্রদান এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তন্ত্রে বলি বলতে উৎসর্গ বুঝতে হবে। এই উৎসর্গ হল নিজের প্রিয় বস্তুকে ইষ্টদেবতার নিকট সমর্পণ। রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে বলি দুই প্রকার। মাংস ও রক্তাদি বলিকে রাজসিক বলি বলা হয়। মধু, ঘৃত পায়েসাদি বলিকে সাত্ত্বিক বলি বলা হয়। *সময়াচারতন্ত্রে* এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ‘বলিশ্চ দ্বিবিধো দেবি সাত্বিকো রাজসস্তথা/ সাত্ত্বিকে বলিমাখ্যাতো মাংসরক্তাদি বর্জিতঃ/ রাজসো মাংস রক্তাদি যুক্তঃ সম্প্রোচ্চয়তে প্রিয়ে’[২]। *কুলার্ণবতন্ত্রে* বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার- এই সাতটি আচারের মধ্য দিয়ে সাধনার ক্রম দেখানো হয়েছে। এই তন্ত্র অনুসারে শৈবাচারে পশুবলির বিধি উল্লেখ আছে[৩]।
সূচক শব্দ: আচার, তন্ত্র, পশু, পুরাণ, বলি, বিধি।

মূল আলোচনা :

তান্ত্রিক আচার ও বলিপ্রথা

তান্ত্রিক উপাসনায় তিনটি ভাব ও সাতটি আচারের উল্লেখ আছে। এক এক জন এক এক পথে সাধনা করেন। তিনটি ভাব হল- পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব। সাতপ্রকার আচার হল- বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল[৪]। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা সাধনার পথ নির্দিষ্ট করে। এই আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলিকে তন্ত্রশাস্ত্র আচার নাম দিয়েছেন। কুলার্ণবতন্ত্রে সাতপ্রকার আচারের উল্লেখ আছে। এই তন্ত্র মতে সাধনার প্রথম স্তর হল বেদাচার এবং ক্রমোর্ধ্বতা অনুসারে সর্বোচ্চ স্তর হল কৌলাচার[৫]। *বিশ্বসার-তন্ত্রে* এই সাতটি আচারকে দুটি ভাগ করা হয়েছে, বামাচার ও দক্ষিণাচার। বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল এই আচার গুলি বামাচারের অন্তর্গত। অন্যদিকে বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণ এগুলি দক্ষিণাচারের অন্তর্গত। বামাচার হল পঞ্চতত্ত্ব যুক্ত আচার এবং দক্ষিণাচার হল পঞ্চতত্ত্বহীন আচার। পঞ্চ তত্ত্বগুলির আদিতে ‘ম’ থাকায় এগুলি পঞ্চ মকার নামেও পরিচিত। তন্ত্রশাস্ত্র পঞ্চ মকার সাধনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। একপক্ষের মতে এই সাধনা তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে তিন প্রকার। প্রসঙ্গত বলা

যায় *সময়াচারতন্ত্রে* তিন প্রকার সাধকের উল্লেখ আছে। এখানে বলা হয়েছে- 'সাধকাস্ত্রিবিধা প্রোক্তা সাত্বিকা রাজসাস্তথা/ তামসাশ্চ তথা দেবি তেষাম্ বক্ষ্যামি লক্ষণম্'[৬]। সাত্ত্বিক সাধকেরা সাত্ত্বিক লক্ষণ যুক্ত হয়ে থাকেন, এঁরা নিয়মপূর্বক সাত্ত্বিকবলি দান করেন। সুন্দর পোষাক পরিহিত রাজসিক সাধক রাজসগুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন, এঁনারা রাজসিক বলিদান করে থাকেন। তামস সাধকেরা রাগান্বিত প্রকৃতির হয়ে থাকেন, এঁনারা কোন কার্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করেন না। অন্যপক্ষের মতে সাধনা স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুই প্রকার। প্রবৃত্তি মার্গের পথ ধরে সাধনার মাধ্যমে নিবৃত্তি মার্গে পৌঁছানোই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সাধনার মাধ্যমে সাধক পশুভাব থেকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চ তত্ত্ব বা পঞ্চ মকারের দ্বিতীয় তত্ত্ব হল মাংস। গ্রাম্য ছাগ, খেচর, মৃগাদি পশুর দেহ থেকে উৎপন্ন হয় পুষ্টি, বুদ্ধি, তেজ ও বল। এর দ্বারা সাধনা হল মাংস তত্ত্ব। পূজা বা উপাসনায় বলি-রূপে উৎসর্গ ছাগাদি মাংসই বৈধ মাংস। এই মাংস অভক্ষ্য নয়। তন্ত্রে মাংস তত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ান্।/ সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক'[৭]। অর্থাৎ মা= রসনা, অংস= প্রিয়। রসনার অংশ হল বাক্য। যিনি বাক্ সংযম করতে পারেন বা যিনি রসনাকে ভক্ষণ করেন তিনিই মাংসাশী। জিহ্বার সংযম হল বাক্ সংযম। প্রকৃত মাংস-সাধক বাক্ সংযমী যোগী জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা পুণ্য এবং অপুণ্য দুই পশুকে হত্যা করেন। যে উপাসক জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা পুণ্য এবং অপুণ্য পশুকে হত্যা করে পরম শিবে লয় হয়ে যান তিনি এই মাংস তত্ত্বের অধিকারী। এই মাংস ভক্ষণ প্রসঙ্গে *কুলার্ণব-তন্ত্রে* বলা হয়েছে, উপাসনার সময় ছাড়া অন্য সময় মাংস ভক্ষণ করলে পাপ হয়। উক্তিটি এইরকম-'মৎস্য-মাংস-সুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্।/ যাগকালং বিনান্যত্র দূষনং কথিতং প্রিয়ে'[৮]। এই তন্ত্রে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি নিজের ভোগের জন্য শাস্ত্র বিধি না মেনে প্রাণীবধ করে সে মৃত্যুর পর নিহত পশুর গায়ে যত লোম আছে ততদিন নরকে বাস করে। তারপর তাঁর পশুযোনিতে জন্ম হয়[৯]। আটজন পশুঘাতকের কথা উল্লেখ আছে- অনুমতিদানকারী, বিশ্বাস উৎপাদনকারী, শিকারী, ক্রয়- বিক্রয়কারী, পাচক, হরণকারী, ভক্ষক এবং ঘাতক। তিনরকম বধের কথা বলা হয়েছে যেমন- বিক্রেতা অর্থের জন্য বধ করে, ভক্ষণকারী ভোজনের জন্য বধ করে ও যিনি ঘাতক তিনি প্রাণনাশের জন্যে বধ করেন। সাধক মাংস ভক্ষণকারী হলে তাঁকে যথাশাস্ত্র বিধি পালন করেই মাংস ভক্ষণ করতে হবে। শাস্ত্র মেনে মাংস ভক্ষণ করলে তবেই আরাধ্যাদেবী প্রীত হন। শাস্ত্রানুসারে যদি কেউ গো এবং ব্রাক্ষ্মণও বধ করেন তাহলেও তার পাপ হয় না[১০]।

মহানির্বাণতন্ত্রে বলি প্রসঙ্গে মাছ-মাংস উল্লেখের পাশাপাশি ষড়্রিপুকে মায়ের দুয়ারে বলি দিয়ে, সমস্ত আসক্তি পুষ্প দিয়ে পূজার্চনার কথা বলা হয়েছে[১১]। তন্ত্র আরাধনায় যে পদ্ধতিতে ষট্চক্রভেদের উল্লেখ আছে সেখানে কোন পশুবলিরূপ কর্ম করা হয় না। যেখানে যজ্ঞীয় পদ্ধতিতে সামাজিক উৎসবের মাধ্যমে আরাধনা করা হয় সেখানে বলিদানের উল্লেখ আছে। এক সম্প্রদায় দেবতাকে অন্নভোগ দিয়ে সন্তুষ্টি লাভ করে আবার অন্য সম্প্রদায় ছাগাদি জীবের বধ করে দেবতার অর্ঘ্য নিবেদন করে। *বাংলার তন্ত্র* গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন- 'তন্ত্র এই দয়াধর্মের, এই ঘাস খাওয়ার গোঁড়ামিকে বেজায় নিন্দা করিয়াছেন'[১৭]। এই সম্প্রদায়ের ভাবনা হল, যে কোন প্রাণীর শরীরে যতক্ষণ উষ্ণ শোণিত থাকে আত্মাও ততক্ষণ থাকে। তাহলে উষ্ণ শোণিত ও আত্মার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। তাই দেবতাকে শোণিত উৎসর্গের মাধ্যমে উপাসনা করা কোন পাপ নয়। বৃক্ষ থেকে ফল, ফুল বিচ্ছিন্ন করে দেবতাকে উৎসর্গ করা, গোবৎসের খাদ্য দুগ্ধ অপহরণ করে পায়েসাদি অর্ঘ্য প্রস্তুত করা, ধান, যব প্রভৃতি শস্যকে পাক করে খাওয়া-

ইত্যাদি কর্মে যেমন কোন অপরাধ হয় না তেমন ছাগাদি প্রাণীকে বধ করলেও কোন অপরাধ হয় না। যে বস্তুতে যার অধিকার আছে সেটি দ্বারাই সে ইষ্টের আরাধনা করতে পারে। যাঁর প্রবৃত্তিমার্গের উপাসনা যেমন তাঁর উপাসনা পদ্ধতি তেমন। নিজে তৃপ্তির সঙ্গে যা খাবে নিজের ইষ্ট দেবতাকেও সেটি ভোগ হিসেবে উৎসর্গ করতে পারে। যেমন বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরের সামনে সাঁওতাল ও কোল জাতি মুরগি বলি দান করেন। *কুমারীতন্ত্রের* চতুর্থ পটলে কালিকাপূজার বলিদানের বিস্তৃত উল্লেখ আছে[১৮]। এই তন্ত্রে দেবী পার্বতী মহাদেবের কাছে কালিকাদেবীর প্রীতিকর পূজোপচারসমূহ জানতে চেয়েছেন। এই তন্ত্রে মহাদেব ভৈরব নামে আখ্যাত। ভৈরব কালিকাদেবীর পূজোসমূহের যে রীতি অবগত করিয়েছেন, সেটি এইরকম- দেবীকে প্রথমে গৌড়ী, মাধ্বী, এবং পৈষ্টী সুরা দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে। এই সমস্ত সুরার অভাবে অনুকল্প দ্রব্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কাংস্যপাত্রস্থিত নারকেল-জল, তাম্রপাত্রস্থিত মধু, তাম্রপাত্রস্থিত গো-দুগ্ধ ঘৃতসংযুক্ত যদি না হয় তবে এসকল দ্রব্য সুরাতুল্য বলে গণ্য হবে। তাম্বুল, শর্করাযুক্ত নারকেল, ঘৃতযুক্ত পায়েস, আর্দ্রকযুক্ত গুড়, তণ্ডুলযুক্ত তিল, সৈন্ধবযুক্ত দধি, জম্বীর, কাঁঠাল, আম্র, আম্রাতক বা আমড়া, কলা, তিন্তিড়ী, শ্রীফল, করঞ্জ, বকুল, তাল, খেজুর এবং অন্যান্য বিবিধ রকমের স্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত ফল দেবীর নৈবেদ্যার্থে অর্পণ করতে হবে। এরপর তিনি বলিদানের দ্রব্যগুলির উল্লেখ করেছেন। 'নরঃ শ্লাঘ্যতমো মেষো মহিষঃ শশকস্তথা।/ শল্বকঃ শূকরশ্চৈব বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ'[১৯]। প্রথম উল্লিখিত 'নরঃ শ্লাঘ্যতমো' এই অংশের পাঠান্তর পাওয়া যায় 'নরশ্ছাগো তথা' এইরকম। অর্থাৎ ভৈরব বচন অনুসারে কালিকাদেবীর পূজায় নর, ছাগ, মেষ, মহিষ, শশক, শজারু, শুকর, বলয়, কৃষ্ণসার মৃগ প্রভৃতি পশু মন্ত্রসাধক বলিরূপে প্রদান করতে পারবে। এছাড়া সুবাসিত জল ও কুলাগার প্রক্ষালিত জল নৈবেদ্যরূপে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ তন্ত্র যে মনুষ্য বধের অযোগ্য নয় সে বিষয়টি স্পষ্ট। *রহস্যপূজাপদ্ধতি* গ্রন্থে জগন্মোহন তর্কালংকার ভৈরবযামল থেকে পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে ভৈরব ও ভৈরবীর কিছু কথোপকথন উল্লেখ করেছেন। এখানে ভৈরবের প্রশ্নানুসারে ভৈরবী পঞ্চমকারের বর্ণনা দিয়েছেন। এটি হল ভৈরবীচক্রপূজা বিধি। এখানে পাঁচপ্রকার পশুর বলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল ছাগ, মেষ, মহিষ, হরিণ ও বণ্যশূকর। এই পঞ্চপশু বলিদানে পৃথক পৃথক ফল লাভ হয়। যেমন- ছাগ বলিদানে স্বর্গলাভ, মেষ বলিদানে রাজ্যলাভ, মহিষ বলিদানে সালোক্যে মুক্তিপ্রদ, হরিণ বলিদানে চক্রার্চ্চনে মন্ত্রসিদ্ধি এবং শুকর বলিদানে ষটকর্ম সিদ্ধিলাভ হয়। *বৃহৎ তন্ত্রসার* গ্রন্থে দেবী দুর্গার আরাধনা করে তবেই বলি দানের উল্লেখ আছে। বলিদানের দ্রব্য সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে- 'শাল্যন্নং পললং সর্পিলার্জচূর্ণানি শর্করা। গুড়মিক্ষুরসাপূপৈর্মধ্বক্তৈঃ পরিমিশ্রিতৈঃ। কৃত্বা কবলমারাধ্য দেবং প্রাগক্তবর্ত্মনা। রক্তচন্দনপুষ্পাদ্যৈর্নিশি তস্মৈ বলিং হরেৎ'[১৫]।

তন্ত্রে বলি বিধি ও প্রশংসা

প্রদেশ ভেদে ভারতবর্ষে তন্ত্রের তিনটি সম্প্রদায় ছিল- গৌড়-সম্প্রদায়, কাশ্মীর-সম্প্রদায় ও কেরল সম্প্রদায়। তিনটি সম্প্রদায়ের সাধকরা উপাসনাতে পঞ্চ মকারের অনুকল্প দ্রব্য গ্রহণ করেন। গৌড়-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক পূজাতে নৈবেদ্য নিবেদনের পর হোম করেন। তারপর তাম্বুল নিবেদন করে বলি-দানরূপ কর্ম করেন। কাশ্মীর-সম্প্রদায়ে পীঠার্চনের পরে বলিদান করা হয়। কেরল-সম্প্রদায়ে পূজার শেষে বলিদান করা হয়[১৬]। এখানে তান্ত্রিক তিনটি সম্প্রদায়েই বলিদানরূপ কর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় পার্থক্য শুধু অনুষ্ঠিত কার্যক্রমে।

তান্ত্রিক মতানুসারে সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যেই বলি প্রদান করা হয়। তান্ত্রিক সাধকদের বলিদানের কিছু বিধি আছে। বলিদান হল সাধকদের একপ্রকার নিত্যকর্ম। প্রত্যহ নিজের ভোজনের পূর্বে মন্ত্রোচ্চারন পূর্বক বলিদান করতে হয়। এর উল্লেখ *সময়াচারতন্ত্রে* পাওয়া যায়, এখানে বলা হয়েছে- ‘নিত্যং স্বভোজনে কালে মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ/ কারেয়দ্বলিদানং চ ভোজনাৎ প্রথমং প্রিয়ে’[১৭]। দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করেই সাধক যথাইচ্ছা গমন করতে পারে। বলিপ্রদানের ফলে সাধক নিজের প্রার্থিত বা কাঙ্খিত ফল লাভ করে। এছাড়াও আচমনের আগে বলিদানের রীতি আছে। রাত্রিতে যথাবিধি বলিদান করে সাধক যদি জপ করে তিনিও নিজের কাঙ্খিত ফল লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে *সময়াচারতন্ত্রে* বলা হয়েছে-‘পুনশ্চ রাত্রৌ সর্বেষাং বলিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ/ যথোক্তং বিধিনা কুর্যাদ্যথোক্তং ফলমশ্নুতে’[১৮]।

পুরাণ-বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা

পুরাণ এর অর্থ হল পুরাতন। পুরাতন হলেও পুরাণ গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম সম্পদ, যা চিরনতুন। শ্রুতি, স্মৃতি ও সংহিতার নানা কাহিনী এতে নিবন্ধ। এইসমস্ত কাহিনীর মধ্যে নিহিত আছে সেই সময়ের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। এজন্যে অতীত সম্বন্ধীয় যে কোন গবেষণাধর্মী কার্যে পুরাণের গুরুত্ব অপরিহার্য। সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবিস্তার, মন্বন্তর ও বংশের চরিত্র- এই পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত শাস্ত্র হল পুরাণ, উল্লিখিত- ‘সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্’[১৯]। সর্গ হল বিশ্বের সৃষ্টিবিষয়ক বর্ণনা, প্রতিসর্গ হল প্রলয় বিষয়ক বর্ণনা, বংশ হল বিভিন্ন রাজা, ঋষি, দেবতা, দৈত্যের বংশের বিবরণ, বংশানুচরিত হল বিভিন্ন বংশের রাজার কীর্তিকলাপের বর্ণনা, মন্বন্তর হল মনুকাল প্রভৃতি কালবিষয়ক বর্ণনা। এই বিষয় গুলোর বাইরেও বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলো যুক্ত করলে পুরাণের দশটি লক্ষণ পাওয়া যায়। সাধারণত এই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত পুরাণগুলো হল উপপুরাণ ও পুরাণ। দশটি লক্ষণযুক্ত পুরাণগুলো হল মহাপুরাণ, যেগুলোকে প্রধানপুরাণও বলা হয়ে থাকে। *ভাগবত পুরাণে* পুরাণের দশটি লক্ষণের উল্লেখ আছে। যেমন- ‘সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্ত্রাণিচ।/বংশ বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ।।/ দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণ্নগ তদ্বিদো বিদুঃ।/ কেচিত্ পঞ্চবিধং ব্রহ্মমন্ মহদল্পব্যবস্থ্যয়া’[২০]। সর্গ- জগৎ সৃষ্টি, বিসর্গ- জীব থেকে জীবের উৎপত্তি, বৃত্তি- পেশা, রক্ষা- ভগবানের বিভিন্ন অবতার ও ধর্ম রক্ষা, অন্তর-মন্বন্তর, বংশ-বিভিন্ন বংশের কথা, বংশানুচরিত- বিভিন্ন বংশের রাজার কীর্তিকলাপের বর্ণনা, সংস্থা- চার প্রকার প্রলয়ের কথা (নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক), হেতু- জগৎ সৃষ্টির জন্যে অনাদি বাসনাময় জীব বা প্রকৃতি, অপাশ্রয়- বিশ্ব, প্রাজ্ঞরূপী ব্রহ্ম। এই দশটি বিষয় মহাপুরাণের অন্তর্গত। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮টি। *শিবপুরাণকে* অনেকে মহাপুরাণ বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে মহাপুরাণের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ টি। একটি সূত্রের সাহায্যে মহাপুরানগুলো একসঙ্গে স্মরণ করা যায়। সূত্রটি হল-‘মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্।/ নালিংপাগ্নি পুরাণানি কূস্কং গারুড়মেবচ’। পুরাণের আদিতে থাকা অক্ষর গুলো নিয়ে আলোচ্য সূত্রটি রচিত। যথাক্রমে পুরাণগুলো হল- *মৎস্য পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বরাহ পুরাণ, বামন পুরাণ, নারদ পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, গরুড় পুরাণ।* মহাপুরাণ ছাড়াও ১৮টি উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। এগুলো তুলনামূলকভাবে নবীন। ১৮টি উপপুরাণ হল- *সনৎ কুমার পুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, নন্দ পুরাণ, শিবধর্ম পুরাণ, দুর্বাসা পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, কপিল পুরাণ, বামন পুরাণ, উষ্ণস পুরাণ, মানব পুরাণ, বরুণ পুরাণ,*

কালী পুরাণ, মহেশ্বর পুরাণ, শাম্ব পুরাণ, সৌর পুরাণ, পরাশর পুরাণ, মরিচ পুরাণ, ভার্গব পুরাণ।

পুরাণের সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। *বায়ু পুরাণে* বেদকে পুরাণের পরবর্তী বলে দাবি করা হয়েছে। তবে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পুরাণবিদদের মতে পুরাণ রচনার সময় আনুমানিক খ্রিস্টিয় তৃতীয় থেকে দশম শতকের মধ্যে। প্রাচীন হিন্দু-ধর্মগ্রন্থগুলোকে সময়ের নিরিখে সাজালে প্রথমেই বেদের কথা বলতে হয়। এরপর আসে দুটি মহাকাব্য- *রামায়ণ* ও *মহাভারত*। তারপর পুরাণের কথা পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস বলা হয়। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে। উল্লিখিত শ্লোকটি হল- 'ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদ সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং......'[২১]। *অথর্ববেদের* একমাত্র ব্রাহ্মণ *গোপথ ব্রাহ্মণ,* এখানে ব্রহ্মণির্মিত পঞ্চবেদের উল্লেখ আছে। ইতিহাসবেদ ও পুরাণবেদ এই পঞ্চ বেদের অন্তর্ভুক্ত[২২]।

পুরাণে বলিপ্রথা

পুরাণ গুলির মধ্যে *কালিকাপুরাণ* ও *পদ্মপুরাণে* সরাসরি বলির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। কোন স্থানে বলি দ্বারা স্বর্গ সাধনের কথা আছে আবার কোথাও বলির ফলস্বরূপ নরকবাসেরও উল্লেখ আছে। *কালিকাপুরাণে* সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়ের নাম বলিদান রাখা হয়েছে। অধ্যায়টির সংখ্যা হল ৫৫। এই পুরাণে দেবী চণ্ডিকাকে সন্তুষ্ট করার উপায়স্বরূপ বলিদানের কথা বলা হয়েছে। বক্তা স্বয়ং ভৈরব। এখানে ছাগল, শরভ এবং মানুষ এগুলি যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ[২৩]। কিছু বলি সামগ্রীর কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, যেমন- পক্ষি, কচ্ছপ, কুম্ভীর, নয় প্রকার মৃগ, সিংহ, মৎস, হাতী প্রভৃতি। উল্লিখিত দ্রব্যের অভাবে সাধক স্বগাত্র-রুধির দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দান করতে পারেন[২৪]। নয় প্রকার মৃগ বলতে বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার এবং শশ এগুলির কথা বলা হয়েছে। উল্লিখিত প্রাণী বলিদানের ফলে সাধক হত্যাদোষে দুষ্ট হন। *পদ্মপুরাণে* দেখা যায় দেবী পার্বতী ভগবান শিবকে বলেন- তামস-গুণাবলম্বী যে ব্যক্তি দেবীর নিমিত্ত জীব হত্যা করেন তাঁর নিঃসন্দেহে নরকবাস হয়। এছাড়াও যারা পশু বলির উপদেষ্টা, হন্তা, কর্তা এবং পশু বিক্রেতা ও উৎসর্গ কর্তা তাঁদেরও নরক বাস হয়[২৫]। অর্থাৎ এই পুরাণে সর্বতোভাবে পশুহিংসা করাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পুরাণে বলি বিধি ও প্রশংসা

সমস্ত শাস্ত্রে বলি বিবিধ নিয়ম মেনে প্রদান করা হয়ে থাকে। পুরাণও সেক্ষেত্রে ব্যাতীত নয়, পুরাণ মতে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী বলিপ্রদান করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত *কালিকাপুরাণে* উল্লিখিত বলিবিধির কয়েকটি দর্শিত হচ্ছে। এই পুরাণে দেবী চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি বলিপ্রদানের কথা থাকলেও, কিভাবে বলিদানের মাধ্যমে ভৈরবরূপী ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করা যাবে তা লিপিবদ্ধ আছে। এখানে বলা হয়েছে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে ছাগল ও মহিষের বলি প্রদান করে মধু ও মাংস অর্পণ করলে ভৈরব তুষ্ট হন। কালিকাপুরাণে রক্ত দিয়ে অভিষিক্ত করে কৃত্রিম শত্রুকে বলিরূপে সাজানোর উল্লেখ আছে। শত্রু বিনাশ হেতু অর্চনা করলে শত্রুর প্রতিকৃতি তৈরীর কথা বলা হয়েছে। এই প্রতিকৃতিটি যবচূর্ণ বা মৃণ্ময় দ্বারা হয়ে থাকে। এই প্রতিকৃতিটিকে চূরান্ত পর্বে শিরচ্ছেদ করে বলিপ্রদান করা হয় [২৬]। যেক্ষেত্রে সাধক স্বকীয় শরীর থেকে রক্ত দান করে সেক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলী আছে। যেমন- সাধক কণ্ঠের অগ্রভাগ, নাভির উর্ধ্বভাগ ও তলদ্বয় ব্যাতীত বাহুযুগল থেকে রক্ত দান করতে পারবে।

এছাড়া ললাট, জ্রযুগলের মধ্য, কর্ণাগ্র, স্তনদ্বয়, উদর, কণ্ঠের নিচের ভাগ এবং নাভির উর্দ্ধস্থিত যাবতীয় হৃদয়ভাগ প্রভৃতি অঙ্গ থেকে দেবীকে রক্ত দান করা বিধিসঙ্গত [২৭]। বীরসাধক যথাবিধি বলিদান করলে তাঁর চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয় এবং সুখ লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে *কালিকাপুরাণে* বলা হয়েছে-'এবং দদদ্বলিং বীরো যথোক্তবিধিনামুনা।/ বলিদানাদেব চতুর্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ম্' [২৮]।

বেদ থেকে শুরু করে তন্ত্র, পুরাণ সর্বত্র বলিপ্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে নির্মূল হয়ে গেছে সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যদিও বিবিধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তার প্রচেষ্টা চলছে। বলি শব্দের সঙ্গে যেহেতু হত্যা জড়িয়ে থাকে সেজন্যে এই বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল, তা সত্ত্বেও মানুষ তার প্রথাকে সহজে হারাতে চায় না। সেহেতু আজও বিভিন্ন পূজাতে কুমড়ো, আঁখ, লাউ প্রভৃতি সবজি বলি দেওয়ার রীতি আছে। কিছু কিছু স্থানে এই সমস্ত সবজি বা ফল ছাড়াও প্রাণী হত্যা করে বলি প্রদানের রীতি আজও অব্যাহত। বেদ, তন্ত্র, পুরাণে প্রাণীকে বলির দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত করায়, এই প্রথা নির্মূল করার প্রয়াস আজ নানা বাধাবিপত্তি ও তর্ক-বিতর্কের সম্মুখীন হয়।

তথ্যসূত্র :

১. উণাদিসূত্র ৪/১১৭
২. সময়াচারতন্ত্র (২০৩), পৃষ্ঠা নং-৩২, চৌখম্বা প্রেস, প্রথম সংস্করণ।
৩. কুলার্ণবতন্ত্র, পৃষ্ঠা নং- ৩৩, প্রথম সংস্করণ।
৪. তন্ত্রপরিচয়, পৃষ্ঠা নং-৫৫, দ্বিতীয় সংস্করণ।
৫. কুলার্ণবতন্ত্র পৃষ্ঠা নং – ৩৩, প্রথম সংস্করণ।
৬. সময়াচারতন্ত্র (২০৪), পৃষ্ঠা নং-৩৩, চৌখম্বা প্রেস, প্রথম সংস্করণ।
৭. তন্ত্ররশ্মি, পৃষ্ঠা নং-৩৭, প্রথম সংস্করণ।
৮. তন্ত্রপরিচয়, পৃষ্ঠা নং-৬৬, দ্বিতীয় সংস্করণ।
৯. কুলার্ণবতন্ত্র (২/১৩১-১৩২), পৃষ্ঠা নং – ৫৯, প্রথম সংস্করণ।
১০. কুলার্ণবতন্ত্র (২/১৩৫-১৩৭), পৃষ্ঠা নং –৬০, প্রথম সংস্করণ।
১১. বাঙ্লার তন্ত্র, পৃষ্ঠা নং-১৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ।
১২. বাঙ্লার তন্ত্র, পৃষ্ঠা নং-১৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ।
১৩. কুমারীতন্ত্র, পৃষ্ঠা-১৮-১৯, নবভারত প্রথম সংস্করণ।
১৪. কুমারীতন্ত্র, পৃষ্ঠা-১৯, নবভারত প্রথম সংস্করণ।
১৫. বৃহৎ তন্ত্রসার (প্রথম খণ্ড), পৃষ্ঠা নং-৩৬৪, প্রাচ্য প্রকাশন।
১৬. তন্ত্রপরিচয়, পৃষ্ঠা নং-৬৮-৬৯, দ্বিতীয় সংস্করণ।
১৭. সময়াচারতন্ত্র (১৯৭), পৃষ্ঠা নং-৩২, চৌখম্বা প্রেস, প্রথম সংস্করণ।
১৮. সময়াচারতন্ত্র (২০২), পৃষ্ঠা নং-৩২, চৌখম্বা প্রেস, প্রথম সংস্করণ।
১৯. বায়ুপুরাণ (৪/১০)
২০. ভাগবত পুরাণ, (১২ স্কন্দ, ৭.৯-১০)
২১. ছান্দ্যোগ্যোপনিষদ (৭/১/২), পৃষ্ঠা নং-৭১৩, গীতা প্রেস, তৃতীয় সংস্করণ।
২২. গোপথ ব্রাহ্মণ (১/১০), পৃষ্ঠা নং- ৮, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, প্রথম সংস্করণ।
২৩. কালিকাপুরাণ (৫৫/৫), পৃষ্ঠা নং-৫১৭, নবভারত পাবলিশার্স।
২৪. কালিকাপুরাণ (৫৫/৩-৪), পৃষ্ঠা নং-৫১৭, নবভারত পাবলিশার্স।
২৫. 'উপদেষ্ট বধে হন্তা কর্তা ধর্তা চ বিক্রয়ী। উৎসর্গ কর্তা জীবানাং সর্বেষাং নরকং ভবেৎ।' (পদ্মপুরাণ)।
২৬. কালিকাপুরাণ (৬৭/১৮৮), নবভারত পাবলিশার্স।
২৭. কালিকাপুরাণ (৬৭/১৬৪,১৬৫), নবভারত পাবলিশার্স।

২৮. কালিকাপুরাণ (৬৭/২০৮), নবভারত পাবলিশার্স।

গ্রন্থপঞ্জি:

- আগমবাগীশ, কৃষ্ণানন্দ। *বৃহৎ তন্ত্রসার* (প্রথম খণ্ড)। সম্পা. মীনা শ্রীবাস্তব এবং শিখা রায়। বারানসী: প্রাচ্য প্রকাশন, ২০০৭।
- *কালিকাপুরাণম্*। সম্পা. শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।
- *কুমারীতন্ত্রম্।* সম্পা. জ্যোতির্লাল দাস। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।
- *কুলার্ণবতন্ত্র*। সম্পা. উপেন্দ্র কুমার দাস। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার। *বৈদিক যজ্ঞ।* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১১।
- চৌধুরী, আশুতোষ। *তন্ত্ররশ্মি।* মেঘালয়: যোগমায়া আশ্রম, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।
- তর্কালংকার, জগন্মোহন। *তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি ও রহস্য পূজা পদ্ধতি।* কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, প্রকাশ কাল জানা যায় নি।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি। *বাঙলার তন্ত্র।* কলকাতা: ভাষা ভেণ্ডার প্রা: লি:, দ্বিতীয় সংস্করণ, (প্রথম প্রকাশ-২০২২), ২০২৩।
- ভট্টাচার্য, সুখময়। *তন্ত্রপরিচয়*। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪।
- Chakravarti, Chintaharan. *Tantras studies on their religion and literature.* Calcutta (now Kolkata): Punthi Pustak, 1963 1st edition.
- Tripathi, Mrityunjaya*. Samayācāratantram.* Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy, 2005. (Krishnadas Sanskrit Series 196).

বাংলার কবিতায় রাজনীতি : ওপার বাংলার আটের দশক

রিয়া ঢোল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
নিউ আলিপুর কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে গণ অভ্যুত্থান তাঁর মৃত্যু ঘটলে বাংলাদেশের রাজনীতি গভীরতর খাদে গিয়ে পড়ে। ১৯৮২-র ২৪ শে মার্চ জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন, সেনাপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন হুসেইন মহম্মদ এরশাদ। স্বেচ্ছাচার; সন্ত্রাস, দমন-পীড়নে দেশ ও রাজনীতি বিপজ্জনক অন্ধকারে গ্রাসিত হতে থাকে। বেহাল অর্থনীতি; চূড়ান্ত দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে নাভিশ্বাস ওঠে আমজনতার। সংবিধান বিপর্যস্ত, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ঢেকে যায় গোড়া ধর্মীয় মৌলবাদে। মূলধারার রাজনীতি (Mainstream politics) হয়ে ওঠে পীড়নের নামান্তর। নতুন শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থমকে দাঁড়ায় সেই সময়। প্রতিবাদ পুঞ্জিভূত রূপ নিতে থাকে গণ অভ্যুত্থানের। যার কাছে পরাজিত হতে হয় সামরিক সরকারকে। এই ভয়াল বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আটের কবিরা কলম ধরেছেন। এই প্রবন্ধে তারই দিকগুলি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: বাংলাদেশ, আটের দশক, মূলধারার রাজনীতি, স্বেচ্ছাচার, সন্ত্রাস, দমন-পীড়ন, ধর্মীয় মৌলবাদ।

মূল আলোচনা:

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ষাটের গণ অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আলো ও উত্তাপের মধ্যে বড়ো হয়েছেন আটের দশকের কবিরা। কিন্তু তারা (যাদের জন্ম পঞ্চাশের শেষ থেকে ষাটের মধ্যভাগ) যখন কবিতাকে প্রকাশমাধ্যম করেছেন, তখন উপরিতলের বাস্তব হয়ে উঠেছে নৈরাশ্য ও স্বপ্নভঙ্গের বাস্তব। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে গণ অভ্যুত্থান তাঁর মৃত্যু ঘটলে বাংলাদেশের রাজনীতি গভীরতর খাদে গিয়ে পড়ে। ১৯৮২-র ২৪ শে মার্চ জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন, সেনাপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন হুসেইন মহম্মদ এরশাদ। স্বেচ্ছাচার; সন্ত্রাস, দমন-পীড়নে দেশ ও রাজনীতি বিপজ্জনক অন্ধকারে গ্রাসিত হতে থাকে। বেহাল অর্থনীতি; চূড়ান্ত দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে নাভিশ্বাস ওঠে আমজনতার। সংবিধান বিপর্যস্ত, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ঢেকে যায় গোড়া ধর্মীয় মৌলবাদে। মূলধারার রাজনীতি (Mainstream politics) হয়ে ওঠে পীড়নের নামান্তর। ১৯৮২-র ২৩ শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী যে নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন, সেখানে অন্যতম বিষয় ছিল উচ্চশিক্ষার সংকোচন, ছাত্রদের বেতনবৃদ্ধি এবং প্রথম শ্রেণি থেকে আরবি ও দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। ১৯৮৩ সালের ১২ই এপ্রিল 'সাপ্তাহিক খবর' এবং 'সোনার বাংলাকে' নিষিদ্ধ করা হয়। লাঠি-গুলি-গ্যাসে শ্বাসরোধ হয়ে ওঠে জাতির। পাল্টা প্রতিবাদে মুখর হয় বাংলাদেশ। ছাত্র-ধর্মঘট-হরতালে স্তব্ধ হয়ে ওঠে দেশ। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত চলা সামরিক শাসনে অতিষ্ট হয়ে ওঠা আমজনতা পরিত্রাণ খুঁজতে থাকে। পুঁজিতন্ত্রের দাপটে গ্রাসিত

হয় অর্থনীতি। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক মেরুকরণ প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে ওঠে। মাথা পিছু আয় কমতে থাকে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থমকে দাঁড়ায়। তারই ফলে "১৮৯২ থেকে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশে বেকার সংখ্যা প্রায় দু'কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল"[১] সমানতালে চলতে থাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং সমস্ত আগ্রাসন ও ব্যাভিচারি শাসনের মধ্যে প্রতিবাদ পুঞ্জিভূত রূপ নিতে থাকে গণ অভ্যুত্থানের। যার কাছে পরাজিত হতে হয় সামরিক সরকারকে। এই ভয়াল বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আটের কবিরা বাহান্ন প্রভাবিত কবিতার হেজিমনির থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। উচ্চস্বর কবিতার ঐতিহ্যকে বর্জন করেছেন। আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে আত্মের যে দ্বন্দ্ব তাকেও নিয়ে আসতে কসুর করেননি।

মূলধারার রাজনীতিকে নিজস্ব মুদ্রায় তারা আক্রমণ করেছেন, দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন শিল্পের মুদ্রায়, আশা ও হতাশাকে কবিতার ভাষা দিতে দ্বিধা করেননি।

দেশ যখন স্বপ্নহীন, শহর যখন মৃত নগরীতে পরিণত, গ্রাম যেখানে বিষাদময়, তখন এই বিষয়গুলিকে কবিতার ফ্রেমে বেঁধেছেন আটের দশকের কবিরা—

"দুপুরের সাইরেন বেজে বেজে ডেকে আনে অন্তর্জ্বালা
একদিন এই মাঠ গুল্ম-লতা-ঝোপ-ঝাড় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত
অস্তিত্বের মর্মমূলে আজ দেখ বিষাদ বিমূর্ত
সবুজ প্রান্তর নেই, উঠাও অনন্ত মেঘমালা"[২]

অপমান ও শোষণজর্জরিত মাটিতে দাঁড়িয়ে মজিদ মাহমুদের মতো কবিরা স্মরণ করেছেন বাংলাদেশের পূর্ব ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নে ভিত্তিতে যে দেশ গঠিত হয়েছিল, আজ তা স্বপ্নহীন শ্মশানে পরিণত শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাটুকু ছাড়া জনতার প্রাপ্তির ঝুলিতে ঢুকেছিল হতাশা আর শূন্যতা—

"বছর বিশেষ আগে যে মাটি আমাকে ধরেছিল প্রথম
একাত্তরের হানাদার আগুন তার চিহ্ন রাখেনি, এমন
ছাপান্ন হাজার মাইলের সীমাবদ্ধতায় কেটে যায় দিন
স্বৈরাচার ধরে আছে কান, তবু জাগে না আমার মরশুম"[৩]

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়ালতা সিটিস্কেপে ধরা দিয়েছে আটের কবিতা ক্যানভাসে। লোকালয়ের ধীরে ধীরে নেমে আসা নিভন্ত আলো, সেই সঙ্গে দুপুরের ঝাঁঝমাখা পরিবেশে নেমে আসা রাত্রির কালো অন্ধকার। সময়ের মার খেতে খেতে কবি যেন হয়ে ওঠেন সর্বহারা উদ্বাস্তু তাঁর চোখে একদিকে ভেসে ওঠে রোগা বিবর্ণ সন্তানের মুখ, অন্যদিকে পাকা ফসলের ক্ষেত জ্বলজ্বল করে ওঠে জলের চিতায়। সময় যেন উল্টো পথে হেঁটে চলেছে সমস্ত জাতি জরাগ্রস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে এসে খাদের কিনারে এই অবক্ষয়ের মুখোমুখি কবির প্রশ্ন—

'হে আমার তিরিশ বয়সী যুবা
রক্তাক্ত স্বদেশ
তোমাকে টেনে হিঁচড়ে মর্গের দিকে
নিয়ে যাচ্ছে কারা?"[৪]

এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের আগ্রাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমগ্র দেশের মানুষ অস্থির। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি চাপিয়ে দেওয়া ক্ষমতা থেকে কবলমুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলনমুখর। জীবন ও মৃত্যুর সংঘাতের ক্ষত রচনা করেছে আটের কবিতার আগ্নেয় ফ্রেম—

"এখানে রক্ত, রক্ত রক্তের দিঘি

কেউ চেনো কি, চেনে কেউ যারা মৃত? কেউ চেনো
চেনে কেউ, চেনো কি, কেউ চেনে?"[৫]

শুধু বিষ্ণু বিশ্বাস নয়, আটের দশকের অন্যান্য কবির কবিতাতেও এই সামরিক শাসনের স্বৈরাচারী রূপ ও মৃতপ্রায় দেশের ন্যারেটিভ স্ব স্ব মুদ্রায় ভাষা-মুখর-

১. সত্যলোভী মতো শৃগাল সন্ত
গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে জাগায় করোটি
ধূসর জীবনের করুণ ক্লিষ্ট
প্রত্নজীবনের চিহ্ন অবশেষ
জিভের লালারস জিভে নিঃশ্বেস"[৬]

২. "রক্তখেকো দানব আসে নগর পথে
ফুলের ঘ্রাণ আর আসে না আমার ঘরে
উদোম ঘরে একলা থাকি স্বপ্নবিহীন"[৭]

৩. "অতঃপর এই লাশ কাঁধে গোরস্থানের পথে হাঁটলাম
কবরে নামালাম তাকে এবং শেষবার দেখলাম
নিরীহ ফ্যাকাশে মুখখানি,
দাফক সম্পন্ন করে, আমি ট্রেনে উঠি
দৈনিক পত্রিকা নিই
ক্রীড়া ও সাহিত্য পাতা পড়তে পড়তে
ঘরে ঘিরে আসি"[৮]

তার মধ্যেই ইতিহাসের যাবতীয় স্বপ্ন, বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের আহ্বান— বিস্মৃত থেকে উগড়ে এসেছে আটের দশকের কবিতায়—

"সাতই মার্চের জনসভা মানে জাতির জাতীয় জনসভা
দেশের সমস্ত মানুষের ঐক্য
সংকটের চরম মুহূর্তে স্থির অবিচল থাকা
এক কণ্ঠ থেকে সব কণ্ঠে অনুরণিত হওয়া
এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"[৯]

জিয়াউর থেকে এরশাদ, স্বৈরাচারী শাসন আটেক দশক জুড়ে কালের অনাচার যখন প্রতিমুহূর্তে তীব্রতর হচ্ছে তখন একদিকে যেমন প্রতিবাদে মুখর হয়েছে ছাত্র-জনতা, তেমনি একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী কবি সাংবাদিকেরা আত্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার লোভে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আত্মবিক্রয়ে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। আত্মবিক্রয়ের এই নিলর্জ্জতাকে আটের কবিরা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে তচনচ করতে চেয়েছেন তীব্র শ্লেষে—

"এইখানে সুলভ মূল্যে
শস্যবীজ শস্য আত্মা, দেহ কাঠামো বিক্রয় হয়।
রৌদ্রবৃষ্টি বারান্দা হেঁটে হেঁটে কিষানের বেলা
হাটখোলা তেমাথায় গিয়ে ভিড় করে"[১০]

নিজের অজান্তেই আত্মবিক্রয় করতে গিয়ে এরা যেন সমাজের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেয়। এবং তা মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় "আত্মদর্পণের সামনে"।

শ্লেষ কখনও রূপান্তরিত হয় অন্তর্গূঢ় ঠাট্টায়—

"ক্রমে শবযাত্রা দীর্ঘতর হতে লাগল। তোমার লম্পট কবিতা
আর সংস্কৃতির ধাড়ি শকুন হাফ আমরা। মোল্লা ধরিবাজ
গলায় ক্রুশ এ যুগের—
সকলেই যোগ দিল সে যাত্রার : ঈশ্বর প্রশান্তি উঠলো গলায় গলায়
ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করতে লাগলো সবাই"[১১]

শুধু সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের ছায়াছবিই নয়, আটের কবিরা নির্দিষ্ট কালখণ্ডকেও কবিতায় এনেছেন। প্যালেস্টাইন সংহতি দিবসে সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে প্রথম প্রতিবাদী মিছিল করে ছাত্রসমাজ ১৯৮২ সালের জুন মাসে। ওই বছর ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে ছাত্ররা মিছিল করলে তাদের উপর সাংঘাতিক হামলা চালায় সেনাবাহিনীর একটি অংশ। কারাগারে আটকে রাখা হয় অসংখ্য ছাত্রকে। ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তীব্রতর হয়। এই সমস্তই ইতিহাসের ধারক হয়ে উঠে এসেছে একাধিক কবির কবিতায়। আটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিল বাউফুন বসুনিয়া। ১৯৮৩ সালের ১১ই জানুয়ারি এক বিরাট ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছিল শিক্ষাভরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে। এই মিছিলে অন্যতম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বসুনিয়া। এমনকি ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছাত্রবন্দিদের মুক্তির দাবি নিয়ে ছাত্রদের সচিবালয় ঘেরাও, সেই সঙ্গে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে ট্রাক তোলার দিন সবক্ষেত্রেই বসুনিয়া ছিল আন্দোলনের অগ্রভাগে। ১৯৮৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা দিবস পালনের জন্য সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাতে সূর্য সেন হলে মিছিল রত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হয় ছাত্রনেতা বসুনিয়া। যে এরশাদ নিজেকে 'কবি' অভিধায় চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, সেই তিনিই বেয়নেটের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন ছাত্রসমাজকে। জর্জরিত করেছেন স্বৈরাচারির এই অসম দ্বিচারিতাকে—

"কবিতা লিখেছেন স্বৈর সরকার, আমরনা, রাজাকার, সমরবিদ
কবিতা লিখেছেন জাতীয় তস্কর, ঠক ও জোচ্চর, ফেরেব্বাজ"[১২]

স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের জাঁতাকলে গোটা আটের দশক জুড়ে জনগণের চাওয়া পাওয়া উপেক্ষিত হয়েছে, তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশও সমান্তরালভাবে ব্যাহত হয়েছে। কবিতায় সামরিক শাসকের স্বৈরাচারী প্রতিমূর্তিটি প্রকাশিত হয়েছে কবির ঘৃণা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণায়—

"নষ্ট দ্রাঘিমায় এসে গেছি হে দেবদূত
অস্তিতে মজ্জায় হিম জমে আছে অজস্র কর্দম
কী করতে কী করে ফেলি বুঝি না পূর্বাপর
কেঁচো খুঁড়ে কী করে ফেলি অজগর"[১৩]

সামরিক শাসন বিরোধী প্রাণ আন্দোলনের উত্তাপ নানাভাবে জারিত করেছে আটের দশকের কবি ও কবিতাকে—

"তোমার কলঙ্ক এমন দিনের আলোর মতো প্রকাশিত
সেনাপতি তোমার উলঙ্গ দেহটাকে
এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে
বাংলাদেশ তোমাকে দেখে নেবে"[১৪]

১৯৮৭ সালে কবি শামসের রাহমানের আহ্বানে জন্ম হয় "জাতীয় কবিতা পরিষদের"। কবিরাও যুক্ত হন এর সঙ্গে। প্রগতিশীল কবি সমাজ যেদিন একত্রিত হয়েছিল স্বৈরাচারের নাগপাশ থেকে একটি মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক স্বদেশের জন্য সময়ের হিসেব তখন তারা রাখেননি। সেই দুঃসহ সময়ের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কবির সচেতন ভাবনা থেকে জন্ম হয়েছিল এমন কবিতার। নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজব্যবস্থায় তখন সত্যও প্রহসনে ভরপুর—

"আমি সত্যের মুখটি পেয়ে গেলাম
পুতিগন্ধমাখা সত্যের মুখটি এমন গণিকালয়ের দিকে ফেরানো"[১৫]

পর পর ঘটে চলা ছাত্র আন্দোলন, তাদের উপর সামরিক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, তাদের মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ, বুক কেঁপে ওঠা স্লোগান দেশকে অন্ধকারমুক্ত করতে তাদের একাগ্রতা বিস্তারিত হয়েছিল যেমন পৃথিবীর হৃদয়ে তেমনই কবির কবিতায়। কবি বারবার এমন যৌবনের বন্দনায় ভরিয়ে তোলেন কবিতা—

"বয়সের কচি ডালে পাখি বসে খায়
হুস হুস শব্দে কে তারে তাড়ায়
জ্বল জ্বলে রোদ পুড়ে যায় তৃণভূমির মুখ
তৃষিত আস গাছ মাথা দুলিয়ে
লেই রোদের বন্দনা গায়,
তার বুক ছায়াময়, তার বুক রোদ থেকে খুব দূরে,
কেশর ফুলিয়েছে যৌবন
এবার যৌবনের পালা
শঙ্খ বাজাও, বলো
জয়ধ্বনি তোমাকে জয়তু যৌবন"[১৬]

দৃঢ় হয়ে উঠেছে শোষণ ও শোষণের বিপ্রতীপে দাঁড়ানো বাইনারি চিত্র—

"একটি ফুলের পরিবর্তে
একটি বুলেট
একটি চুম্বকের পরিবর্তে
একটি ছোবল
একটি প্রণয়ের পরিবর্তে
একটি হিংস্রতা
কেবলই পরিণাম, কেবলই নিয়তি"[১৭]

জনগণের আন্দোলন আরও সংঘবদ্ধ রূপ ধারণ করে। সেই সঙ্গে তা গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয় ১৯৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। বাংলাদেশ সচিবালয় সহ সমস্ত সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মী, আধা-সরকারী কর্মী একত্রিত হয়ে ওইদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন। ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেড় দশকের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ডিসেম্বর মাসের এই গণ অভ্যুত্থানের উদ্দীপনা ধরা পড়েছে আব্দুল হাই শিকদারের কবিতায়—

"সর্প স্কন্দ, জোহাক সিপন্দ পাহাড়ের শয়তান
লবন-স্পর্শ পেয়ে গত হলো রক্তচোষা জোঁক
ডিসেম্বর'৯০ আজ আশ্চর্য এক নাম"[১৮]

আটের দশকের বাংলা কবিতা কখনও রাজনীতি বিমুখ হয়ে থাকেনি। আমরা দেখিয়েছি মূল ধারার রাজনীতিকে (Main stream politics) কবিতায় এনেছেন আটের কবিরা পূর্বসুরীদের শিল্প কাঠামোকে অগ্রাহ্য করা নিজস্ব ভাষা ও শৈলীতে। তবে এটি আংশিক সত্য। বলা ভালো আটের দশকের তরুণ কবিরা এরই পাশাপাশি অর্ন্তচেতনার রাজনীতিতেও নিমগ্ন থেকেছেন গাঢ়ভাবে। একধরণের বিষাদ ও শূন্যতা, যা শুধু বাংলাদেশের রাজনীতি উদ্ভুতই নয়, বৈশ্বিক রাজনীতি জাতও। আটের কবিরাই প্রথম নাগরিকতায়, ব্যক্তিগত সংবেদনে নিয়ে গেছেন মগ্ন চৈতন্যের গভীরে। কবি রণজিৎ দাশ লিখেছেন— "এই সময়ের তরুণদের কবিতা সচেতনভাবে অগ্রজদের কাব্যধারা থেকে একটি মস্তবড় বাঁক নিয়ে, লোকচেতনার পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে প্রবেশ করল অস্থির, নাগরিক ব্যক্তিচেতনার জগতে। তাঁদের কবিতার বিষয়ে এল বিষাদ ও বিপন্নতা, এবং আঙ্গিকে এল ভাষার বিপর্যাস ও বিমূর্ততা"[১৯] সেই আন্তর রাজনীতি ছড়িয়ে আছে আটের দশকের কবিতার বড়ো অংশ জুড়ে। আর যেখানে শিকারির ফাঁদ থেকে কবি যেতে চান বিষাদের অন্তপুরে এবং সেখানে "কান্নার ভেতর থেকে একটি লোমশ কুকুর গলা বাড়ায়/এবং বিশাল জিভ দিয়ে চেটে নেয় রাত্রির কুয়াশা"[২০]। সময় যখন গো-ক্ষুরের মতো বিভাজিত তখন "রাতে বেড়াতে আসে বেদনা শান্তির ছোট বোন/শান্তির কাছ থেকে সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ বুঝে নিতে।[২১] উপরিতলের বাস্তবতা থেকে আশির কবিতা মগ্ন চৈতন্যে এসে নির্মাণ করতে থাকে অন্তর্লোকের রাজনীতি সংকেতে, সুররিয়াল প্রকাশভঙ্গিতে; প্রত্যক্ষ বাস্তবের অর্থকে অতিক্রম করে এভাবেই—

"সবুজ প্রিজমে আমি চোখ রেখে সব কিছু দেখি
দর্জিদের অনুপস্থিতির এই দীর্ঘ অবসরে
আতশ কাচের গুঁড়ো জড়ো করে চুপে
ঢেকে রাখি কাঁকফুক, দর্জিঘর, ঘাড় ও জানালা"[২২]

এবং সেখানে কাল মিশ্রিত হয় কালান্তরে, লোকায়ত পরিণত হয় লোকাতীতের রাজনীতিতে। বাংলাদেশের কবিতার মাইলস্টোন সেই রাজনীতি।

তথ্যসূত্র :

১. ব্যাপারী প্রতাপ,বইমেলা ২০২১, 'কবিতায় রাজনৈতিক অভিঘাত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ১৯৪৭-২০০০',ঢাকা, বেহুলা বাংলা, পৃ-৩২১
২. ইসলাম মারুফুল, 'বিপ্রতীপ', ফেব্রুয়ারি ২০১০ 'নির্বাচিত কবিতা', ঢাকা, অ্যাডন পাবলিশার্স, পৃ-২৬
৩. মজিদ মাহমুদ, ফেব্রুয়ারী ২০১০, মাহফুজ মঙ্গল, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঢাকা, আদর্শ, পৃ-২২।
৪. সুজাদ তারিফ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, "সময়কে আমি উল্টো পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছি, কবিতা সংগ্রহ, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন লিমিটেড, পৃ-৫৫
৫. বিশ্বাস বিষ্ণু, ফেব্রুয়ারী ২০১০, 'ভোরের মন্দির', শাহরিয়ার শরীফ (সম্পা), আশির দশকের কবি ও কবিতা,টাঙ্গাইল,নিমকাল প্রকাশনা, পৃ-২৪৭
৬. শাদার শোয়েব, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, 'শবগাড়ি', 'অশেষ প্রস্তর যুগ', কবিতা সংগ্রহ, ঢাকা, উলুখড়, পৃ-১৫
৭. সুলতানা সুহিতা, একুশের গ্রন্থমেলা-২০০২, করতলে অবিশ্বাস, 'দুঃসহ শুদ্ধতা', কবিতা সংগ্রহ-১, ঢাকা, নবরাগ প্রকাশনা, পৃ-২৩
৮. সাদিক মোহাম্মদ, জুলাই ২০১০, 'জন্মান্তর', শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঢাকা,অন্য প্রকাশ, পৃ-৩৩
৯. পিনু গোলাম কিবরিয়া,অক্টোবর ১৯৮৪, জাতির জাতীয় জনসভা, এখন সাইরেন বাজানোর সময়, ঢাকা, পাণ্ডুলিপি, পৃ-৩৪।

১০. মাহমুদ শিমুল,একুশে বইমেলা ২০১৬, 'পাট রচনা', মস্তিষ্ক দিনরাত্রি, সপ্তহস্ত সমুদ্র সংলাপ,ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, পৃ-২৭১।
১১. হোসেন খন্দকার আশরফ, একুশে বইমেলা ২০১১,'এলিয়েন', তিন রমণীর ক্যাসিদা, কবিতা সংগ্রহ,ঢাকা, শিখা প্রকাশনা, পৃ-৩৬।
১২. রায়হান মারুফ, ফেব্রুয়ারী ২০০২, 'আশির দশক-স্বপ্নভঙ্গের চারুফর্ম, শত কবিতা সতত কবিতা, ঢাকা,আগামী প্রকাশনা, পৃ-১৪।
১৩. শাদাব শোয়েব, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, স্বগতোক্তি, অশেষ প্রস্তরযুগ, কবিতা সংগ্রহ, ঢাকা, উলুখড়, পৃ-১১।
১৪. নাহার ফিরদৌস,এপ্রিল ১৯৮৮, বাংলাদেশ রেগে গেছে, উলঙ্গ সেনাপতি, অক্টোপাস প্রেমঢাকা, সত্তরোজ সাহিত্য সংসদ, পৃ-২০।
১৫. নাহার ফিরদৌস,ঐ, 'মানুষের পাঁচটি মুখ', ঐ, পৃ-২৬
১৬. নাহার ফিরদৌস,ঐ, 'একমাত্র আমার বসন্ত', ঐ, পৃ-১১
১৭. নাহার ফিরদৌস, ঐ, 'রক্তের অবশিষ্ট রোগ', ঐ, পৃ-১৩
১৮. শিকদার আব্দুল হাই, ফেব্রুয়ারী ২০০৬,'ডিসেম্বর ৯০, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঢাকা, নব প্রকাশ, পৃ-৫৫
১৯. দাশ রণজিৎ ও শরিফ সাজ্জাদ (সম্পা), ২০২০, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশনা, পৃ-১৬
২০. হোসেন খন্দকার আশরফ, ফেব্রুয়ারি-১৯৯১, 'নকটার্ণ গুচ্ছ', 'সৈয়দ তারিফ সম্পাদিত, 'অনিরুদ্ধ আশি-এক দশকের কবিতা', ঢাকা, একবিংশ প্রকাশন, পৃ-১৮
২১. স্ট্যালিন রেজাউদ্দিন, ঐ, 'শেষ দৃশ্য', ঐ, পৃ-৩০
২২. মাজহার জুয়েল, ফেব্রুয়ারী ২০১৯, 'দর্জিঘরে এক রাত', ঢাকা,বেহুলাবাংলা, পৃ – ২।

জলবায়ু পরিবর্তন ও ইকো-রিফিউজি : একটি পর্যালোচনা

সুশান্ত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে বৈশ্বিক এক চ্যালেঞ্জ। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব প্রতিনিয়ত মানব সমাজে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘটছে তাপমাত্রার উষ্ণায়ন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মরুভূমি প্রসার, বৃষ্টিপাতের ধরন বদল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই প্রভাবের ফলে অনেক মানুষ তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। তাদেরই বলা হয় 'পরিবেশ উদ্বাস্তু'।

'পরিবেশ উদ্বাস্তু' কারা? 'পরিবেশ উদ্বাস্তু' বলতে তাদের বোঝানো হয়, যারা জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশগত সংকটের কারণে তাদের বসতবাড়ি বা জীবিকা হারিয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হন। উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ভারতবর্ষের উপকূলীয় এলাকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিবছর বসতভিটা হারাচ্ছে। আবার মরুভূমির প্রসারণের ফলে আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের অনেক মানুষ তাদের গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্য দেশে চলে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ উদ্বাস্তু সমস্যা কেবল কোনো একটি দেশের নয়, এটি বৈশ্বিক সমস্যা। তাই এর সমাধানও বৈশ্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার।

সূচক শব্দ: জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বউষ্ণায়ন, উদ্বাস্তু, বিপন্ন বসুধা, বিপন্ন মানুষ, কথাসাহিত্য।

মূল আলোচনা:

"শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ!
কেন ক্লান্ত হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে!
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।"[১]

প্রকৃতির বুকে মানুষের সৃষ্টি এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই মানুষের বিকাশ। প্রকৃতিই প্রতি মুহূর্তে তার জল, আলো, বাতাস, আহার দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের প্রকৃতির প্রতি ছিল বিস্ময়পূর্ণ ভক্তিবোধ। আজও বহু সম্প্রদায়ের মানুষ

প্রকৃতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। কিন্তু এসবের পাশাপাশি একদল মানুষ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ছুটল প্রকৃতিকে জয় করে শৃঙ্খলিত করতে। ফলে প্রকৃতি নিধনের জন্য সৃষ্টি হল বিশ্ব উষ্ণায়ন। এই বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে জমাট বাঁধা বরফ গলে সমুদ্র মহাসমুদ্রগুলোর জলস্ফীত হয়ে বিশ্বের শতকোটি মানুষের জীবন, জীববৈচিত্র্য, প্রাণিকুল, বন-বনানীর অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। মানুষকে বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন বটে, তবে মানুষ নির্বুদ্ধিতা এবং স্বার্থান্বেষিতার কারণে বনাঞ্চল নিধন এবং নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে অসংখ্য শিল্প গড়া, এসব বেহিসাবি কাজ মানুষ করে চলেছে। সে কারণে বিশ্ব উষ্ণ হয়ে জমাট হয়ে থাকা বরফ গলতে থাকার ফলে সব সাগর মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সেই ভবিষ্যৎ খুব দূরে নয়, যখন সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান বহু দ্বীপদেশসহ অনেক অপেক্ষাকৃত নিচু জনপদ সমুদ্রবক্ষে বিলীন হয়ে যাওয়া অবধারিত হয়ে উঠেছে। এরই পাশাপাশি ঝড়, খরা, বন্যা, নদীভাঙ্গন ভায়াবহ চেয়ারা নিয়ে থাবা দিতে লাগল মানুষের উপর। ফলে মানুষ নিরুপায় হয়ে ছুটতে লাগল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গ্রাম থেকে শহরে, কিম্বা দেশ থেকে দেশান্তরে। সৃষ্টি হল মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা ‘পরিবেশ উদ্বাস্তু’। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে সেই সংখ্যা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিগত কয়েক দশক ধরে ‘জলবায়ু শরণার্থী’ (refugee) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলেও ইদানীং বিষয়টি বৈশ্বিক উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বিশেষ করে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন ও সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। ধনী, দরিদ্র সকল দেশেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দৃশ্যমান হলেও দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। যার ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী নিজের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে অন্যত্র অভিবাসনে বাধ্য হচ্ছেন। এই অভিবাসন নিজের দেশ কিংবা দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে গমন করার ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানান্তরের বিষয়টি চিহ্নিত করতে গিয়ে Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)-এর প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (১৯৯০) বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বব্যাপী যে সকল নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে তার মধ্যে একক ভাবে এবং সর্ববৃহৎ প্রভাব হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী নতুন করে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সৃষ্টি বা ‘Human Migration’।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্বাস্তুদের নামকরণ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ‘climate change refugee’, ‘Environmental refugee’, ‘Human Migration’, ‘Environmentally displaced person (EDP)’, ‘Disaster refugee’, ‘Ecologically displaced person’, ‘Environmental-refugee-to-be (ERTB)’, ‘Eco-refugee’, ইত্যাদি নামে পরিবেশ-উদ্বাস্তুদের অভিহিত করা হয়। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অন্যান্য আর্থসামাজিক বিষয়গুলিকে সমান গুরুত্ব মনে করে এর প্রবক্তারা ‘climate refugee’ কিংবা ‘Environmental Migration’ ইত্যাদি নামকরণ অস্বীকার করেন। তবে ১৯৭৬ সালে ‘Environmental refugees’ বা ‘পরিবেশ উদ্বাস্তু’ শব্দবন্ধনটি পরিবেশ পরিযায়ীদের সম্পর্কে প্রথম ব্যবহার করেন ওয়ার্ল্ডওয়াচ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিবেশবিদ লেস্টার ব্রাউন। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের জন্য সংস্থা (IOM) পরিবেশগত অভিবাসীদের জন্য নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি প্রস্তাব করেছে—

> পরিবেশগত অভিবাসী হল সেই ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তির দলসমূহ, যারা পরিবেশের আকস্মিক বা ক্রমপরিবর্তনের কারণে, যে-পরিবর্তনসমূহ তাদের জীবন বা জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নিজেদের অভ্যাসগত আবাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, অথবা স্বেচ্ছায় এপথ বেছে নেয়, এবং যারা দেশের ভেতরে অন্যত্র কিংবা বিদেশে চলে যায়।[২]

'United Nations Environment Programme report'-এ Environmental refugees সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> Environmental refugees are defined as those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life. By 'environmental disruption' in this definition is meant any physical, chemical and/or biological changes in the ecosystem (or the resource base) that render it, temporarily or permanently, unsuitable to support human life.[৩]

অভিবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা (IOM) তিন ধরনের জলবায়ু শরণার্থী এর প্রস্তাব দিয়েছে[৪]—

- Environmental emergency migrants: পরিবেশ বিপর্যয় বা আকস্মিক পরিবেশের কারণে সাময়িকভাবে অভিবাসন করেন এমন মানুষেরা। উদাহরণ : আয়লা, আমফান, সুনামি, ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে কেউ চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।
- Environmental forced migrants: পরিবেশের অবনতিজনিত কারণে জনগণকে চলে যেতে হবে। উদাহরণ: কেউবা পরিবেশের ধীরে ধীরে অবনতি যেমন বনভূমি, উপকূলীয় অবনতি ইত্যাদির কারণে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।
- Environmental motivated migrants: পরিবেশগত অনুপ্রাণিত অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসাবেও পরিচিত সম্ভাব্য ভবিষ্যতের সমস্যা এড়াতে যে লোকেরা চলে যেতে বেছে নিয়েছেন। উদাহরণ: মরুকরণের কারণে ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারণে ছেড়ে যাওয়া কেউ।

২০১৭ সালের হিসাবে, আন্তর্জাতিক আইনে জলবায়ু শরণার্থীর কোনও মানক সংজ্ঞা ছিল না। তবে, ইউএন ডিসপ্যাচের একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে "জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উত্থিত লোকেরা বিশ্বজুড়ে রয়েছে"। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন যে শরণার্থীদের বিষয়ে জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের সম্মেলনে পুনর্লিখনের অসুবিধার কারণে এই শরণার্থীদের "জলবায়ু শরণার্থী" হিসাবে বিবেচনা করা ভাল। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি রায় দিয়েছে যে "জলবায়ু সঙ্কটের প্রভাবে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের তাদের দত্তক দেশগুলি দেশে ফিরতে বাধ্য করা যাবে না।" আমাদের এই প্রবন্ধে "ইকো-রিফিউজি" বা "জলবায়ু শরণার্থী" বলতে কেবল মানুষকে বোঝায়নি। মানুষের পাশাপাশি সব রকমের জীব-জন্তুর, কীটপতঙ্গকেও ধরা হয়েছে। কারণ তাদেও বিনাশ মানে মানুষেরই ক্ষতি।

পরিবেশ-উদ্বাস্তুর পরিণাম হল জলবায়ু পরিবর্তন, জলীয় উৎপাদনের প্রতিবন্ধীকরণ, জৈববৈচিত্র্যের ক্ষতি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধীকরণ। পরিবেশের উদ্বাস্তু সমাধানের জন্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজন।

"ইকো-রিফিউজি"র সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অন্ততঃ তিনটি দিক থেকে হতে পারে—

১. পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি: প্রাথমিক ধাপ হল পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতিতে মানব প্রভাবের সীমানা নির্ধারণ করা। পরিবেশের সংরক্ষণ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ভাল ব্যবহার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা উচিত।

২. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও নীতি: পরিবেশ সম্পর্কে নীতি এবং ব্যবস্থাপনা গঠন করা প্রয়োজনীয়। এই নীতি পরিবেশের সংরক্ষণ, জৈববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, ও জনগণের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত।

৩. সচেতনতা ও শিক্ষা: পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এবং সামাজিক পরিষেবার মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ও প্রেরিত করা উচিত।

এই মূল পদক্ষেপগুলি সমন্বয়ে পরিবেশ উদ্বাস্তুর সমস্যাগুলির সমাধানে অবদান রাখতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা সাথে সাথে পরিবেশ উদ্বাস্তুর সমস্যাগুলির সঙ্গে লড়াইতে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার—

১. পরিবেশ বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ: সঠিক তথ্য ও পরিবেশ বিবেচনা করা প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বোধগম্য পরিবেশ সমস্যাগুলি শনাক্ত করা এবং যে পদক্ষেপগুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি নির্ধারণ করা যায়।

২. প্রয়োগশীল প্রয়োজনীয় প্রয়োগ: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং এগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োগ করা দরকার।

৩. সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো: পরিবেশ উদ্বাস্তু সমস্যাগুলির সমাধানে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মাধ্যমে এবং শিক্ষা ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ও প্রেরিত করা উচিত।

৪. পরিবেশে বিনিয়োগ: পরিবেশ উদ্বাস্তুর সমস্যাগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় পরিবেশে বিনিয়োগ করা উচিত। প্রয়োজনীয় অর্থ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা দরকার যেন পরিবেশ উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য আবশ্যিক সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৫. পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার: পরিবেশ উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- পরিবেশ বান্ধব যানবাহনের ব্যবহার, নতুনদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা পণ্য বা সার্ভিস প্রদান।

৬. গবেষণা ও উন্নতি: পরিবেশ উদ্বাস্তুর সমস্যাগুলির সমাধানে গবেষণা এবং উন্নতির জন্য নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ এবং তথ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এটি নতুন ও সুযোগপূর্ণ প্রযুক্তি এবং পদ্ধতির আবিষ্কারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা এবং সমাধানে অগ্রগতি পেতে যদি প্রয়োজন হয়, তবে অনুসন্ধান, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি বেশি প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়াও, পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য আরও প্রভাবশালী নীতি এবং ব্যবস্থাপনা অঙ্গীকার করা উচিত। সম্প্রদায়ের সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণের জন্য মানুষের

প্রস্তুতি ও সহানুভুতি বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিবেশ উদ্বাস্তুর সমস্যার সমাধান এবং মানব সমৃদ্ধির পথে একটি অবিশ্বস্ত অগ্রগতি সম্ভব।

২

পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্বসাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস। এই সাহিত্যগুলি 'climate fiction' নামে পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ গুলিতে মানবতা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তার উপর ভিত্তি করে সম্ভব্য ভবিষ্যতের কল্পনা করে রচিত সাহিত্য হল 'climate fiction'। এর গুরুত্ব অধিক। কারণ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সমস্যাগুলি পূরবেই তুলে ধরে। এমনই কিছু নির্বাচিত আখ্যানকে কেন্দ্রে রেখে আমরা পরিবেশ উদ্বাস্তু বিষয়টি দেখতে চাইব। নদী ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে লেখা তিলোত্তমা মজুমদারের (জন্ম ১৯৬৬) 'রাজপাট' (২০০৮) উপন্যাসটি। মা গঙ্গা কখনও কখনও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তখন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এক একটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চতুষ্কোনা গ্রামটি মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেছে গঙ্গার ভাঙ্গনে। সেই সঙ্গে তলিয়ে গেছে মানুষের কত প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি। সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ উদ্বাস্তু। নদী-কেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে লেখা অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'মহানদী' (২০১৫) উপন্যাসটি। ১৯৫৫ খ্রি. ওড়িশার সম্বলপুরে মহানদীর বাঁধ বেঁধে তৈরি করা হয়েছে হীরাকুদ জলভাণ্ডার। বাঁধ দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তার গল্প আছে এখানে। মহানদীর বাঁধ মানুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণী কীটপতঙ্গদেরকেও উদ্বাস্তু করেছে।

সুকান্তি দত্তের 'যুধান কথা' (২০০১) উপন্যাসেও পরিবেশ ভাবনা উঠে এসেছে। পরিবেশ বিপন্ন নিয়ে লেখা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অপারেশন রাজারহাট' (২০১৩)। এই উপন্যাসে লেখক নিউটাউনের উৎসের কথা বলেছেন। রাজারহাটের পনেরো লক্ষ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। পঞ্চান্নটা মৌজার মানুষও শিকড়হীন হয়ে গেছে গাছগুলোর মতো। আমাদের রাজ্যে আর্সেনিক সমস্যা তথা জলদূষণকে কেন্দ্র করে লেখা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৯৪৪) 'জলতিমির' (১৯৯৮) উপন্যাসটি। ভূগর্ভ থেকে অতিরিক্ত জল উত্তোলনের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে জলে আর্সেনিক সমস্যা, সেই চিত্র ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

বিনোদ ঘোষালের 'প্রাণের পরে' (২০১৪) উপন্যাসটির কেন্দ্রে আছে একটি ঝিল। মনার ঝিল। দিল্লি রোডের ধারে একটি বিস্কুট ফ্যাক্ট্রির কয়েক একর জমির মধ্যে এই ঝিল। বাংলাদেশ থেকে আসা বহু মানুষ এই জলাশয়কে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করে। কেউ মাছ ধরে, কেউ পানিফল চাষ করে। সেই ঝিলে পরে বিস্কুট ফ্যাক্টারির মালিকের নজর। ফলে মনার জল তারা কিনে নিয়ে ফ্যাক্টারির যাবতীয় বিষাক্ত স্ক্র্যাপ, রোলিং মিলের স্ক্র্যাপ ফেলা হয়।

> পুলিশ-প্রশাসন সবাই পেটপুরে খেয়ে বসে রয়েছে। আর ডেইলি ফ্যাক্টারির যত বিষাক্ত-দূষিত স্ক্র্যাপ ফেলা হচ্ছে এই জলাভূমির ওপর। এমনকী আমাদের ফ্যাক্টরির পাশে যে রোলিং মিলটা রয়েছে সেখানকারও যাবতীয় স্ক্র্যাপ ফেলা হচ্ছে এর মধ্যে। ফলে যা হওয়ার তা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। কেমিক্যালসের কারণে সমস্ত মাছ মরে ভেসে উঠেছে, ওখানে যেসব পাখি আসত সকালে-বিকেলে সেইসব পাখি আসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছু পাখি সেইসব বিষাক্ত মাছ খেয়ে মরেও গেছে।[৫]

ফলে ঝিল বাঁচানর গুরুত্ব বুঝে একসময় আন্দোলন শুরু হয়।

অমর মিত্র (জন্ম ১৯৫১) 'কৃষ্ণগহবর' (১৯৯৮) উপন্যাসে বায়ু দূষণের সমস্যা তুলে ধরেছেন। কিন্নর রায় (জন্ম ১৯৫৩) তাঁর 'প্রকৃতিপাঠ' (১৯৯০) উপন্যাসে দেখিয়েছেন, কলকাতার আকাশ থেকে "পাখি কমে আসছে, পোকা কমছে, ব্যাঙ কমছে। কীটনাশক, ধোঁয়ায়, অ্যাসিড-বৃষ্টিতে, বহুতল বাড়ি আর শব্দ দূষণে ফিরে যাচ্ছে প্রকৃতি।"[৬]

নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে মানুষ নিজের স্বার্থে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে। এই ড্যাম কত মানুষ কীটপতঙ্গকে উদ্বাস্তু করেছে। জলের তলায় চলে গেছে বহু গ্রাম। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেছে কত প্রাচীন সংস্কৃতি ইতিহাস। এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন অরিন্দম বসু তাঁর 'জলডুবি' গল্পে। বিকাশকান্তি মিদ্যার 'জেনেটিক' গল্পের মূল বিষয় ফ্ল্যাট-সংস্কৃতি। কীভাবে উন্নয়নের জোয়ারে ভেড়ি-পুকুর-চাষের জমি বাস্তু ভিটে হয়ে যাচ্ছে তা দেখিয়েছেন। বিজন কলকাতার একটি ফ্ল্যাটে এসেছে। ফ্ল্যাটের নাম শঙ্খচিল। তাদের ফ্ল্যাটের কাছে একটি পুরনো বাড়ি আছে। সেখানে কাক, চড়ুই, দোয়েল, ফিঙে, বুলবুলি, টুনটুনি আসে। গান গায়। কিন্তু এখানের সব ভেড়ি ভরিয়ে ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়। ফলে শুধু মানুষ নয় সংকটে এখানকার সব পশু পাখিরা। তারাও বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

অভিজিৎ সেনের একটি গল্প 'মাছ'। গল্পে আমরা দেখি বৃষ্টি না হওয়ার জন্য নদীতে জল বাড়েনি। নদী মাছশূণ্য। গল্পের নায়ক গোপাল সাত আট দিনে একটিও মাছ ধরতে পারে নি। বিগত তিন বছর সে কখনও খালি হাতে নদী থেকে ফেরে নি। কিন্তু সময় আর আগের মত নেই, মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে নদীর উপর চাপ। নানা রকমের জাল দিয়ে মানুষ ডিম পোনা শুদ্ধ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। "মাছ বাড়বেই বা কি করে, আর পরের বছর মানুষ ধরবেই বা কি?"[৭]

নদী বাঁধ প্রসঙ্গ এসেছে এই গল্পে। নদী বাঁধ পরিবেশের বিন্যাসকে ভেঙে চুরে দেয়। গোপাল মাছ ধরার জন্য জলের নীচে নামে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

> কয়েক বছর আগে ইটের ব্লক করে তার উপরে মোটা তারের জাল ঢাকা দিয়ে ওপরের বাঁধ তৈরি হয়েছিল। ভাঙনের মুখে সেই ইট জালশুদ্ধ নেমে এসেছে নদীর গহ্বরে। গোপাল সন্তর্পণে সেই তারের সঙ্গে পা আটকে বড়শি ধরা হাতখানা সোজা ঢুকিয়ে দিল সেই গর্তের মুখে।[৮]

নদীকে কেন্দ্র করে যারা জীবিকা নির্বাহ করতো তারা আজ অসহায়। জল দূষণে নদী আক্রান্ত। ফলে মৎসজীবীদের জীবিকা নির্বাহ করাও কঠিন হয়ে উঠেছে। শুধু মাছেরা নয় মানুষও আজ তাই উদ্বাস্তু। তাই "বাজারের সস্তা মাতালের মতো গোপাল যেন হাত তুলে ভগবানকে অভিশাপ দিচ্ছে।"[৯]

অমর মিত্রের গল্প 'নদীভূমি'। দক্ষিণবঙ্গে যেখানে জনপদ গড়ে উঠেছে সেখানে একটি নদী ছিল। কিন্তু সেই নদীর আর কোনো চিহ্ন নেই। অবাক হয়ে যান রাজস্থানের মানুষ, জেলা শাসক। জানা যায় নদীটির নাম পিয়ালী নদী। নদীগর্ভ বুজে যায়, চর জেগে ওঠে। সেখানে বসতি স্থাপন হয়। জলের অভাবে ধানচাষ বন্ধ হয়। মাছ চাষ বন্ধ হয়। একসময় জনতা সোচ্চার হয় সেচের জলের দাবিতে। তাদের পায়ের তলায় মৃত নদী। একটি নয়, অনেক নদী যারা একদা সাগরে প্রবাহিত হতো।

জয়া মিত্রের লেখা 'কাঁকরমাটি' (২০০৮)। গল্পে আমরা দেখি মোরাম ফেলা রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয় তিনটি ট্রাক। কারণ জনতার ঘেরাও-এ পালাতে পারে না। নিমডি সহ

নিকটবর্তী মহুলডাঙা, অকলবাইদ, সুদামডি গ্রামের নারী-পুরুষ সকলেই মোরাম তোলার প্রতিবাদে সামিল হন।

অরিন্দম বসুর 'এই অরণ্যে' গল্পের কেন্দ্রে আছে পরিবেষ উদ্বাস্তুর কথা। অরুণাভ কস্তুরি নতুন ফ্ল্যাট কিনে এসেছে। নরেন্দ্রপুরে সবুজে ঘেরা ফ্ল্যাটটি। নাম 'অরণ্য'। কারণ অরণ্য নিধন করে ফ্ল্যাটটি নির্মিত হয়েছে। প্রোমোটারের কথায় যারা এখানে থাকবে তাদের ভালো লাগবে। কিন্তু অচিরেই সেই ভালোলাগা চলে যায়। পাঁচতলার ফ্ল্যাটে নানান পোকা মাকড়ের উপদ্রব শুরু হয়। "যারা চলে গেছে তারা আর ফিরে আসেনি। নতুন কেউ এসেছে। সেও চলে গেছে। কেউ কিন্তু তোমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। আসলে সবাই তো ওদের জায়গায়, একসময় মানুষ ওদের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল। এখন আমরা সবাই ট্রেসপাসার্স।"[১০] এরা সব পরিবেশ উদ্বাস্তু।

সুকান্তি দত্তের 'লেবুপাতার ঘ্রাণ' (১৯৯৮) গল্পে আমরা দেখি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের রুক্ষ নিরস এক বিশক্ত দিনের গল্প কথা। সত্তর বছরের প্রিয়নাথ তার চোখের সামনে সবকিছু পরিবর্তন হতে দেখেছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৯৪৮) 'চিমনি' (১৯৮৯) গল্পটি পরিবেশ বিপন্নটা নিয়ে লেখা। এই গল্পে 'সুন্দরবন ফসফেট অ্যান্ড কেমিক্যালস' কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে এলাকার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলন, জনমত সংগ্রহ ও প্রতিরোধের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

উত্তম পুরকাইত-এর 'ফড়িঙের যুদ্ধ বিষয়ে কিছু কথা' গল্পে আমরা দেখি ফার্মাল পাওয়ারকে কেন্দ্র করে চারপাশের ভয়ংকর দূষণের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই ফার্মাল পাওয়ারের ছাই ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে। ধুলোয়-ধোঁয়ায় মানুষ পথ হাঁটতে পারে না। গাছের পাতায় ছাইয়ের ঘন আস্তরণ পড়ে গেছে। "থার্মাল পাওয়ারের ছাইয়ের কারণে পুকুরের মাছ, মাঠের ধান, পাড়ের কলা পেঁপে, রেললাইনের ধারে ধারে ঝিলের পদ্ম, নারকেল, সবজি সমস্ত নষ্ট হতে বসেছে।"[১১] বিভিন্ন কীটপতঙ্গের স্বাভাবিক জীবনছন্দ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। ফ্লাই-অ্যাশ সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের প্রাণী জগতকে আক্রান্ত করেছে। তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ছাই কীভাবে পরিবেশকে বিপন্ন করে তোলে এই গল্পে তা উঠে এসেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং এটি সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। আইনগত পদক্ষেপের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করতে হবে। বিকল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে দ্রুত 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল প্রদান করতে হবে। এ তহবিলের একটি অংশ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে ব্যয় করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু উদ্বাস্তুদের মানবাধিকার আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আইনি স্বীকৃতি, সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদানের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা দরকার। সদস্য দেশগুলোকে ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য করা উচিত এবং প্রতিটি দেশকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কমানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে। সর্বোপরি জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রতিটি দেশের সরকারকে সক্রিয় হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চিতা, পত্রপুট, উদাসীন, দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃ ৪৬৬
২. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/জলবায়ু শরণার্থী, (Accessed on 12.04.2024)

৩. E. El-Hinnawi, Environmental Refugees (Nairobi: United Nations Environment Programme, 1985), 4. El-Hinnawi's definition does not distinguish between people displaced beyond the borders of their own state and those displaced within state borders (unlike many definition of 'refugees', including the Geneva Convention). For the purposes of this paper, I concentrate on those displaced beyond the borders of their own state.

৪. তদেব, তথ্যসূত্র ২

৫. ঘোষাল বিনোদ, প্রাণের পরে, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪৩০, পৃ. ৮৩

৬. রায় কিন্নর, প্রকৃতি পাঠ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৯

৭. সেন অভিজিৎ, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৭৫

৮. তদেব পৃ. ৭৭

৯. তদেব পৃ. ৭৮

১০. বসু অরিন্দম, রংকলের মাঠে, এই অরণ্যে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৪৪

১১. পুরকাইত উত্তম, কানা নদীর খোঁজে, ফড়িঙের যুদ্ধ বিষয়ে কিছু কথা, ছোঁয়া, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৬৮

সহায়ক গ্রন্থ:

১. পাণ্ডা বিশ্বজিৎ, বিপন্ন পরিবেশের আখ্যান, সোপান, কলকাতা, ২০২২

২. প্রামাণিক দূর্বা, ছোটগল্পে পরিবেশভাবনা, বলাকা সাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৩

৩. মণ্ডল সুশান্ত, সম্পাদিত, ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১

৪. সরকার অমিত কান্তি, মাইগ্রেশন এক নিরন্তর যাত্রা, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২

৫. সেন সন্তোষ, বিপন্ন পরিবেশ বিলুপ্তির পথে মানব সভ্যতা, মেহনতি পাবলিকেশন, উত্তর ২৪ পরগনা, জানুয়ারি ২০২৪।

সমাজমানসের বিশ্লেষণের নিরিখে : লোককথার ‘ভূত’

মেঘা ভট্টাচার্য
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর পর্যায়)
ময়নাগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি

সারসংক্ষেপ (Abstract): ‘ভূত’- এর প্রচলিত অর্থ মৃত ব্যক্তির আত্মা। মানুষ অপঘাতে মারা গেলে বা অতৃপ্ত কামনা-বাসনা বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার দেহের মৃত্যু হয় ঠিকই কিন্তু লোকবিশ্বাস অনুসারে তার আত্মা বারবার ফিরে এসে জীবিত মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায়। গল্পকথায় দেখি সে এই যোগাযোগের মাধ্যমে কখনো মানুষকে নিজের বিষয়ে কিছু বলতে চেয়েছে বা কখনো নানাবিধ কারনে ক্ষতি করতে চেয়েছে আবার ‘ভালো’ ভূতের নজিরও কম নেই। রেভারেন্ড লালবিহারী দে গ্রামবাংলার জনজীবন থেকে এইসব লোককথা সংগ্রহ করে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন ‘Folk-Tales of Bengal’। ভূত, রাক্ষস অথবা রূপকথা সবকিছুই এই গ্রন্থে গল্পাকারে থাকলেও মূল কিছু পার্থক্যের কারনে রূপকথা, দত্যি-দানব বা রাক্ষসের সাথে ভূত-এর চারিত্রিক একটি প্রভেদ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় মূলত এই সংকলনে যে চার প্রকার ভূতের কাহিনী রয়েছে তার অন্দরমহলে আলোকপাত করে সমসাময়িক বাংলার সমাজকে দেখার চেষ্টা করা। লোককথায় যেহেতু কোনো লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না, সুনির্দিষ্ট কোনো সাল-তারিখ যুক্ত সময়ের গণ্ডি পাওয়া যায় না কাজেই বলা হয় এইসব গল্পগুলি মূলত সমাজদেহ থেকেই উৎপত্তি লাভ করে সমাজদেহেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সুতরাং, একজন পক্ষপাতহীন বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে এর পর্যালোচনায় অবশ্যই সমাজ প্রসঙ্গ, সমাজের মানুষের মানসিক অবস্থা, সমাজের ন্যায়-নীতি, ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে আসবে। শিশুপাঠ্য হিসেবে বোধহয় ‘তেঁনাদের’ দূরে সরিয়ে রাখার দিন শেষ হল। ‘ভূত’ কেবলমাত্র মনোরঞ্জন বা গা ছমছমে অনুভূতি সৃষ্টিকারী উপাদান না হয়ে, নিজেই যেন স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে বাংলার জনজীবনের সাক্ষ্য দিয়ে গেছে চুপিসারে – তাই তাকে উদ্ধার করার ক্ষুদ্র প্রয়াসে এই কলমের আয়োজন।
সূচক শব্দ (Key word): ভূত কী, লোককথা কী,লালবিহারী দে’র ‘Folk-Tales of Bengal’ , লোককথায় ভূতের প্রকারভেদ, ভূতের ভাষা, ভূতের বাসস্থান, ভূতের কাহিনীতে সমাজ প্রসঙ্গ, চরিত্রের মানসিক দিক, লোককথা শিশুসাহিত্য নয়।

মূল আলোচনা (Discussion):

(এক)

'ভূত'- শব্দবন্ধের সাথেই ভয়ের চিহ্ন মিশ্রিত থাকে।'ভূত' অর্থে অতীতকে নির্দেশ করে। Wikipedia এর তথ্যানুসারে ভূত, প্রেতাত্মা, বা অশরীরী হল মৃত ব্যক্তির আত্মা। মৃত্যুর পরে তারা অশরীরী হয়ে জীবিত ব্যক্তির সামনে আত্মপ্রকাশ ক’রে সংযোগ সাধনে সক্ষম-

> “ভূত তদভব অর্থে হল যা হয়ে ফুরিয়ে গেছে কিন্তু যার আদল লুপ্ত হয়নি। অর্থাৎ শব্দটির তদভব রূপ ভুয়ো যা বোঝায়। ভুয়ো মানে, যার ভিতর সার বস্তু কিছু নেই তবে বাইরের খোলার বা আবরণের আদল আছে। ভূত তাই যেন মরা মানুষের না-মরা ছাঁচ।”[১]

এই 'ভূত'-কে নিয়েই দেশে-বিদেশে নানা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচ্যের ডাইনি থেকে পাশ্চাত্যের ভ্যাম্পায়ার কথাসাহিত্যের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো এক একজন বাউন্ডুলে তরুণ। তারা হয়তো সেভাবে মূল সাহিত্য স্রোতে এক আসনে বসার সুযোগ লাভ করতে পারেনি। তবুও, তাদের বাদ দিয়ে চলা দায়। বাংলার লোককথায় 'তেঁনাদের' আসন সকলের ঊর্ধ্বে। শিশু-কিশোর থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যথাক্রমে শ্রোতা ও বক্তা হয়ে গল্পের ধারাকে প্রবহমান রেখেছে। বিশেষত, গ্রামেগঞ্জে সন্ধ্যার আলো-আঁধারি পরিবেশে জোনাকির সবুজ আলো যখন বাঁশঝাড়ে মিশে যায়, তখনই পড়াশোনার ফাঁকে চলত গল্প শোনার আবদার। কখনো বা ঝঞ্ঝামুখর রাতে মুড়ি-তেলেভাজার সাথে হ্যারিকেনের আবছা আলোয় যখন মাটির দেওয়ালে দীর্ঘছায়া ভ্রুকুটি নাড়ত, সেই ছায়ায় যেন আরো কিছু ফিসফাস শব্দবন্ধ গল্পের মোড়কে উঁকি দিত। অথবা যে দুরন্ত শিশু কথা শুনতে চাইতো না তাকে অনায়াসেই বাড়ির অভিভাবকেরা অন্ধকারে বাইরে গেলে 'পেত্নী'তে ঘাড় মটকাবে- জাতীয় বাক্য শুনিয়ে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যেন লক্ষণরেখা টেনে দিতেন। আসলে অজানার প্রতি কৌতূহল আবার তা থেকে অনির্দেশ্য ক্ষতির আশঙ্কায় মানবজীবন জর্জরিত। তাই ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগতভাবে এই ভূত বা ভয়ের কাহিনীগুলি যুগপরম্পরায় প্রবাহিত হতে থাকে এবং লোককথার মর্যাদা পায়।

লোককথা মৌখিক বা জনশ্রুতি মূলক ধারাকে অনুসরণ করে সমাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। এতে অবাস্তব উপাদান ব্যবহৃত হলেও তার একটি অন্তর্নিহিত অর্থ এবং সর্বজনীন আবেদন থাকে। অর্থাৎ-

> "শ্রুতি-পরম্পরায় যে সকল বিষয়বস্তু চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ইহার উপকরণ- কোন মৌলিক বিষয়বস্তু ইহার উপজীব্য হইতে পারে না।... একটি মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক (traditional) ধারা অনুসরণ করিয়া লোক-কথা সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে।"[২] লোককথার লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না তারা যুগে যুগে সমাজের মধ্য দিয়ে পুনর্গঠন এর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে একজন বহুখ্যাত লেখক। তিনি তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'Folk Tales of Bengal' (১৮৮৩) সংকলন করেন। ইতিপূর্বে,বাংলার গ্রামীণ জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৌখিক কাহিনীর কোন লিখিত রূপ ছিল না। তিনিই প্রথম এই লোক কাহিনী মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে লীলা মজুমদার এবং মনীন্দ্র দত্ত 'বাংলার উপকথা' নামে পৃথক পৃথক রূপে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মূলত বাংলার রূপকথা, এবং ভৌতিক কাহিনী এখানে স্থান পেয়েছে। কাহিনীগুলো বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলার জনজীবনের বিভিন্ন সময়ের সামাজিক পরিবেশ- পরিস্থিতি ও মানুষের মানসিক গঠনেও আলোকপাত করা সম্ভব।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মূলত বাংলার লোককথায় 'ভূত' প্রসঙ্গ। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ভূতের অস্তিত্ব বাংলায় কল্পনা করা হয়, যেমন- ব্রহ্মদৈত্য, পেত্নী, শাঁকচুন্নি, স্কন্ধকাটা, নিশিবুড়ি, ডাইনি ইত্যাদি। তেঁনারা আবাসস্থল হিসেবে গাছতলাই পছন্দ করেন এবং তারা তাদের বিশেষ বাগভঙ্গিমায় সানুনাসিক স্বরে কথা বলেন। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মৃতের নামের মাথায় যেমন চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ করা হয় সেকারনেই একজন মানুষের অপঘাতে মৃত্যু হয়ে সে অশরীরী হয়ে উঠলে মৃত্যু পরবর্তী ভূতদশায় তিনি সানুনাসিক স্বরধনি ব্যবহার করেই কথা বলেন (হঁ, অ্যাঁ, উঁ) ইত্যাদি। 'Folk-Tales of Bengal' গ্রন্থে যথার্থই ভৌতিক শর্তে চারটি গল্পের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যথা- 'The Ghost Brahman' বা 'ব্রাহ্মন ভূত', 'A Ghostly Wife' বা 'পেত্নী বৌ' , 'The Story of a Brahmadaitya' বা 'ব্রহ্মদৈত্য কথা', 'The

Ghost who was afraid of being bagged' বা 'ভীতু ভূত'। এখানে রূপকথার মোড়কে রাক্ষসদের প্রসঙ্গ নিয়ে কাহিনী থাকলেও উভয়ের মূল প্রভেদ হল রাক্ষসদের বিকটদর্শন দেহধারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়, তারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত যাকে cannibalism এর মত এক আদিম প্রথার নিদর্শন বলা যায়। এখানেই সূক্ষ্ম অশরীরী ভূতের সাথে রাক্ষসের একটা মৌলিক তফাত রয়ে যায়।

(দুই)

রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র 'Folk-Tales' সংগ্রহে যেসব ভূতের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রথমেই 'The Ghost Brahman' বা 'ব্রাহ্মন ভূত' অর্থাৎ ছদ্মবেশি ভূত প্রসঙ্গ রয়েছে। এক গরীব ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে অর্থসংগ্রহ করে বিয়ে করেছিল। পরবর্তীতে স্ত্রীকে রেখে সে অধিক অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে দূরদেশে চলে যায়। এই সুযোগে তার রূপ ধরে এক ভূত এসে বসবাস করতে থাকে। এই কাহিনীতে আমরা দেখি লোককথার সাধারন নিয়ম নীতি মেনেই কোনও নির্দিষ্ট স্থাননাম বা চরিত্রের নামও নেই। গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে-

"Once on a time there lived a poor Brahman..." [৩]

তৎকালীন সময়ে আমরা গরীব ব্রাহ্মণের বিবাহ সমস্যার চিত্রটি এভাবে পাই-

> "Who not being a kulin, found it the hardest thing in the world to get married. He went to rich people and begged them to give him money that he might marry a wife."[৪]

সংস্কৃত শব্দ 'কুলিন' থেকে 'কৌলীন্য' শব্দের উৎপত্তি। এই 'কুলিন' শব্দের অর্থ হল-উত্তম পরিবার বা উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশজাত। কথিত আছে বল্লাল সেন ১১৫৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু কুল ও বর্ণ সমীকরণ আইন' নামে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। প্রকৃতঅর্থে নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা' গ্রন্থে জানিয়েছেন কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তক হিসেবে বল্লাল সেনের নাম জড়ালেও তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারন, তাঁর রচিত 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। 'কৌলীন্য' অর্থে গুণের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি কাল্পনিক উচ্চ-নীচ বিভাজনকেই বোঝায়।[৫] এছাড়াও, ডঃ অতুল সুর তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন-

> "আচরন, শালীনতা, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থভ্রমণ, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, ও দান-কুলীনের এই নয়টি লক্ষন। কিন্তু ব্রাহ্মনসমাজে যাকে একবার কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাদের বংশপরম্পরায় কুলীন বলে সম্মানিত করা হত-উপরিউক্ত নবধা গুণ অনুযায়ী নয়।"[৬]

অর্থাৎ কুলীন, অন্ত্যজ ইত্যাদি সৃষ্টি করার ফলে সমাজে বিভেদ হওয়া স্বাভাবিক। যে কারনে কুলীন ব্রাহ্মন তার মেয়ের বিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণের সাথে দিতেই বাধ্য ছিল, আর যারা কুলীন নন তাদের অবস্থা ছিল হয়ত ভূতের গল্পের এই অ-কুলীন ব্রাহ্মণের মতই। তাই গল্পে দেখা যায় কন্যার পিতাকে দেওয়ার জন্য তার বিরাট অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল-

> "And a large sum of money was needed...as for giving to the parents of the bride."[৭]

অর্থাৎ, সমাজনীতির মানদণ্ডে বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণের চিত্র শুধু গল্পের নামহীন চরিত্র নয়, সে একটি সময়ের সাক্ষ্য বহন করেছে গল্পের চরিত্র হয়ে। তার অনুপস্থিতিতে একটি ভূত এসে তার জায়গা দখল করে নিয়েছে এ ঘটনা তার অসহায় অবস্থার প্রতিরূপ। তার দুর্দশা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে রাজার কাছ থেকেও সুবিচার পায় না-

"And what a king this is! He does not do justice."[৮]

দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লোককথাগুলি মানুষের জীবনকেই তুলে ধরে তাই হয়ত ভূত আর প্রকৃত ব্রাহ্মণের মধ্যে তফাত করতে শাসক পারেন নি, (বিশেষ চেষ্টাও করেননি যদিও)। বিচারপ্রাপ্তির শেষে লোককথার চিরন্তন রীতি মেনেই 'and lived happily for many years'- এর মাধ্যমে গল্পের নটে গাছটি মুড়িয়েছে। আমাদের ভালো থাকতে চাওয়ার প্রত্যাশার ভারও বহন করে শেষের এই শব্দবন্ধটি।

'Folk-Tales of Bengal'- এর পরবর্তী ভূতের গল্প হিসেবে 'The Story of a Brahmadaitya' বা 'ব্রহ্মদৈত্য কথা' পাই। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কোনও ব্রাহ্মণ অপঘাতে মারা গেলে তার আত্মা ব্রহ্মদৈত্যে পরিণত হয়। সুকুমার সেনের মতে-" শুদ্ধাচারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মার মতোই যেন ব্রহ্মদৈত্য"[৯] এই কাহিনীতে আমরা 'ভালো ভূত'-এর ধারণা লাভ করি। গল্পানুসারে, এক ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রীর যখন দারিদ্র্যতার কারনে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখন সে কিভাবে এক ব্রহ্মদৈত্যের সহায়তায় প্রভূত অর্থ-সম্পদ-সমৃদ্ধি লাভ করেছে তারই কাহিনী রয়েছে।

উপরিউক্ত দুটি কাহিনীর মূলেই আমরা 'গরিব ব্রাহ্মণে'র অস্তিত্ব পেলাম। এই গল্পে দেখা যায়-

> "As he had no means of livelihood, he used everyday to beg from door to door and thus got some rice which they boiled and ate..."[১০]

অথচ, আপাতভাবে সমাজে ব্রাহ্মণরা নিশ্চয়ই উচ্চজাতি হিসেবেই গন্য হতেন। সমাজে সুযোগসুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা অগ্রসর ছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত জাতিপ্রথা তথ্যের জন্য বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণসমূহে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

> "মৎস্যপুরাণে [২১৭।১৬৩-৬৪] বলা হয়েছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হলেও ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না, তাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া যেতে পারে বা অপরাধসূচক কোন চিহ্ন তাকে ধারণ করানো যেতে পারে... মনু ৩।১৪৯ অবলম্বনে বলা হয়েছে যে যিনি ব্রাহ্মণ গ্রহীতাদের যোগ্যতার প্রশ্ন না তুলে নিঃসংকোচে দান করেন তিনি দেবতা ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করেন"।[১১]

এবং এই সম্মান বা মর্যাদার বিষয়টি কাহিনীর শেষে ব্রাহ্মণের সাথে বন্ধুত্বের ফলে ব্রহ্মদৈত্যের ভৌতিক জীবন থেকে মুক্তিলাভের দৃশ্যেও বোঝা যায়- "As by befriending the Brahman the Bramhadaitya's allotted period had come to an end and the 'Pushpaka' chariot had been sent to him from heaven."[১২] অর্থাৎ সম্মান বা শুভবোধে ব্রাহ্মণশ্রেণি একটি মর্যাদাজনক জায়গায় অবস্থান করত সন্দেহ নেই। তবু লক্ষণীয়, লোককথার কাহিনিগুলোতে ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদার দিকটি বজায় থাকলেও তাদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতার চিত্র পাওয়া যায়নি। আসলে উচ্চজাতি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পরেও ধর্মশাস্ত্রকাররা ব্রাহ্মণদের জন্য যে জীবনযাপনরীতি বেঁধে দিয়েছিলেন তাতে বিশেষ স্বছলতার সুযোগ ছিল না-

"মনু (৪।২-৩) বলেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রাহ্মণ ঠিক ততটা ধনই উপার্জন করবে যাতে কোনক্রমে তার পরিবারের ভরন পোষণ হয়,... যাজ্ঞবল্ক্য (১।২৮) বলেন যে কৃষক ফসল কেটে নেবার পর মাঠে যে শস্য পড়ে থাকে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ জীবনযাপন করবে"।[১৩]

বেদচর্চা ও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণদের প্রধান বৃত্তি হওয়া উচিত একথা পতঞ্জলি, যাজ্ঞবল্ক্যরা বলে গেছেন। এছাড়াও অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহকে বৃত্তি হিসেবে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সকলেরই তো বেদ কণ্ঠস্থ ছিল না, তাই সেসব পেশায় সকলে নিযুক্ত হতেও পারতেন না। দানের ওপর নির্ভর করে সংসার প্রতিপালন বাস্তবে প্রায় অসম্ভব ছিল কাজেই দারিদ্র্যতা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। তবুও বলা হয়েছে-

> "যদি ব্রাহ্মণ শিক্ষাদান, পৌরোহিত্য, এবং দান গ্রহণের দ্বারা সংসার প্রতিপালনের সুযোগ না পায় তাহলে সে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে"।[১৪]

তবুও, সামাজিক মানমর্যাদা রক্ষার খাতিরেই হয়ত ব্রাহ্মণেরা অন্য পেশার চাইতে দানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই, লোককথাগুলোতে বারবার ব্রাহ্মণের পরিচয় হিসেবে 'দরিদ্র' শব্দবন্ধ তার পিছু ছাড়তে নারাজ।

(তিন)

'The Ghost who was afraid of being bagged' বা 'ভীতু ভূত' গল্পে দেখি মূল কাহিনীতে রয়েছে এক নাপিত দম্পতি। অভাবী নাপিত তার বুদ্ধির জোড়ে কীভাবে ভূতকে ব্যবহার করে নিজে ধনবান হয়েছে তারই বর্ণনা রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তার স্বল্প উপার্জন বা উপার্জনহীনতার বিষয়টি এই গল্পে দেখা গেল। পরিবারের একজন সদস্যের ওপরেই সব ভার এবং তার স্বল্প উপার্জনে নাপিতের স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে বলেছে-

> "when I was in my father's house I had plenty to eat, but it seems that I have come to your house to fast. Widows only fast; I have become a widow in your lifetime."[১৫]

এবং অধিক উপার্জনের তাগিদে নাপিত বা প্রথম গল্পের সেই ব্রাহ্মণ অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। লোককথাগুলির মূলে 'অভাব' নিজেই যেন একটি স্বাধীন চরিত্র হয়ে অদৃশ্য থেকে কথাকে কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছে। ব্রহ্মদৈত্য বা ভীতু ভূত উভয়েই মানুষকে সম্পদশালী হতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ, মানবমনের অবদমিত সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্য প্রাপ্তির আশা পূরণের কাজ করে চলেছে ভূতেরা। হয়ত তারা অশরীরী তবুও রাতারাতি ধনী হওয়ার কল্পনাজগৎ বা fantasy world- এ মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে। ভয়ের সাথে ভূতের নাম জড়ালেও 'তেঁনারা' একপ্রকার মানুষের ইচ্ছেপূরণের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছিল।

'A Ghostly Wife' বা 'পেত্নী বৌ' গল্পে এক নারী ভূতের সাথে পরিচিত হতে পারি। 'পেত্নী' শব্দটি সংস্কৃত 'প্রেতিনী' শব্দ থেকে এসেছে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী যে সব অবিবাহিতা মেয়ে অপঘাতে অতৃপ্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে মারা যাওয়ার পর তারাই পেত্নী হয়। পাশাপাশি সুকুমার সেনের দেওয়া তথ্যানুযায়ী কমবয়সী পেত্নীই হল শাঁকচুন্নি। 'শাঁকচুন্নি' শব্দটির উদ্ভব 'শঙ্খচূর্ণী' থেকে। বেশভূষা অনুযায়ী শাঁকচুন্নি হাতে শাঁখা পরিধান করে। তারা সাধারণত বিবাহিতা মহিলার ওপর ভর করে তাদের জীবনে প্রবেশ করে মানুষের মত জীবনযাপন করতে চায়। অনেকসময় বাড়ির সদস্যদের ক্ষতি করার কথাও লোকমুখে শোনা যায়।

গল্প অনুসারে, এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর ওপর এক শাঁকচুন্নি ভর করে তার বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে নানা সন্দেহজনক ঘটনা ঘটতে থাকে। যেমন, অবিশ্বাস্যভাবে অল্প সময়ে সে ঘরের কাজ শেষ করত, আবার একদিন সে নিজের হাতকে ইচ্ছেমত লম্বা করে পাশের ঘর থেকে জিনিস এনে দেয় বা উনোনে জ্বালানি না থাকায় নিজের পা-ই ঢুকিয়ে

দিয়েছিল উনোনের মধ্যে। ফলে তাঁর ওপর 'ভূতে ভর' করেছে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে বাড়িতে ওঝা আনা হয় এবং তাঁর ক্রিয়াকর্মের ফলে প্রকৃত বধূটি তার জীবন ফিরে পায়। একটি 'শাঁকচুন্নির' বা 'পেত্নী'র এভাবে ব্রাহ্মণপত্নীকে আক্রমণ করে তার পরিবারে এসে মানুষের মত ঘর-সংসার করার দৃশ্য সমাজের কোনও এক বিধবা নারীর মনের কামনা-বাসনারই প্রতিবিম্ব নয় কি? লক্ষণীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শাঁকচুন্নিটির পরিবারে বধূ রূপে থাকাকালীন পরিবারের কোনও সদস্যের অনিষ্ট করার কথা ছিল বা সুযোগও ছিল। কিন্তু সে তা করেনি, অবশেষে একদিন কাহিনী ক্লাইম্যাক্সে পৌছায়, সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। পূর্বেই বলেছি 'পেত্নী' বা 'শাঁকচুন্নি' এমন অশরীরীকেই বোঝায় যারা আশা-আকাঙ্খা বুকে নিয়ে পরলোক গমন করে। এক্ষেত্রেও, তারা সেইসব দুর্ভাগা নারীকেই প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে, যাদের একদিন সব পাওয়ার কথা ছিল অথবা যারা কিছুই পায়নি। লোককাহিনীর প্রবাহে এভাবেই হয়ত সমাজের কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আধুনিক যুগে Magic বা ঐন্দ্রজালিকক্রিয়ার বিশেষ প্রাধান্য না থাকলেও সমাজদেহে যে এই ক্রিয়ার বিশেষ অস্তিত্ব বর্তমান ছিল লোককথাগুলি তারই প্রমাণ-

> "একদিন ওঝাই ছিল সমাজের নায়ক; অতএব তাহার অনুষ্ঠিত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারাই সমগ্র সমাজ জীবন পরিচালিত হইত।... সেদিন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় কেহই অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করিত না, বরং নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই তাহা স্বিকার করিয়া লইত"।[১৬]

গল্পে বধূবেশে থাকা শাঁকচুন্নিকে যখন ওঝা জুতো দিয়ে পিটিয়ে তার ভূত তাড়াচ্ছেন একবার নয় বারবার তখনও কেও তাঁকে বাধা দেয়নি-

> "Ojha took up his slippers and began belabouring her with them."[১৭]

সুতরাং, একাধিকবার এই পীড়ন পদ্ধতির প্রতি প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না সমাজের মানুষকে, তারা বিষয়টিকে যে 'ভূত তাড়ানোর' পদ্ধতি হিসেবেই গ্রহণ করেছে কোনও দ্বিমত এতে নেই। অর্থাৎ, অলৌকিক বিষয়ের প্রতি সমাজের যে অটুট বিশ্বাস একসময় ছিল, তার প্রমাণ এই 'ওঝা প্রসঙ্গে' পাওয়া গেল।

(চার)

এভাবেই লোককথার ভূত একবার নয় বারবার নিজেদের মাধ্যমে সমকালীন সমাজকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। হয়ত তার প্রকাশ প্রত্যক্ষ ছিল না, সমষ্টির লৌকিক ভাবনার ছাপ মিশে গেছে কথার অন্দরে ও অন্তরে। এটাই এর প্রাণশক্তি। লোককথার ভৌতিক উপাদান গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যও। প্রসঙ্গত, মনোজ বসুর 'জামাই' গল্পটিকে স্মরণ করতেই হয়। লোককথার বধূরূপী শাঁকচুন্নি যখন কোন জ্বালানী না থাকায় নিজের পা-কেই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেছিল এই দৃশ্যের সাথে জামাই' গল্পের চঞ্চলার একই আচরণ লোককথার প্রবাহশক্তিকেই ইঙ্গিত করে। এই 'folktale' বা উপকথার সংকলন গ্রন্থে রূপকথাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। এইসব ভৌতিক কাহিনী বা রূপকথাগুলোকে শিশুপাঠ্য হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে থাকলেও শুধুমাত্র এই উপাধি প্রদান করে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার দিনও বহুকাল আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে যথার্থই জানিয়েছেন-

> "আপাতদৃষ্টিতে লোককথা শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত বলিয়া মনে হইলেও, ইহা অপরিণত মনের সৃষ্টি নহে... পরিনত মন নিজের আনন্দে ইহা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা রক্ষা করিয়াছে, ইহাকে সযত্নে পালন করিয়াছে..."[১৮]

কথাগুলি যে শুধুমাত্র রূপকথার জন্য প্রযোজ্য নয় সে তো পূর্বেই বলা হয়েছে। সর্বোপরি, ‘তেঁনাদের’ কেবল ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে বা অবসর বিনোদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার বদলে আমাদের বোধহয় তাদের প্রতি সামান্য হলেও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। কে না বলতে পারে হয়ত ‘তেঁনাদের’ হাত ধরেই আবিষ্কৃত হতে পারে হারিয়ে যাওয়া সেইসব দিনেরা!

গ্রন্থপঞ্জি (References):

১। সেন, সুকুমার, এপ্রিল ১৯৯০, ‘গল্পের ভূত’, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, আনন্দ পাবলিশারস লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ১

২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৬২, ‘বাংলার লোক-সাহিত্য’ (প্রথম খণ্ড), ১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃষ্ঠা- ৪৪৩

৩। DAY. REV. LAL BEHARI. (1912). ‘FOLK-TALES OF BENGAL’. ST. MARTIN’S STREET, LONDON. MACMILLAN AND CO. LIMITED. PAGE- 173

৪। পূর্বোক্ত, ‘FOLK-TALES OF BENGAL’, page- 173

৫। ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ, ১৯৮৭, ‘ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা’, ২৫৭বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০১২, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৬

৬। সুর, অতুল, ১৯৮৬, ‘বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন’, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট কলকাতা-৬, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ২১০

৭। পূর্বোক্ত, ‘FOLK-TALES OF BENGAL’, page- 173

৮। পূর্বোক্ত, ‘FOLK-TALES OF BENGAL’, page- 175

৯। পূর্বোক্ত, ‘গল্পের ভূত’, পৃষ্ঠা- ২

১০। পূর্বোক্ত, ‘FOLK-TALES OF BENGAL’, page- 192

১১। পূর্বোক্ত, ‘ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা’, পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫

১২। পূর্বোক্ত, ‘FOLK-TALES OF BENGAL’, page 198-199

১৩। পূর্বোক্ত, ‘ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা’, পৃষ্ঠা- ৫১

১৪। পূর্বোক্ত, ‘ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা’, পৃষ্ঠা- ৫২

১৫। পূর্বোক্ত, ‘FOLK-TALES OF BENGAL’, page 247

১৬। পূর্বোক্ত, ‘বাংলার লোক-সাহিত্য’, পৃষ্ঠা- ৪৬৬

১৭। পূর্বোক্ত, ‘FOLK-TALES OF BENGAL’, page 190

১৮। পূর্বোক্ত, ‘বাংলার লোক-সাহিত্য’, পৃষ্ঠা- ৪৫৫

আকরগ্রন্থ:

১। DAY. REV. LAL BEHARI. 1912. ‘FOLK-TALES OF BENGAL’. ST. MARTIN’S STREET, LONDON. MACMILLAN AND CO. LIMITED.

২। দে, রেভারেন্ড লালবিহারী, জানুয়ারি ১৯৮৮, ‘বাংলার উপকথা’, অনুবাদ মণীন্দ্র দত্ত, ১ কলেজ রো কলকাতা-৯, তুলিকলম প্রকাশনী।

লেখার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণামূলক উৎস:

‘সাহিত্যতক্কো’ সাহিত্য পত্রিকা, ‘বাংলা সাহিত্যে ‘ভূত কথা’।

হিমেল ১৪২০, সম্পাদক – উদয় রতন মুখার্জী, ১৬২/ডি/১ কুতুল শাহী রোড, বারাসাত, কলকাতা – ১২৪।

চৈতন্যের প্রকাশান্তর নিরপেক্ষত্বে অদ্বৈতমত সমীক্ষা

রাহুল ভৌমিক
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: চৈতন্যের স্বরূপ বিষয়ে কেবল দার্শনিকগণই নন বৈজ্ঞানিকরাও অতি প্রাচীন কাল হইতেই অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকেই এবিষয়ে অবগত যে, আমরা 'চেতন'। তবে এই 'চৈতন্য'এর স্বরূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল। এক্ষণে প্রশ্ন হইল, ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়সমূহ 'চৈতন্য' বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, প্রায় প্রতিটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই মুক্তির কথা বলিয়া থাকেন। মুক্তি বলিতে বুঝায়, দুঃখ হইতে মুক্তি। মুক্তির উপায় বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিলেও, তাহারা প্রত্যেকেই এবিষয়ে একমত যে, 'আত্মজ্ঞান'ই হইল মুক্তি। সুতরাং, আত্মাই হইল এক্ষেত্রে মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আত্মা সর্বদাই চৈতন্যের সহিত সম্পৃক্ত। যেমন- ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, চৈতন্য হইল আত্মার আগন্তুক গুণবিশেষ, অপরদিকে জৈনগণ বলেন যে, চৈতন্য হইল আত্মার স্বরূপ বা গুণ। তবে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ভিন্নার্থে চৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। ভগবৎপাদ ভগবান ভাষ্যকার শ্রী শঙ্করাচার্য অদ্বৈত বেদান্তের মূল সিদ্ধান্তকে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া বলেন যে,

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।।

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নয়। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মস্বরূপই। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে- 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম'। এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম বা আত্মার জ্ঞানস্বরূপতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, অদ্বৈত মতে- শুদ্ধ চৈতন্য, আত্মা, জ্ঞান সবই হইল নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ।

এই জ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য হইল অদ্বৈত মতে স্বপ্রকাশ। জ্ঞান বা চৈতন্যের এই স্বপ্রকাশত্ব হইল সূর্যের ন্যায় অর্থাৎ সূর্য যখন উদিত হয়, তখন তাহা ঘট-পটাদি তাবৎ বিষয়ের প্রকাশের সহিত নিজেকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। সূর্য উদিত হইয়াছে কি না- ইহা জানিবার জন্য জন্য যেমন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করিতে হয় না, একইভাবে জ্ঞান বা চৈতন্যও সেইরূপ। যখন আমাদের কোন বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে, তখন বিষয় প্রকাশের সহিত জ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত অপর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। এই কারণে অদ্বৈতীগণ জ্ঞান বা চৈতন্যকে স্বপ্রকাশ বলিয়া থাকেন। অদ্বৈতীগণ কীরূপে চৈতন্য বা আত্মার স্বপ্রকাশত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন তাহা এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

মূল শব্দ: চৈতন্য, মুক্তি, ব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ।

মূল আলোচনা:

শাস্ত্রে ইহা কথিত হইয়াছে যে, 'লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিঃ', অর্থাৎ লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই কোন বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে। কোন বস্তু বিষয়ে যদি প্রমাণ বা লক্ষণ প্রদান করা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে সৎ বস্তু বলা যায় না। অদ্বৈতীগণও স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন।

বেদান্ত আচার্যগণের মধ্যে আচার্য চিৎসুখ তাহার *প্রত্যকতত্ত্বপ্রদীপিকা* গ্রন্থে স্বপ্রকাশের যাবতীয় লক্ষণ একত্রিত করিয়া আলোচনা করেন। তিনি সেক্ষেত্রে স্বপ্রকাশত্বের মোট দ্বাদশ লক্ষণ উপস্থাপন করেন। অন্মধ্যে প্রথম একাদশ লক্ষণের দোষ উপস্থাপন পূর্বক শেষ লক্ষণটিই যে অদ্বৈতসম্মত তাহা তিনি বিচারপূর্বক উপস্থাপন করেন। তবে সমস্ত লক্ষণ কেবলমাত্র এই একটি প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নহে, এক্ষেত্রে স্বপ্রকাশত্বের সিদ্ধান্তলক্ষণের আলোচনাই অবসরপ্রাপ্ত। তবে সিদ্ধান্তলক্ষণের মূল ভিত্তি হইল দশম লক্ষণ। ফলত প্রথম হইতে নবম লক্ষণ পর্যন্ত অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, দশম লক্ষণ হইতে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়াস এই প্রবন্ধে করিলাম। নিম্নে সেই লক্ষণসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল-

১। স্বপ্রকাশত্বের প্রথম লক্ষণ প্রদান করিতে চিৎসুখাচার্য বলেন যে, 'স্বশ্চাসৌ প্রকাশশ্চ স্বপ্রকাশঃ', অর্থাৎ স্বত্ববিশিষ্ট প্রকাশই হইল স্বপ্রকাশ।

২। স্বপ্রকাশত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ হইল, 'স্বস্য স্বয়মেব প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ', অর্থাৎ যাহা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাই হইল স্বপ্রকাশ।

৩। স্বপ্রকাশত্বের তৃতীয় লক্ষণ উপস্থাপন করিতে চিৎসুখাচার্য বলেন যে, 'সজাতীয়প্রকাশাপ্রকাশ্যত্বং', অর্থাৎ যাহা সজাতীয় প্রকাশের দ্বারা অপ্রকাশিত তাহাই হইল স্বপ্রকাশ।

৪। আচার্য প্রদত্ত স্বপ্রকাশত্বের চতুর্থ লক্ষণটি হইল- 'স্বসত্তায়াং প্রকাশব্যতিরেকবিরহিতত্বং', অর্থাৎ নিজসত্তায় প্রকাশের অভাবের অভাব না থাকাই হইল স্বপ্রকাশ।

৫। চিৎসুখাচার্য স্বপ্রকাশত্বের পঞ্চম লক্ষণ উপস্থাপন করিতে বলেন যে, 'স্বব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বং বা', অর্থাৎ নিজব্যবহারের হেতু হইয়া যাহা প্রকাশস্বরূপ তাহাই হইল স্বপ্রকাশ।

৬। স্বপ্রকাশত্বের ষষ্ঠ লক্ষণটি হইল, 'জ্ঞানাবিষয়ত্বং বা', অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের অবিষয়, তাহাই হইল স্বপ্রকাশ।

৭। চিৎসুখাচার্য প্রদত্ত স্বপ্রকাশত্বের সপ্তম লক্ষণটি হইল, 'জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষত্বং বা', অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের অবিষয় হইয়া অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই হইল স্বপ্রকাশ।

৮। স্বপ্রকাশত্বের অষ্টম লক্ষণটি হইল- 'ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্বং বা', অর্থাৎ যাহা ব্যবহারের হেতু হইয়া জ্ঞানের অবিষয় হয় তাহাই হইল স্বপ্রকাশ।

৯। স্বপ্রকাশত্বের নবম লক্ষণ উপস্থাপন করিতে চিৎসুখাচার্য বলেন যে, 'স্বপ্রতিবদ্ধব্যবহারে সজাতীয়পরানপেক্ষত্বং বা', অর্থাৎ নিজবিষায়ক ব্যবহারে সজাতীয় অপরের অপেক্ষা না করাই হইল স্বপ্রকাশ।

চিৎসুখাচার্য এই সকল লক্ষণেরই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনন্তর স্বপ্রকাশত্বের দশম লক্ষণ প্রদান করিতে আচার্য বলেন যে-

১০। 'অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বং বা' অর্থাৎ যাহা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষ ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে, তাহাই হইল স্বপ্রকাশ। জগতের তাবৎ পদার্থ অপরোক্ষ ব্যবহারের বিষয় হইলেও তাহারা বেদ্য বা জ্ঞানের বিষয় হইয়াই ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। একমাত্র জ্ঞানই বেদ্য না হইয়া অপরোক্ষ ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। ফলে জ্ঞানই হইল স্বপ্রকাশ।

তবে এই লক্ষণটিও যথাযথ নয়। চিৎসুখাচার্য বলেন যে, পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহের সকল আপত্তি এক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। লক্ষণে বলা হইয়াছে যে, যাহা অবেদ্য বা জ্ঞানের বিষয় না হইয়া অপরোক্ষ ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে তাহাই হইল স্বপ্রকাশ। কিন্তু যাহা জ্ঞানের বিষয় নয়, সেবিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন সম্ভব নহে এবং তদ্বিষয়ে কথারও (বাদ, জল্প, বিতণ্ডা) প্রবৃত্তি হইবে না। এতদ্ভিন্ন অপর একটি দোষ এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইল, সুষুপ্তি, মোক্ষ বা প্রলয়কালেও লক্ষণটি গমন করিবে না। কারণ, মোক্ষ বা প্রলয়কালে কোন ব্যবহার থাকে না। ফলত অব্যাপ্তি দোষ বশত এই লক্ষণটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

১১। আচার্য চিৎসুখ স্বপ্রকাশত্বের একাদশতম লক্ষণ উপস্থাপন করিয়া বলেন যে, 'তদ্যোগ্যত্বং বা', অর্থাৎ পূর্বোক্ত দশম লক্ষণটি মোক্ষকালে অব্যপ্ত হওয়ায় লক্ষণে 'যোগ্যত্ব' পদটি নিবেশ করিতে হইবে। মোক্ষকালে ব্যবহারবিষয়ত্ব না থাকিলেও ব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব বিদ্যমান। ফলত, লক্ষণটি হইল, 'অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' অর্থাৎ যাহা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্য, তাহাই হইল স্বপ্রকাশ।

তবে স্বপ্রকাশত্বের এই লক্ষণটিও নির্দোষ নহে। এক্ষেত্রে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হয়, প্রথমত, লক্ষণোক্ত 'ব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব'- ইহা স্বপ্রকাশ জ্ঞানের ধর্ম নাকি স্বরূপ? এক্ষেত্রে যে পক্ষই অবলম্বন করা হোক না কেন, উভয়তই পাশারজ্জু। যদি বলা হয় 'ব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' হইল জ্ঞানের ধর্ম তাহা হইলে দ্বিবিধ সমস্যা উপস্থিত হইবে। প্রথমত, একথা সর্বসম্মত যে, ধর্ম কখনও ধর্মী ব্যতীত থাকিতে পারে না। যদি 'ব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' জ্ঞানের ধর্ম হইত তাহা হইলে তা সর্বদাই জ্ঞানে উপস্থিত থাকিবে। কিন্তু মোক্ষকালে কোন ব্যবহার না থাকায়, লক্ষণটি পুনরায় অব্যাপ্ত দোষে দুষ্ট হইবে। দ্বিতীয়ত, 'ব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' যদি স্বপ্রকাশ জ্ঞানের ধর্ম হয় তাহা হইলে, নির্ধর্মক ব্রহ্মে ধর্মের অঙ্গিকার করিতে হয়। সেক্ষেত্রে অদ্বৈত সিদ্ধান্তহানী হইবে। ফলত এই প্রথম পক্ষটি গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে দ্বিতীয়পক্ষটি যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইবে। প্রথমত, 'ব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' যদি জ্ঞানের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানস্বভাব আত্মা ব্যবহার নিরূপণের অধীন হইবে, ফলে আত্মা সপ্রতিযোগিক হইবে এবং দ্বিতীয়ত লক্ষ্য ও লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে কোন ভেদ করা যাইবে না। ফলত এই লক্ষণটিও গ্রহণীয় নয়।

সিদ্ধান্ত লক্ষণ: এযাবৎ সমস্ত লক্ষণ দোষযুক্ত হওয়ায় পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, স্বপ্রকাশের কোন লক্ষণ প্রদান সম্ভব নহে এবং যে বিষয়ে লক্ষণ প্রদান করা যায় না, তাহা দার্শনিক আলোচনার বিষয়ও নয়। ইহার উত্তরে চিৎসুখাচার্য স্বপ্রকাশত্বের সিদ্ধান্ত লক্ষণ প্রদান করিতে বলেন যে-

অপরোক্ষব্যবহৃতেযোগ্যস্যাধীপদস্য নঃ।
সংভাবে স্বপ্রকাশস্য লক্ষণাসংভবঃ কুতঃ।।

এক্ষেত্রে লক্ষণোক্ত 'অধীপদস্য' পদের অর্থ হইল জ্ঞানের বিষয় এবং 'অপরোক্ষব্যবহৃতেযোগ্যস্য' পদের অর্থ হইল অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য। সুতরাং সম্পূর্ণ লক্ষণটি হইল- 'অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব'। অর্থাৎ যাহা অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্য তাহাই হইল স্বপ্রকাশ। এক্ষেত্রে লক্ষণস্থ 'যোগ্যত্ব' পদের অর্থ হইল যোগ্যতার অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব। অতএব সম্পূর্ণ লক্ষণটি হইল- 'অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যতাত্যন্তাভাবাধিকরণং স্বপ্রকাশত্বম্'। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় হইল, যোগ্যতার অধিকরণ কখনও কখনও তাহার অত্যন্তাভাবের অনধিকরণও হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যদি কোন একটি অধিকরণে কোন একটি বস্তু

কোন এক কালে থাকে, তাহা হইলে সেই অধিকরণে সেই বস্তুটির অত্যন্তাভাব আছে- ইহা বলা যায় না। তার্কিকগণ অত্যন্তাভাবের লক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বলেন যে, “নিত্যসংসর্গাভাবত্বম্ অত্যন্তাভাবত্বম্”। ন্যায়মতে, সংসর্গাভাব ত্রিবিধ, যথা- প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। এই ত্রিবিধ অভাবের মধ্যে উৎপত্তি আছে যাহার তাহা হইল ধ্বংসাভাব, যাহার বিনাশ আছে তাহা হইল প্রাগভাব এবং যাহার উৎপত্তি-বিনাশ কোনটিই নাই তাহা হইল অত্যন্তাভাব। এই হেতু অত্যন্তাভাব হইল নিত্য-সংসর্গাভাব।

সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যে কালে অধিকরণে প্রতিযোগি বিদ্যমান, সেই কালে সেই অধিকরণে প্রতিযোগির অভাব আছে- ইহা বলা যায় না। তবে পূর্বপক্ষীগণ ইহার বিরুদ্ধে বলিতে পারেন যে, একথা বলা যায়; অর্থাৎ, একটি টেবলে ঘট আছে আবার ঘটের অভাবও আছে- একত্রে এই দুইটি কথাই বলা যায়। তাৎপর্য হইল, টেবিলে ঘট আছে, তবে টেবিলটি ঘট না হওয়ায় টেবিলে ঘটের অন্যোন্যাভাবও আছে। সুতরাং, একই কালে টেবিলে ঘট এবং ঘটের অভাবও বিদ্যমান- একথা বলা যায়।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতীগণ বলেন যে, এক্ষেত্রে উভয়স্থলেই প্রতিযোগি পৃথক। সংসর্গাভাবের প্রতিযোগি হইল ঘট, কিন্তু অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগি হইল ঘটতাদাত্ম্য। ফলে কোন স্থলে সেই বস্তুর উপস্থিতি এবং তাহার অভাব একত্রে থাকিতে থাকিতে পারে না।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রতিযোগি বিদ্যমান, অর্থাৎ সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব উভয় অভাবই হইল ঘটপ্রতিযোগিক অভাব। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, এমন হইলে সেক্ষেত্রে সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাবের মধ্যে কোন তফাৎ করা যাইবে না, সঙ্কর দোষ ঘটিবে।

ইহার পরেও পুর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে, সংসর্গাভাব হইল সংসর্গপ্রতিযোগিক অভাব এবং অন্যোন্যাভাব হইল তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিক অভাব। এতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, উভয়ত্রই সম্বন্ধপ্রতিযোগিত্ব সমান হওয়ায়, ঘটের অভাব বা পটের অভাব না বলিয়া সর্বত্র সম্বন্ধের অভাব বলিতে হইবে। এহেন অবস্থায় অভাবসমূহের মধ্যে ভেদ করা যাইবে না এবং মূকীভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

সুতরাং, ইহা সিদ্ধ হইল যে, প্রতিযোগির অধিকরণ হইল তাহার অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ। আলোচ্যস্থলেও ইহা বলিতে হয় যে, অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বরূপ প্রতিযোগি যদি কোন কালে জ্ঞানে থাকে, তাহা হইলে তাহার অত্যন্তাভাব কদাপি জ্ঞানে থাকিবে না অর্থাৎ অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতাত্যন্তভাবানধিকরণত্ব জ্ঞনে বিদ্যমান। ফলে, প্রতিযোগির অধিকরণ যে তাহার অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধ হইল।

এই প্রকারে অব্যাপ্তি দোষ পরিহারের প্রচেষ্টা যে কেবল অদ্বৈতীগণ করিয়া থাকেন এমন নয়, তার্কিকগণও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন, বৈশেষিকগণ দ্রব্যের লক্ষণ প্রদানপূর্বক বলেন যে, “গুণাশ্রয়ো দ্রব্যম্”, অর্থাৎ যাহা গুণের আশ্রয় তাহাই হইল দ্রব্য। তবে এই লক্ষণ সৃষ্টির আদ্যক্ষণে অবস্থিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই কারণে বৈশেষিকাচার্যগণ দ্রব্যের লক্ষণ প্রদান করিয়াছিলেন “গুণাত্যন্তাভাবানধিকরণং” অর্থাৎ গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ হইল দ্রব্য। সৃষ্টির আদ্যক্ষণে দ্রব্যে কোন গুণ থাকে না, তবে তদপরবর্তী কালে দ্রব্যে গুণ সংযুক্ত হয়। ফলে দ্রব্য কদাপি গুণের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয় না। সুতরাং, বৈশেষিকসিদ্ধান্তের সহিত অদ্বৈরসিদ্ধান্তের মিল থাকায়, স্বপ্রকাশের লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা সঠিক নয়। ফলত লক্ষণটি মোক্ষকালেও গমন করিবে। কারণ, মোক্ষকালে

অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা না থাকিলেও, মোক্ষপূর্বে সংসারকালে ব্যবহার থাকে বলিয়া, মোক্ষকালেও যোগ্যতাত্যন্তভাবানধিকরণত্ব থাকিবে।

সিদ্ধান্তলক্ষণে যে অপসিদ্ধান্তমূলক দোষ উপস্থাপন করা হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে বলা হইয়াছিল যে, 'অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' যদি জ্ঞানের ধর্ম হয় তাহা হইলে নির্ধর্মক ব্রহ্মে ধর্মের আরোপ করা হইবে, ফলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তহানী হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, যেই ধর্ম এখানে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা আসলে কাল্পনিক ধর্ম এবং সংসার দশায় কাল্পনিক ধর্ম স্বীকার করা দোষাবহ নয়। নৈয়ায়িকগণও বহুস্থলে কাল্পনিক ধর্ম স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন- নৈয়ায়িকগণ আকাশে তলমলিনতার আরোপ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আকাশের রঙ নীল। তবে বস্তুতপক্ষে আকাশের কোন রঙ নাই; নীল বর্ণ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর দ্বারা আকাশে আরপিত হইয়া থাকে এবং এই তলমলিনতা দ্বারা আমাদের সমস্ত ব্যবহারও সম্পাদিত হইয়া থাকে। ফলে নৈয়ায়িকগণ যদি এইরূপ কাল্পনিক ধর্ম স্বীকার করিতে পারেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীও বলিতে পারেন যে, সংসার দশায় এইরূপ কাল্পনিক ব্যবহার বিদ্যমান। এবিষয়ে শ্রতিবাক্যও দৃষ্ট হয়, ভগবান সুরেষ্যরাচার্য বলেন যে,

অক্ষমা ভবতঃ কেয়ং সাধকত্বপ্রকল্পনে।
কিং ন পশ্যসি সংসারং তত্রৈবাজ্ঞানকল্পিতম্।।

অর্থাৎ, 'অদ্বৈতসম্মত আত্মায় সাধকত্ব কল্পনায় তোমার এত অসহিষ্ণুতা কেন হে পূর্বপক্ষী? তুমি কী দেখতে পাও না যে, সমস্ত জগত প্রপঞ্চই তো ব্রহ্মে কল্পিত'।

এছাড়াও পঞ্চপাদিকাকার অধ্যাসভাষ্যে "বিষয়িণস্তদ্ধর্মানাং চ বিষয়ে অধ্যাসঃ মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্" ইত্যাদি অংশের ব্যখ্যাপূর্বক অন্যোন্যাধ্যাসের কথা বলেন। অন্যোন্যাধ্যাস বলিতে বুঝায়, একটি বস্তুতে অপর এক বস্তুর অধ্যাস। যেমন- রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস, সর্পে রজ্জুর অধ্যাস; রজ্জুতে সর্পধর্মের অধ্যাস আবার সর্পে রজ্জুধর্মের অধ্যাস। একইভাবে, আত্মা-অনাত্মার ক্ষেত্রে, অনাত্মায় আত্মধর্মের অধ্যাস, আবার আত্মায় অনাত্ম ধর্মের অধ্যাস হয়। ইহাতে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, আত্মায় অনাত্ম ধর্মের অধ্যাস সম্ভব হইলেও, আনাত্মায় আত্মধর্মের অধ্যাস হইতে পারে না। কারণ অদ্বৈতমতে, আত্মার কোন ধর্ম নেই, তাহা নির্গুণ। ইহার উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলেন যে, "আনন্দো বিষয়ানুভব নিত্যত্বম্ ইতি সন্তি ধর্মাঃ, অপৃথকত্বে অপি চৈতন্যাতপৃথগিবাবভাসন্তে ইতি নি দোষঃ", অর্থাৎ, অদ্বৈতমতে আত্মা নির্গুণ হইলেও কখনও কখনও তাহাতে ধর্ম আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন- আনন্দস্বরূপতা, বিষয়ের অনুভব, নিত্যত্ব। কিন্তু অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই সকল ধর্ম আত্মা হইতে অতিরিক্ত নয়, তাহারা আত্মস্বরূপই। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিরূপ উপাধিজন্য আমরা ইহাদের পৃথকরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এইরূপে সিদ্ধান্তলক্ষণ যে অপসিদ্ধান্ত দোষে দুষ্ট নহে তাহাও প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্তলক্ষণ পরীক্ষা: সিদ্ধান্তলক্ষণ অর্থাৎ "অবেদ্যতে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব"- এক্ষেত্রে দুইটি বিশেষণ বিদ্যমান, যথা- অবেদ্যতে এবং অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব। সিদ্ধান্তী বলেন লক্ষণে যদি 'অবেদ্যত্ব' পদটি সন্নিবিষ্ট না করা হইত, অর্থাৎ 'অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' মাত্র লক্ষণ করা হইত তাহা হইলে, লক্ষণটি ঘট-পটাদিতে অতিব্যাপ্ত হইবে, কারণ ঘট-পটাদিও অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য। এই হেতু লক্ষণে 'অবেদ্যত্ব সতি' পদটি যুক্ত করা হইয়াছে। 'অবেদ্য' পদের অর্থ হইল জ্ঞানের অবিষয়ত্ব। ঘট-পটাদি তাবৎ পদার্থসমূহ জ্ঞানের বিষয় হইয়াই অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে; ফলে তাহাদিগের মধ্যে

'অবেদ্যত্ব' থাকে না। জ্ঞানই কেবল জ্ঞানের অবিষয় হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হয় বলিয়া, জ্ঞানই হইল একমাত্র স্বপ্রকাশ।

সিদ্ধান্তী বলেন যে, লক্ষণে যদি 'অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' পদটি নিবেশ না করিয়া, 'অবেদ্যত্ব' মাত্রকে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ করা হইত, তাহা হইলে অতীত-অনাগত সকল বস্তু এবং নিত্যানুমেয় ধর্ম প্রভৃতিতে লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইবে। এই কারণে লক্ষণে 'অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' পদটি নিবেশ করা হইয়াছে। অতীত-অনাগত বস্তু এবং ধর্মাদি বিষয় সমূহ অবেদ্য হইলেও তাহাদের অপরোক্ষ ব্যবহার হয় না বলিয়া তাহারা অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্যও নহে। ফলে লক্ষণে 'অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যত্ব' পদটি সন্নিবিষ্ট করায় অতীত-অনাগত বস্তু প্রভৃতিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

সিদ্ধান্তী পরিশেষে বলেন যে, লক্ষণোক্ত 'অবেদ্যত্ব' পদ দ্বারা 'সামান্যত জ্ঞানের অবিষয়ত্ব' প্রতিপাদিত হয় না; 'অবেদ্যত্ব' পদের অর্থ হইল 'ফলাব্যাপ্যত্ব'। প্রশ্ন হইল ফলাব্যাপ্য বলিতে কী বুঝায়? অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী ফলের লক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বলেন যে, "আবরণভঙ্গে চিত্ এব ফলত্বাৎ" তাৎপর্য হইল, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে বিষয়াভিমুখে গমন করিয়া বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া বিষয়াবরক যে অজ্ঞান, তাহা নাশ করিয়া থাকে। অনন্তর, ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে নির্গত অন্তঃকরণবৃত্তিতে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে বলা হয় চিদাভাস। অন্তঃকরণবৃত্তি এবং অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাস- উভয়ে মিলিতভাবে জ্ঞেয় বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানাবরণ নাশ করে এবং চিদাভাস বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই যে অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ অর্থাৎ চিদাভাসকেই 'ফল' বলা হয়। এইরূপ ফলের যাহা বিষয় হয় তাহাই হইল ফলব্যাপ্য। কিন্তু আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য ফলব্যাপ্য নয়, তাহা ফলাব্যাপ্য। সাধক যখন 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য শ্রবন, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন অখণ্ডাকারবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মাবরক যে অজ্ঞান তাহা বিনষ্ট হয়, তবে সেক্ষেত্রে বিষয়ের প্রকাশের নিমিত্ত চিদাভাসের প্রয়োজন নাই। কারণ, ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র অবেদ্য বা ফলাব্যাপ্য। এইরূপেই চিৎসুখাচার্য প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মাই হইল একমাত্র স্বপ্রকাশ এবং "অবেদ্যতে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়যোগ্যতাত্যন্তাভাবাধিকরণত্বম্"- ইহাই হইল স্বপ্রকাশত্বের নির্দোষ লক্ষণ।

পরিশেষে বলিতে হয় যে, অদ্বৈত বেদান্ত মতে, বস্তু হইল তিন প্রকার এবং সেই বস্তু গ্রাহক জ্ঞানও ত্রিবিধ। এই তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে শুক্তি-রজত হইল একজাতীয় বস্তু, ঘট-পটাদি হইল আরেকজাতীয় বস্তু এবং ব্রহ্ম হইল আরেকজাতীয় বস্তু। এই ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে শুক্তি-রজত অবিদ্যাবৃত্তিগ্রাহ্য, ঘট-পটাদি অন্তঃকরণবৃত্তিগ্রাহ্য এবং ব্রহ্ম অখণ্ডাকারাবৃত্তিবেদ্য। অদ্বৈত বৈদান্তিকগণ কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তির স্বপ্রকাশত্বের কথা বলেন না। নৈয়ায়িকাদি সম্প্রদায় যাহাকে 'জ্ঞান' বলিয়া থাকেন অদ্বৈত মতে তাহা হইল 'বৃত্তিজ্ঞান'। এই বৃত্তিজ্ঞান হইল সাক্ষীভাস্য এবং এই সাক্ষীই হইল স্বপ্রকাশ। সাক্ষীর স্বরূপ বিষয়ে ভামতী এবং বিবরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। সুতরাং সাক্ষীর স্বরূপ কী- ইহা অবশ্যই বিচারের বিষয়। বিবরণ মতে শুদ্ধচৈতন্যই হইল সাক্ষী। চিৎসুখাচার্য এই সাক্ষীস্বরূপ যে চৈতন্য- তাহারই স্বপ্রকাশত্বের কথা

বলিয়াছেন। সুতরাং, চরম জ্ঞানই হইল স্বপ্রকাশ, অন্তঃকরণবৃত্তিবেদ্য জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়। এই চরম জ্ঞানেরই অবেদ্যত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, যাহা ফলাব্যাপ্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। চিৎসুখী, ২০১৫, তত্ত্বপ্রদীপিকা, বারাণসী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন।
২। সরস্বতী, মধুসূদন, ১৯৭১, অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, তারা পাবলিকেশনস্।
৩। তর্কপঞ্চানন, বিশ্বনাথ, সম্পা.পঞ্চানন শাস্ত্রী, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ভাষা-পরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, কলিকাতা।
৪। আচার্য, পদ্মপাদ, ১৯৯৫, পঞ্চপাদিকা, দিল্লী, চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান।
৫। আচার্য, প্রশস্তপাদ, ১৯৯৭, পদার্থধর্মসংগ্রহ, কাশী, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে 'আনন্দমঠ'

সুমন মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কৈলাশহর, ত্রিপুরা

বাংলার সাহিত্য জগতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিঃ) এক অমূল্য সম্পদ। বাংলার সাহিত্যাকাশে তিনি সর্বদাই এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান। তাঁর অমূল্য সাহিত্য সৃষ্টি নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে। সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার করার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। স্বাদেশিকতা বিস্তারে তাঁর 'ভারতকলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা,' 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধ , 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ এবং 'আনন্দমঠ ',দেবীচৌধুরানী ও 'সীতারাম' উপন্যাস বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর জাতীয় আদর্শের মূল নীতি ছিল আত্মশক্তির সাধনা ও ভীক্ষানীতি বর্জন। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস দেশপ্রেমের গীতা হিসাবে চিহ্নিত।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিয়তাবাদী ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে পূর্ণভাবে বিকশিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপন্যাস বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য জগতে এক অমূল্য সৃষ্টি। ইংরেজ সরকারের সীমাহীন শোষন, শাসন ও লুণ্ঠনের ফলশ্রুতিতে ১১৭৬ সালে বাংলার করাল দুর্ভিক্ষের এক করুণ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এছাড়া একদল গৃহী ও সকল সুখভোগ ত্যাগী সন্ন্যাসী বা 'সন্তান'-দের স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গের কাহিনি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু.সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট, অরাজকতা ও অভাগার হাত থেকে স্বদেশরাণীকে মুক্ত করার শপথ তারা গ্রহণ করেছিল। সন্ন্যাসের নতুন আদর্শ প্রচার করে তারা মাতৃমুক্তি যজ্ঞে নিবেদিত প্রাণ একদল রাজনৈতিক সন্ন্যাসী গঠনের কথা বলেছেন- যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হবে মানবমুক্তি, দেশমাতার মুক্তি ও দেশহিতৈষণা। নারী-পুরুষ ধনী-দরিদ্র, সাধারণ মানুষ-সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রকৃত জনজাগরণের মাধ্যমেই দেশের মুক্তি আসবে। তাই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত সত্যানন্দের নেতৃত্বে সন্তান দলের আবির্ভাব ঘটে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট: পলাশীর যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভ বাংলার শাসন ব্যবস্থার এক আমুল পরিবর্তন করেন। নবাব নামে মাত্র ক্ষমতার অধিকারী থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নায়েবসুবা রেজা খাঁ ও সিতাব রায় কোম্পানির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দেশ শাসন করতে থাকেন। রাজস্ব নির্ধারণ সম্পর্কে ক্রমাগত নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় কৃষিরও যথেস্ট ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের এরূপ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সন) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়।

ইংরেজ কোম্পানি বাংলা ও বিহারে দেওয়ানী লাভ করার পর সমগ্র রাজস্ব ব্যবস্থায় চরম অরাজকতা আসে ও গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। দেওয়ানি লাভের পর শুরু হয় রাজস্ব বৃদ্ধি ও তা আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ চাপ। জমির উপর নির্দিষ্ট হারে খাজনা ধার্য না থাকায় কোম্পানি যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণে খাজনা আদায় করতে প্রয়াসী হয়।

রাজস্ববিভাগের পূর্বতন দক্ষ তহশিলদারদের বরখাস্ত করে একদল নূতন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।। তাদের লক্ষ্য হয় কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করার জন্য যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নবাব আলিবর্দির আমলে পূর্ণিয়া হতে রাজস্ব আদায় হত ৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু নূতন কর্মচারী নিয়োগ করার পর সেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা।

এমন সময় প্রকৃতিও বাংলার উপর রুষ্ট হল। ১১৭৬ সালে বাংলায় গ্রিস্মকাল, রোদ্রের প্রখর উত্তাপ, বৃষ্টি হয়নি, মাঠের ধানগুলি সব শুকিয়ে গেল, যারা অল্প ফসল চাষ করেছিল তা রাজ পুরুষরা সিপাহীর জন্য কিনল। লোকে আর খেতে পেত না, প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করল, তারপর এক সন্ধ্যা আধা পেট খেল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস শুরু করল। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়ালে বাংলায় কান্নার কোলাহল পরে যায়। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের শোষণ এবং প্রকৃতির অভিশাপে বাংলায় চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিবরণ: হান্টার সাহেব তাঁর' 'এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মুখবন্ধে এই করাল দুর্ভিক্ষের চালচিত্রকে তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পর পর দুই বছর অনাবৃষ্টির পর কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের জুলুমে সর্বস্বান্ত হয়ে কৃষক তার'গরু, লাঙল বেচে ফেলে ও বীজধান খেয়ে ফেলে। লোকে প্রথমে ভিক্ষা করতে শুরু করে, তারপর আর কে ভিক্ষা দেয়? শেষ পর্যন্ত পুত্র, কন্যাকে বিক্রি করতে আরম্ভ করল। গাছের পাতা, ঘাস প্রভৃতিও তারা খেতে আরম্ভ করে। এই সঙ্গে আরম্ভ হয় মারাত্মক গুটি বসন্তের মহামারি। কেউ কাউকে স্পর্শ করে না, জল দেয় না, চিকিৎসা করে না, দেখে না, মরলে ফেলে না, লোকে অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে, গৃহে বসন্ত আসলে গৃহবাসীরা ভয়ে পালায়। অন্যান্য কারণের মধ্যে অস্থায়ী গভর্নর কার্টিয়ারের অপদার্থতা ও দুর্ভিক্ষের ত্রাণে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া এই সময় বাজারে মুদ্রা সংকট ছিল। পরিবহণের অসুবিধায় খাদ্য সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্নহীন কঙ্কালসার মৃতদেহগুলি রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে। মাংসভোজী পশু, পাখীদেরও মনুষ্য-মাংসে অরুচি দেখা দেয়। দলে দলে লোকখাদ্যের আশায় কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটে আসে। গ্রাম বাংলায় যখন মৃত্যুর উৎসব চলছিল, তখন কলিকাতায় শ্বেতাঙ্গ সমাজ আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা, নৃত্য-গীত, সুরাপানে আনন্দ উচ্ছল জীবন যাপনে রত ছিল। হিকির গেজেটেও তার বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

অবশেষে ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হয়। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হলেন। সুবৃষ্টি হল, পৃথিবী শস্যশালিনী হল, যারা বেঁচে ছিল, তারা পেট ভরে খেল। অনেকে অনাহারে রুগ্ন হয়েছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করতে পারল না। অনেকে তাতেই মরুল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্য। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ি পরে পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর ভূমিখণ্ড অকর্ষিত হয়ে পরে রইল, অথবা জঙ্গলে ভরে গেল।

দস্যুরা, ডাকাতরা সোনা-রূপা-গয়না ছেড়ে চাল লুণ্ঠন করতে লাগল। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল চাল দাও, চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা চাই না। শৃগাল কুকুরের মাংস খেয়েছি, ক্ষুধায় প্রান যায়, এস ভাই, আজ বেটাকে খাই'- বলে দস্যুরা দলপতিকে খেতে প্রস্তুত হল। আরেকজন দস্যু বলল, 'রাখ, রও, রও, যদি মনুষ্য মাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে

হইবে, তবে এই বুড়ো শকুনের মাংস কেন খাই, আজ যাহা লুঠিয়াছি তাহাই খাই, এস ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই বলে কল্যানীর মেয়েকে খেতে উদ্যত হল।

সন্ন্যাসী- ফকির বিদ্রোহ: 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হল, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আন্দোলন। স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসন, শোষণ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়। বিদ্রোহীরা সবখানেই ভূমিহীন, নিরন্ন কৃষকদের সমর্থন পায়। তারা কেবলমাত্র জমিদার, মহাজনদের গৃহ ও ইংরেজদের রাজকোষ লুঠ করে। উইলিয়াম হান্টারই সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলেন। তিনি বলেন যে, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের দলে ছিলেন মুগল সম্রাজ্যের ভাঙনের ফলে বেকার সেনাগণ, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক শ্রেণি, সন্ন্যাসী- ফকিরা যারা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত, তারাই ছিল বাংলা-বিহারের কৃষক সন্তান এবং অন্ন-বস্ত্রের জন্যে তারা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে। এই বিদ্রোহীরা অনেকে সন্ন্যাসী ও ফকিরের বেশ নেয়।

তখন বাংলা জুড়ে দলে দলে সন্ন্যাসী আসত। তারা ছিল দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, যুদ্ধবিশারদ এবং নানা গুণে গুনবান। তাঁরা সচরাচর একপ্রকার রাজবিদ্রোহী-রাজার রাজস্ব লুণ্ঠন করত, বলিষ্ঠ বালক পেলেই অপহরণ করে সুশিক্ষিত করে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করত, এ জন্য তাঁদের ছেলে ধরা বলত। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সত্যানন্দ ঠাকুর, ভবানন্দ ঠাকুর, জীবানন্দ ঠাকুর, ধীরানন্দ ঠাকুর, জনানন্দ ঠাকুর, নবীনানন্দ বা শান্তি, মহেন্দ্র প্রমুখগণ। এই সন্তানদের মূল মন্ত্র ছিল ‘বন্দেমাতরম’। তাঁরা একে অপরকে ‘বন্দেমাতরম’ বলে সম্বোধন করত। ধবংসপ্রায় কৃষকরা এই নেতাদের ডাকে উপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। দলে দলে সন্তানরা এসে ভবানন্দ, জীবানন্দের পায়ে প্রণাম করে, দলবদ্ধ হয়ে দিগ্ দিগন্তে মুসলমানকে শাসন করতে বের হল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরে মারপিট করে, কখনো প্রাণবধ করে, যেখানে সরকারি টাকা পায়, লুট করে, মুসলমানের গ্রাম পেলে দগ্ধ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে সৈন্য পাঠায়,কিন্তু সন্তানদের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হতে পারে না।

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে সন্তানদের উপদ্রব বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রথমে ফৌজদারি সৈন্য দ্বারা বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন কিন্তু ফৌজদারি সৈন্যের এমন অবস্থা হল যে, কোনো বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনলে পালাত। অতএব নিরুপায় দেখে ওয়ারেন হেস্টিংস ক্যাপ্টেন টমাসকে সেনাপতি করে একদল সৈন্য বিদ্রোহ নিধারণে পাঠান। কিন্তু সন্তানদের ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে বিরাট সংখ্যক ইংরেজ সৈন্যও কোনো কিছু করতে পারেনি। ঢাকার ইংরেজ কুঠি, রাজশাহীর রামপুর কুঠী আক্রান্ত হয়। ১৭৬৭ খ্রিঃ পাটনায় জমিদারদের গৃহ আক্রান্ত হয়। ১৭৭০ খ্রিঃ পূর্ণিয়ায় ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। বিদ্রোহীরা দিনাজপুর ও উত্তর বাংলায় মহাস্তানগরের প্রাচীন দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং মজনু শাহের নেতৃত্বে ইংরাজ সেনাপতি লেঃ টেলরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মজনু বিহারে চলে যান। মজনুর প্রভাবে কৃষকরা ইংরেজকে কর প্রদান বন্ধ করে। ১৭৭২ খ্রিঃ রংপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা ইংরাজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন-টমাসকে নিহত করে ও ইংরাজ সেনাকে পরাস্ত করে। ১৭৭৩ খ্রিঃ ১লা মার্চ সন্ন্যাসী-ফকির যোদ্ধাদের আক্রমণে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডসের বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। এডওয়ার্ডস নিহত হন। ১৭৭৬ খ্রিঃ থেকে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে আত্মকলহের ফলে বিদ্রোহীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা

পৃথক ভাবে ইংরাজদের বাধা দেন। এরপর ভবানী পাঠক পরাজিত ও নিহত হন। দেবী চৌধুরানীও পরাস্ত হন। ইংরেজের দমন নীতির ফলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের অবসান হয়।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব: বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপন্যাসে তৎকালীন বাংলার জন জীবনের এক করুণ কাহিনি ফুটে উঠেছে। মন্বন্তরের কবলে পরে বাংলার মানুষের দুর্বিষহ অবস্থার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সপ্তদশ শতকের ৭০'-এর দশকের বাংলার ধর্ম, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের এক সুস্পষ্ট ধারণা এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসন ও শোষণের ভয়াবহতা এবং ব্রিটিশ আশ্রিত রাজস্ব কর্মচরীদের সীমাহীন প্রজা শোষণ ও অত্যাচারের নিষ্ঠুর চিত্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলন এই উপন্যাসকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হলেও এই বিদ্রোহ পরবর্তীকালে এক দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলন ক্ষুধার্ত চাষি, সম্পত্তিচ্যুত জমিদার ও কর্মচ্যুত সৈনিকদের সমর্থনে এক ভয়াবহ রূপ নেয়। মানুষ দলে দলে 'সন্তান' দলে, অংশ নেয়। 'সন্তান' দুলের 'বন্দেমাতরম' সংগীত জাতীয়তার মূল মন্ত্র রূপে গৃহীত হয়। পরবর্তী কালে 'বন্দেমাতরম' সংগীত ভারতের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে জাতীয়তার মূলমন্ত্র, উৎস ও প্রেরণায় পরিণত হয়, এই সংগীত স্বাধীন ভারতের সংবিধানে 'জাতীয় গীত' হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলার সন্যাসী-ফকির ও 'সন্তান' দলের শসস্ত্র আন্দোলন ব্রিটিশ সরকরের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহীদের অস্ত্রের আঘাতে বহু ইংরেজ সৈন্যের রক্তে ভারতমাতা পবিত্র হয়ে উঠেছিল। বলাবাহুল্য, ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের 'গীতা' স্বরূপ বিবেচিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- ‘আনন্দমঠ’,
গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী— ‘বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠ’
কালীপ্রসন্ন ঘোষ— “আনন্দমঠের মূলমন্ত্র”, ‘বান্ধব’, ৭ম বর্ষ;
কিরণশঙ্কর রায়— “আনন্দমঠ”, ‘সবুজপত্র’, ১৩২৬;
ললিতচন্দ্র মিত্র— ‘স্বদেশ প্রতিমা’;
অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত— ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ পৃ. ৩০৮-৩৩৮;
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ‘বঙ্কিম-জীবনী’, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৮৬-৩০৩;
পূর্ণচন্দ্র বসু— ‘কাব্যসুন্দরী’, পৃ. ২০০-২২৩।

নবনীতা দেবসেনের গল্পে নারী : স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে

সন্দীপ মুখার্জ্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীর একমাত্র কন্যা নবনীতা দেবসেন ওরফে খুকু। জন্মেই যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নাম-প্রাপ্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হয়েছিলেন।'ভালো-বাসা' বাড়ির সাহিত্যিক আড্ডায়, শিশু সাহিত্যিক বাবা-মায়ের স্নেহ-সাহচর্যে, শিক্ষায় ও সাহিত্যের আবহাওয়ায় নবনীতা দেবসেনের সাহিত্য মনস্কতা সৃষ্টি হয়েছিল। কবিতার মাধ্যমে হাতেখড়ি হলেও অচিরেই তিনি গদ্য সাহিত্যের জগতেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তবে নবনীতা দেবসেনের সাহিত্য রচনায় নারীরা বলিষ্ঠরূপে উঠে এসেছে।আসলে নবনীতা দেবসেন নারীদের সামনের সারিতে এগিয়ে দিতে বহু চেষ্ঠা করেছেন। নারীদের 'কর্তা'র আসনে বসাতে চেয়েছেন তিনি। ফলত, তাঁর বেশিরভাগ গল্পেই নারীদের ক্ষমতায়নের তথা অগ্রগমনের পদধ্বনি শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেনের 'গল্পসমগ্র'-এর চারটি খণ্ডের অন্তর্গত 'ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা', 'অপারেশন ম্যাটারহর্ন', 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ', 'নাট্যারম্ভ', প্রভৃতি গল্পে নবনীতা দেবসেন নারীজীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছেন। যেখানে ভারতবর্ষীয় মেয়েরা অনায়াসেই দেশে-বিদেশে আত্মনির্ভরশীল হয়ে পাড়ি দিতে পারে, ম্যাটারহর্নের দক্ষিণ মুখ অভিযানের উদ্দেশ্যে সাহসী পদক্ষেপ ফেলতে পারে, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে পারে। প্রতিটি গল্পেই নারীচরিত্র এক স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল।

এর পাশাপাশি নবনীতা দেবসেনের 'সীতা থেকে শুরু' এবং 'সপ্তকাণ্ড'-এর অন্তর্গত গল্পগুলিতে পৌরাণিক নারী চরিত্রের নবরূপায়ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।লঘু হাস্যরসে পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলির আঁতের কথাকেই যেন তুলে ধরেছেন নবনীতা দেবসেন। তাঁর কলমে সীতা দৃপ্ত প্রতিবাদী চরিত্র, শূর্পণখা কান-নাক কাটা নয় বরং অতীব সুন্দরী, স্বনির্ভরশীল, স্বাধীনা। যে ঊর্মিলাকে রামায়ণে খুঁজেই পাওয়া যায় না; সেই ঊর্মিলা নবনীতা দেবসেনের কলমে বড্ড অভিমানী ও প্রতিবাদী। নবনীতা দেবসেনের নারীরা কখনো ভালোবাসায় মাতৃস্বরূপিনী কখনোবা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। প্রগতিশীলতা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, মানসিক শক্তি ও সাহস, আত্মবিশ্বাস, উদ্দীপনা নবনীতার মেয়েদের ক্ষমতায়নের পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

সূচক শব্দ : নারী, পুরুষতন্ত্র, প্রগতিশীল, পৌরাণিক নারী, প্রতিবাদী, ব্যতিক্রমী, আত্মমর্যাদা।

মূল আলোচনা :

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।[১]

রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্নের মাঝেই বিগত দুই শতাব্দী পূর্বে সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। যে সমাজে মেয়েরা দুর্বল হিসাবে বিবেচিত ছিল, যেখানে মেয়েদের মুক্তচিত্তে কথা বলার অধিকার ছিল না, যে সমাজ মেয়েদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার বিরোধী ছিল; সেই সমাজের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন উনিশ ও বিশ শতকের বহু বুদ্ধিজীবী, সমাজসংস্কারক, চিন্তাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকেরা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ সুগম না থাকলেও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ-প্রতিরোধের মাধ্যমে মেয়েরা ক্রমশ আত্মশক্তি স্ফূরণের অবকাশ পেয়েছে। শিল্পায়নের প্রসার ও প্রচারও ক্রমবিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ প্রভৃতি রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও বিপুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ক্রমশ এই ঘটনাবর্তে শিথিল হয়ে পড়ে পারিবারিক রক্ষণশীলতার শৃঙ্খল। ফলত, স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে মেয়েদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার সূত্র ধরেই মেয়েরা ক্রমশ বিভিন্ন পেশাকে অবলম্বন করে বহির্বিশ্বে ছুটে বেড়াচ্ছে। সমাজ পরিবর্তনের এই বাস্তব দলিল উঠে এসেছে আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, কবিতা সিংহ প্রমুখ কথাকারদের কলমে। বিশ শতকে নবনীতা দেবসেনের কলমেও নারীজীবন নিয়ে নানারকম পরীক্ষণমূলক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবনীতা দেবসেনের হাতে বিশ শতকের নারীরা ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, দৃপ্তময়ী ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এমনকি তারা কর্মসূত্রে আন্তর্জাতিক দেশগুলিতেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিজীবনের সাফল্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতার স্বপ্নে মশগুল বিশ-একুশ শতকের মেয়েরা। মেয়েদের সমাজ-ইতিহাসের দীর্ঘ লড়াইতে, দাবি-দাওয়ার মাধ্যমে অর্জিত বিষয়গুলি যেন বর্তমানে সাধারণ অধিকারে পর্যবসিত হয়েছে। তবু সমাজ-মানসিকতার গভীরে চোরাস্রোতে বয়ে চলেছে পুরুষতন্ত্রের ধারা। নবনীতা দেবসেন তা উপলব্ধি করতেন বলেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

> আমার লেখা তো সবই নারীকেন্দ্রিক, রূপকথাও নারীপ্রধান, আমার নারীবাদটুকু সর্বত্র ছড়িয়ে মিশিয়ে রয়েছে। আমার চেষ্টা মেয়েদের স্থানটি সামনে এগিয়ে নিয়ে আসা। 'কর্ম' থেকে সরিয়ে 'কর্তার' জায়গায় বসানো। আমার পৌরাণিক গল্পগুলিও তাই। সমাজের শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত করে দিতে হবে নারীবাদীভাবনা, নারীরা ক্ষমতা, নারীর প্রতি সম্মান। সেটা আলতো হাতেই তো ভালো। তাই না? পুরুষবিদ্বেষ অদরকারি। নারীবাদ মানে পুরুষবিদ্বেষ নয় কিন্তু। একটা ভ্রান্তিপূর্ণ সিস্টেমের বিরোধিতা করা হচ্ছে, যেটা পুরুষের তৈরি। এখন চিন্তাশীল পুরুষরাও যার বদল চাইছেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের নাতি-নাতনিদের জীবিতাবস্থায় নারীবাদ শব্দটা পৃথিবীতে পুরোনো আর বাসি হয়ে গেলেই ভালো। দূরের দিকে চেয়ে আমাদের এমন সাহিত্য রচনা করা উচিত, নারীবাদ অদরকারি হয়ে গেলেও যার শৈল্পিক মূল্য ফুরিয়ে যাবে না।[২]

এই ভাবনা থেকেই নবনীতা দেবসেনের গল্পে মেয়েদের উত্তরণের ছবি পাওয়া যায়।

নবনীতা দেবসেনের গল্পের বেশিরভাগ জায়গা জুড়েই আছে নারী। রূপকথা, পৌরাণিক গল্পের পাশাপাশি তাঁর আত্মজীবনী কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে নারীদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়াস আছে। তাঁর গল্পে মেয়েদের নিজস্ব জীবন, জগৎ ও অনুভূতির প্রকাশের পাশাপাশি নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবনীতা দেবসেনের 'গল্পসমগ্র'১ম খণ্ডের অন্তর্গত 'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পে লেখিকা নবনীতা দেবসেনের আত্মজীবনের ছবি ধরা পড়েছে। গল্পে নবনীতা দেবসেনের ব্যক্তিত্ব, মানবিকতা ও সাহসী

কার্যকলাপ সমাজের ধারণাকেই বদলে দেয়। কার্নিশে আটকে পড়া বুনো হুলো বেড়াল উদ্ধারের জন্য নবনীতা দেবসেন নিজেই বীরত্বের সঙ্গে তেতলার কার্নিশে নামতে উদ্যত হয়েছেন। ম্যাটারহর্নের অভিযাত্রী নবনীতা দেবসেনের কাছে সামান্য কার্নিশে ওঠা যেন অতি সহজ কাজ। সমাজের ধারণায় মেয়ে বলে তিনি পিছিয়ে নেই; বরং তিনি নির্ভয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, চুল শক্ত করে বেঁধে কার্নিশে নামার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছেন। মেয়ে হয়েও তিনি অনায়াসেই রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। অন্যদিকে কার্নিশ থেকে বিড়াল নামানোর জন্য তিনিই দমকলের অফিসারদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে জিতে কাজ হাসিল করেছেন। এ গল্পে নবনীতা দেবসেনের পুরুষোচিত সাহস, বীরত্ব ও বাস্তবতা প্রশংসার দাবি রাখে।

'ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা' গল্পে নবনীতা দেবসেনের বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সেমিনারে নবনীতা দেবসেনের আহ্বান ভারতীয় নারীদের অবস্থানকে এগিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু পাসপোর্ট, ভিসা, প্লেন মিস করার ঘটনাগুলি নবনীতা দেবসেনের অপদস্থের পরিচয় প্রকাশ করলেও তাঁর অজেয় মানসিকতা প্রশংসার দাবি রাখে। জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই হেরে যাওয়া নয়; বরং সুটকেস, ভিসা, পাসপোর্ট হারিয়েও এক অদ্ভুত জীবনীশক্তিতে বিপদ থেকে উদ্ধারের ইতিবাচক মানসিকতা নবনীতা দেবসেনের মধ্যে দেখা যায়।

'অপারেশন ম্যাটারহর্ন' গল্পে দুই ভারতীয় নারীর সাহস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও অদম্য মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবনীতা দেবসেন ও রেণুকা মাউন্টেনিয়ারিং না শিখেও ম্যাটারহর্নের দক্ষিণ মুখ জয় করার অদম্য সঙ্কল্পে স্থির থেকেছে। হাঁপানির রোগী হয়েও নবনীতা দেবসেন হাড়কাঁপানো শীতকে অগ্রাহ্য করে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে অ্যাডভেঞ্চারের মানসিকতায় অভিযানে অগ্রসর হয়েছে। তবে লেখিকারা যে সময় পর্বতারোহণে বেরিয়েছেন সেই সময়ও ভারতবর্ষের মেয়েদের পর্বতারোহণের তেমন চল ছিল না। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলার মেয়ে নবনীতা দেবসেন আর তামিলনাড়ুর মেয়ে রেণুকা ম্যাটারহর্নের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। নবনীতা দেবসেন এই গল্পে শুধুমাত্র যে নিজেদের দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, এমন নয়। বিশ্ব নারীবর্ষে এক জাপানী নারীর এভারেস্ট শিখর জয় করার সংবাদদানের মাধ্যমে নারী-প্রগতিকেই তুলে ধরতে চাইলেন। লেখিকা এভাবেই নারীরজয় গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন।

'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ' গল্পে শিক্ষিত প্রগতিবাদী গীতুকে পাওয়া যায়। নগরকেন্দ্রিক ভোগবাদী জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে গীতু তার আপন সত্তাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্বাধীনভাবে, স্বাবলম্বনের সঙ্গে বাঁচার স্বাদ পেয়েছে সে। অন্যদিকে পরিবারের জাঁতাকলের মাঝে পড়ে একদা 'ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ন' সমস্ত শখ, আহ্লাদ, স্বাবলম্বন, স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে ক্রমশ আত্মক্ষয় করেছে। তবে এ গল্পে গল্পকথকের আত্মপ্রতিষ্ঠার চরম আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গও প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে গল্পকথক বলেছেন :

> ...ওদের ওই জান-প্রাণ দিয়ে কেরিয়ার গড়াটাতে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে ভাই। ওদের এয়ারকনডিশনড অফিসের চেয়ার টেবিলগুলো যেমন ফ্যাশনেবল আর কমফরটেবল, ওদের লাইফগুলোও তাই – আর লোকগুলোও সব একজাতের। একটাকে চিনলেই সবগুলোকে চেনা হয়ে যায়।[৩]

সেজন্যেই গল্পকথক আত্মশক্তির জাগরণের জন্য গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে ফিলসফির শিক্ষিকা হতে চেয়েছেন। স্বামী, সংসার, সন্তানদের জন্য নিজের ভেতরের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি দমিয়ে রাখতে পারেননি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে নিজস্ব পরিসর গড়ে তোলার প্রয়াসের মাধ্যমে যেমন ভোঁতা পারিবারিক আবেষ্টনী থেকে বহির্জগতে পা রাখার চেষ্টা রয়েছে, তেমনই হারিয়ে যাওয়া শখ-আহ্লাদকে পুনরায় জাগিয়ে তুলে'আত্মানং বিদ্ধি'র পথে চলার প্রয়াসও ধরা পড়েছে।

'জোবান সুজিকি' গল্পে একদিকে নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের শাসন, অন্যদিকে নারীর স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। এ গল্পে উন্নয়নশীল জাপানে নারীদের বিপরীত অবস্থানের ছবি ফুটে উঠেছে। পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের প্রতীক তানাবে তার স্ত্রীকে গৃহমধ্যে বন্দী করে রাখে। শুধু তাই নয় স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করলে তোশিও তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতেও দ্বিধান্বিত নয়। পুরুষশাসিত সমাজের নির্দয়তা এ গল্পের পরতে পরতে লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি জাপানের রেস্তোরাঁতে মেয়েদের স্বাধীনভাবে পুরুষসঙ্গী ভাড়া করে নিয়ে যাবার আধুনিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাও নজর এড়ায় না। 'জোবান সুজিকি' গল্পে জাপানী মেয়েদের এই বিপরীত আর্থ-সামাজিক অবস্থান তুলে ধরেছেন লেখিকা।

'সুটকেস' গল্পেও এক গৃহস্থ নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারের চাহিদা, দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে বিবাদ-অশান্তির মধ্যে অসহিষ্ণু সলাজনয়নী দেবী প্রতিবারই বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুটকেস নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়ে সলাজনয়নী দেবী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ ফেলেছে।

'দাদামণির আংটি' গল্পেও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ধরা পড়েছে। এ গল্পে বৌদির প্রতিবাদী সত্তা, বুদ্ধিমত্তা, বাকচাতুর্য প্রশংসার দাবি রাখে। বৌদি ও দাদামণির দাম্পত্য কলহে বারবারই পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপ ও উইমেন্স লিবারেশনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সাধরণত মেয়েদের বিবাহের পর রান্নাঘরের মধ্যেই মেয়েদের জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। দাদামণির ও বৌদির দাম্পত্য কথোপকথনের এক টুকরো ছবি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে :

> 'নিকুচি করেছে কিচেনের।' ...কে চায় পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে?নোংরা, জায়গা, কেবল অ্যামবিশান দিয়ে ভর্তি, আর লোভ দিয়ে। তোমরা ভাবো মেয়েদের আর কাজ নেই, কেবল পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশের জন্যে হন্যে হয়ে আলি-গালি খুঁজছে?– সে-সব দিন আর নেই গো-গন ফরেভার! ওইসা দিন ঔর নেহী আয়েগা – বুঝলে স্যার।[৪]

এই গল্পে এভাবেই বর্তমানে মেয়েদের অবস্থার অগ্রগতির পদধ্বনি শোনা যায়। মেয়েরা আর ভীরু কাপুরষ নেই। পুলিশের সামনেও তাই দিব্যি প্রতিবাদী কণ্ঠে তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারে।'সেদিন দুজনে' গল্পের গিন্নি চরিত্রটিও দাদামণির স্ত্রীর তুলনায় কম নয়।রেন-ওয়াটার পাইপ বেয়ে গিন্নির তালাবদ্ধ ঘরে ঢোকার দুঃসাহস, মধ্য-আকাশে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাসপোর্টের চিন্তা প্রভৃতি ঘটনাগুলির মাধ্যমে গিন্নির, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রসিকতা ও এক আবেগী প্রাণচঞ্চল জীবনের সন্ধান দেয়।

'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পের নারী চরিত্রটি হলেন স্বয়ং নবনীতা দেবসেন। তিন প্রজন্মের প্রেমের বিবর্তন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় লেখিকাকে। অন্য উপায় না পেয়ে নিজের দুই কন্যার বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি আধুনিক প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের

প্রেমভাবনা জানতে পেরেছেন। এ গল্পে নবনীতা দেবসেনের চরিত্রটি হাস্যরসের মোড়কে, বন্ধুত্বের স্নেহস্পর্শে গড়ে উঠেছে।

নবনীতা দেবসেনের 'গল্পসমগ্র'২য় খণ্ডের অন্তর্গত 'নাট্যারম্ভ' গল্পে নারী চরিত্র হিসাবে পুপসি, বন্দনা, শমিতাকে পাওয়া যায়। এ গল্পে জার্নালিস্ট পুপসি প্রগতিবাদী মানসিকতায় বিশ্বাসী। নিজের ইচ্ছেমত সে তার বিবাহের পাত্র নির্বাচন করেছে। বিয়ের সময় বাঙালীদের প্রথানুযায়ী ভারী শাড়ি, গয়না পরারএবং সামাজিক রীতি-নীতি নিয়ম কানুনের সম্পূর্ণ বিরোধী সে। তাই তার শাশুড়ি কান ফুটো করার কথা বললে পুপসি বলেছে :

> কানে ফুটো? যত পৈশাচিক, বর্বর কাণ্ডকারখানা। গয়না কে পরতে চায়? না। করবে না পুপসি কানে ফুটো। তাতে আর্শীবাদ না হয়, না হবে।[৫]

আসলে পুপসি সমাজের এই বার্বারিক প্র্যাকটিসকে ঘৃণা করে। এ গল্পে পুপসির মা শমিতাও কলেজ শিক্ষিকা। তিনিও মেয়ের মতনই প্রগতিশীল মানসিকতায় বিশ্বাসী। তিনি লিভ টুগেদার-এ বিশ্বাসী, বিয়েতে নয়। তাই দিনক্ষণ, লগ্ন, জাতি, রাশি মেনে বিয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী সে। তবে পুপসির শাশুড়ি বন্দনা, পুপসি বা শমিতার মতো অতটা প্রগতিশীল না হলেও রক্ষণশীল দজ্জাল শাশুড়িও নয়। এ গল্প থেকে পাঠক অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারেন যে সমাজে ধীরে ধীরে নারীদের অবস্থানের উন্নতি হচ্ছে। ফলত মেয়েদের মানসিকতাতেও ক্রমশ বদল আসতে শুরু করেছে।

'মেজকাকিমার গল্প'-এ মেজকাকিমার ব্যতিক্রমী চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। সেলস রিপ্রেজেনটেটিভদের প্রতি মেজকাকিমার দয়া-মায়া-মমতা বিশ শতকেও দুর্লভ। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের প্রতি মেজকাকিমার স্নেহশীলতা প্রশংসনীয়।

'সীতা থেকে শুরু'-র দ্বিতীয় পর্বের 'মাতৃয়ার্কি' গল্পে নারীভাবনার প্রয়াস ধরা পড়েছে। তিন প্রজন্মের মাতৃতান্ত্রিক সংসারের 'উজ্জ্বল, মননশীল, ব্যস্ত, মায়ারী, হাসি-ঝলমলে'[৬] চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে এ গল্পে। এ গল্পের শুরুতেই লেখিকা নারী প্রসঙ্গে বলেছেন:

> মেয়েরা দু'জাতের। একদল মাতৃতান্ত্রিক বাই নেচার, এঁরা সংখ্যালঘু কিন্তু শক্তিতে লঘু নন মোটেই। বাকিরা পিতৃতান্ত্রিক, অবলা। এঁদের কল্যাণেই জগতে পুংশাসিত সমাজে নারীর আজ এই দুরবস্থা। প্রথম জাতের মেয়েতে জগৎ পরিপূর্ণ থাকলে 'উইমেন্স লিব মুভমেণ্ট'-এর প্রয়োজন হত না। কেননা তাঁরা বাল্যে পিতাকে, যৌবনে পতিকে এবং বার্ধক্যে পুত্রকে অনায়াস-অঙ্গুলি সঞ্চালনে পদানত রাখেন। শুধু পুরুষজাতি কেন, তাবৎ মনুষ্যসমাজ তথা সসাগরা বসুন্ধরা তাঁদের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব মেনে নেয়। এঁরা এঁদের জীবনের সব কিছুকেই অনায়াস স্বায়ত্ত্ব-শাসনে রাখেন। দ্বিতীয় কোনো শক্তির তোয়াক্কা করেন না।[৭]

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমাদের সমাজে এখনও এই দুই ধরনের নারীই রয়েছে। নবনীতা দেবসেন নিজেকে অবলা বললেও তাঁর মা রাধারানী দেবীকে তিনি প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্তমানে তিনি মহারানীর আসনে বসে কর্তৃত্ব ফলান। অন্যদিকে নবনীতা দেবসেন মহারানীর শাসনে বশংবদ প্রজা। সময়েরদিক থেকে নবনীতা দেবসেন আধুনিক হলেও মানসিকতায় তার মা অনেক বেশি প্রগতিশীল। নবনীতা দেবসেন তার মাকে রাসসুন্দরী দেবীর মতো আত্মজীবনী লিখতে বললে তার মায়ের উত্তরে প্রগতিশীল ভাবনার প্রকাশ ধরা পড়েছে:

> তোরা উইমেন্স লিবারেশন করিস অথচ ভাবনার বেলায় সেই পুরুষের মতো মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরই তুলনা করিস। কই বলতে পারলি না তো 'জীবনস্মৃতি'র মতো? কি গান্ধীজীর অটোবায়োগ্রাফির মতো? আর বিনোদিনীর মতো বলতেই অমনি বললি 'তা কেন'? কে নয়? বিনোদিনীর জীবনই তো বেশি মূল্যবান, শিল্পী-জীবন।[৮]

এই ভাবনা একুশ শতকের সকল মেয়ের মধ্যে থাকলে তবেই প্রকৃত স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করা যায়। রাধারানী দেবীর মধ্যে যেমন পুরুষ বিদ্বেষ ছিল না, তেমনই নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

'সীতা থেকে শুরু'র তৃতীয় পর্ব 'আধুনিকী'তে অন্তর্ভুক্ত 'এলিজাবেথান সিস্টেম' গল্পে আধুনিক নারীসমাজের চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এলিজাবেথান সিস্টেম চালু হলে মেয়েদের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়া দরকার। এলিজাবেথান সিস্টেম চালু হলে ভারতীয় সমাজ থেকে পণপ্রথা, ডিভোর্স, খোরপোশের মামলা, শাশুড়ি-বউমার ঝামেলা চিরতরে দূরীভূত হবে বলে মনে করেন দাদামণি-বৌদি। কিন্তু এই সিস্টেমে মেয়েরা বিবাহ না করেও মাতৃত্বের অধিকারী হতে পারবে, শ্বশুরবাড়িতে না থেকে বাপের বাড়িতেই থাকতে পারবে। কিন্তু ছেলেরা বিবাহ না করে পিতৃত্বের দাবি করতে পারবে না। ফলত বংশরক্ষা হবে না। তাই এলিজাবেথান সিস্টেম বিদেশে চালু হলেও আমাদের ভারতবর্ষেও তা চালু হলে সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসবে। এবং সেই পরিবর্তন যে সর্বদাই সুখকর হবে এমন নয়। ভারতীয় জলবায়ু, রীতিনীতি, সংস্কার, মানসিক গঠন, অর্থনৈতিক-সামাজিক গঠন সবদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এ সিস্টেম ভারতবর্ষের জন্য নয়। বৌদি এক সামান্য গৃহবধূ হয়েও ভারতীয় সমাজের এই কঠিন সত্যটি চিনে নিতে ভুল করে নি। বৌদির বোধগম্যতার দূরদৃষ্টি আছে সন্দেহ নেই।

'পরভৃৎ' গল্পে এক স্কুল শিক্ষিকা সরমার পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধরা পড়েছে। এ গল্পে সরমার আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র ভাবে ধরা পড়েছে। গর্ভপাতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরমা তার স্বামী সৌমেনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হেনেছে। সন্তান হল স্বামী-স্ত্রীর একান্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষার ফসল। কিন্তু সরমা জানতে পারে তার গর্ভের ভ্রুণবীজ সরমার গর্ভে বড় হলেও তা আসলে অন্যের আকাঙ্ক্ষার ফসল। সরমার মধ্যে সৌমেন আসলে রুণ্টুকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। ফলত সরমা ও সৌমেনের মধ্যে পবিত্রতার লেশমাত্র ছিল না। তাই সরমার গর্ভপাতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পুরুষের কামুকতা, চরিত্রহীনতা ও প্রতারণার প্রতি একদিকে দৃঢ় প্রতিবাদ, অন্যদিকে তার আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস রক্ষা করার প্রয়াস ধরা পড়েছে।

নবনীতা দেবসেনের 'গল্পসমগ্র'৩য় খণ্ডের অন্তর্গত 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ', 'স্বপ্নের মতো,' 'বামন-মুচি-রাজা' প্রভৃতি গল্পে নারী পরিসর ধরা পড়েছে। 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ' গল্পে কিম্বার্লি মেসনের ক্রূরতা, হিংস্রতা ও প্রতিশোধস্পর্শী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে নবনীতা দেবসেনের বেশিরভাগ গল্পেই নারীর কমনীয়তা, সহানুভূতি, দয়া, মায়া, মমতা, ভালোবাসার প্রকাশ দেখা যায়, যেখানে নারী চরিত্রের এমন ক্রূরতার প্রকাশে গল্পটি ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই। কিম্বার্লি মেসন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে কেরিয়ারের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলেও 'বিষকন্যা' কিম্বার্লি মেসন ভিত্তোরিওর প্রতিষ্ঠা মেনে নিতে পারেনি। তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ভিত্তোরিওকে বিবাহ করে তার জীবনটা নরক করে তুলেছে। কিম্বার্লি

মেসনের মতো এমন স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক প্রতিহিংসাপরায়ণ নারী নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যে বিরল।

'স্বপ্নের মতো' গল্পে নবনীতা দেবসেন নিজেই স্বতন্ত্র চরিত্ররূপে উপস্থিত হয়েছেন। গেস্টহাউসে রাত্রিযাপনের ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার মধ্যে অবিচল থাকার মানসিকতা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা। এ গল্পে লেখিকার ডাকাবুকো চরিত্রের পাশাপাশি তাঁর ভ্রমণসুলভ মানসিকতাও ধরা পড়েছে। 'বামন-মুচি-রাজা' গল্পে অভিষেকের প্রাক্তন প্রেমিকা জয়ার মহত্ব, উদারতা, নির্ভীকতা, সাহস ও দৃঢ়তায় নারীর নিজস্ব পরিসর অনুসন্ধানের প্রয়াস ধরা পড়েছে। 'দেশের চিঠি' গল্পে মা ও মেয়ের প্রগতিশীলতা, আধুনিক মনস্কতার পরিচয় রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরোনোর প্রয়াস আছে মা ও মেয়ের চিন্তা-চেতনায়। চৌত্রিশ বছর দাম্পত্য সংসার কাটানোর পরেও যে সংসারে একজন স্ত্রী তার ঘরের মেয়ে হয়ে উঠতে পারে না; বরং 'পরের মেয়ে'র তকমা গায়ে নিয়ে জীবন কাটাতে হয় সেই সংসারের পিতা যে কখনোই কন্যার স্বেচ্ছা পাত্রনির্বাচন, স্বনির্ভরতা ও লিভ-টুগেদারের ধারণাকে মেনে নিতে পারবে না, সেটাই স্বাভাবিক। তাই ফুলটুসির মা কন্যার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রীতি-নীতি, প্রথাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তাই কন্যাকে মনোবল জোগাতে বলেছেন:

> তোমার মন শক্ত রেখো- 'বাবা শুয়ে পড়েছেন বিয়ের খবর শুনে'এই কথা ভেবে মুষড়ে পোড়ো না। এখানে বাবার শুয়ে পড়াটা তাঁরই ভুল চিন্তার ফল। ....তাছাড়া উনি নিজেই এ বাড়ির সর্বময় কর্তা। যাবতীয় সিদ্ধান্তই সব একা একা নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। হঠাৎ তুমি তাতে বাগড়া দিলে। নিজের জীবন নিয়ে দিব্যি নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে। তাঁর সঙ্গে একটা পরামর্শও করলে না, অনুমতি চাইলে না, কেবল শুভ সংবাদটি পরিবেশন করলে, এজন্যও তাঁর মনমেজাজ বিগড়ে থাকতে পারে। তুমি বা রবার্ট এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। এটা ওঁর অহং-এর প্রশ্নে ঘটেছে। তোমাদের কোনও ত্রুটির কারণে নয়। ওঁর শুয়ে পড়াটা শারীরিক কোনও দুর্যোগের ফলে হয়নি, হয়েছে মানসিক দুর্যোগে।[৯]

ফুলটুসির মা সংসারে কোনোদিন নিজস্ব সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কিন্তু কন্যার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভর মানসিকতার প্রকাশ দেখে গর্ব অনুভব করেছেন।

নবনীতা দেবসেনের গল্পের পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলিও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। 'সীতা থেকে শুরু' গ্রন্থের তিনটি পর্বই নারী কেন্দ্রিক। কাহিনির সময়কালের নিরিখে তার নামকরণও করা হয়েছে। 'পৌরাণিকী'তে মহাকাব্যের বঞ্চিত, অবহেলিত নারীদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেন বলেছিলেন :

> এই বইয়ের গল্পগুলি সবই মেয়েদের নিয়ে। 'সীতা থেকে শুরু' নামের কিঞ্চিৎ ভণিতা দরকার। মহাকাব্য পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হতো এই বীর্য-বাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষের যুদ্ধকাব্যের জগতে নারীর ঠাঁই বড় করুণ। সে লক্ষ্মীই হোক আর অলক্ষ্মীই। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাড়কাই হোক বা শূর্পণখা, যেন দুঃখ পেতেই তাদের জন্ম। তাদের দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়।[১০]

এই ভাবনা থেকেই নবনীতা দেবসেন তাঁর গল্পের পৌরাণিক নারীদের প্রভাবশালিনী, আত্মপ্রতিষ্ঠ ও দীপ্ত প্রতিবাদী চরিত্ররূপে উপস্থাপন করেছেন। 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে তাই শূর্পণখা অনায়াসেই বলতে পারে :

> আমি প্রভাবশালিনী, স্বচ্ছন্দগামিনী আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীনা।... স্বেচ্ছায় দুর্বল না হলে দেব দানব যক্ষ রক্ষ মানুষ বা পশু কেউই আমার বল হরণ করতে পারে না।[১১]

'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পে নবনীতা দেবসেনের সীতা চরিত্র নির্মাণও বেশ ব্যতিক্রমী। গভীর অভিমানে নবনীতার সীতা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে বলতে পারেন :

> অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ-পত্নীকে যিনি স্বমহিমায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না, বরং ভীরুর ন্যায় নির্বাসন দিয়ে মন্দজনের নিন্দাবাক্যকেই জয়ী করেন, সেই দুর্বল, প্রবঞ্চক, অসাধু প্রেমিকের অন্নবস্ত্র আশ্রয় আমার আর আকাঙ্ক্ষিত নয়।[১২]

সীতার চরিত্রের এই তেজস্বিতা মূল রামায়ণে দেখা যায় না। 'অম্বোপাখ্যান' গল্পেও শাল্বর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত অম্বা যে ভীষ্মের প্রণয়াকাঙ্খী সেটি বলতে দ্বিধা করেননি।

নবনীতা দেবসেনের 'গল্পসমগ্র'৪র্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'সপ্তকাণ্ড'এর গল্পগুলিতে পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলির বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে। 'বসুমতীর কেরামতি' গল্পে দেখা যায় মা বসুমতী কন্যা সীতার স্বাধীনসত্তা ও স্বেচ্ছাসিদ্ধান্তকে সম্মান করেন। তাই অনায়াসেই তিনি কন্যার সম্মান রক্ষার্থে জামাতা রামচন্দ্রের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য বলেছেন:

> বাবাজীবন, আমি নাচার। তোমার প্রার্থনার শুধু আধখানাই আমি পূর্ণ করতে পারি। ... সীতা স্বাধীন মেয়ে। তার নিজের বোধ-বুদ্ধি মতন চলে। এখানে ব্রতেশ্বরীর মন্দিরে বহু সম্মানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে আছে সে। ভক্তদের এত আদর, ভালোবাসা, এত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ছেড়ে সে কেমন করে চলে যাবে? আর কেনই বা যাবে? সে তো তোমার কাছে এমন প্রতিষ্ঠা পায়নি?[১৩]

নাগরাজ্যের মাতৃশাসিত সমাজব্যবস্থায় মা বসুমতী কন্যাকে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিয়ে সীতার লাঞ্ছনা ও অপমান দূর করতে চেয়েছেন। এমনকি রামচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষবাণে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিই আঙ্গুল তুলেছেন বসুমতী।

'ঊর্মিলা-নিদ্রা' গল্পে মহাকাব্যের 'উপেক্ষিতা' নারী ঊর্মিলার নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরেছেন নবনীতা দেবসেন। তীব্র প্রতিবাদী ও অভিমানী ঊর্মিলা সমগ্র 'রামায়ণ' কাহিনির প্রতিই প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়ে বলেছে:

> স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় থাকার জন্যই যার স্বামীর জন্ম সেই স্ত্রীর জীবিত থেকে কী লাভ? আমার জীবন তো দাস-পত্নীর জীবন, রাজপুত্রীর নয়।[১৪]

ঊর্মিলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী রূপটি নবনীতার হাতে নবরূপে ধরা পড়েছে।

'লক্ষ্মণের নরকদর্শন' গল্পে ত্রিজটা, শূর্পণখা ও অয়োমুখীর মধ্যে মনুষ্যত্বের আরোপে তাদের নারী হৃদয়ের দুঃখ, যন্ত্রণা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ফুটে উঠেছে। 'অথ গঙ্গা সত্যবতী কথা: অথবা সতীন সংবাদ' গল্পে দুই সতীন গঙ্গা ও সত্যবতীর একান্ত আলাপ ধরা পড়েছে। পৌরাণিক এই দুই চরিত্র সত্যবতীর কলমে নতুন রূপে ফুটে উঠেছে। সত্যবতী ও গঙ্গার প্রগতিশীল মানসিকতা, বাকপটুত্ব ও যৌক্তিকতা নবনীতা দেবসেনের কলমে সুনিপুণভাবে উন্মোচিত হয়েছে।যেখানে পাঠকও এক নব চোখে, নবভাবে মহাকাব্যের নারীদের দেখতে পান।

নবনীতা দেবসেনের সমগ্র সাহিত্যেই নারীদের স্থানটি স্বতন্ত্র। লেখিকা সেই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তাঁর নারী চরিত্রদের নির্মাণ করেছেন। কখনো কোমলে, ভালোবাসায়, দয়া-মায়ায়, সহানুভূতিতে মাতৃস্বরূপিনী। কখনো আবার কঠোরে, প্রতিবাদে, অভিমানে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। নবনীতার নারীরা কখনো কখনো পুরুষতান্ত্রিকতার বঞ্চনার শিকার হলেও তা মাথা পেতে মেনে নিতে শেখেনি, বরং প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। বিপদের সম্মুখীন হয়েও নবনীতার নারীদের মধ্যে সাহসের অভাব দেখা যায় না, বরং তারা অফুরন্ত উদ্দীপনায় ভরপুর। নবনীতা দেবসেনের গল্পে মাতৃচরিত্র বরাবরই স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রগতিশীলতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাও যে মেয়েদের সুরক্ষাকবচ সেই বোধের সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছেন পিছিয়ে পড়া মেয়েদের মধ্যে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকেই নবনীতার নারীরা লড়াই করার শক্তি অর্জন করেছে। জীবনের দুঃখকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে রঙ্গ-রসিকতায়, আনন্দ-উল্লাসে পূর্ণরূপে জীবনসুধা পানের আকাঙ্ক্ষায় নবনীতার নারীরা অনন্য।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা:২০, ২০১২, পৃ.৭১৬
২. নবনীতা দেবসেন, ‘নানারঙের নবনীতা,’ পত্রভারতী, কলকাতা:৯, ২০২১, পৃ.৪০১
৩. নবনীতা দেবসেন, ‘গল্পসমগ্র’১, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা:৭৩, ২০১৯, পৃ.৯০
৪. তদেব, পৃ.২২৫
৫. নবনীতা দেবসেন, ‘গল্পসমগ্র’২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা:৭৩, ২০১৯, পৃ.১০৩
৬. তদেব, পৃ.২০৯
৭. তদেব, পৃ.২৬৩
৮. তদেব, পৃ.৩০৫
৯. নবনীতা দেবসেন, ‘গল্পসমগ্র’৩, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা:৭৩, ২০১৯, পৃ.২৫১
১০. নবনীতা দেবসেন, ‘গল্পসমগ্র’২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা:৭৩, ২০১৯, পৃ.২০৯
১১. তদেব, পৃ.২২০
১২. তদেব, পৃ.২৪৪
১৩. নবনীতা দেবসেন, ‘গল্পসমগ্র’৪, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা:৭৩, ২০১৯, পৃ.৮৭
১৪. তদেব, পৃ.৯৭।

নৈতিকতার অনুসন্ধান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি

রাহুল শীট
গবেষক, দর্শন বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: একজন দার্শনিক তখনই প্রকৃত অর্থে সফল হন, যখন তার চিন্তা ও মতবাদ সমাজে কল্যাণমূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তবে দার্শনিকের ভাবনার প্রকাশ সবসময় প্রথাগত দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের মাধ্যমেই ঘটে না। প্রাচ্যের চিন্তাবিদ, বিশেষ করে ভারতীয় এবং বাংলা অঞ্চলের দার্শনিক ও সাধকগণ, তাদের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ মূলত কবিতা, শ্লোক, চর্যা কিংবা গানের মাধ্যমে ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পষ্ট, এবং তার সৃষ্টিকর্মের প্রতিটি দিকেই বিভিন্ন দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৈতিকতার একটি অনন্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন, যেখানে মানবিকতা, ভালোবাসা, এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে এটি মানুষের আত্মার বিকাশ এবং সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতার ধারণা, এর তাত্ত্বিক ভিত্তি, এবং সমাজে এর প্রয়োগ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈতিকতা, মানবিকতা, আদর্শ, সমাজ, আধ্যাত্মিকতা, ভালোবাসা, শান্তি।

ভূমিকা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪২) বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, গবেষক এবং দার্শনিক। তাঁর সৃষ্টিকর্মে বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক কবি-দার্শনিকের কথা উল্লেখযোগ্য, যেমন—ওমর খৈয়াম, রুমি, গ্যেয়েটে, আল্লামা ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কখনো একাডেমিক দার্শনিকদের মতো সূক্ষ্ম দর্শন বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেননি, কারণ সেটি তাঁর কাজের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। তর্ক-বিতর্কের যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণের চেয়ে তাঁর দার্শনিক ভাবনায় মানবতাবোধ এবং অনুভূতির প্রাধান্য বেশি। একই সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ভাববাদী দর্শনের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি তাঁর ভাববাদী দর্শনকে প্রকাশ করেছেন সাহিত্যকর্মে, বিশেষত কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেগুলোতে কেবল কলাকৈবল্যবাদের পরিচয়ই নয়, শৈল্পিক দক্ষতা ও নান্দনিক চিন্তার এক চমৎকার মিশ্রণও উপস্থিত। তবে তাঁর কবিতায় নৈতিক ভাবনার ছাপও গভীরভাবে লক্ষণীয়। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নৈতিক ধারণা ভিন্ন হলেও তাদের মূল প্রতিপাদ্য প্রায় অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা ফুটে উঠলেও সেগুলোর অন্তর্নিহিত দর্শন একই থাকে। হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসেবে বাল্যকালে তিনি বেদ-উপনিষদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হন। পরিণত বয়সে তিনি

বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং তাদের মূল্যায়ন করেন। পাশাপাশি বৈষ্ণব, বাউল ও লোকজ মানবধর্মও তাঁর চিন্তায় প্রভাব ফেলে। জীবনের শেষ পর্যায়ে সূফি, আউল-বাউল এবং ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী ধারা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও সাহিত্যকর্মে এই বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় ও ব্যক্তির চিন্তার প্রতিফলন স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সাহিত্যকর্মে এসব দর্শন চিন্তার মিথস্ক্রিয়ার অনন্য নিদর্শন দেখা যায়।

নৈতিকতা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। এটি মানবিক মূল্যবোধ, ভালোবাসা, সহানুভূতি, এবং দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি মানবতার কবি এবং চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত, নৈতিকতার একটি গভীর এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্য, যা ব্যক্তিকে তার স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে নৈতিকতাকে যুক্ত করে মানবিকতাকে নতুন এক মাত্রা দিয়েছে। তিনি মনে করতেন, নৈতিকতা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বা সামাজিক নির্দেশ নয়; এটি মানুষের আত্মিক বিকাশ এবং সমাজের উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান। তাঁর সাহিত্য, শিক্ষা, এবং দার্শনিক চিন্তায় নৈতিকতার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এই নিবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতার ধারণা, এর তাত্ত্বিক ভিত্তি, এবং এর প্রয়োগিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি, বর্তমান বিশ্বে তাঁর নৈতিক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতাও মূল্যায়ন করা হবে।

মূল আলোচনা:

১. নৈতিকতার মূল চেতনা:

সাধারণভাবে নৈতিকতা বলতে সেই মানবিক গুণগুলোকে বোঝায়, যা মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে। জীবনধারণের জন্য মানুষ ব্যক্তি ও সমাজের ভালো-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত এবং ন্যায়-অন্যায়ের মতো আচরণগুলো নির্ধারণ করেছে। এই মূল্যবোধের ভিত্তিতে শুভ ও কল্যাণময় আচরণকে নৈতিক আচরণ এবং অশুভ ও অকল্যাণময় আচরণকে অনৈতিক আচরণ বলা হয়। নৈতিকতার ধারণা মূলত ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি বা বিবেকের আহ্বান থেকে উদ্ভূত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৈতিকতাকে একটি গভীর মানবিক চেতনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিকতা কোনো চাপিয়েদেওয়া নীতি নয়, বরং মানুষের আত্মার অভ্যন্তরীণ সত্যের প্রকাশ। তিনি নৈতিকতাকে ভালোবাসা, সহানুভূতি, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, নৈতিকতা হলো সেই শক্তি, যা মানুষকে স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।

"নৈতিকতা মানে মানুষের হৃদয়ের মুক্তি এবং এটি তাকে তার প্রকৃত স্বরূপে পৌঁছে দেয়" (The Religion of Man, 1930)

২. নৈতিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তি:

রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতারদর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে:

- আধ্যাত্মিকতা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিশীলতার অন্যতম কেন্দ্রীয় ধারা হলো আধ্যাত্মিকতা। তাঁর দর্শন, সাহিত্য, এবং সংগীতে আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন অনন্যভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি মানবজীবনের গভীরতর স্তর, প্রকৃতি এবং সর্বজনীন চেতনাকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তা মূলত ব্রহ্মবাদী দর্শন থেকে প্রভাবিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর শুধুমাত্র পূজার স্তব বা নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন; তিনি সর্বত্র, মানবিক সম্পর্ক ও প্রকৃতির মধ্যেও বিরাজমান। "গীতাঞ্জলি" কাব্যগ্রন্থে তিনি এই উপলব্ধিকে গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ:

"তোমার সৃষ্টির পথে চলিয়াছি বলিয়াই তোমার প্রকাশ দেখা দিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর মানবতাবাদ। তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতা মানে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক নয়, বরং তা মানবকল্যাণের পথে নিবেদিত হওয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন, আত্মার প্রকৃত উপলব্ধি তখনই সম্ভব, যখন আমরা অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে সম্মান করি এবং ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করি।প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর সংযোগও তাঁর আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শান্তিনিকেতনের নির্মাণ তাঁর এই চিন্তার বাস্তব প্রয়োগ। প্রকৃতির কোলে, মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার মাধ্যমে তিনি চেতনাকে বিকশিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর একাধিক কবিতা ও গান প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার সংযোগের কথা বলে।রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার পথে এক নিরন্তর অনুসন্ধানী ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই, তিনি কখনও প্রশ্ন করছেন, কখনও উপলব্ধি করছেন, আবার কখনও নিজেকে সমর্পণ করছেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দর্শনের গভীরতর দিকগুলো প্রকাশ করেছেন।

- মানবিকতা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৈতিকতা ও মানবিকতা মূলত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাবোধে নিহিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের নৈতিকতা কোনো বাহ্যিক শৃঙ্খল বা ধর্মীয় বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়; বরং তা মানুষের অভ্যন্তরীণ মানবিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে। রবীন্দ্রনাথ মানবিকতাকে মানব জীবনের মূল স্তম্ভ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে যেমন, (*গোরা, ঘরে বাইরে*) মানবিক সম্পর্ক, শ্রেণীসংঘাত, এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতা ও মানবিকতা শুধুমাত্র তাঁর সময়ের জন্য নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও সমান প্রাসঙ্গিক। তিনি যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা মানব সমাজকে শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একীভূত হতে সাহায্য করে।রবীন্দ্রনাথ নৈতিকতাকেমানবিকতার গভীর প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের দায়িত্ব শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করা।

- সামাজিক দায়িত্ব:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা সাহিত্যের অমর প্রতিভা, তাঁর রচনায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। মানবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকার এবং আত্মার মুক্তির জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা তাঁর রচনাগুলিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা, এবং পরম সত্যের প্রতি আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা মানব সভ্যতার প্রকৃত উন্নতির

পথ দেখায়। তাঁর রচনা, যেমন *গীতাঞ্জলি, ঘরে-বাইরে,* এবং *চতুরঙ্গ,* নৈতিক প্রশ্ন ও আত্মসন্ধানের প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ সমাজকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখতেন। সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন, বিশেষত শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, তিনি সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটি মডেল গড়ে তোলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শুধুমাত্র একাডেমিক নয়, বরং পরিবেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ শেখানোর উপর জোর দেয়।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজের বিভিন্ন অসামঞ্জস্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুলেছেন। তাঁর কবিতা, নাটক ও গল্পগুলোতে সাম্য, নারীর অধিকার, এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার চর্চার আহ্বান রয়েছে। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শিক সংকট এবং *চার অধ্যায়*-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের নৈতিক দ্বন্দ্বের বর্ণনা পাওয়া যায়।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব কেবল তাঁর নিজের সময়ের নয়, আধুনিক সমাজের জন্যও প্রাসঙ্গিক। তাঁর চিন্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ রয়েছে। নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্বের মধ্য দিয়ে আমরা একটি উন্নত ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

৩. রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতা এবং ভালোবাসা:

রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতারদর্শনে ভালোবাসা একটি কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাঁর মতে, ভালোবাসা হলো সেই শক্তি, যা মানুষকে পারস্পরিক বিভাজন এবং সংঘাত থেকে মুক্ত করে। তিনি বলেছেন, "ভালোবাসা হলো সেই আদর্শ, যা মানুষকে তার সত্তার গভীরে পৌঁছাতে সাহায্য করে" (The Religion of Man, 1930)

ভালোবাসা এবং নৈতিকতার এই সম্পর্ক তাঁর সাহিত্যে বারবার উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, গীতাঞ্জলি-তে তিনি ভালোবাসাকে আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন।

৪. নৈতিকতার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা:

রবীন্দ্রনাথের মতে, নৈতিকতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়; এটি সমাজে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠারও মাধ্যম।

1. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা:

নৈতিকতা মানবসমাজের মূল স্তম্ভ, যা ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। এটি সামাজিক জীবনে শান্তি, সাম্য, এবং সংহতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা নৈতিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, যা শুধু আইন এবং শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে না বরং মানুষের অন্তর্নিহিত নৈতিক অনুভূতি, মূল্যবোধ, এবং দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, নৈতিকতা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার প্রধান চালিকাশক্তি। এটি ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি, সহমর্মিতা, এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। সমকালীন বিশ্বে, যেখানে সংঘাত এবং বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, নৈতিকতার ভূমিকা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা এবং প্রসারই একটি স্থায়ী শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার একমাত্র পথ।

2. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:

ন্যায়বিচার সমাজের স্থিতিশীলতা, সমতা, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মৌলিক ভিত্তি। এটি এমন একটি ধারণা যা নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। ন্যায়বিচার শুধুমাত্র আইন এবং শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের নৈতিক চেতনা এবং

মূল্যবোধের একটি গভীর বহিঃপ্রকাশ। নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচার পরস্পর সংযুক্ত, এবং এ দুটির সমন্বয়ই একটি সুসংগঠিত, সমৃদ্ধ, এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, ন্যায়বিচার একটি সমাজের শান্তি, সংহতি, এবং প্রগতির প্রধান উপাদান। নৈতিকতা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি শুধুমাত্র আইন বা শাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না, বরং মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, এবং আচরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে, যেখানে সামাজিক অসাম্য এবং সংঘাত একটি বড় চ্যালেঞ্জ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক মূল্যবোধ এবং ন্যায়পরায়ণতার চর্চাই একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার একমাত্র পথ।

3. বিভেদের ঊর্ধ্বে নৈতিকতা:

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাভাবনার মূল সুর ছিল মানবতার প্রতি গভীর ভালোবাসা, যা তিনি তাঁর সাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ ও গানের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে পৃথিবীজুড়ে মানবজাতির একত্রিত থাকার জন্য একটি নৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, ধর্ম ও জাতিগত পরিচয়ের মাধ্যমে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। এর বদলে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সমঝোতার অনুভূতি তৈরি করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় পার্থক্য এবং জাতিগত ভেদাভেদকে মানবতার শত্রু হিসেবে দেখতেন। তাঁর "বিশ্ববন্ধু" ভাবনা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই উদ্ভূত, যেখানে তিনি জাতি ও ধর্মের সব কটি সীমানা অতিক্রম করে মানবজাতির একাধিকতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, সঠিক নৈতিকতা তখনই সম্ভব, যখন মানবিকতা সকল ধরনের বিভেদ ও বৈষম্যকে অতিক্রম করে একে অপরকে ভালোবাসে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের নৈতিক দর্শন একটি মানবিক ও একতাবদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলার পথনির্দেশক। তিনি দেখিয়েছেন যে, নৈতিকতার প্রকৃত রূপ কেবল তখনই উপলব্ধি করা যায়, যখন আমরা জাতি, ধর্ম এবং ভাষার মধ্যকার সব ধরনের বিভেদকে দূর করে মানবতার বৃহত্তর লক্ষ্যকে সম্মান করি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এই কথা শিখিয়ে দেয় যে, মানবতা কখনোই বিচ্ছিন্ন বা বিভাজিত হতে পারে না, বরং এটি একটি অন্তর্নিহিত ঐক্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

৪. নৈতিকতার ব্যবহারিক দিক:

রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতার দর্শন প্রয়োগিক। তিনি মনে করতেন, নৈতিকতা কেবল ভাবনায় সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।

1. শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতা:

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন, যা কেবল জ্ঞান নয়, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবিকতার বিকাশের ওপর জোর দেয়।

2. সাহিত্যে নৈতিকতা:

তাঁর সাহিত্যে নৈতিকতার প্রভাব স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ঘরে বাইরে উপন্যাসে নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তির আদর্শের চর্চা প্রতিফলিত হয়েছে।

3. সমাজসেবায় নৈতিকতা:
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, সমাজসেবা হলো নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে এই চেতনা বাস্তবায়িত করেছিলেন।

৫. রবীন্দ্রনাথের নৈতিক দর্শনের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:
রবীন্দ্রনাথের নৈতিক দর্শন বর্তমান সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক:

1. বৈষম্য দূরীকরণ:
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, বৈষম্য মানবজীবনের স্বাভাবিক অংশ নয়। এটি সমাজের কৃত্রিম নিয়ম এবং সংস্কারের ফল। ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সৃষ্ট এই বৈষম্য মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাঁর নৈতিক দর্শন মানবতার গভীর চেতনা এবং সমাজের সমতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বৈষম্যের বিভিন্ন রূপ, যেমন ধর্মীয়, জাতিগত, লিঙ্গ, এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে তাঁর দর্শন একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বর্তমান বিশ্বে, যেখানে বিভাজন এবং সংঘাত ক্রমবর্ধমান, রবীন্দ্রনাথের নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি বৈষম্য দূর করে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে।

2. পরিবেশগত নৈতিকতা:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্ককে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর নৈতিক দর্শনে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীলতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সমকালীন বিশ্বে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরিবেশগত নৈতিকতা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম এবং মানবিক দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন কবিতা, গান, এবং নাটকে পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান, তা ফুটে উঠেছে।'সোনার তরী' এবং প্রকৃতি:এই কাব্যে প্রকৃতির অনন্ত রূপ এবং তার প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ তুলে ধরা হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি' এবং পরিবেশচেতনা: গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিতে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সংযোগের বিষয়টি গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'অরণ্যের অধিকার' এবং পরিবেশ সুরক্ষা:এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অধিকারকে সমর্থন করেছেন এবং মানুষকে তার ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিবেশগত নৈতিকতা আজকের বিশ্বে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেখানে পরিবেশগত সংকট মানবজীবনের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতা এবং সংবেদনশীলতা মানুষের নৈতিক বিকাশের একটি অংশ। বর্তমান বিশ্বে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার প্রভাব মোকাবিলায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৈতিক দর্শন কেবল ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যেও একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। তাঁর পরিবেশগত নৈতিকতা আজকের পরিবেশ সংকট মোকাবিলায় এক কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের রবীন্দ্রনাথের দর্শন বিশ্বমানবতার জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়ক হতে পারে।

3. মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৈতিক দর্শন মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। তাঁর দর্শনের মূল সুর হলো মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, সাম্য, এবং ন্যায়। সমকালীন সমাজে, যেখানে বৈষম্য, শোষণ, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি একটি নতুন আশার আলো দেখাতে পারে। মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং একটি কার্যকর সমাধানের পথপ্রদর্শক।

উপসংহার:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৈতিকতার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি গভীর মানবিক চেতনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে, নৈতিকতা মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং সমাজে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর উপায়। বর্তমান সমাজে, যেখানে নৈতিকতার অভাব প্রকট, রবীন্দ্রনাথের দর্শন নতুন দিশা দেখাতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৫৩); রবীন্দ্র রচনাবলী, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী।
2. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৬১); ধর্ম ও সমাজ,শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, পৃ.10-40।
3. রায়, হরপ্রসাদ, (১৯৯২); আত্মসত্তার মুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন।
4. অধিকারী, ড. সুশান্ত কুমার, (২০১০); রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, কলকাতা,দে'জ পাবলিশিং।
5. চক্রবর্তী, দেবাশীষ, (২০১৭); শিক্ষা ও নৈতিকতা: রবীন্দ্র দৃষ্টিকোণ, কলকাতা,হ্যাপি পাবলিকেশন,পৃ.20-50।
6. মকসুদ, সৈয়দআবুল, (২০১৩) রবীন্দ্রনাথেরধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, ঢাকাঃবাংলাদেশ, প্রথমাপ্রকাশন, পৃ.৫৪-৮০, ৯২-১৭২।
7. Tagore, R. (1930). The Religion of Man. New York. Macmillan. P. 25-74,109-203.
8. Chakrabarti, M. (2013). Rabindranath Tagore: His Philosophical Outlook. Delhi. Sahitya Akademi.
9. Tagore, R. (1917). Nationalism. New York. Macmillan. P.115-159.
10. Sen, A. (2005). The Argumentative Indian. London. Penguin Books.P.89-190,273-256.
11. Radice, W. (1987). Rabindranath Tagore: Selected Poems. London. Penguin Classics. P.1-20, 23-150.

লুই পার পদে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও সাধনা

বিশ্বনাথ পাহাড়ী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন নিদর্শন রূপ 'চর্যাপদ'। চর্যাপদে রয়েছে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন প্রণালী। পদগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন প্রণালীর পাশাপাশি সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার চিত্র নিপুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে লুই পার পদে বৌদ্ধধর্মের সাধন পদ্ধতি ও ধর্ম দর্শন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লুইপাদের পদের প্রেক্ষিতে সহজিয়া সাধন তত্ত্বের মাধ্যমে বোধিচিত্ত লাভ ও সাহজ মার্গ দর্শন।
সূচকশব্দ: করুণা, সহজ, বোধিচিত্ত, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি, অক্ষোভ্য, রূপ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, বেদনা, সংবেদনা, সংস্কার, পঞ্চদেহস্থান।

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে লুই পার পদে বৌদ্ধধর্মের সাধন পদ্ধতি ও ধর্ম দর্শন আলোচানা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাচীনত্ব ও আভিপ্রায়িকতার জন্য চর্যাপদের পদ ততটা বোঝা যায় না। প্রত্যেকটা পদের উপর রাগ লেখা হয়েছিল। পুথিতে ৩ (খ) নং পৃষ্টায় ১নং পদটি পাওয়া গিয়েছিল। পদকর্তা লুই পাদ। এই পদটি পটমঞ্জুরী রাগে গাওয়া হয়েছিল।

চর্যার ধর্ম দর্শন সাধন পদ্ধতি:

যেকোনো আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধন পদ্ধতির সঙ্গে তিনটি বিষয় থাকে।

১) সাধ্য— যাকে লাভের জন্য চেষ্টা করা হয়।
২) সাধক— যে সাধ্যকে পেতে চাই।
৩) সাধনা— যে পদ্ধতির মাধ্যমে সাধক সাধ্যকে পাওয়ার চেষ্টা করেন।

চর্যাপদে যে ধর্ম-দর্শন বিবৃত হয়েছে, তার মধ্যেও এই তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। চর্যা ধর্ম-দর্শন অনুযায়ী সেই তিনটি বিষয় হল—

১) সাধ্য— সহজ স্বরুপ ও সহজানন্দ।
২) সাধক— সহজ সাধক ও সহজিয়া।
৩) সাধনা— সহজযান বা সহজপন্থা বা সহজসাধনা।

উপরের প্রতিটি কথায় ব্যবহৃত 'সহজ' কথার অর্থ কী? বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দার্থ অনুযায়ী 'সহজ' শব্দটি এখানে সরল বা ইংরেজি easy শব্দের সমার্থক নয়। 'সহজ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'সহজাত যা' অর্থাৎ যা কিনা সঙ্গে সঙ্গে জন্মেছেন। সহজ বলতে চর্যাপদে সহজ আনন্দ বা সহজ স্বরূপ। যা জীব দেহ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নেয় বা অস্তিত্বশীল হয়। এই জীবদেহের সঙ্গে জাত বা সহজাত সহজস্বরূপকে যিনি উপলব্দি করতে চান, তিনিই সহজিয়া বা সহজ সাধক। এবং যে সাধন পদ্বতির দ্বারা এই উপলব্ধিতে তাঁরা পৌঁছান, তাই সহজযান। "চর্যাগীতিতে যে ধর্মসাধনার ইঙ্গিত আছে তা প্রধানত এই সহজযান বৌদ্ধধর্মের। এই ধর্মসাধনাকে 'সহজ' নামে অভিহিত করার দ্বিবিধ সার্থকতা আছে, প্রথমত এই ধর্ম সাধনার সাধ্যও সহজ, দ্বিতীয়ত সাধনপদ্ধতিও সহজ।"[১]

এই সহজ সাধনার মূলে আছে দেহকেন্দ্রিক সাধনা, যার অপর নাম কায়া সাধনা। এই কায়া সাধনার প্রথম পথই হল 'দেহশুদ্ধি'। দেহশুদ্ধির হল দেহের মধ্যে যেখানে যে যে তত্ত্ব বা দেবতা অবস্থান করেন তাকে অনুভব করা। এই দেহশুদ্ধির পথে সহজানন্দে পৌঁছানোর জন্য চর্যাপদের ধর্ম দর্শনের তাত্ত্বিকক্রম রয়েছে।

প্রথমত, বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধদেব পাঁচ রকমের ধ্যান করেছিলেন, অজ্ঞান বা অবিদ্যার পাঁচটি প্রকাশের বিরুদ্ধে। একে বলা হয় বুদ্ধের 'পঞ্চধ্যান'। এই পঞ্চধ্যান মূর্তিকে বলা হয় পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ বা পঞ্চতথাগত। আর অবিদ্যা বা অজ্ঞানের ঐ পাঁচটি প্রকাশকে বলে পঞ্চস্কন্ধ। পঞ্চস্কন্ধ হলো—

১) রূপ [বহিঃ প্রকাশিত যা কিছু]
২) সংজ্ঞা [এক ধরনের অনুভব, যাকে আমরা বহি ইন্দ্রিয় থেকে নিয়ে থাকি]
৩) বিজ্ঞান [এক ধরনের জ্ঞান, যেটি অবিদ্যার অস্তিত্বকে বুঝিয়ে দেয়, যাকে বলা হয় অহংকার]
৪) বেদনা [সংবেদনা]
৫) সংস্কার [কাজ করতে করতে মনের মধ্যে যে ছাপ পড়ে যায়]

পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ বা পঞ্চতথা হলেন—

১) বৈরোচন ২) রত্নসম্ভব ৩) অমিতাভ ৪) অমোঘসিদ্ধি ৫) অক্ষোভ্য

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের প্রত্যেকে অবিদ্যার এই পঞ্চ প্রকাশের এক একটি দেবতা। এবং সহজ সাধকের দেহের পাঁচটি স্থানে এই পঞ্চ দেবতার অবস্থান। নিচের তালিকা থেকে এটি বোঝা যাবে।

পঞ্চস্কন্ধ	পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ	পঞ্চদেহস্থান
রূপ	বৈরোচন,	মস্তক
সংজ্ঞা	অমিতাভ	মুখ
বিজ্ঞান	অক্ষোভ্য	হৃদয়
বেদনা	রত্নসম্ভব	নাভি
সংস্কার	অমোঘসিদ্ধি	পা

প্রথমত বলা হয়, সহজ সাধকেরা দেহের এই পাঁচটি স্থানে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের অবস্থান কল্পনা করেছেনএবং তাদের উপলব্ধির মাধ্যমে পঞ্চস্কন্ধময় দেহের তত্ত্বময় প্রকৃত স্বরূপটি চিনেছেন। এই চেনা জানাটি ঘটলেই সহজ সাধকের দেহ শুদ্ধি ঘটে। এই দেহশুদ্ধি হলে তখন সহজ সাধকের দেহ যোগসাধনার উপযোগী হয়।

দ্বিতীয়ত, এই অংশে সাধককে জানতে হবে সাধক কায়া আর বুদ্ধকায়ার সম্পর্ক। এটি জানাটি হলো সাধ্য স্বরূপকে জানা। আগের পর্যায়ে আমরা দেখেছি সাধক কেমন করে প্রস্তুত হবেন সাধ্যকে পাওয়ার জন্য সাধনা করতে, সে সম্পর্ক বিবৃত। এই পর্যায়ে আমরা দেখবো সাধ্য সম্পর্কে আলোচনা। বৌদ্ধধর্ম শূন্যকে সর্ব্বোচ্চ সাধ্য বলে ঘোষণা করেও বুদ্ধদেবের মানবকায়াকে অদৃশ্য শূন্যের সঙ্গে সমীকৃত করে তুলেছেন। প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের দুটি

দেহ বা কায়াকে কল্পিত করা হয়েছে। বাস্তব মানব দেহকে বলা হয়েছিলো রূপকায়। এবং তাঁর তত্ত্বদেহটিকে বলা হয়ছে অরূপকায়। "তাঁদের ধর্মমতে বোধিচিত্ত বা মহাসুখই হচ্ছে পরম সত্য এবং সাধকের পরম কামনার বিষয়। প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা ও উপায়রূপিণী করুনাকে সাধনার দ্বারা মিলিত করলেই এই মহাসুখ লাভ হয়। এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুনার তত্ত্বকে সহজিয়া সাধকেরা দেহের বিবিধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপর স্থাপন করেছেন এবং এজন্য দেহের মধ্যে তাঁরা চারটি চক্র বা পদ্মের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন।"[২] মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই দুটি কায়কে পরিত্যাগ করে অন্য তিনটি কায়ের কথা বলা হয়েছে।

১) নির্মানকায় [এটি বুদ্ধের মানব রূপ]

২) সম্ভোগকায় [এটি বুদ্ধের আনন্দময় জ্যোতিরূপ]

৩) ধর্মকায় [এটি বুদ্ধের অদ্বয় রূপ। এটি শূন্যতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে]

কায়	চক্র	দেহ	মুদ্রা	মুহূর্ত	আনন্দ
নির্মানকায়	নির্মানচক্র	নাভিদেশ	কর্মমূদ্রা	বিচিত্র	আনন্দ
ধর্মকায়	ধর্মচক্র	হৃদয়দেশ	ধর্মমুদ্রা	বিপাক	পরমানন্দ
সম্ভোগকায়	সম্ভোগচক্র	কন্ঠদেশ	মহামুদ্রা	বিমর্দ	বিরমানন্দ
সহজকায়	সহজচক্র	মস্তক	সময়মুদ্রা	বিলক্ষণ	সহজানন্দ

পরবর্তীলে সহজযানে এই ত্রীকায়ের সঙ্গে চতুর্থকায় যুক্ত হয়েছে। তাঁর নাম সহজকায় বা বজ্রকায়। এটি সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলে বজ্রযানী বা মহাযানী বৌদ্ধরা ঘোষণা করেছেন। লক্ষণীয় বজ্রযানী বজ্ররা এই কায়গুলোর সঙ্গে দেহকে যুক্ত করেছেন এবং যোগ সাধনাকে যুক্ত করে সাধনার প্রতিটি স্তরে অনুভূতি গুলিরও সময় গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। আমরা একটি ছকের সাহায্যে কায়সমুহ, চক্রসমুহ, দেহস্থানসমুহ, চারটি যোগসাধনার স্তর বা মহাসমুহ, চারটি মুহূর্ত বা সময় এবং যোগ সাধনা, এই সাধনা করতে করতে ঐ চারটি মুহূর্তে উপলব্ধি আনন্দ সমুহকে এখানে বিবৃত করবো। সহজযানের তৃতীয় স্তরের আলোচনা সাধন পন্থাকে নিয়ে। ভারতীয় দর্শনের সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনার প্রচলিত জীবন যাপন প্রসতি বা মানুষের সাধনার প্রকৃতিগত আচার আচরনের বিপক্ষে একটি চ্যালেঞ্জ। সেই কারণেই তপস্যা এবং সাধনা এই দুটি শব্দ ব্যাবহার করা হয়। তপস্যা শব্দের মধ্যে যে 'তপ' ধাতুটি আছে, তাঁর অর্থের সঙ্গে কষ্টের অনুভূতি জড়িয়ে আছে। পাশাপাশি সাধনা শব্দটিতে 'সাধ' ধাতু আছে। তাঁর অর্থের সাথে ইচ্ছা ও ধারণা শব্দ দুটি যুক্ত। আসলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনাগুলি বোঝাতে চাই যে প্রকৃতির বা সাধারন জীবন যাপনের বিপরীত পথে গিয়ে অন্য রকম কিছু লাভ করার চেষ্টা সাপেক্ষ কষ্ট দায়ক। পাশাপাশি এটাও সত্য যে চেষ্টা ও কষ্টের বিনিময়ে যা লাভ করা যায় তা তৃপ্তিদায়ক, আনন্দ জনক ও কল্যাণকর। এই লক্ষ্যটিকে গ্রহণ করেছেন চর্যাপদের সহজিয়া সাধনাপন্থা অনুসরন করা সহজ সাধকেরা। সহজিয়া যোগ সাধোনার মতে মানবশরীরের অসংখ্য নাড়ীর মধ্য ৩২ টি প্রধান। তাঁর মধ্যে তিনটি প্রধানতর, তারমধ্যে একটি প্রধানতম। তাঁদের মতানুযায়ী এই তিনটি প্রধান নাড়ী মেরুদণ্ডের একেবারে নিচ থেকে মস্তক পর্যন্ত সমান্তরাল ভাবে প্রসারিত।বস্তুত এই তিনটি নাড়ীর কথা তন্ত্রসহ অন্যান্য ভারতীয় দর্শন বা সাধনপদ্ধতিকেও স্বীকার করা হয়েছে। এগুলি হল-

১) মেরুদণ্ডের বাম দিক দিয়ে মস্তক পর্যন্ত প্রসারিত সেটি স্বাসবাহী নাড়ী বা প্রাণবাহী নাড়ী। তন্ত্রসহ অন্য ভারতীয় দর্শনে এর নাম 'ইড়া'। সহজিয়া দর্শনে এর অনেকগুলি নাম

পাওয়া যায়, যেমন- প্রজ্ঞা, লালনা, চন্দ্র, শশী, ধমণ, আলি, অভাব, গঙ্গা, গ্রাহক, স্তর, এ, ইত্যাদি। এই নাড়ীটিতে শূন্যতা বা প্রজ্ঞা চিন্তা বা ধারনা বা আদর্শকে খেয়াল করা যায়।

২) ডানদিকে মস্তক পর্যন্ত প্রসারিত নাড়ীটি প্রশ্বাসবায়ু বাহী অপানুবায়ু বাহী হিসেবে কল্পিত। এরও বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন– রসনা, সূর্য, রবি, চমন, কালি, ভাব, গ্রাহ্য, ব্যাঞ্জন, ইত্যাদি। এই নাড়ীটিতে করূণা বা উপায়ের ধারণা বা আদর্শকে কল্পনা করা হয়েছে।

৩) মধ্য পথ দিয়ে মস্তক পর্যন্ত যে নাড়ীটি বিস্তৃত তন্ত্রসহ ভারতীয় দর্শনে তার নাম সুষুম্না। সহজিয়া তন্ত্রে এই নাড়ীটির নাম অবধূতিকা।

তন্ত্রসহ অন্য একাধিক ভারতীয় দর্শনে নাভীমণ্ডল বা তার নিমাংশে সুষূম্নার প্রায় সূচণাদেশে একটি সুপ্তশক্তির কল্পনা করা হয়েছে। অগ্নি পিণ্ডের মতো প্রবল শক্তিশালি এরই নাম দেওয়া হয়েছে কূলকণ্ডলিনী। এটিকে এরা ব্রজসত্ত্বের শক্তি বলেছেন। এবং বিভিন্ন নামে সম্ভোধন করেছেন। যেহেতু এটি শক্তি তাই প্রতিটি নামই মানববিবাচক। যেমন— চণ্ডালী, ডোম্বী, শবরী, যোগিনী, অবধূতিকা ইত্যাদি। কখনো একে শূন্য বা নৈরাত্মা নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

সাধক সহজযোগের মাধ্যমে বাম ও দক্ষিণ এই নাড়ীকে অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা শূন্যতা এবং করূনা বা উপায় এই উভয়কে নাভিদেশে অবস্থিত নির্মাণচক্রে মিলিত করেন। এর ফলে শুপ্তশক্তির জাগরণ ঘটে। এই জাগণের ফলে প্রথম বোধিচিত্ত উপলব্ধি হয়। "তন্ত্রমতে দেহের বামগা ও দক্ষিণা ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রাণ ও অপান বায়ুকে মধ্যগা সুষুম্না নাড়ী পথে চালিত করে সাধন সম্মত ভাবে মস্তিষ্কের সহস্রার পদ্মে আনয়ন করলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করেন।"[৩]

বৌদ্ধধর্মে শূন্যতায় হলো প্রজ্ঞা। যা করুণার মাধ্যমে মঙ্গল করার উপায়। বোধিচিত্ত উপলব্ধি হয় শূন্যতা ও করুণার মিলনে। "মহাযানী ধর্মমতে বোধিসত্ত্বাবস্থা বা বোধিচিত্ত লাভই সাধকের পরম কাম্য। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে বোধিচিত্ত শূন্যতা ও করুনার মিলিত অবস্থা।"[৪] এরপর সহজিয়া সাধকেরা পুনরায় যোগ সাধনারর দ্বারা পঞ্চস্কন্ধ এবং পঞ্চতথাগতকে দগ্ধ করে চণ্ডালী নামক এই শক্তিকে অবধূতিকা নামক মাধ্যম দিয়ে নাড়ীকে উর্ধ্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। ক্রমে ক্রমে সম্ভোগকায় ও ধর্মকায়কে যথাক্রমে সম্ভোগচক্র ও ধর্মচক্রকে প্রজ্জ্বলিত করে শেষ পর্যন্ত সহজচক্রে উপনীত করে। এটিই মহাসুখের সর্ব্বোত্তম উপলব্ধি। তবে বৌদ্ধধর্মে সহজানন্দের স্বরূপ ও শূন্যতার স্বরূপ এনারা ব্যাখ্যা করেননি। "এই মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভই সাধকের লক্ষ। ঈশ্বর নয়, মোক্ষ বা মুক্তি নয়। ধর্মতত্ত্ব বা থিয়োলজির দিক থেকে মহাসুখের দুটি চরিত্র বড়ো হয়ে ওঠে। একটা হলো 'শূণ্যতা' অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিশ্বগত রূপরসধ্বনি গন্ধস্পর্শের যোগে চিত্তে যে অনুভব ও বাসনার আলোড়ন ঘটে, তার সম্পূর্ণ নিষ্কাশন। সে এক বোধ-বেদনা-আবেগ অনুভবশূণ্য অবস্থা। আর দ্বিতীয় হলো 'করুণা'। এই 'করুণা'-র ধারণাতেই বৌদ্ধদর্শন সম্পূর্ণ মানবিক ও নৈতিক হয়ে ওঠে-বৌদ্ধধর্মের উৎসগত প্রেরণা-মানুষ ও জীবের দুঃখ সহানুভূতি ও তাঁদের দুঃখ ত্রাণ করার চেষ্টার মধ্যে এ ধর্মতত্ত্বের একটা ভিন্নতর মহত্ত্ব তৈরি হয়। যদি সহজানের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই চর্যাগুলিতে এই করুণার কথা, জীবত্রাণের কথা আসে না বললেই চলে। এখানে শুধু চিত্তসংযম থেকে সাধনার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাওয়ার কথা। সিঁড়ির উপরের প্রান্তে আছে ওই মহাসুখের অবস্থান।"[৫] শূন্যতা উপলব্দির চারটি স্তরের কথা বলেছেন।

১) নির্মাণচক্রে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনে চণ্ডালীর উপলব্ধিতে বোধিচিত্তের আবির্ভাবে প্রথম যে উপলব্ধি তা হলো 'শূন্য'। কিন্তু এখানে চিত্তবৃত্তি সমুহ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। এখানে ৩৩ রকমের প্রকৃতিদোষ চিত্তকে ঘরে থাকে।

২) এর পরের স্তরে চণ্ডালী যখন বোধিচিত্ত নিয়ে সম্ভোগ চক্রকে স্পর্শ করে তখন উপলব্ধি হয় 'অতিশূন্য'। এখানেও প্রায় ৮০ রকমের প্রকৃতি দোষ চিত্তকে কুলোশিত করে রাখে।

৩) এরপরে তৃতীয় স্তরে যখন চণ্ডালী বোধিচিত্তকে নিয়ে ধর্মকায়ে ধর্মচক্রকে স্পর্শ করে, তখন 'মহাশূন্য' অনুভূত হয়। এখানেও ৭ রকমের দোষ থাকে।

এই ত্রিস্তরীয় প্রকৃতি দোষকে 'আভাসত্রয়ী' বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলিকে পেরোলেই চতুর্থ স্তরে সহজকায়ে পৌঁছানো যায়। এখানেই 'সর্ব্বোশূন্যতার' উপলব্ধি। এই সর্ব্বোশূন্যতার যে বিকাশ সেখানে চিত্ত অচিত্যে পরিণত হয়।

"কআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।। ধ্রু।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমান।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।। ধ্রু।।
সঅল স (মা) হিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতে নিচিত মরিআই।। ধ্রু।।
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।। ধ্রু।।
ভণই লুহ আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিন্ডি বইঠা।। ধ্রু।"[৬]

১ নং পদটির নামকরণ 'সুকুমার সেন' 'কায়চর্যা' করেছেন। ১ নং চর্যায় লুইপাদ একটি গাছের চিত্রকল্প অঙ্কন এর মাধ্যমে সহজিয়া ধর্ম সাধনার পদ্ধতি ও লক্ষ্যকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। শরীরকে যেখানে বলা হয়েছে বৃক্ষধ্বংস্বরূপ। সহজ সাধনা বা কায়া সাধনা তাই শরীরই এর প্রধান উপজীব্য। উপনিষদ বা গীতায় সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে সাধকের সাধনা উপস্থিত করা হয়েছিল। তারই ছায়া অনুসরণে জগৎ শরীরকে ছেড়ে ব্যক্তি শরীরকে এখানে আলোচ্য বস্তু করা হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শনে রূপ প্রভৃতি পঞ্চস্কন্দের কথা বলা আছে। এরা শরীরের পাঁচটি স্থানে অবস্থিত। সহজ সাধনায় বলা হয় রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের পাঁচজন দেবতা রয়েছেন এবং তারা পাঁচটি স্থানে অবস্থিত। নীচের ছকে এটিকে বোঝানো যেতে পারে— দেহের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত এদের অবস্থানের ক্রম—

পঞ্চস্কন্ধ	পঞ্চ অধিদেবতা	পঞ্চস্থান
সংস্কার	অমোঘসিদ্ধি	পা
বেদনা	রত্নসম্ভব	নাভি
বিজ্ঞান	অক্ষোভ্য	হৃদয়
সংজ্ঞা	অমিতাভ	মুখ
রূপ	বৈরোচন	মস্তক

বলা হয়, পঞ্চস্থানের রূপটি পঞ্চস্কন্ধের এই পঞ্চ অধিদেবতা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বা পঞ্চতথাগতের অধিষ্ঠান কল্পনার নামই পঞ্চধ্যান। এই পঞ্চধ্যানের মাধ্যমে শুরু হয় সহজ সাধনা। এর ফলে সাধক নিজ দেহ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের তত্ত্বময় রূপ অনুভব করে। তার ফলে ঘটে দেহসুদ্ধি। লুই প্রথম পঙ্‌তিতে এই কায়াতরুর রূপকে এই দেহসুদ্ধিব ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেন সেই শরীরে কাল বা রাহু প্রবেশ করে। এই কাল বা রাহু হল জন্ম মৃত্যুর প্রতীক। সহজিয়া সাধক মনে করেন প্রকৃতির আভাস দোষ, মোট আশি রকমের সেটি চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ, সেটি এই শরীরকে প্রাকৃত সত্যে অর্থাৎ অজ্ঞানে ডুবিয়ে রাখে, যার ফলে সাধক কোনো ভাবেই বজ্রসত্যে তথা সর্ব্বোচ্চ সত্যকে জানতে পারে না। তাই লুই সাধক বলেছেন যে— গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে। "সদগুরুই মূল সাধনরহস্য ব্যাখ্যা করবেন।" টীকাকার মুনিদত্ত বলছেন যে— "শুধুপ্রবৃত্তিমূলকভববোধেও সহজানন্দ নেই, শুধু নিবৃত্তিমূলক শূন্যতাতেও সুখ নেই— এই দুইয়ের অন্বয় সামরস্যেই সহজানন্দরূপ মহাসুখের উপলব্ধি"[৭] যারা নির্বাণ পেতে যায় তাদেরকে পঞ্চধ্যানের পঞ্চ ক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করে পদ্মরাজ্যের সংযোগ জাত অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলায় বয়ে চলা প্রজ্ঞা ও করূনা নামক বায়ুকে মধ্য পথে সুষুম্মা বা অবধূতিকার পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই উভয়কে মেলানোই দৃঢ়তা প্রাপ্ত হওয়া। এর ফলে সাধক বোধিচিত্তকে জাগাতে পারবে এবং ধীরে ধীরে চতুর্থ আনন্দ সহজানন্দকে নিরোবধি উপলব্ধি করতে পারবে। "যে সিঁড়িটি বা উর্ধ্বগামী পথটি বেয়ে সাধক এই মহাসুখে পৌঁছাবেন তা একটি নাড়ি। বজ্র সহজান প্রাচীন তন্ত্র থেকে একটি কল্পিত শারীরতত্ব ধার নিয়েছে, যাতে মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত একটি নাড়ি কল্পনা করা হয়েছে, যার নাম তন্ত্রমতে সুষুম্না, আর এখানে 'অবধূতিকা'।"[৮] লুই এটাও বলেছেন যেঅনেকেভাবেসমাধি লাভের চেষ্টা বোধ হয় অনেক জরুরী। কিন্তু আসলে মহাসুখ বা সহজানন্দ পাওয়ার জন্য এইসব সমাধির প্রয়োজন হয় না। তাঁর মতে মহাসুখের ধারনা না থাকার জন্যই বুদ্ধ বিরোধীরা দুঃখ পায়। সুখ দুঃখ ভোগ করতে করতে তারা জন্মায় ও মরে, অথচ মহাসুখ পায় না।

এর পরেই লুই পা বলছেন ছন্দ অর্থাৎ নানান রকম মুদ্রা বা কষ্টকর যোগ সাধনাকে ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় রূদ্ধ করার চেষ্টা ছেড়ে বরং শূন্যতা রূপ পক্ষের উপর নির্ভর করতে হবে। এই শূন্যতা রূপ আসলে পঞ্চ, সহজ সাধনা। এই সহজ সাধনা ইন্দিয়কে কষ্ট দিয়ে ত্যাগের কথা না বলে ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। লুই তাঁর গান শেষ করছেন যে তিনি এই সাধনায় অগ্রসর হয়ে সিদ্ধ হয়েছেন। পঞ্চধ্যানের মাধ্যমে দেহ সুদ্ধি করেছেন। সহজ সাধনার নির্দেশ অনুযায়ী ধমন-চমনকে নিয়ন্ত্রন করে উভয়কে যুক্ত করে অবধূতিকার মাধ্যমে পরিচালিত করে বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটিয়েছেন। পদটি শুরু হয়েছিল দেহ শুদ্ধির ইঙ্গিত দিয়ে। আর শেষ হয়েছে সহজ সাধনায় সিদ্ধ সাধকের সাধনার পথ লক্ষ্যকে ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১) দাশ ডঃ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃ. ৫৫

২) ঐ, পৃ. ৫৮

৩) ঐ, পৃ. ৫৫

৪) ঐ, পৃ. ৫৫

৫) শাস্ত্রী হরপ্রসাদ (সম্পা), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৮৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা -৭০০০০৬, পৃ. ভূমিকাংশ – পবিত্র সরকার।

৬) দাশ ডঃ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃ. ১১৭
৭) ঐ, পৃ. ১১৯
৮) শাস্ত্রী হরপ্রসাদ (সম্পা), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৮৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা -৭০০০০৬, পৃ. ভূমিকাংশ – পবিত্র সরকার।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) চৌধুরী সত্যজিৎ (সম্পা), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
২) বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা — ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ- ২০০৬-৭।
৩) মহাপাত্র রাজর্ষি, ইতিহাসের আলোকে বাংলা, প্রভা প্রকাশনী, ১ কে, রাধানাথ মল্লিক সেন, কলকাতা – ৭০০০১২।
৪) সেন ডঃ সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ০৯, তৃতীয় সংস্করণ- ১৯৭৫।
৫) হক লালিম, গৌতম বুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, বাংলা একাদেমী ঢাকা।

ভারতীয় দর্শনে ধর্মের স্বরূপ

বিপ্লব সরকার
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ (ন্যায়)
শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ দিল্লী, ভারত

সারসংক্ষেপ : 'শব্দকল্পদ্রুমে' 'ধর্ম' শব্দটির নির্বচনে বলা হয়েছে "ধর্ম্মঃ, পুং, ক্লী, ধরতি লোকান্ ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মভিরিতি বা।" √ধৃ + (ব্যর্ত্তিস্তুহুস্রিতি) উণাম্ ১/১৩৬ ইতি মন্ প্রত্যয় করে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'শব্দকল্পদ্রুমে' 'ধর্ম' শব্দটি মূলত ধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

'ধর্ম' শব্দটির পর্য্যায়বাচী শব্দ হল পুণ্যম্, শ্রেয়ঃ, স্বকৃতম্, বৃষঃ, ইত্যমরঃ। 'ধর্ম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল নির্দেশ, কর্তব্য, ব্যবহার, অধিকার, ন্যায়, নৈতিকতা, সততা, Religion, ঈশ্বরের কর্ম ও কার্যাবলী। সেহেতু ধর্মবিষয়ে প্রথমে আলোচনার প্রয়োজন। 'ধর্ম' কাকে বলে? সাধারণতঃ ধর্ম শব্দটি ইংরাজী Religion অর্থে এখন ব্যবহার হয়ে থাকে। এই Religion পদের উৎপত্তি দুটি মূল লাতিন শব্দের সংযোগে 'Re' এবং 'ligare' শব্দ থেকে। 'Re' শব্দের অর্থ 'পিছন' এবং 'ligare' অর্থ 'নিয়ে যাওয়া'। এই পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের অভিমুখে জীবকে যা নিয়ে যায়, তাই Religion অথবা, যার দ্বারা ঈশ্বর-চৈতন্য লাভের জন্য বিভিন্ন ধর্ম সমপ্রদায় কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুমোদিত স্বতন্ত্র প্রার্থনা-উপাসনা পদ্ধতি এবং ধর্মানুষ্ঠানকে Religion বলে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্মপ্রচার'-এ বলেছেন "সংসারে যা একমাত্র সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যা মিলনের তাকে ধর্ম বলে।" ডঃ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "নিজের ক্ষুদ্রতর সত্তাকে বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে ও মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করাই বৈদিক ধর্মের মূল কথা।"

শ্রুতিতে বলা হয়েছে ধর্ম সবকিছুর মধ্যে বিরাজিত। এছাড়া অভিধর্মকোষ ভাষ্যে ধর্মের লক্ষণে বলা হয়েছে "প্রজ্ঞাংমলা সানুচরাহভিধর্মঃ।" অর্থাৎ প্রজ্ঞা, অমলা ও সানুচর হল ধর্ম। এছাড়া বলা হয়েছে, "ধারণাদ ধর্মঃ। তদয়া পরমার্থধর্মো বা নির্বাণা ধর্মলক্ষণা বা প্রত্যভিমুখী ধর্ম ইত্যভিধর্মা।" এখানে পরমার্থ ও নির্বাণকেও ধর্ম বলা হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিকগণ ধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন "বেদবিহিত কর্মজন্যোধর্মঃ।" অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবাত্মায় যে বিশেষগুণ উৎপন্ন হয়, তাই ধর্ম। মহর্ষিপতঞ্জলিকৃত **'ধর্ম'** এর অর্থ খুব গভীর ও ব্যাপক। ধর্ম শব্দের ধাতুগত অর্থের সঙ্গে এর যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। P.V.Kane তাঁর **"History of Dharma Sastra"** গ্রন্থে ধর্ম শব্দটি ধারণ, পালন ও সংরক্ষণ এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম বলতে বোঝায় জনসাধারণের আচরণীয় বিধি। এ প্রসঙ্গে মানবধর্মশাস্ত্রের টীকায় মেধাতিথি বলেছেন ধর্ম পাঁচপ্রকার কর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, নৈমিত্তিকধর্ম ও গুণধর্ম। পূরাণসাহিত্যে ধর্ম হল শ্রুতি ও ধর্মশাস্ত্র বিহিত বর্ণাশ্রমাত্মক।

মূলশব্দ: ধর্ম, ন্যায়, প্রজ্ঞা, অনুমেয়, সর্গ, শ্রুতি, যজন।

মূল আলোচনা:

ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি -

শব্দকল্পদ্রুমে **'ধর্ম'** শব্দটির নির্বচনে বলা হয়েছে **"ধর্ম্মঃ, পুং, ক্লী, ধরতি লোকান্ প্রিয়তে পুণ্যাত্মভিরিতি বা।"**[1]√ধৃ + (ব্যর্ত্তিস্তুহুস্ত্রিতি) উণাম্ ১/১৩৬ ইতি মন্ প্রত্যয় করে **'ধর্ম'**শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। শব্দকল্পদ্রুমে**'ধর্ম'**শব্দটি মূলত ধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

ধর্ম শব্দটির পর্য্যায়বাচী অর্থ -

'ধর্ম' শব্দটির পর্য্যায়বাচী শব্দ হল পুণ্যম্, শ্রেয়ঃ, স্বকৃতম্, বৃষঃ, ইত্যমরঃ। মেদিনীতে **'ধর্ম'**শব্দটি ন্যায়, স্বভাব, আচার, উপমা, ক্রতু, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া মেদিনীতে অহিংসা, উপনিষৎ প্রভৃতি অর্থে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র বলেছেন "দানাদিকে ক্লী" এই অর্থে 'ধর্ম' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গেও ব্যবহার হয়ে থাকে।

ধর্মের আভিধানিক অর্থ -

'ধর্ম'শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল - নির্দেশ, কর্তব্য, ব্যবহার, অধিকার, ন্যায়, নৈতিকতা, সততা, Religion, ঈশ্বরের কর্ম ও কার্যাবলী। সেহেতু ধর্মবিষয়ে প্রথমে আলোচনার প্রয়োজন। 'ধর্ম' কাকে বলে? সাধারণতঃ ধর্ম শব্দটি ইংরাজী Religion অর্থে এখন ব্যবহার হয়ে থাকে। এই Religion পদের উৎপত্তি দুটি মূল লাতিন শব্দের সংযোগে 'Re' এবং 'ligare' শব্দ থেকে। 'Re' শব্দের অর্থ 'পিছন' এবং 'ligare' অর্থ 'নিয়ে যাওয়া'। এই পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের অভিমুখে জীবকে যা নিয়ে যায়, তাই Religion অথবা, যার দ্বারা ঈশ্বর-চৈতন্য লাভের জন্য বিভিন্ন ধর্ম সমপ্রদায় কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুমোদিত স্বতন্ত্র প্রার্থনা-উপাসনা পদ্ধতি এবং ধর্মানুষ্ঠানকে Religion বলে। এই সূত্র ধরে, যদি ধর্ম বলতে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রিস্ট প্রভৃতি ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং রীতি-নীতি পালনকে বোঝায় তাহলে ধর্ম কথাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত ব্যাপার হয়ে পড়ে। আর সেখানে মানুষের ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আমাদের মনে এক নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। দীর্ঘকাল আগেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং ধর্মের নামে মানব সমাজের কৃত্রিম বিভাজন অনেককেই ধর্মের প্রতি বিরূপ ও বিদ্রোহী করে তুলেছে।

ধর্মান্ধতা, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে স্তব্ধ করে দেবে কি বিশ্বমানবের প্রতিশ্রুতি? পেছনের দিকে টেনে ধরবে কি সভ্যতার বিজয় রথের রশি? অথবা বিজ্ঞান ও মননের পথেই কি মানুষ একদিন উপলব্ধি করবে ধর্মহীন মহাবিশ্বচৈতন্যকে। এই কঠিন প্রশ্নের নির্ভীক উত্তর হয়তো অনেক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী মানুষই তাঁদের দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন, গবেষণা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তুলে ধরবেন, কিন্তু ধর্ম শব্দটির যে বহুদ্বার অর্থাৎ বহু অর্থ। আর সেই অর্থের ভিতর তার সভ্যতা, তার কৃষ্টি, তার সৃষ্টিমনস্কতা, তার মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ লুকানো আছে তা হলে সেগুলো কোথাও যেন হারিয়ে যাবে। ধর্মের সেই অর্থের অনুসন্ধান করার চেষ্টা এই শোধপ্রবন্ধে করা হয়েছে যার দ্বারা মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ, মৈত্রী ভাবনা ও পরকল্যাণের ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

ডঃ ভারতী মুখার্জীর মতে - প্রাচীন ভারতে ধর্ম শব্দটির ব্যঞ্জনা ছিল ব্যাপক। ধর্ম বলতে কেবল শাস্ত্রীয় অনুশাসন বোঝাত না। ধর্ম শাস্ত্রীয় অনুশাসন অপেক্ষা আরও অনেক উচ্চস্তরে

---

[1]শব্দকল্পদ্রুম

অবস্থিত। ধর্মই অনুশাসন তৈরী করে এবং অনুশাসন ধর্মের উপর অধিষ্ঠিত। ধর্ম পরজগৎ সম্পর্কীয় কোন তত্ত্ব নয়। আগেই বলা হয়েছে, ব্যুৎপত্তিগত ভাবে ধর্ম শব্দটির উদ্ভব 'ধৃ' ধাতু থেকে। 'ধৃ' ধাতুর আভিধানিক অর্থ ধারণ করা, দৃঢ় সন্নিবদ্ধ করা, ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ইত্যাদি। যা ধারণ করে তাকে ধর্ম বলে। বিশেষ অর্থে যা সমাজকে ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্মপ্রচার'-এ বলেছেন "সংসারে যা একমাত্র সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যা মিলনের তাকে ধর্ম বলে।"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা অনুসারে বলতে হয়, যা কিছু মিলনের, শান্তির, ঐক্যের বাণী তাই ধর্ম। ধর্ম বৈষম্য, বিরোধ ও বিচ্ছেদ রূপ অধর্মকে দূর করে মানুষকে সুস্থ নির্বিঘ্ন স্বচ্ছন্দ জীবন দান করে। মানুষ তখন জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথের সেই কথা - মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। 'জীবাতবে ন মৃত্যবে' -- বাঁচবার জন্য, মরবার জন্য নয়।

maintain, to preserve'. Thus dharma means something that holds, maintains or preserves (our existence or nature). ড. গোস্বামী 'to hold', 'to maintain', 'to preserve' অর্থাৎ ধারণ, পালন ও সংরক্ষণ ধর্মের মূলত এই তিনটি অর্থকে গ্রহণ করেছেন, যার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ঋগ্বেদ সংহিতার সায়ণ ভাষ্যে -**"ধর্ম। ধারণাৎ ধর্ম। ধর্ম ধৃঞ ধারণে। ইত্যস্মাৎ অন্যেভ্যোংপি দৃশ্যন্তে। ইতি মনিন"**[2]। এছাড়া ঋগ্বেদসংহিতায় কমবেশি ৪১টি বা তার বেশি মন্ত্রে ধর্ম শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩/১৭/১ নং সূক্তে ধর্ম শব্দটির যে প্রয়োগ দেখা যায় সেখানে সায়ণ ধারণ এই অর্থই গ্রহণ করেছেন 'ধর্ম। ধারণাৎ ধর্ম। অগ্নেঃ - যজ্ঞনির্বাহকতয়া তদ ধারকত্বাৎ ধর্মাগ্নিঃ।' এছাড়া ১০/৯২/২ মন্ত্রটিতে যে ধর্মশব্দের প্রয়োগ হয়েছে তাতেও ধর্ম শব্দটির অর্থ ধারণ করা। **'ধর্ম ধৃঞ ধারণে ইত্যস্মাৎ অন্যেভ্যোংপি দৃশ্যন্তে ইতি মনিন্।'**[3]এই রকম অনেক মন্ত্রে দেখা যায় ধর্ম শব্দটির অর্থ, ধারণ করা। এছাড়া ঋগ্বেদ সংহিতায় ধর্ম শব্দটির ধর্মীয় নির্দেশ বা সত্য অর্থে প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায়।

ডঃ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "নিজের ক্ষুদ্রতর সত্তাকে বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে ও মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করাই বৈদিক ধর্মের মূল কথা।"তাহলে প্রশ্ন ওঠে তিনি ধর্ম বলতে কী বুঝিয়েছেন? "যা সকল তুচ্ছতার মধ্যে, সকল আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, সকল উত্থান পতনের মধ্যে মানুষকে সত্যে ধারণ করে তাই ধর্ম।" ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম শব্দটির যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা ধারণ অর্থই প্রকাশ করে। তাঁর লেখার মধ্যে উঠে এসেছে যা মানুষকে ধারণ করে সেটা ধর্ম। সে ধারণ সত্যে ধারণ।

ভারতীয় দর্শনে ধর্মের স্বরূপ আলোচনা -

বিচারশাস্ত্রে ধর্মের স্বরূপ আলোচনায় ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, মীমাংসাশাস্ত্রের নামান্তর বিচারশাস্ত্র। এই গ্রন্থে ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। শ্রুতিতে বলা হয়েছে ধর্ম সবকিছুর মধ্যে বিরাজিত। এই শ্রুতির অর্থ যথাযথ বিচারে জগতের সমস্ত কিছুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধ ধর্মের আয়ত্তাধীন, সেহেতু ধর্মের স্বরূপ জ্ঞানের জন্য মীমাংসাশাস্ত্রের প্রয়োজন। মীমাংসকমতে**"যজ্ঞাদয়ো ধর্মাঃ। যত্র সর্ববিধা ধর্মাঃ সমাবিষ্টা বেদেন স্বয়ং তে যজ্ঞাদয়ঃ**

[2]ঋগ্বেদসংহিতা - ৩/১৭/১

[3]ঋগ্বেদসংহিতা - ১০/৯২/২

প্রথমধর্মরূপেণ সমাদৃতাঃ।" বেদে বলা হয়েছে-**"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন।"** এই শ্রুতিবাক্য থেকে একথা বলা যায়**"দেবাঃ প্রজাপতিপ্রাণরূপাঃ যজ্ঞেন যজ্ঞোক্তেন যজ্ঞসাধনভূতেন সঙ্কল্পেন বা। যজ্ঞং পুরুষং যজ্ঞস্বরূপং বিষ্ণুং বা ইতি। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। ইতি শ্রুতিঃ। অযজন্ত পূজিতবন্তঃ, তানি তে, ধর্মাণি ধর্মাঃ প্রথমানি মুখ্যানি, আসন অভূবন্।"**[4]

যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুই জগৎরূপ বিকারের মুখ্য বা প্রথম ধারক। মহামতি জৈমিনি ধর্মের লক্ষণে বলেছেন **'চোদনা লক্ষণোংর্থো ধর্মঃ'**। অর্থাৎ বৈদিক বিধিদ্বারা নির্দিষ্ট শ্রেয়সাধক অর্থ ধর্ম।

বৌদ্ধমতে**"অনুমেয়ো অত্র জিজ্ঞাসিতবিশেষো ধর্মঃ।"**[5]অর্থাৎ প্রাপ্তিনিশ্চয়কালে ধর্ম অনুমেয়।

এছাড়া অভিধর্মকোষ ভাষ্যে ধর্মের লক্ষণে বলা হয়েছে **"প্রজ্ঞাংমলা সানুচরাহভিধর্মঃ।"** অর্থাৎ প্রজ্ঞা,অমলা ও সানুচর হল ধর্ম। এছাড়া বলা হয়েছে, **"ধারণাদ ধর্মঃ। তদয়া পরমার্থধর্মো বা নির্বাণা ধর্মলক্ষণা বা প্রত্যভিমুখী ধর্ম ইত্যভিধর্মা।"**[6] এখানে পরমার্থ ও নির্বাণকেও ধর্ম বলা হয়েছে।

জৈনমতে **"গতিস্থিত্যুপয়হৌ ধর্মাধর্ময়োরূপকারঃ।"**[7] অর্থাৎ ধর্ম জীব এবং পুদগলের গতি সহায়ক একরকম দ্রব্য, যার অভাবে কোন রকম চলাফেরা ও স্থান পরিবর্তন সমভব হয় না, তাকে ধর্ম বা ধর্মাস্তকায় বলে।

বৈশেষিকগণ ধর্মের স্বরূপে বলেছেন **"যতোংভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।"**[8] অর্থাৎ যা থেকে অভ্যুদয় ও শ্রেয়লাভ হয় তাই ধর্ম। এক্ষেত্রে বৈশেষিকদর্শনে উক্ত ধর্মের স্বরূপের সঙ্গে মীমাংসাদর্শনের ধর্মের স্বরূপের অনেকটা মিল দেখা যায়। ন্যায়-বৈশেষিকগণ ধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন **"বেদবিহিতকর্মজন্যোধর্মঃ।"**[9] অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের ফলে জীবাত্মায় যে বিশেষগুণ উৎপন্ন হয়, তাই ধর্ম।

সাংখ্যমতে **"অন্তঃকরণধর্ম্মরং ধম্মাদীনাম।"**[10] অর্থাৎ মনের বৃত্তিবিশেষই ধর্ম।

পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনে বলেছেন **"যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্মীর বা পদার্থের কার্যসাধিকা শক্তিই ধর্ম।"**[11]যোগ্যতা হল শব্দের কার্যরূপে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য। মহর্ষিপতঞ্জলিকৃত **'ধর্ম'** এর অর্থ খুব গভীর ও ব্যাপক। ধর্ম শব্দের ধাতুগত অর্থের সঙ্গে এর যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। কে ধারণ করে? শক্তি। এই শক্তি বিশ্বজগতের প্রতিটি পদার্থকে ধারণ করে। তাই প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্ব রক্ষা করে তার অন্তর্নিহিত শক্তি। সেই শক্তি সেই

---

[4] বি.শা.ধর্ম

[5]ন্যা.বি.

[6]অভি.ধর্ম.

[7]ত.সূ.

[8]বৈ.দ.

[9]তর্ক.সং

[10]সা.দ.

[11]পা.দ.

পদার্থের গুণ। সেই গুণ সেই পদার্থের ধর্ম। এ থেকে একথা অনুমান করা যায় মানুষেরও অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। এই অন্তর্নিহিত শক্তি তার গুণ এবং সেই শক্তি মানুষের মানবত্বকে ধারণ করছে। তাই মানবত্বই মানুষের ধর্ম। বিধাতার এই বিপুল শক্তির মাঝে মনুষ্যত্বরূপ ধর্ম মানুষকে মানবেতর জীব থেকে আলাদা করে রাখে।

ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম ও দানধর্মের স্বরূপ আলোচনা-

গৌতম ধর্মসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসুত্রের সম্পাদনাকালে উমেশচন্দ্র পাড়ে মহাশয় ধর্মের স্বরূপ বর্ণনায় বলেছেন, ধর্ম শব্দটি ঋগ্বেদে মূলত বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা সংজ্ঞারণে প্রযুক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন প্রায়ই এই ধর্মশব্দটি **'ধর্মণ'** প্রাতিপদিকের রূপ এবং এর প্রয়োগ ক্লীবলিঙ্গে হয়েছে। তিনি এর ত্রিবিধ অর্থ ধার্মিক ক্রিয়া, ধার্মিক বিধি ও নিশ্চিত নিয়মের উল্লেখ করেছেন।

মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে পাই **"রাজধর্মান প্রবক্ষ্যামি, ইতি"**।[12] **"ধর্মশব্দঃ কর্তব্যতাগুনম'**। মেধাতিথির ভাষ্যে বলা হয়েছে রাজার এই কর্তব্য দুই প্রকার দৃষ্টার্থক ও অনুষ্টার্থক। ষাড়গুলোর প্রয়োগ হল দৃষ্টার্থক। এর দ্বিতীয় শ্লোকে মনু বলেছেন এই ষাড়গুণ্য প্রয়োগের দ্বারা একজন ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম অবলম্বন করে নিজের রাজ্যের অধিবাসী সকল প্রজাকে পালন বা রক্ষা করবেন। মেধাতিথি তাঁর টীকায় বলেছেন **"পরিরক্ষণম পরিপালনম"**[13]। সেক্ষেত্রে কর্তব্য যদি ধর্ম হয় তাহলে সেই কর্তব্য হবে পরিপালন। একই ভাবে যাজ্ঞবল্কসংহিতার ব্যবহার অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর বলেছেন প্রজাপালন রাজার প্রধান ধর্ম। এই সব আলোচনাকালে একথা উঠে আসে ধর্মের এই তিনটি অর্থের মধ্যে পালন ও রক্ষণ রাজধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও এর বাইরে ধর্ম হল সেটাই যা সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিছুকে ধারণ করে আছে, পালন করছে ও রক্ষা করছে।

P.V.Kane তাঁর "History of Dharma Sastra" গ্রন্থে ধর্ম শব্দটি ধারণ, পালন ও সংরক্ষণ এ অর্থে গ্রহণ করেছেন।"Dharma behind the curtain"এই গবেষণা প্রবন্ধে Prof. Piyali Praharaj-এর মতে ধর্ম শব্দটির অর্থ ধারণ, সংরক্ষণ ও পোষণ। তিনি বলেছেন "The word dharma is derived from root dir (to uphold, to support, to nourish)[14]।

ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম বলতে বোঝায় জনসাধারণের আচরণীয় বিধি। এ প্রসঙ্গে মানবধর্ম শাস্ত্রের টীকায় মেধাতিথি বলেছেন ধর্ম পাঁচপ্রকার কর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, নৈমিত্তিকধর্ম ও গুণধর্ম[15]। টীকাকার গোবিন্দস্বামী বৌধায়ন ধর্মসূত্রের টীকায় একই ভাবে স্মার্তধর্মের অন্তর্গত ধর্মকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করেছেন। কিন্তু তিনি এর অতিরিক্ত যা বলতে চেয়েছেন তা হল সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম। তিনি মূলত এই পাঁচটিকে দুটি সাধারণ ভাবে ভাগ করেছেন। এই সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্মের মধ্যে যাগ, আচার, দান ও অহিংসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাচরণ রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে কারণ এগুলি ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণের সঙ্গে সময় সমাজের মঙ্গল সাধনের সামগ্রিক পদ্ধতি। আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মের স্বরূপে বলেছেন যাগ, আহ্নিকাদি আচার, দম,

[12]মনু.সং

[13]তদেব, মেধাতিথিভাষ্য

[14]হিস্ট্রি অফ্ ধর্মশাস্ত্র

[15]তদেব, মেধাতিথিভাষ্য – 2/25

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায় ও আত্মদর্শনই হল পরমধর্ম কারণ সকল কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়[16]। এইগুলি সকল বর্ণধর্মের ও আশ্রমধর্মের পালনীয় অবশ্যকর্ম। এগুলির মধ্যে দানধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণের মধ্যে দানধর্ম অন্যতম। দানের ইচ্ছা ব্যক্তিকেসমষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। আত্ম ও পরের সাযুজ্য ঘটায়। অন্যের অশ্রুতে আপন হৃদয় সিক্ত করে। এই একাত্মবোধ না থাকলে দানধর্ম আর দানধর্মে থাকে না। দয়া আর অনুকমপায় পর্যবসিত হয়। তাই ধর্মশাস্ত্রে দানধর্ম বর্ণাশ্রমভূক্ত সকল ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় কর্ম হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম শব্দটির সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের আদর্শ এবং সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য কর্তব্যসমূহ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মূলত প্রাচীন ভারতে ব্যক্তির আচরণীয় বিষয়ের দিকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর থেকে অনুমেয় যে ব্যক্তিসমূহের পৃথক পৃথক কল্যাণ প্রচেষ্টার মধ্যে সামগ্রিকভাবে সমাজকল্যাণের অভিপ্রায়ের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দয়া, দম, শান্তি এই দশটি ধর্মাচরণ সকল আশ্রমের সাধারণ ধর্ম। তাই জাতিকূল-অবস্থানির্বিশেষে মানবমাত্রেরই আচরণীয় এই সকল শুভকর্মের মধ্যে দানধর্ম অন্যতম ও সার্বজনীন। এ বিষয়ে মানবধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে-**"সত্য যুগে তপস্যাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দ্বাপরে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং কলিতে দানধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব পণ্ডিতেরা এইরকম মত দিয়ে থাকেন।"** কেননা দানবর্মে শরীর ক্লান্ত হয় না, অন্তরের সংযমের প্রয়োজন হয় না। কলিকালে অল্পায়ুশক্তিহীন মানুষের পক্ষে দান করা অনায়াসেই সম্ভব বলে দানধর্মকেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। কলিকাল বলতে শাস্ত্রকাররা সমসাময়িক কালকে বোঝাতে চেয়েছেন এবং দানধর্মের অবশ্যপালনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন।

আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য দানধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন- **"উপযুক্ত পাত্রে দেশ, কাল, উপায় ও দ্রব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রদান করা হলে তখন দান ধর্মে পরিণত হয়।"**[17] বিজ্ঞানেশ্বর আচার্য টীকায় বলেছেন দান চারটি ধর্মাচরণের মধ্যে অন্যতম পালনীয় আচরণ। বিজ্ঞানেশ্বরের এই মতটি দানকে কলিযুগের একমাত্র ধর্মের আসনে বসিয়েছে।

সকল বর্ণাশ্রমের আচরণীয় সামান্যধর্মের আলোচনায় দানের কথা বারবার উঠে আসে। সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কালে, অবস্থায় ও পরিবেশে বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আমরা ধর্মশাস্ত্রে পাই। ধর্মশাস্ত্রে আমরা দেখি, যে দুটি ভিত্তিপ্রস্তরের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত তা মূলত বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম। বর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের কথাই বলা হয়েছে, এর অতিরিক্ত কোনো পঞ্চম বর্ণ স্বীকৃত হয়নি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন স্বধর্মে নিধন হওয়া শ্রেয় কিন্তু পরের ধর্ম ভয়াবহ। এদিক দিয়ে ব্রাহ্মণের স্বধর্ম হল জ্ঞান লাভ করা। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম প্রজাদেরকে রক্ষা করা, বৈশ্যের স্বধর্ম কৃষিকার্য, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করা ও শূদ্রের স্বধর্ম এই তিন বর্ণের লোকের সেবা করা। এই চতুর্বর্ণের স্বধর্ম শাস্ত্রে এভাবে বলা হয়েছে[18]। মনু বলেছেন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত। যজন, অধ্যয়ন, দান ও প্রজারক্ষণ এই কয়টি কর্ম ক্ষত্রিয়ের এবং পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদগ্রহণ বৈশ্যের কাজ।

[16]বৌ. ধর্মসূত্র, পৃ - 73

[17]যা.স্মৃতি – 1/6

[18]ম.নু.সং – 11/236

শব্দকল্পদ্রুমেও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি দেখা যায়। চারবর্ণের মধ্যে দানধর্ম উপরে উক্ত তিন বর্ণের স্বধর্ম বা সাধারণ ধর্মরূপে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বলা হয়েছে দান বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরসাধারণ ধর্ম। আপতঙ্গ ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসূত্র ও বশির ধর্মসূত্রে একইভাবে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিয়াহ এই ছয়টি কর্ম ব্রাহ্মণের বলা হয়েছে। এর মধ্যে অধ্যাপনা, যাজন ও সৎপ্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের জীবিকা তার জন্য বর্ণের এই তিনটি কর্ম নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দান, যজন, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন। দান, যজন ও অধ্যয়ন ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম ও জীবিকা হল প্রজারক্ষণ দ্বারা। আর বৈশ্যের ক্ষেত্রেও সাধারণ পালনীয় ধর্ম এক কিন্তু তাদের জীবিকা কৃষিকার্য, পশুপালন, বাণিজ্য ও সুদগ্রহণ। শূদ্রের দানের কথা নেই। তাদের সেবাই পরম ধর্মরূপে বলা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রে যে দানধর্মের কথা বলা হল তা তিন বর্ণের সাধারণ পালনীয় ধর্ম।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে স্বাধ্যায়, দমগুণ, মৈত্রীভাব, সমাহিতভাব, নিত্যদানশীলতা, প্রতিগ্রহ বর্জন ও সর্বভূতের প্রতি অনুকম্পা ব্রাহ্মণের গুণ। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে।মহাভারতের বনপর্বেও বলা হয়েছে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, করুণা, তপস্যা ও দয়া প্রভৃতি গুণ যাদের মধ্যে দেখা যায় সে ব্রাহ্মণ। এই সকল ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ আছে দানশীলতা তার মধ্যে অন্যতম। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণের কর্তব্যের মধ্যে দানধর্মের উল্লেখও পাওয়া যায়।

ধর্মশাস্ত্রে একজন ক্ষত্রিয় রাজার সাধারণ ধর্ম প্রজাপালন ও রক্ষণ। তার জন্য যে দণ্ডনীতি ক্ষত্রিয় রাজার জানা প্রয়োজন সে সম্পর্কে কোটিল্য বলেছেন **"অলব্যলাভার্থী লবৎপরিরক্ষণী রক্ষিতার্থবিবধনী বৃদ্ধস্য তীর্থেধূ প্রতিপাদনী চ।"**[19] ধর্মশাস্ত্রে শাস্ত্রকার মনুও একই কথা বলেছেন একজন সার্থক প্রশাসকের প্রথম কাজ হবে যা লাভ করা হয়নি তা লাভ করার অভিলাষ করা। দ্বিতীয়ত যা লাভ করা হয়েছে তা সযত্নে রক্ষা করা, তৃতীয়ত কৃষি, বাণিজ্যদ্বারা, লবধ হন বর্ধিত করা। চতুর্থ কাজ হবে যে ধন বর্ষিত হয়েছে তা সৎপাত্রে দান করা। মনু মনে করেন ক্ষত্রিয় রাজার লাভ, রক্ষণ, বর্ধন ও দান এই চারটি কাজ ধর্মাদি পুরুষার্থের সাধনের জন্য। তাই সকল সময়ে আলস্য পরিত্যাগ করে এইগুলি ঠিক মতো করা উচিত। এই চতুর্বিধ দণ্ডনীতির মধ্যে প্রত্যেকটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি দ্বারা রাজ্যের বিকাশ সমম্ভব নয়। এখানেও দানধর্মের গুরুত্ব সমভাবে প্রযোজ্য।

দানধর্ম যেমন চারবর্ণের পালনীয় সাধারণ ধর্ম তেমন চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমের বিশেষ ধর্মরূপে পরিগণিত। **হিস্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্রে** পি ভি কানে যমবচনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন-

যতীনাং তু শমো ধর্মন্ধনাহারো বনৌকসাম্।
দানমেব গৃহস্থানাং শুশ্রুষা ব্রহ্মচারিণাম।।[20]

ধর্মশাস্ত্রে বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। মূলত বর্ণধর্মের দ্বারা জাতির জীবন নিয়ন্ত্রিত হত এবং আশ্রমধর্মের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনসুনির্দিষ্ট হত। এই আশ্রম চতুষ্টয় হল রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এর মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমে দান একমাত্র ধর্ম বলে কথিত ছিল।

---

[19]কৌ.অর্থ, 1/4/1

[20]হি.অ.ফি, পৃ - 837

দানের দ্বারা অরাতি শান্ত হয়, শত্রু মিত্র হয়, দান সমস্ত কিছুর প্রতিষ্ঠা স্বরূপ[21]। তাই শাস্ত্রকার মনু গার্হস্থ্য আশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন গৃহস্থের কর্তব্য হল অনাকে হিংসা না করে সাধানত সামান্য কিছু দান করা। অল্প দান করলেও এই দাতার নিকট এমন একজন ব্যক্তি বা দানপাত্র একদিন আসবেন যিনি দান গ্রহণের দ্বারা দাতাকে সব পাপ থেকে রাশ করবেন। যে গৃহস্থ হিংসা শূন্য হয়ে অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করে ও যে শুদ্ধ মনে তা গ্রহণ করে উভয় ব্যক্তিই স্বর্গগামী হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে দানধর্মকে যেমন সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম বলা হয়েছে তেমনি গার্হস্থ্য আশ্রমে দানকে সাধারণ ধর্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই অত্রিস্মৃতিতে বলা হয়েছে দান অপেক্ষা ইহকালে ও পরকালে বড় মিত্র নেই। স্মৃতিকার ব্যাস বলেছেন অনাহূত হয়ে অপ্রার্থিত হয়ে দান করাই মুখ্য দান। যে বস্তুকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়, সেই বস্তু দান করাই শ্রেয়।

পুরাণে ধর্ম ও দানধর্মের উৎস ও ক্রমবিকাশ–

পুরাণসাহিত্য অতিবিশাল। যদিও সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত পুরাণের পঞ্চলক্ষণ, পূরাণে বর্ণিত ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় আলোচনায় এমন কোনো বিষয় নেই যা নিরূপিত হয়নি। পুরাণে দানধর্মের বিবিধ অঙ্গ উপাঙ্গ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই পূরাণসাহিত্যে ধর্ম হল শ্রুতি ও ধর্মশাস্ত্র বিহিত বর্ণাশ্রমাত্মক। পুরাণে বর্ণিত শিষ্টজনের অনুমোদিত আচারগুলি হল দান, সত্য, তপস্যা, বিদ্যা, যজন, পূজন, দম ও অলোভ। এর মধ্যে দানধর্মের স্থানপ্রথম। সকল মন্বন্তরে মনু ও সপ্তর্ষি প্রমুখ যে এই দানধর্মের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন তা পূরাণ থেকে আমরা জানতে পারি। মৎস্যপুরাণে দানের লক্ষণে পাই দানের যোগা সেই বস্তু যা দাতার কাছে একান্ত অভীরতম এবং ন্যায়পথে উপার্জিত। সেই সব দ্রব্য গুণবান জনে প্রদানকে দান বলে। যত কিছু উপায় আছে তার মধ্যে দান শ্রেষ্ঠ বলে নির্দিষ্ট। সুপ্রযুক্ত দানের দ্বারা অন্যকে জয় করা সম্ভব। দানের বশ হয় না এমন লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। দানের দ্বারা দেবতারাও লোকের বশীভূত হন। দানশীল ব্যক্তি সকলের কাছে প্রিয় হয়। দানশীল রাজা স্বল্প সময়েই শত্রুপক্ষীয়দের পরাজিত করতে পারেন।সব লোক দানে বশীভূত হওয়ার ফলে লোকে দানকে সমস্ত উপায় থেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসা করে থাকে। পুরাণে দানকে ধর্মের পঞ্চদশ মার্গের মধ্যে একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পঞ্চদশ মার্গ হল যজন,যাজন, তপস্যা, দান, দম, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য, সত্য, তীর্থভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ, বেদার্চনা, ব্রাহ্মণ সম্মান, ইন্দ্রিয়বিজয় ও মাৎসর্যহীনতা, এইগুলি ধর্মের এক একটা পথ যার মধ্যে দানধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়[22]। তাই প্রাচীনকালে রাজা অম্বরীষ, ভাগব, কারবীর্যার্জুন, প্রহ্লাদ ও পন্থ প্রমুখ নরপতি বহু দানধর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁরা মহাদান করেছিলেন বলে তাঁদের কোনো শত্রু ছিল না এই পৃথিবীতে।

সহায়ক গ্রন্থসূচী:

- ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ, 2002, **বিচারশাস্ত্রে ধর্মস্বরূপবিবেচনম**, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগীয় পত্রিকা, পৃ. 16
- ধর্মকীর্তি, **ন্যায়বিন্দু,**2021, সম্পা. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তি, সপ্তম মুদ্রণ, সাহিত্যশ্রী, 2/8

---

[21]মহা. উপনি, 22/1/22

[22]ম.পুরাণ, 212/18-21

- বসুবন্ধু, **অভিধর্মকোশ**, 1981, সম্পা. দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী, বৌদ্ধভারতী, 1/1
- **তত্ত্বার্থসূত্রম**, 2001, সম্পা. ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, ভারতী জৈন পরিষদ, 5/13
- কণাদ, **বৈশেষিকদর্শন**, 1363, অনু. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 1/1/2
- অন্নংভট্ট, **তর্কসংগ্রহ**, 1339, সম্পা. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুত্র নং 118
- কপিল, **সাংখ্যদর্শন**, অনু. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 5/25
- পতঞ্জলি, **পাতঞ্জলদর্শন**, 2004, অনু. ভর্গানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
- **মনুসংহিতা**, 1410, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, 7/3
- **হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র**, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ - 6
- **যাজ্ঞবল্কস্মৃতি**, 1407, সম্পা. শ্রীমতি সুমিতা বসু ন্যায়তীর্থ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, 1/8
- **শব্দকল্পদ্রুম** কোশগ্রন্থ
- **ঋগ্বেদ সংহিতা**, গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, - ৩/১৭/১ ।

বিশ্বায়ন ও আফসার আমেদের কথাসাহিত্য

তাপস পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উত্তর আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বায়ন। আশির দশক শুরুর পর থেকে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দুনিয়ায় পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও বিপুল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। দেশীয় অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল এক ভোগবাদী মানসিকতা। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-কর্পোরেট শক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদী সংস্কৃতি মানুষকে বস্তুগত কামনা-বাসনার দিকে চালিত করেছিল। ফলে জীবন হয়ে উঠেছিল যান্ত্রিক, সমাজ হয়ে উঠেছিল বাজার। এরকমই এক সমাজজীবনে দাঁড়িয়ে কথাসাহিত্য রচনা করেছেন আফসার আমেদ। স্বাধীনতা উত্তর কালের কথাকার রূপে আফসার আমেদ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মুসলমান সমাজ ও পরিবারের অন্দরমহলের প্রত্যাশা প্রত্যাখ্যান, আলো, অন্ধকার, স্বপ্ন, হতাশা, বিষাদ নিজস্ব অবয়ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। নয়ের দশক থেকে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে; এক কথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বায়ন প্রবেশ করেছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে এই যান্ত্রিক জীবন ও বাজারকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বায়নের অভিঘাত আমাদের সমাজে ও জীবনে কতটা রূপান্তর ঘটিয়েছে তা আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের সূত্রে আমরা আলোচনা করবো।
সূচক শব্দ: পণ্যায়ন, গ্রামের মফস্বলের রূপান্তর, প্রজন্মগত ব্যবধান, বিবিধ ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার, যৌথ পরিবার ভেঙে ছোট ছোট পরিবার, প্রযুক্তির সর্বৈব ব্যবহার, ক্যারিয়ারমুখী নতুন প্রজন্ম, কর্মজগতের ব্যাপ্তি ও নতুন নতুন পেশা, সম্পর্কের ক্ষণভঙ্গুরতা, গ্রামীণ লৌকিক সংস্কৃতিতে শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসন, ডিপ্রেশন।

মূল আলোচনা:
বিশ্বায়ন ও মুক্ত অর্থনীতির ফলে ভারতীয় বাজারে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ভারতে আধুনিক প্রযুক্তি সকলের কাছে সহজলভ্য হয়। বিশ্বায়ন আসলে বাজার দখলের রাজনীতি। বিশ্বায়ন মূলত বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পর্ককে আরো নিবিড় করে তোলে। ভারতে বিশ্বায়নের সূত্রপাত ঘটেছে স্বাধীনতার আমল থেকেই। ১৯৪৮ সালে চল্লিশটি দেশ মিলে GATT (General Agreement on Tariff and Trade) চুক্তি সই করে। যার মাধ্যমে বিশ্বায়নের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৯৪ সালে ১৩৫টি দেশ আন্তর্জাতিক বানিজ্যচুক্তিতে সই করে। গড়ে তোলে World Trade Organization। যার কাজ ছিল বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ গড়ে তুলতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি করা। চুক্তিগুলির তদারক করা। ভারতে মুক্ত অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী নরসিম্হা রাওয়ের সময়ে (১৯৯১-১৯৯৬)। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং এই কাজটি করেন। ফলে ভারতীয় বাজারে দেশী বিদেশী কোম্পানিগুলির অবাধ প্রবেশ ঘটে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ও মহার্ঘ্য ভোগ্যপণ্যদ্রব্য সহজলভ্য হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত এবং ধীরে ধীরে নিম্নবিত্তের নাগালে আসে

আধুনিক প্রযুক্তি। সর্বস্তরে প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারণ সমাজে আনে আমূল পরিবর্তন। মানুষের জীবন ও মননে দেখা দেয় বদল। মানুষ ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে ক্রমশ। নৈতিকবোধের অধঃপতন ঘটে। যা শিল্প সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। প্রযুক্তির ব্যবহারে মানুষের জীবন অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়। কিন্তু মানুষের মন ক্রমশ বিপর্যস্ত হতে থাকে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সৃষ্টি হয় নানা সঙ্কট, জটিলতা। মানুষ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বাংলায় 'বিশ্বায়ন' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজি শব্দ 'Globalization'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে। 'Globalization' শব্দটির অর্থ সন্ধানে অগ্রসর হলে যে অর্থ আমরা পাই তা এরকম—

> "the increase of trade around the world, especially by large companies producing and trading goods in many different countries"; "when available goods and services, or social and cultural influences, gradually become similar in all parts of the world."[১]

অর্থাৎ ইংরেজি 'Globalization' শব্দের অর্থ অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে দেখা গেল তা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃহৎ কোম্পানিগুলি— যারা পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা করে; তাদের দ্বারা বাণিজ্যবৃদ্ধি। পণ্য, পরিষেবা কিংবা সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক প্রভাবের দ্বারা তা বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অভিন্ন হয়ে ওঠে।

ইংরেজিতে 'Globalization' পরিভাষাটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে, তার আগে মোটামুটি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে অন্য বিষয়ে পরিভাষাটি চালু হয়েছিল। এই পরিভাষাটির জনপ্রিয়করণে যাঁর ভূমিকা সর্বাধিক, তিনি হলেন Theodore Levitt (1925-2006), যিনি ১৯৮০-র দশকে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেন। বাংলায় 'বিশ্বায়ন' শব্দটির যে অর্থ অভিধানে উপস্থিত সেটি হল—

> "অর্থনীতি প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া।"[২]

আভিধানিক এই অর্থপ্রাপ্তির পর আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে 'বিশ্বায়ন' শব্দটির মধ্যে দুটি শব্দ জোড়া রয়েছে; বিশ্ব এবং অয়ন। এখানে বিশ্ব শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে 'পৃথিবী' ধরে নিলেও ব্যাপকার্থে তা পৃথিবী ও তার চারপাশের গ্রহ-নক্ষত্রসমন্বিত সমগ্র মহাকাশ। এরপর দ্বিতীয় যে শব্দটি পড়ে থাকল সেটি 'অয়ন'। অয়ন শব্দের অর্থ পথ, গতি বা অবলম্বন। সামগ্রিকভাবে যে অর্থটি মোটের উপর আমাদের কাছে অভিধান থেকে এসে পৌঁছায়, তা হল বিশ্বায়ন=বিশ্বের পথ বা বিশ্বের গতি।

বিশ্বায়নের কাছে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় মানুষরূপে নয়, শুধুমাত্র ক্রেতা বা উপভোক্তা হিসেবে। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মানুষের মনুষ্য পরিচয় লুপ্ত হয়ে তার একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠেছে ক্রেতা। বিশ্বায়িত সমাজ জীবনে হৃদয়, বিবেক, চেতনা, মূল্যবোধ, ভাব, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, শরীর, সম্পর্ক, সংস্কৃতি, আনন্দ— সব কিছুই হয়ে উঠেছে পণ্য। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্পর্কের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে এই পণ্য।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ওপর ভর দিয়ে। আমাদের প্রতিদিনের যাপনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে বিশ্বায়নের উন্মুক্ত বাজার থেকে আসা কালার টিভি, ফ্রিজ, ওয়াসিং মেশিন, মাইক্রো ওভেন, স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ,

কম্পিউটার, দু চাকা কিংবা চার চাকার গাড়ি। এই সমস্ত ভোগ্যপণ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনধারাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। বিগত তিনটি দশক জুড়ে এই ভোগ্যপণ্যমুখী সংস্কৃতি প্রচারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে দূরদর্শন। দূরদর্শনের মধ্যেও এসেছে 'বহুজাতিক চ্যানেল', আজকের দিনে টিভি শুধু রঙিনই নয়, তা হয়ে উঠেছে LSD কিংবা LED মডেলের Smart TV। পশ্চিমী সংস্কৃতির আগ্রাসী প্রভাবে সিরিয়াল, রিয়ালিটি শো, সংবাদ চ্যানেলগুলির বিতর্ক সভাগুলিই যেন আমাদের সাংস্কৃতিক বোধ নির্মাণ করে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে হলিউডের পথ বেয়ে আমাদের যাবতীয় শিল্পকলাতে যৌনতা ও হিংস্রতাই প্রধান হয়ে উঠছে। মল, মাল্টিপ্লেক্স, শপিংমল মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভোগ্যপণ্যমুখী করে তুলতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছুই হয়ে উঠেছে পণ্য। তাই বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলি শহর ছাড়িয়ে মফস্বলকেও গ্রাস করে নিচ্ছে। বিশ শতকের নয়ের দশক এবং একুশ শতকের প্রথম দুটি দশকে সৃষ্ট সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী ভাবে বিশ্বায়িত মানুষ ও সমাজের কথা উঠে এসেছে।

আফসার আমেদের জন্ম ১৯৫৯ সালে হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর হন। প্রথম দিকে আফসার আমেদ মূলত কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করলেও পরবর্তীকালে তিনি গদ্যরচনা শুরু করেন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'ঘর গেরস্তি'। প্রায় তিন দশক জুড়ে তাঁর লেখালেখি। মুসলমান সমাজ তাঁর লেখায় প্রামাণিকতার সত্যে ও আখ্যানশিল্পের সজীবতায় অভিনব ভাবে উঠে এসেছে। তাঁর রচনা 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'বারোমাস' ও 'সারস্বত'-এর মতো সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি 'প্রতিক্ষণ' নামক একটি সাহিত্য সাময়িক পত্রিকাতে কয়েক বছর কাজ করেছেন। তাঁর রচিত 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাস অবলম্বনে মৃণাল সেন 'আমার ভুবন' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন। ২০১৭ সালে তিনি 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বায়ন ও তার সাথে সম্পর্কিত ভোগ্যপণ্যগুলি ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের কিংবা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক নির্মাণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা আমরা তাঁর কথাসাহিত্য অবলম্বনে আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

আফসার আমেদ তাঁর 'খাঁচা' (২০১৩) উপন্যাসে শ্রীরামপুর শহরে শ্রীমন্ত ও সুমির নাগরিক জীবনের যে যাপনচিত্র এঁকেছেন সেখানে বিশ্বায়নের সঙ্গে আগত পণ্যের ছোঁয়া সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এই নাগরিক জীবনে ডোরবেল (Door bell), হোম ডেলিভারি (Home delivary), টিভি সিরিয়াল (Television serial), মশার তেল (Mosqueto oil), বক্স খাট (Bedsted), মোবাইল (Moboile), ল্যাপটপ (Laptop)—সব কিছুরই অনুষঙ্গ এসেছে। লোডশেডিং হয়ে যাওয়ার পরেও ল্যাপটপের আলোয় মোহনীয় হয়ে ওঠে মালিনী—

> "বলতে বলতে লোডশেডিং হয়ে যায়। সারা মহল্লা আলোহীন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই অন্ধকারে শ্রীমন্তর ল্যাপটপটা মায়াবী এক পরিবেশ তৈরি করেছে। ছায়াচ্ছন্ন এক মোহনতা। তার মধ্যে নিজের স্পন্দন শুধু শুনতে পায়।"[৩]

আমাদের প্রতিদিনের যাপনের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। এই সমস্ত আধুনিক জিনিসপত্র ছাড়া আজকের দিনে জীবনচালনা করা যে অসম্ভব হয়ে পড়েছে তা এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন।

বিশ্বায়িত সমাজজীবনে নগদ টাকা ছাড়াও প্লাস্টিক মানির বিশেষ আধিপত্য রয়েছে। শুধু শহর নয়, এমন কি মফস্বলও নয় প্রত্যন্ত গ্রামেও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ATM (Automatic Teller Machine) কাউন্টার পৌঁছে গেছে। এই ATM কাউন্টার থেকে মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী যখন খুশি টাকা তুলতে পারে। কিন্তু গ্রামের দিন আনা দিন খাওয়া মানুষেরা কোনোদিন হয় তো ATM শব্দটাই শোনেনি, তাই মানুষ ছাড়া মেশিন থেকে টাকা বেরিয়ে আসা তাদের কাছে অলীক বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে ওঠে। আফসার আমেদের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' (২০১১) উপন্যাসে দেখা যায় মালিয়া গ্রামে নিজেদের বাড়ি-ঘর ভেঙে যাওয়ায় বিলাল ও তার স্ত্রী দিলজান বাগনান স্টেশনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাগনান স্টেশনে তাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের গ্রামের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া নিখোঁজ মানুষ আবিদের। আবিদকে এ টি এম থেকে টাকা তুলতে দেখে দিনমজুর বিলাল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়—

> "তবুও তার মনে হল আরও কিছু টাকা সঙ্গে রাখুক। অমনি সে স্টেশন সংলগ্ন এস বি আই-এর এ টি এম কার্ডে পাঁচ হাজার টাকা তুলে আনল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। সঙ্গে গিয়েছিল বিলালও। বিলাল তো তাজ্জব! কাউন্টারে কেউ নেই অথচ কার্ড ঢোকাতে এমনি এমনি টাকা বেরিয়ে এল।"[৪]

প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের উঁচুতলার মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজের নিচুতলার দরিদ্র ও দিনমজুর মানুষদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষভাবে কোনো যোগ নেই।

বিশ্বায়িত জীবনে মোবাইল ফোন আমাদের যাপনের একটি অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আমাদের কোনো আত্মীয়-পরিজনের আসতে দেরি হলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে মোবাইলে ফোন করে জেনে নিতে পারি তার বিলম্বের কারণ। বিশ্বায়নের পূর্বকালে যখন মোবাইলের প্রচলন ছিল না তখন মানুষ তার আত্মীয়ের আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকত। কিন্তু আজকাল সবকিছুতে মোবাইলের ব্যবহার মানুষের আগেকার ধৈর্যশীল ও অপেক্ষমান মনকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। আফসার আমেদের 'মজলিশে মৃত্যু বিষয়' গল্পের কথক সবসময় মোবাইলের ব্যবহার পছন্দ করেন না—

> "মোবাইলে সুন্দরকে ধরব? যখন আসে আসুক। সব কিছুতে মোবাইলের ব্যবহার পছন্দ করছি না আজকাল। এ যন্ত্রটা একটু বেশি পীড়াদায়ক। অপেক্ষা বোঝে না, অপেক্ষার ভেতর কল্পনাকেও বোঝে না, জন্মাতে দেয় না। ইদানীং হুট কথায় মোবাইলের বাতিক আমরা ত্যাগ করেছি।"[৫]

এই গল্পের সংবেদনশীল কথক ও তার বন্ধুরা মোবাইলের সংসর্গ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। আবার 'একটি মেয়ে' (২০১৪) উপন্যাসে আফসার দেখিয়েছেন যে সেঁজুতি নিভৃতিকে উপভোগ করতে চেয়ে মোবাইলের সুইচড অফ করে রেখে দেয়। ক্যারিয়ারমুখী একটি মেয়ে মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজনদের থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়—

> "মোবাইলটা তেমনি সুইচড অফ হয়ে পড়ে থাকল বিছানায়। পাথরের টুকরোর মতো। তাতে আর প্রাণসঞ্চার ঘটায়নি। মনাদা আবার ফোন করত। মা মনাদার কাছে এসে অনেক রাত পর্যন্ত সেঁজুতির সঙ্গে কথা বলতে থাকত। সেঁজুতি সে সুযোগ মাকে দেয়নি।"[৬]

সেঁজুতি শহরের একটি মেয়ে হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই করতে চেয়েছে। এই লড়াইয়ে মোবাইল ফোন তার পরিবার-পরিজনদের থেকে আড়ালে থাকার সুযোগ কেড়ে নিতে চেয়েছে বলে সে মোবাইলের সুইচড অফ করে রেখে দেয়।

প্রজন্মগত ব্যবধান আমাদের সমাজে ইতিপূর্বেও ছিল কিন্তু বিশ্বায়নের আবির্ভাবে এই প্রজন্মগত দূরত্ব বহুগুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির নতুনত্বকে বর্তমান প্রজন্ম যত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে নিয়েছে পূর্ববর্তী প্রজন্ম ততটা গ্রহণ করতে পারেনি। এর ফলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও দুই প্রজন্মের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আবার পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও বহু যোজন তফাৎ দেখা যায়। কথাকার আফসার আমেদ তাঁর 'আয় রে সোনা চাঁদের কণা', 'এলাটিং বেলাটিং সই লো', 'মজলিশে মৃত্যু বিষয়' গল্পে এবং 'খোঁজ', 'একটি মেয়ে' ও 'বাঁচার খোঁজে' উপন্যাসে প্রজন্মগত ব্যবধানের কথা উপস্থাপন করেছেন। 'আয় রে সোনা চাঁদের কণা' গল্পের কথক অফিস থেকে ফিরে মায়ের ঘরে গল্প শুনতে যান না অথচ ওপরের ঘরে তিন প্রবীণের সঙ্গে আড্ডায় তিনি সামিল হন। গল্পের কথকের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্কে দূরত্ব এসে গেছে—

> "কতকাল মায়ের কাছে যাওয়া হয়নি। প্রতিদিন তো অফিসফেরতা দোতলায় উঠে গিয়ে মন্দ্রাকান্তার কুক্ষিগত হই। এমন মায়ের অদর্শনে মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে, বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। তো আজ যাই। কিন্তু যাওয়ার অভ্যেস নেই বলে যেতে পারি না। দরজাটা ঠিকঠাক খুঁজে পাই না।"[৭]

আসলে মা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কথক আর সেই দরজা খুঁজে পান না, যেটা দিয়ে অনায়াসে মায়ের কাছে পৌঁছানো যেতে পারতো। কথকের মা প্রতিদিন এক কৃষকের কাছে মাঠপরীদের গল্প এবং ধানকুমারীর কাহিনি শোনেন। কারণ কথক ছোটবেলায় এই সব গল্প শুনতে ভালোবাসতেন। মাঠপরীদের গল্প শুনে যদি কথকের ছোটবেলার স্মৃতি মনে আসে এবং যদি সেই গল্পের লোভে তিনি আবার তার মায়ের কাছে যান, এই আশাতেই তার মা প্রতিদিন সন্ধ্যায় কৃষকটিকে আসতে বলেন। কিন্তু ওপরের ঘরে স্ত্রী ও তিন প্রবীণের সঙ্গে যে আড্ডা তার মৌতাত থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন না। এমনকি তার মায়ের 'আয় রে সোনা চাঁদের কণা' গানকে ওই তিন প্রবীণ 'কুকুরের কান্না' আখ্যা দিলেও তিনি কোনো প্রতিবাদ করেন না। এই সময়ের মেরুদণ্ডহীন সভ্য মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন এই গল্পের কথক। আবার তার দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ের ভদ্রতার মুখোশপরা ভণ্ড ও চতুর মানুষদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন গল্পকার—

> "অধ্যাপক, পুলিশ অফিসার, জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনজনই হাল্কা হাসির ঠোঁটে চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছে। আসলে এদের আদবকায়দা অসাধারণ, টিভি নিউজে এদের বড়ো মানায়। এরা কথার মধ্যে ভাষা লুকোয়, ভাষার মধ্যে কথা লুকোয়। চমৎকার হাসতে পারে, চমৎকার মিথ্যে কথা বলতে পারে। ...আজকাল মানুষ হাসি বিক্রি করছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাঁটাচলার ভঙ্গিও বিক্রিপণ্য হয়ে উঠেছে। তাই ভণ্ডত্ব, অসততা বিক্রি হবে না কেন?"[৮]

বিশ্বায়িত সমাজ ব্যবস্থায় ভণ্ডত্ব ও অসততাই হয়ে উঠেছে সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চাবিকাঠি। 'মজলিশে মৃত্যু বিষয়' গল্পে দেখা যায় প্রায় ছুটির দিনে রচয়িতার বাড়িতে যে আড্ডা জমে সেখানে তার অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা শ্যামসুন্দরবাবুর কোনো সংস্রব থাকে না। তাদের আড্ডাগুলো এই বৃদ্ধমানুষটিকে ছাড়াই জমে ওঠে—

> "আমরা মনেই করি না কখনো একজন অসুস্থ আর বুড়োমানুষ এই ফ্ল্যাটের অন্য ঘরে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। আমাদের যেমন আড্ডা জমার তেমনই জমে। আর আমি এখন এই মুহূর্তে শ্যামসুন্দরবাবুর ঘরে উঁকি দিয়ে আড্ডার ঘরে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আড্ডার জন্য।"[৯]

বর্তমান প্রজন্ম এতটাই ভাবলেশহীন, স্বার্থপর, মায়ামমতাহীন ও উদ্দাম যে অসুস্থ মানুষের প্রতি তাদের সামান্য মানবিক আচরণটুকু প্রকাশ পায় না।

বিগত তিনটি দশক জুড়ে বিশ্বায়ন আমাদের সমাজে, যাপনে ও মননে যে পরিবর্তন সাধন করেছে কথাকার আফসার আমেদ সেই পরিবর্তনের স্পন্দনকে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। সেখানে যেমন গ্রামের চরিত্র বদলে মফস্বলে রূপান্তর, প্রযুক্তি সর্বস্বতায় বন্দী মানুষের কথা এসেছে তেমনি পণ্যসর্বস্ব দুনিয়ায় মানুষের অসহায়ত্ব ও একাকীত্বকেও তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। বিশ্বায়ন একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় প্রক্রিয়া, যার সূচনা ঘটেছে বিশ শতকের নয়ের দশকে কিন্তু এর সমাপ্তি কবে ঘটবে আমরা জানি না। বিশ্বায়ন এখনো ঘটমান বর্তমান (Present Continuous) রূপে বিরাজমান, কবে ঘটমান অতীত (Present Perfect Continuous) হবে কেউ জানে না। তাই ভবিষ্যতে বিশ্বায়নের প্রভাব আমাদের সমাজে ও জীবনে আরো অনেক বদল ঘটাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে আমরা বিশ্বায়নের যে অভিঘাত ও তার ছোঁয়া পাই সেখানে বিগত তিন দশকের মানুষের মন, মেজাজ ও মনোবীজের পরিবর্তনশীলতাকে অনুভব করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Third Edition, Cambridge University Press, 2008, pp. 610

২. চৌধুরী, জামিল (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৯৯১

৩. আমেদ, আফসার, *খাঁচা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬২-৬৩

৪. আমেদ, আফসার, *সেই নিখোঁজ মানুষটা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৫

৫. আমেদ, আফসার, *খুনের অন্দরমহল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ৯৭

৬. আমেদ, আফসার, *একটি মেয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯

৭. আমেদ, আফসার, *সেরা ৫০ টি গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ২৫০

৮. তদেব, পৃ. ২৫২

৯. আমেদ, আফসার, *খুনের অন্দরমহল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

নাগার্জুনের কাল পরীক্ষা : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

আয়েসা খাতুন
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সভ্যতার আদিক্ষণ থেকেই এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের জ্ঞানচর্চার দীপ্তি সূর্যের ন্যায় সর্বদাই আলোকোজ্জ্বল। যখন পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডে সভ্যতার আলোটুকুও পৌঁছায়নি, সেই সময় থেকেই ভারতীয় মহান ঋষি মনিষীগণ তাঁদের আত্মোপলব্ধির কথা প্রচার করে গিয়েছেন।[১] এই আত্মোপলব্ধিকে তুলে ধরার জন্য, মানব সমাজের কল্যানার্থে তা সহজবোধ্য করার জন্য যুগে যুগে জ্ঞানচর্চার পদ্ধতিকে খণ্ডন ও মণ্ডনের মধ্য দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর করে তুলেছেন তাঁরা। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এর শুরুর অংশটি অনুমান করতে পারি। ভারতীয় সাহিত্যের তথা বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ গুলির মধ্যে অন্যতম হল বেদ। এই 'বেদ' কথাটির অর্থই হল 'জ্ঞান'। লিপিবদ্ধ পুস্তক আকারে এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত হলেও এর জ্ঞান শাশ্বত বলেই মনে করা হয়। বেদের রচনাকাল আনুমানিক ১৫০০ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টপূর্ব। এরপরই আসছে উপনিষদীয় যুগ। যেখানে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রথম উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। উপনিষদীয় যুগ এবং প্রাক্ বৌদ্ধ যুগকে সমসাময়িক বলেই মনে করা হয়। উপনিষদ যুগের সময়কাল ৬০০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ বলেই মনে করা হয় এবং গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকাল ৬২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। সমসাময়িক হওয়ার কারণে উভয়ের আলোচনার মধ্যে কিছু পদ্ধতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানত গল্পকথা, উপমা, উপদেশ ইত্যাদির মাধ্যমেই নিজ নিজ তত্ত্বগুলি আলোচিত হত।

কিন্তু বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ সমাজে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং বুদ্ধবাণী গুলিকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগীতির আহ্বান করা হয়। সেই সময় প্রচলিত আলোচনা পদ্ধতি থেকে ভিন্ন এক অভিনব পদ্ধতি নিয়ে উপস্থিত হল মোগ্‌গলীপুত্ত তিস্য বিরচিত *কথাবত্থু*গ্রন্থ। যেখানে দুর্বোধ্য দার্শনিক বিষয়গুলিকে যুক্তিতর্কের দ্বারা সহজবোধ্য ভাবে উপস্থিত করা এবং পরমত খণ্ডনের গভীর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এটি মূলত বৌদ্ধ মনস্তাত্তিক এবং প্রশ্নোত্তর মূলক গ্রন্থ। যা বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত প্রথম তর্কশাস্ত্র। এর পরবর্তীতে আরও একটি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যা প্রায় একই রকম যুক্তি পদ্ধতি অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল তা হল *মিলিন্দ প্রশ্ন*।

আনুমানিক ৫০ থেকে ১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রের আবির্ভাবকাল হিসাবে গন্য করা হয়, তিনি হলেন বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন। নাগার্জুন সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার মধ্যে আমরা দুটি ভাষায় রচিত নাগার্জুনের জীবনবৃত্তান্ত পাই, যার একটি চিনা ভাষায় অন্যটি তিব্বতী ভাষায়। নাগার্জুনের মৃত্যুর বহু পরে তাঁর জীবনী লেখা হয়। ফলে সেখান থেকে পাওয়া তথ্যগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতটা তা বিচার করা অন্য আর একটি আলোচ্য বিষয়। কিন্তু নাগার্জুন যে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তবে প্রচলিত আছে তিনি তাঁর জিজ্ঞাসু হৃদয় নিয়ে বিশ্বের সমস্ত জাগতিক বস্তুর পরিবর্তে আত্মোন্নতি কামনা করেন এবং সাধন মার্গ অবলম্বন করেন। যার ফলে তিনি জ্ঞান সমুদ্র থেকে বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ

প্রজ্ঞাপারমিতা নামক একটি গ্রন্থ আহরণ করেন। আর তারপর থেকেই তাঁর নাম হয় 'নাগার্জুন' অর্থাৎ নাগ শ্রেষ্ঠ।

নাগার্জুন হলেন বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা। বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ১০০ বছর অতিবাহিত হওয়ায় পরপরই বৌদ্ধ সমাজে নানা উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এ সময়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক আন্দোলন শুরু হয়ে ছিল থেরবাদ ও অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদারের মধ্যে, সেখানে নাগার্জুন নিজ জ্ঞান দ্বারা দার্শনিক বিতর্ককে এক অন্য পর্যায়ে উন্নিত করে ছিলেন। তৎকালীন সময়ে প্রাচীন বৈদিক সম্প্রদায়গুলি মধ্যে যেমন- প্রকৃতি-পুরুষবাদী সাংখ্য-যোগ, পরমাণুবাদী বৈশেষিক ইত্যাদি ছাড়াও আরও একটি সম্প্রদায় যারা এক নতুন যৌক্তিক শাস্ত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁরা হলেন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়। তাদের জ্ঞান বিষয়ক অবস্থানই ছিল এমন একটি বস্তুবাদকে বিস্তৃত ভাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা যা সমস্ত মৌলিক উপাদান গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। জ্ঞান সম্পর্কীয় এমন এক তত্ত্ব প্রনয়ণ করা যা সত্যতার সমস্ত দাবী মেনে কাজ করবে, যা একটি সুশৃঙ্খল পরিকাঠামো যুক্ত যৌক্তিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যা সঠিক, অভ্রান্ত যৌক্তিকপুর্নাঙ্গ তত্ত্ব প্রদান করবে। এর পাশাপাশি বৌদ্ধ শিবিরেও অধিবিদ্যাকে কেন্দ্র করে পরমাণুবাদ এবং পদার্থের মৌলিক বিভাগ নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। ফলে নাগার্জুনকে এই নতুন ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং বৌদ্ধ মতকে প্রতিহত করার জন্য বীরবিক্রমে বৌদ্ধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়ে ছিল, যা আগে কখনো হয়নি। যার ফলস্বরূপ আমরা নাগার্জুনের শূন্যবাদ (Nihilism)-এর ধারণা পাই।

নাগার্জনের শূন্যবাদের ধারণা প্রাথমিক ভাবে বৌদ্ধ পরিভাষায় যার অর্থ হল- 'স্থিতিশীলতার অভাব', যা বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ত্ব। নাগার্জুন মনে করেন বস্তুর কোন সারসত্তা নেই, স্বভাব নেই। সুতরাং যা কিছু আছে তা 'শূন্যতা', 'স্বভাবশূন্যতা', 'সারসত্তাশূন্যতা'। নাগার্জুন বৈদিক ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বের অসারতা ও নীতি শাস্ত্রের উল্লেখ করে পথভ্রষ্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সঠিক পথে আনার জন্য তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে *মূলমধ্যমককারিকা* হল অন্যতম। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা আরও বেশি পরিমার্জিত করে তিনি *শূন্যতাসপ্ততি* গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তিনি *বিগ্রহব্যাবর্তনী, বৈদল্যপ্রকরণ, যুক্তিষষ্ঠিকা, রত্নাবলী, সুহৃল্লেখ* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

নাগার্জুনকৃত এই *মূলমধ্যমককারিকা* গ্রন্থটি মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের আকর গ্রন্থ। সাধারণত আমরা যে সমস্ত প্রত্যয়গুলিকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ব্যবহার সংগঠিত হয় সেই সমস্ত কিছুকেই এই গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন- বাহ্যজগত, আত্মা, কাল, কার্য-কারণ ইত্যাদিকে মানব মনের কল্পনা বলেই মনে করেন নাগার্জুন। আসলে এগুলি সবই স্বভাব শূন্য অলীক বস্তু। এই গ্রন্থের ঊনবিংশতম পরিচ্ছেদে তিনি 'কাল' বিষয়ক একটি আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে মূলত সকল উল্লিখিত বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে। কাজেই গ্রন্থে উল্লিখিত 'কালপরীক্ষা' নামক পরিচ্ছেদে কালকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু কাল খণ্ডনের কারণ কী? কাল বা সময় হল জগতের এমন একটি তত্ত্ব যা সমস্ত কিছুর অদৃশ্য কারণ। যা সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সুতরাং কালই হল সকল ঘটনার প্রাক্ শর্ত এবং মৃত্যু বা ধ্বংসের কারণ। সময় ছাড়া আমরা কোন কিছুরই উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতিশীলতাকে কল্পনা করতে পারি না। তাছাড়াও জগতের অমোঘ নিয়ম কর্মবাদেরও ব্যাখ্যা চলে না, যদি না আমরা কালকে স্বীকার করে নিই। বুদ্ধ স্বয়ং সমস্ত কিছুকে সর্বদা পরিবর্তনশীল ক্ষণের প্রবাহের মধ্যে অন্তর্ভাব করার চেষ্টা করেছেন। তাই আর্যসত্য চতুষ্টয়ের

মধ্যে যে বুদ্ধ ভাবনা তার একটি হল- 'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং'। অতএব ক্ষণিকতায় বিশ্বাসীরা মনে করেন ক্ষণ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং বস্তু মাত্রই ক্ষণিক। কালকে আমরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

কিন্তু নাগার্জুন 'কালপরীক্ষা' নামক পরিচ্ছেদে কাল সম্পর্কীয় সমস্ত বিকল্পকেই খণ্ডন করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে কালের অন্য কোন স্বভাব না থাকায় তা স্বভাব শূন্য। জগতে যা কিছু সাপেক্ষ তাই সৎ- এ প্রকার বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত মানলে বলতে হয় নিরপেক্ষ ভাবে কোন কিছুই থাকতে পারে না। সুতরাং কাল যদি সৎ পদার্থ হয় তাহলে তাকেও কোন না কোন কিছুই সাপেক্ষেই থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন হল এই যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কথা আমরা বলি তা কার উপর নির্ভরশীল? যদি বলা হয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীত কালের উপর নির্ভরশীল, তাহলে বলতে হয় অতীত কালেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সত্তা ছিল।[1] কিন্তু অতীতে কখনোই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সদ্ভাব সম্ভব নয়। অতএব বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যদি অতীত কালের উপর নির্ভরশীল না হয় তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

এখন যদি কেউ বলেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীতের উপর নির্ভরশীল না হোক; অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীতের উপর নির্ভর না করেই স্বতোৎপত্তি হয়।[2] কিন্তু এমনটাও বলা যায় না কারণ অতীত ছাড়া কোন ভাবেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বতঃ সদ্ভাব সম্ভব নয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কে যদি সৎ হতে হয় তাহলে অতীতের সাপেক্ষেই হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আর যদি বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন অস্তিত্ব না থাকে তাহলে অতীতেরও কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কেননা কোন কিছুকে আমরা অতীত তখনই বলতে পারি যদি বর্তমান বলে কোন কিছু থাকে। বর্তমান বলেই যদি কোন কিছু না থাকে তাহলে অতীতও অনপেক্ষ হয়ে পড়বে। ফলে অতীত কালকেও আর সৎ বলা যাবে না। সুতরাং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলেই কিছু না থাকে তাহলে কালের কোন অস্তিত্ব নেই এমনটাই সিদ্ধান্ত করতে হয়।

এখন যদি কেউ আপেক্ষিকতা নিয়েই প্রশ্ন করেন যে- আদৌ কি কোন কিছু সাপেক্ষ? তার উত্তরে নাগার্জুন বলেন জগতের সকল কিছুই সাপেক্ষ কেননা জগত প্রতীত্যসমুৎপন্ন। যেমন- উত্তম ও অধমের ধারণা মধ্যমের উপর নির্ভর করে। উত্তম স্বতঃই উত্তম হতে পারে না আবার অধম স্বতঃই অধম হতে পারে না। উত্তম ও অধম মধ্যমের সাপেক্ষেই বিদ্যমান। সুতরাং কেউই স্বতঃই অস্তিত্বশীল নয়। তাই অধিবিদ্যক আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা যে চরম বৈপরীতের কথা বলি তা আসলে আমাদের মনের অলীক কল্পনা মাত্র।

অভিধম্ম পিটকে বলা হয়েছে কাল কোন স্থির বস্তু নয় তা বর্তমানের প্রবাহ। ভবিষ্যৎ কাল অতীত কালের মধ্য দিয়ে, বর্তমান কালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই বৌদ্ধ শাস্ত্রে স্থিতিক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এই প্রবাহের মধ্যেই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ হল এক একটি অংশ মাত্র। কিন্তু নাগার্জুন বলেন স্থিতিকাল যে আছে তা আমরা জানব কী

---

[1]প্রত্যুৎপন্নোঽনাগতশ্চ যাব্যতীতমপেক্ষ্য হি।

প্রত্যুৎপন্নোঽনাগতশ্চ কালেঽতীতে ভবিষ্যতঃ।।- মূলমধ্যমককারিকা, ১৯/১।

[2]...প্রত্যুৎপন্নোঽনাগতশ্চ স্যাতাং কথমপেক্ষ্য তম্।।- মূলমধ্যমককারিকা, ১৯/২।

করে? আমরা কখনোই ক্ষণকে জানতে পারি না। আর যে কাল কখনো গৃহিতই হয় না সে কাল স্থিত না অস্থিত এ বিষয়ে কোন আলোচনাই চলে না।[3]

সবশেষে নাগার্জুন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে যথার্থ অস্তিত্ব বলেই কিছু হয় না। আর কালের প্রবাহ বিষয়টি কোন যথাযথ বিষয়ই নয়। এখন যদি কেউ বলেন যে কালের অস্তিত্ব ভাব পদার্থ নির্ভর কেননা কাল ভাব পদার্থ। কালের যে উপলব্ধি আমাদের হয় তা ভাব পদার্থের মাধ্যমেই হয়। কোন ভাব পদার্থকে অপেক্ষা করেই আমরা কালকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে মনে করি। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হবে ভাব পদার্থগুলি কি পূর্বত সিদ্ধ?[4] অর্থাৎ ভাব পদার্থগুলির যদি আগে থেকে কোন অস্তিত্ব থাকে তাহলেই তার সাপেক্ষে কালকে অস্তিত্বশীল বলা যাবে। কিন্তু নাগার্জুন মনে করেন ভাব পদার্থগুলিই যখন সৎ অর্থে আদৃত নয় তখন কাল কীভাবে ভাবের উপর নিভর করে অস্তিত্বশীল হবে? কাজেই কালের কোন বাস্তবিক স্বরূপ নেই কেননা কালে কোন সাপেক্ষত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

নাগার্জুনের *মূলমধ্যমককারিকা* গ্রন্থে পরমত খন্ডনার্থে যে পদ্ধতি প্রণালী ব্যবহার করা হয়েছে তাকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে পারি। উক্ত গ্রন্থের যা সারমর্ম তা এক কথায় চরম সংশয়বাদ(Spectism)-কেই প্রশ্রয় দেয়। তিনি কেবল কাল নয় জাগতিক সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। সব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষ দাবি করে যে বিশ্বে এমন কিছু আছে যা সংশয়াতীত, প্রশ্নাতীত যাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু বিশ্বে যেমন বিভিন্ন বিষয় আছে ঠিক তেমনি সংশয় করারও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন- ধরা যাক, কোন ব্যক্তি অন্ধকারে গাছকে মানুষ ভেবে সংশয় করে। কোন বৈজ্ঞানিক দৈবিক কোন কারণের উপর সংশয় করেন। আবার দার্শনিক কোন প্রচলিত জগত সংক্রান্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে। যেমন- সক্রেটিস, ডেকার্ট, হুসাল প্রমূখ। সে অর্থে নাগার্জুনও এই সমস্ত সংশয়বাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। তবে তিনি যেভাবে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার একটি সুশৃঙ্খল পরিকাঠামো রয়েছে যা প্রাক্ বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন।

তৎকালীন সময়ে আমরা ভারতীয় দর্শনের সংশয়বাদের ব্যাখ্যা মহর্ষি গৌতম রচিত *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থে পাই। বৈদিক যুক্তিবিদ্যার এক অনবদ্য নিদর্শন হল এই অক্ষপাদ রচিত ন্যায়দর্শন। এখানে তিনি দুই ধরনের সংশয়বাদ এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন প্রথমত, এমন কোন বিষয়ে সংশয় যা সমস্ত ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন জীবনে করে থাকে। যেমন- স্থানুতে পুরুষের সংশয়। কিন্তু এই ধরনের সংশয় পরবর্তীতে জ্ঞানের দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, দার্শনিক সংশয়বাদ যেখানে যেকোন দার্শনিক বিষয় সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করা যায়। আর এই সংশয়ের সমাধানের জন্য আনুষ্ঠানিক বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয় যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী যুক্তির প্রয়োগ করেন এবং তত্ত্বের নির্ণয় হয়। সংশয়বাদের এরূপ বিভাজন থেকে স্পষ্ট যে নাগার্জুন একজন অবশ্যই দার্শনিক সংশয়বাদী (Philosophical Sceptic)। নাগার্জুনের প্রতিপক্ষ ছিল সেই সমস্ত কিছু যা চিরাচরিতভাবে অনুশীলিত, সামাজিক এবং ধর্মীয়। নাগার্জুনকে প্রমাণ করতে হত চিরাচরিত এই সমস্ত কিছুই ভ্রান্ত। তথাকথিত বৌদ্ধ অধিবিদ্যা

নাস্তিতো গৃহ্যতে কালঃ ন বিদ্যতে।

[3]যো গৃহ্যতাগৃহিতশ্চ কালঃ প্রজ্ঞপ্যতে কথম্।।-মূলমধ্যমককারিকা, ১৯/৫।

[4]ভাবং প্রতীত্য কালশ্চেৎকালো ভাবাদৃতে কুতঃ।- মূলমধ্যমককারিকা, ১৯/৬।

এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদী যৌক্তিকতার চরমফল হল ভ্রান্তি আর এটা প্রমাণ করার জন্যই নাগার্জুন সংশয় পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন।

মূলমধ্যমককারিকা গ্রন্থটি কারিকা আকারে রচিত প্রথম গ্রন্থ। ফলে এই গ্রন্থের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এই গ্রন্থটিতে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তা হল প্রসঙ্গ পদ্ধতি (Reductio-ab-absurdam) এবং চতুষ্কোটি (Fourfold method)। আর এই দুই পদ্ধতির দ্বারাই সূক্ষ্ম তর্কের মাধ্যমে সমস্ত কিছুকে খণ্ডন করে শূন্যতাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিপক্ষকে সমূলে প্রতিহত করা। এই পদ্ধতির বীজ আমরা *কথাবত্থু* গ্রন্থে দেখতে পাই।*কথাবত্থু* গ্রন্থে মোগ্গলীপুত্ত-তিস্য বুদ্ধের তত্ত্ব রক্ষার্থে এবং বিভিন্ন উপসম্প্রদায় গুলিকে পরাজিত করার জন্য প্রসঙ্গ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। কেননা সেই সময় বিরোধী মতগুলি খন্ডন করার ক্ষেত্রে গল্পকথা, উপমা বা উপদেশের কোন কার্যকারিতা ছিল না। তার জন্য এমন সংলাপের প্রয়োজন ছিল যা অত্যন্ত গঠনমূলক এবং যৌক্তিক আকার দ্বারা পরিচালিত হবে। নাগার্জুনও পরমত খণ্ডন করার জন্য এই প্রসঙ্গ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এই প্রসঙ্গ পদ্ধতিতে সর্বদাই কিছু প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয় যা বিরোধী পক্ষের মত। তারপর সেই মত সম্পর্কীয় সমস্ত বিকল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং উক্ত মতের মধ্যে অসংগতি প্রদর্শন করে মতটিকে খারিজ করে দেওয়া হয়। যেমন-

- ‘ক’ হয় ‘খ’
- যদি (‘ক’‘খ’ হয়) তাহলে (‘ক’‘গ’-ও বটে)
- ‘ক’ হয় কিন্তু নয় (‘ক’ ‘গ’ হয়)
- যদি নয় (‘ক’ ‘গ’ হয়) তাহলে নয় (‘ক’ ‘খ’ হয়)

  সুতরাং, নয় (‘ক’ হয় ‘খ’)

অতএব লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রধান আশ্রয় বাক্য থেকে যে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়েছে তা সম্পূর্ণ স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত। এই যুক্তিটিতে পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানের ‘transposition’ এবং ‘modus ponens’-এর নিয়ম অনুসরণ করে সিদ্ধান্তটি নিঃসৃত হয়েছে। আর এই ভাবেই থেরবাদীগণ বিরুদ্ধ মতের প্রতি স্ববিরোধিতা দেখিয়ে তা খন্ডন করতেন। এই যৌক্তিক পদ্ধতিকেই আরও বেশি করে পরিমার্জিত করে নাগার্জুন চতুষ্কোটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। সেখানে সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য বিকল্প গুলির উল্লেখ করে প্রত্যেকটিতে দোষ প্রদর্শনের মাধ্যমে পরমতখণ্ডন করেছেন। এই পদ্ধতির যৌক্তিক আকার হল-

- ‘ক’ হয় ‘খ’
- ‘ক’ নয় ‘খ’
- ‘ক’ হয় ‘খ’ অথবা ‘ক’ নয় ‘খ’
- এমন নয় ‘ক’‘খ’ আবার এমন নয় ‘ক’‘খ’ নয়।

ধরা যাক্, ক=আত্মা তাহলে বলতে হয়-

- আত্মা আছে
- আত্মা নেই
- আত্মা আছেও আবার নেইও
- এমন নয়, আত্মা আছে আবার এমন নয় আত্মা নেই।

এখন এই চারটি বিকল্পের বাইরে আর কোন বিকল্প অবশিষ্ট থাকতে পারে না। আর নাগার্জুন উক্ত চারটি বিকল্পকে নস্যাৎ করে আত্মা সম্বন্ধীয় তত্ত্বকেই খণ্ডন করেছেন। এই চতুষ্কোটি খন্ডিত হলে বস্তুর স্বরূপহানী হয় ফলে যা থাকে তাহল শূন্য। তাই মাধ্যমিক বৌদ্ধ মতে, "চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত শূন্যমেব"। চারটে বিকল্পের কোনোটির না হওয়াই হল শূন্যতা। চতুস্কোটি হল- সৎ, অসৎ, সদাসৎ এবং সদাসৎ ভিন্ন; এর অতিরিক্ত কোন সম্ভাবনাই সম্ভব নয়।

এখন মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হল শূন্যবাদ। আর এই শূন্যবাদ অনুসারে, যদি কোন কিছু যথার্থ হয় তাহলে তাকে সাপেক্ষ্য হতে হবে। কোন কিছুই নিরপেক্ষভাবে সৎ হতে পারে না। কেননা সৎবস্তু মাত্রই প্রতীত্যসমুৎপন্ন আর যা প্রতীত্যসমুৎপন্ন তা সাপেক্ষ্য সুতরাং যা সাপেক্ষ তাই সৎ। তাই চন্দ্রকীর্তি বলেছেন- "প্রতীত্যসমুৎপাদস্য যঃ অর্থঃ স এব শূন্যতাশব্দস্য অর্থঃ"। সুতরাং যদি কোন বস্তুকে আমাদের জানতে হয় তাহলে অন্য বস্তুর সাপেক্ষ্যই জানতে হবে। যদি কোন কিছু সৎ হয় তাহলে তা কোন কিছুর স্বপক্ষেই সৎ আবার কোন কিছু অসৎ হলে তা কোন কিছুর ভিত্তিতেই অসৎ অর্থাৎ সকল বস্তু মাত্রই আপেক্ষিক। আর যা নিরপেক্ষ নয় তা'ই নিঃস্বভাব। যা নিঃস্বভাব তাই শূন্য। অতএব জগৎ সম্পর্কে নাগার্জুনের যে অভিমত তা এক প্রকার আপেক্ষিকতাবাদ (relativism)।

আরও বলা যায় যে, নাগার্জুন যে যুগান্তকারী আলোচনা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন তা একেবারেই অন্যান্য আলোচনা পদ্ধতি থেকে অভিনব। নাগার্জুন ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বিভিন্ন বৌদ্ধ উপসম্প্রদায়গুলির অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানতত্ত্বকে তাদেরই নির্মিত যুক্তিজ্ঞান দ্বারা খন্ডন করেছেন। নৈয়ায়িক সম্মত বিতর্ক শৈলী গুলির মধ্যে বাদ, জল্প, বিতণ্ডার উল্লেখ করা হয়, এদের একত্রে 'কথা' বলা হয়। এদের মধ্যে বিতন্ডা পদ্ধতি হল ধ্বংসাত্মক। কেননা বিতণ্ডা পদ্ধতির উদ্দেশ্যই হল পরমত সমূলে খন্ডন। এই পদ্ধতি কেবল খণ্ডন করার লক্ষ্যেই প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে নিজমত সম্পর্কে কোন প্রতিজ্ঞা করা হয় না। নাগার্জুনও এখানে কোনরকম স্বমত সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা না করে কেবল খণ্ডন করার উদ্দেশ্যেই বিপরীত মত খন্ডন করেছেন। নাগার্জুন বিরুদ্ধ মতগুলির বিরুদ্ধে অনবস্থা, স্ববিরোধিতা ইত্যাদি দোষ প্রদর্শন করেছেন। ফলে নাগার্জুনের বিতন্ডা পদ্ধতির যৌক্তিকভাবে চরম ফল হল শূন্যতা। তাই চন্দ্রকীর্তি ও বুদ্ধ পালিতও মনে করেন- প্রাসঙ্গিক মাধ্যমিক, জগতের সমস্ত কিছুকেই অলীকতায় পর্যবসিত করেন। নাগার্জুন মনে করেন সংশয়ের দ্বারাই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করা যায়, আর ব্যবহারে সিদ্ধ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে চরম সত্যকে জানা যায়। আরএই চরম সত্যকে জানলে তবেই নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করা যায়।

নাগার্জুনের তত্ত্বকে পাঠ করলে বোঝা যায় যে এই তত্ত্বের মধ্যে কোন ইতিবাচক দিক নেই, বিশেষ করে যখন তথ্য নির্ণয়ের কথা ওঠে। নাগার্জুনের চতুষ্কোটি পদ্ধতি আসলে ভাষাতাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক যার দ্বারা আমরা যথার্থতা নির্ণয় করতে পারি। যদি ভাষা ব্যবহারের শৈলীর দিকে লক্ষ্য করা হয় তাহলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে উভয় যুক্তিবিদ্যাতেই শূন্যতাকে 'logic of śūnya' বলা হয়। এটা বলার অর্থই হল এটা দেখানো যে শূন্যতার বোধই হল চরম বোধ যা একটি অনুভূতি, যা ধর্মের আধার; কেননা তা প্রতীত্যসমুৎপাদের সাথে সম্পর্কিত।

এটা সঠিক যে কারিকাগুলি অধ্যায়ন করে শূন্যতাকে বোঝা একটু কঠিন। প্রসঙ্গ পদ্ধতির দ্বারা এখানে সমস্ত প্রচলিত তত্ত্বকেই খন্ডন করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে অলীকতাকেই

নিঃসৃত করে। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হবে সবকিছুই যদি অলীক, শূন্য হয় তাহলে ব্যবহারের কি হবে? নাগার্জুন এখানে সত্যতা সম্পর্কীয় দুটি তত্ত্বের মধ্যে বিভাগ করেছেন- একটি হল সংবৃত্তি (empirical relative truth) এবং অন্যটি হল পারমার্থিক সত্য (non- empirical supreme truth)। এই দুই সত্যতা সম্পর্কে বুঝলে তবেই আমরা বৌদ্ধ সত্ত্বাতাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে যথাযথভাবে বুঝতে পারব। এখানে শূন্যতা বলতে পারমার্থিক সত্যতা বা স্বভাবকেই বোঝানো হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এর সাথে বাস্তবিক জগতের কোন সম্বন্ধ নেই। আসলে বৌদ্ধ দর্শনের মূল কথাই হল প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব আর এই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বই দুটি সত্যতার জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

সহায়কগ্রন্থ:

১. Chatterjee, Heramba, 1962, *Mūla-madhyamaka-kārikā of Nāgārjuna* (with commentary of chandrakirti and with Mañjuvyakhyā), calcutta, Firma K. L. Mukhopdhyay.

২. Inada, Kenneth K, 1993, *Nāgārjuna* (Translation of his Mulamadhyamakakarika with on Introductory Essay), Delhi, Sri Satguru publications.

৩. Kalwpahana, David I. 1991, *Mūlamadhyamakakārikā of Nāgarjuna* (Introduction, Sanskrit text, English translation and annotation), Delhi, Motilal Banarsidass publishers.

৪. চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, ২০১৫, *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা,* কলকাতা, মহাবোধি বুকএজেন্সি।

৫. মহর্ষি গৌতম, ২০১৫, *ন্যায়দর্শন* (১মখন্ড); মহামহোপাধ্যায় শ্রী ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

Help from Internet:

1. https:/// iep. Utm. Edu/nagarjuna/
2. https:///bhartiyadarsan. Blogspot. Com/2017/09/blog post -95 html.

নীতিকথা ও লোকছড়ার এক অনন্য সৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল'

এমডি. বাবুল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকে ভারতে গড়ে উঠা শিল্প-সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দেশ-বিদেশ জুড়ে। অন্যদিকে তাঁকে লেখালেখিতে উৎসাহিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা শিশু সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল'। বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্য বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এটি। বলা হয়, 'ছবি লেখেন অবন ঠাকুর', অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এতটাই সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল যে, পড়ার সময় তার লেখা ছবির মতো চোখের সামনে ভাসতে থাকে। 'ক্ষীরের পুতুল'ও অসম্ভব রকমের প্রাঞ্জল একটি রচনা। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের সঙ্গে লোককথার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন 'ক্ষীরের পুতুল' রূপকথায়। তাঁর চমৎকার উপস্থাপন ভঙ্গি শিশু মনে এনেছে কল্পনার অনুরণন। তিনি সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি জাতির উত্তর প্রজন্মকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন নিজেদের ঐতিহ্য। তাদের সচেতন করিয়ে দিয়েছেন বহুবিবাহ'র মতন কুপ্রথা এবং গরিব-দুঃখী-অন্নহীনের বেদনার সঙ্গে। এই সকল প্রসঙ্গগুলিই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ : ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রূপকথা, ঐতিহ্য, লোকছড়া।

মূল আলোচনা:

'হিংসেয় ছোটরানী বুক ফেটে মরে গেল' 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) গল্পটি এইভাবে শেষ হয়েছে। গল্প শেষে ৮ থেকে ৮০ যে কোনো বয়সের পাঠক আনন্দ পেয়েছে-ছোটরানীর উচিত শিক্ষা হয়েছে ভেবে। গল্পের কাঠামো অবশ্যই রূপকথার আর কাহিনির মধ্যে মিশে আছে ব্রতকথার ঐতিহ্য আর লোকছড়া। এইভাবে রূপকথার সঙ্গে নীতিকথাকে গল্পে মিশিয়ে দিয়েছেন, শিশু-মনস্তত্ত্বকে পুষ্টি দিয়েছেন শিশুকথার জাদুকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর তুলি কথা বলে। কলম নয় তুলি দিয়ে তিনি লেখেন। শিশু-মনস্তত্ত্বের অন্যতম রূপকার তিনি। তাঁর লেখা, চিন্তা-চেতনার জগত শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়েই তৈরি হয়েছে এ কথা বলা চলে। আকাশ-পাতালব্যাপী যার বিস্তার ঘটেছে খুব সাবলীলভাবে।

অবনীন্দ্রনাথের চমৎকার উপস্থাপন ভঙ্গি শিশু মনকে কল্পনায় অনুরণিত করেছে। কথায় ছবি এঁকেছেন তিনি। গল্পের শুরুতেই গল্প শোনার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে যায়, যখন তিনি লেখেন—

> "এক রাজার দুই রানী দুও আর সুও। রাজবাড়ীতে সুওরানীর বড় আদর, বড় যত্ন। সুওরানী সাত মহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুওরানী মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুকে-ভরা সাত-রাজার-ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানী রাজার প্রাণ।"[১]

সুওরানীর সুখের ঐশ্বর্য চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে, কিন্তু গল্পের এই ছোট্ট অংশটুকু শোনার পর শিশু মনে প্রশ্ন আসে তাহলে দুওরানীকে রাজা কি ভালো চোখে দেখেন না? সুওরানীর পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ দুওরানীর গল্প শুনিয়ে শিশু মনকে তৎক্ষণাৎ দুঃখ কাতর করে তোলেন—

> "দুওরানী - বড়রানী, তাঁর বড় অনাদর, অযত্ন। একখানি ঘর দিয়েছেন - ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন - বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন, জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন - ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।"[২]

এরপর গল্প এগিয়ে যায় নিজস্ব ভঙ্গিতে, প্রশ্ন রেখে যায়-রাজার কেন দুই রানী, বহুবিবাহ প্রথার দৃষ্টান্তে গল্পে সমসাময়িক সময় এইভাবে উঠে আসে। অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহার করে পাঠক কিংবা শ্রোতাকে অবনীন্দ্রনাথ অসম্ভবের জগতে নিয়ে যান। একই শব্দের বারংবার ব্যবহার কখনো সময়ের দীর্ঘসূত্রতা বোঝাতে কিংবা বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় অর্থ প্রকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছে। ভাঙ্গা ঘরে দুওরানী, রাজা বাণিজ্য যাত্রা শেষে ফিরবেন সেই আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন নীল সাগরের দিকে তাকিয়ে। আর পাশাপাশি"আদরিনী সুওরানী সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে-শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।"[৩] রাজাও সুওরানীর কথা ভাবছেন "বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানী সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানী মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন।"[৪] রাজা ফিরে এসে সুওরানীকে উপহারগুলো যখন দিয়েছেন, সেখানেও অবনীন্দ্রনাথ যেন এক মায়া রাজ্য তৈরি করেছেন— "সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি - সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে।"[৫] যদিও এসব কোনো কাজে লাগেনি। রাজা যার জন্য এত কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন, সবটাই বৃথা হয়ে গেল। সুওরানীর জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা কোনো উপহারই ঠিকঠাক ব্যবহারযোগ্য হলো না, শাড়ি, বিভিন্ন গহনা তিনি পরিত্যাগ করলেন। রাজাকে অপমান করে 'রানী অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন'

দুওরানীর জন্য রাজা নিয়ে এলেন এক ছোট্ট বাঁদর ছানা। যাকে নিয়ে তার সংসার। বাঁদর হয়েও সে কথা বলে। কথা বলা বাঁদর। রাজমন্ত্রী জাদুকরের দেশের জাহাজ থেকে বাঁদর-ছানাটা কিনেছিলেন, স্বভাবতই বাঁদরটির অলৌকিক ক্ষমতার অপ্রত্যক্ষ আভাস এখান থেকে পাওয়া যায়। লোককথার মোটিফ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের মধ্যে বাঁদর রাজার বিবেককে জাগিয়ে তুলেছে, রাজাকে সুপরামর্শ দিয়েছে, সৎ-অসৎ এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়েছে। দুওরানীর দুঃখ কিভাবে দূর করা যায় সে বিষয়ে বাঁদর নতুন নতুন পথ উদ্ভাবন করেছে। বাঁদর ও দুওরানী মা ও সন্তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মায়ের দুঃখে সন্তান কতখানি ভূমিকা নিতে পারে, বাঁদর চরিত্রে সেই রূপ ধরা পড়েছে। নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করে রাজার থেকে উপহার পেয়ে তা দিয়ে দুওরানীর অভাবের সংসারে সুখের দিন বয়ে এনেছে। এখানেও অনুপ্রাস অলংকারের ব্যবহারে গল্পকার চমক দিয়েছেন "বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো থান মোহরে ষোলো জন ঘরামি নিলে, ষোলো গাড়ি খড় নিলে, ষোলোশো বাঁশ দিয়ে, ষোলো গাড়ি খড় দিয়ে, ষোলোজন ঘরামি খাটিয়ে, চোখের নিমেষে দুওরানীর বানর ভাঙ্গা ঘর নতুন করলে"[৬]

দুই.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোককথাকে তাঁর লেখায় নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত ও ঐতিহ্য মূলক লোককথাকে কখনো নিজস্ব ভাবনায় সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছেন, কখনো রূপকথার গল্পে এক মায়াবী সৌন্দর্য জগত তৈরিতে তিনি লোকছড়ার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি চর্চায় তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলার ব্রত' এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'ক্ষীরের পুতুল' গ্রন্থে বাংলার প্রচলিত ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে। অত্যন্ত হালকা চলে সাবলীল ভঙ্গিতে এই কাজ তিনি করেছেন। শিশু মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির জাগরণ ঘটেছে, তাদের বাংলা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে এই লোকছড়ার মধ্য দিয়ে। কাজটি কৌশলে গল্পকার বাঁদরের ষষ্ঠী ঠাকুরের বরে পাওয়া দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে দেখিয়েছেন। দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেই ছড়ার জগতে প্রবেশ -'ষষ্ঠী দাস শেঠের বাছাদের' দর্শন সম্ভব হয়েছে।

ষষ্ঠী ঠাকুরন বানরের গড়া 'ক্ষীরের পুতুল' খেয়ে খিদে মেটাতে গিয়ে তার হাতে ধরা পড়ে এবং সেই সুযোগকে ব্যবহার করে বানর। দেবী ষষ্ঠী সন্তান দাত্রী। তাঁর সাম্রাজ্যে হাজার শিশুর মেলা। বাঁদর দিব্যদৃষ্টিতে দেখল - "ষষ্ঠী তলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে - ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্থলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল"[৭]

এই মায়া রাজ্যের বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ সরাসরি ছড়া প্রয়োগ করে বর্ণনা করেননি, বরং ছড়ার গদ্যরূপ তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কল্পনা শিশুদের মনকে এক নিঃস্বার্থ, শাসনহীন, গুরুমশাই এর রক্তচক্ষুর থেকে শতযোজন দূরে নিয়ে যায়। পল্লীবাংলার এক অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে এই লেখায়—"আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি- পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি যাতে প্রভু নাচেন"[৮] এখানে প্রচলিত ছড়া 'মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর' এর প্রয়োগ গদ্য মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। "সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদঙ্গ ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে কমলাপুলির দেশে পুঁটুরানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে।"[৯]এখানেও "আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে/ঢাক মৃদঙ্গ ঝাঝর বাজে" শীর্ষক প্রচলিত ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এরপরেও জেলেদের ছেলেকে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে দেখা যায়। এটিও প্রচলিত ছড়ার অংশ–"বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে"[১০] প্রচলিত আরেকটি ছড়া–"খোকা এলো বেড়িয়ে/দুধ দাওগো জুড়িয়ে।।/দুধের বাটি তপ্ত/খোকা হলেন খ্যাপ্ত।।"[১১] এর গদ্য রূপে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন "পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন।"[১২] আরো একটি সর্বজন পরিচিত ছড়া "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান।/শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।/এক কন্যে রাধেন বাড়েন এক কন্যে খান।/এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।।[১৩] এইভাবেই অবনীন্দ্রনাথ এক ছড়ার রাজ্য তৈরি করেন। যেখানে দিগনগর, কমলাপুলি, জলের ঘাটে মেয়েদের নাইতে যাওয়া, শিব ঠাকুরের তিন কন্যের কার্যকলাপ সবই গ্রাম বাংলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাস্তবের শিশু মনও কল্পনায় পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় এই মায়া রাজ্যে।

তিন.

বর্তমান প্রজন্মের শিশু কিশোরদের কাছে অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' কতখানি প্রাসঙ্গিক এ প্রশ্ন আমাদের ভাবায়। সত্যি কি এই প্রজন্মের শিশু কিশোর মন এ জাতীয় রূপকথার জগতে

পদার্পণ করে? হয়তো করে, তবে সেই সংখ্যা বোধহয় খুব বেশি নয়। ইন্টারনেটের কল্যাণে আজকের শিশুরা এই জাতীয় বই পড়তে খুব বেশি উৎসাহী নয়,এ কথা বহুলাংশে সত্য। ইংরেজি মাধ্যমে পড়া বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীর কাছে বাংলা রূপকথার গল্প কিছুটা উদ্ভট মনে হতে পারে। সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক, বাঙালিরা নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে তাদের সন্তানকে, এজাতীয় পাঠের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে সে সংখ্যা খুব বেশি নয়। চ্যাটজিবিলিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রভৃতি যা সাম্প্রতিক কালে বিশ্বে কৃত্রিমভাবে মেধাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার প্রতি এই প্রজন্ম অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু একথা সত্য 'ক্ষীরের পুতুল' কিংবা 'বুড়ো আংলা' মতো গল্প সকল শিশু কিশোরের পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে 'ক্ষীরের পুতুল' এর গল্প শুধুমাত্র বাঁদরের গল্প হয়ে থাকবে না, অন্য মাত্রা নিয়ে আসবে যদি সে সঠিকভাবে পাঠ করে। বাঁদর এই গল্পে রাজাকে ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ এর পার্থক্য চিনিয়ে দেয়। সুওরানী রাজার বাণিজ্য যাত্রা শেষে আনা উপহার পরিত্যাগ করলে বাঁদর রাজাকে এই সত্য চিনিয়ে দেয় "বড়ো ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেব কন্যের হাতে বোনা, নাগ কন্যের হাতে গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি পরতে পারে না মহারাজ। রাজ ভান্ডারে তুলে রাখ, যাকে বউ করবে তাকে পরতে দিও।"[১৪] বাঁদরের এই আত্মপ্রত্যয়ী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাজাকে সাহস দিয়েছে। বাঁদরের বুদ্ধি বড়োরানীর দুঃখমোচনে সাহায্য করেছে। বড়ো রানীর ছেলে হওয়ার গল্পে রানী নিজে ভীত হলেও বুদ্ধি প্রয়োগ করে বাঁদর তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। অপুত্রক রাজার সন্তানহীনতার দুঃখ বাঁদর পূরণ করেছে। ছোটরানী ডাকিনীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বড়োরানীকে বিষের নাড়ু খাইয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেও সফল হয়নি। বন থেকে লতাপাতা, গাছের শিকড় ইত্যাদি ঔষধী এনে তা খাইয়ে মৃতপ্রায় বড়োরানীকে সুস্থ করে তুলেছে। দৈহিক শক্তিতে বানর দুর্বল হলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কৌশলে সে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা জয় করেছে। বড়োরানী অর্থাৎ মায়ের প্রতি সন্তানের বিশুদ্ধ ভালোবাসা বাঁদরের সামগ্রিক কার্যকলাপে প্রকাশ পেয়েছে। রাজার পুত্র মুখ দর্শনের জন্য বাঁদর গড়ে তুলেছে এক দুঃসাহসিক উপায়। এবং বড়রানীকে আশ্বস্ত করে বলেছে-

> "তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড়ো অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস শেঠের বাছা কোলে পাবি।"[১৫]

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের সঙ্গে লোককথার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন 'ক্ষীরের পুতুল' রূপকথায়। ষষ্ঠী লৌকিক দেবী, ক্ষুধার্ত ষষ্ঠী ক্ষীরের পুতুল খেয়ে ক্ষুধার্ত লোকের অন্নহীনতার বেদনা অনুভব করেছে। এখানেও পুজো না হলে ষষ্ঠী ঠাকুরও খেতে পারবেন না এই নিষেধাজ্ঞা এক জাতীয় ব্রত পালন। বাঁদরের বুদ্ধির কাছে ষষ্ঠী ঠাকুর পরাস্ত হয়েছে। গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে রাজা রানীর মিলনে। বানর তার বুদ্ধিমত্তার পুরস্কার স্বরূপ রাজমন্ত্রীত্ব পেয়েছে। আসলে সুকৌশলে বাঁদর চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ মানব জাতির আদিম রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, সেপ্টেম্বর, ২০০৪, ক্ষীরের পুতুল, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৫।
২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১০।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১০।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১।
১০. মিত্র, অন্তরা, প্রথম প্রকাশ: উৎসব ২০২১, অবনীন্দ্রনাথ ঠাসুরের ক্ষীরের পুতুল, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা-২৯।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯।
১২. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, সেপ্টেম্বর, ২০০৪, ক্ষীরের পুতুল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২।
১৩. মিত্র, অন্তরা, প্রথম প্রকাশ: উৎসব ২০২১, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩।

এছাড়াও ‘পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা’, ১৪০২ বঙ্গাব্দ; বরুণকুমার চক্রবর্তী রচিত 'লোক সংস্কৃতির সুলুক সন্ধান', দে'জ পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০১৫; এবং 'বাংলার ছড়া', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৯ গ্রন্থগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

শৈব তীর্থ ঊনকোটি ; ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির অনন্য ধারক

মৌসুমী পাল
ফেকাল্টি মেম্বার, বাংলা বিভাগ
ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
আনন্দনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ : রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা মানিক্য বংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালেও ক্ষুদ্র এই পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা ছিল স্বাধীন রাজ্য। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর অন্তর্ভুক্তি চুক্তির মাধ্যমে ত্রিপুরা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতীয় অধিররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক উপাদানের নিরিখে এই পাহাড়ি রাজ্যটিকে মোটেই ক্ষুদ্র বলা যায় না। ত্রিপুরার ইতিহাসের ধারাকে অনেক বেশি মহিমান্বিত করেছে এখানকার বৈচিত্রময় বিভিন্ন স্থাপস্ত্য ও ভাস্কর্য সমূহ। ছবিমূড়া, পিলাক, ঊনকোটি প্রভৃতি স্থানগুলির ইতিহাস ও ভাস্কর্য ত্রিপুরার পরিচিতি ও মিশ্র সংস্কৃতির ধারাকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে। বৌদ্ধসংস্কৃতির ধারা নিয়ে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে পিলাক, পাশাপাশি হিন্দুসংস্কৃতির দেব-দেবীর ধারণা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ছবিমূড়া ও ঊনকোটি। এই স্থাপত্যের একটি অনন্য উপাদান হল শিব এবং বুদ্ধের ত্যাগী ও ধ্যানমগ্ন রূপের প্রতিকৃতি; যা ত্রিপুরার ইতিহাসে এক বিরল মাত্রা সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সময়ে ঊনকোটি ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সকলের নিকট একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান; যেখানেঅশোকাষ্টমী ও পৌষ সংক্রান্তিতে তীর্থস্থানটির কুন্ডের জলে অবগাহন স্নান ও পুর্জাচনা একটি অতি পুণ্যের ও সৌভাগ্যের বিষয় বলেই তীর্থ যাত্রীদের অথবা ত্রিপুরাবাসীদের একান্ত বিশ্বাস।
সূচক শব্দ: ত্রিপুরা ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ইতিহাস, ভৌগোলিক বর্ণনা, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার, মিথ্।

মূল আলোচনা :

উত্তর-পূর্বভারতের ত্রিপুরা রাজ্যটি ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে অতি ক্ষুদ্র হলেও, বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের নিরিখে রাজ্যটির মহিমাকে মোটেই ক্ষুদ্র বলা যায় না। অতীত ত্রিপুরার গৌরবোজ্জ্বল ও বৈচিত্রময় ইতিহাসের ধারা বর্তমানে প্রায় অনেকেরই জানা। আর এই ইতিহাসের মহিমাকে আরো বেশি মহিমান্বিত করে তোলেছে এখানকার বৈচিত্রপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন।

স্থাপত্যও ভাস্কর্যের উপস্থিতি। ছবিমূড়া, পিলাক, ঊনকোটি প্রভৃতি স্থানগুলি স্বমহিমায় প্রতিনিয়ত ত্রিপুরার ইতিহসে নিজেদের উপস্থিতি গর্বের সাথে জানান্ দিয়ে চলেছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারণা নিয়ে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে পিলাক, অন্যদিকে হিন্দু সংস্কৃতি, বিশেষত শিব – উমা – গনেশ – বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেব –দেবীর ধারণা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ছবিমূড়া, ঊনকোটি প্রভৃতি বিশেষ স্থাপত্য সমূহ। এই স্থাপত্যের একটি অনন্য উপাদান শিব এবং বুদ্ধের ত্যাগী ও ধ্যানমগ্ন রূপের প্রতিকৃতি, যা ত্রিপুরার ইতিহাসে এক বিশেষ মাত্রা সৃষ্টি করেছে।

'ঊনকোটি' নামকরণের উৎস সন্ধানে:

ইংরেজিতে 'টপোনিমি'-র বাংলা প্রতিশব্দ হল 'স্থান নাম বিদ্যা'। জ্ঞানচর্চার এই ধারাটি বিশেষত উনিশ শতক থেকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সূত্রবদ্ধ হতে শুরু করেছে। কোনো একটি বিশেষ

স্থানের বা কীর্তির নামকরনের উৎস সন্ধানের চেষ্টার দ্বারা ওঠে আসে ওই বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কার-বিশ্বাস, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, ভাষাতত্ত্ব রাজনৈতিক কার্যলার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিক সমূহ।

ত্রিপুরায়, বিশেষ বাংলা স্থাননামে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এখানে প্রচুর সংখ্যাবাচক নামের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন – আঠারোমুড়া, সতেরো মিঞ্চার হাওয়া, সেভেন্টিনাইন টিলা, বিরাশি মাইল, ঊনকোটি প্রভৃতি। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় 'ঊনকোটি' নামকরনের উৎস সন্ধান।

কৈলাশহর মহকুমায় অবস্থিত ঊনকোটি একটি বিশেষ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, যা ত্রিপুরাবাসীর নিকট 'শৈব তীর্য ঊনকোটি' বলেই অধিক পরিচিত। প্রাচীন ত্রিপুরায়ও রাজাদের নিকট ঊনকোটি দর্শন ছিল এক বিশেষ পুন্য অর্জনের কাজ। এই কথার সমর্থনে রাজমালার উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক –

"কতদিন পরে রাজা ঊনকোটি গেল।
এক ঊনকোটি লিঙ্গ তথাতে দেখিলা।"[১]
(রাজমালা দ্বিতীয় লহর, বিজয় মানিক্যখন্ড)
" রাজধর চলিল দুলালী গ্রাম পথে।
ইটা গ্রাম হৈয়া চলে ঊনকোটি তীর্থের।"[২]
(রাজমালা, তৃতীয় লহর, অমর মানিক্য খন্ড)

'ঊনকোটি' নামকরণের উৎস সন্ধানের এই অংশে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থের ধর্মকর্ম্ম অধ্যায়ে ঊনকোটি সম্পর্কিত তাঁর মন্তব্য এখানে তুলে ধরা যাক – "পূর্ব্ব ভারতে বোধহয় বারাণসীর কোটি – তীর্থের পরই ছিল ঊনকোটির স্থান। বস্তর, এখনও ঊনকোটি পাহাড়ের গায়ে ইতস্তত যতমূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে, তাহাতে ঊনকোটি নামের স্বর্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধিক বৃহদাকৃতি শৈব প্রতিমা ও প্রতিমার শির এখনও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ও গনেশ ছাড়া পরিবার দেবতাদের মধ্যে হর, গৌরী, হরিহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুখ ও চতুর্মুখ লিঙ্গ প্রভৃতিও আছেন।" [৩]

তাছাড়া ঊনকোটি নামকরণকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার লোক মুখে প্রচলিত রয়েছে কয়েকটি কিংবদন্তি বা জনপ্রিয় লোককাহিনী, যেমন একটি কাহিনি এইরূপ – হিন্দু পুরান বা মহাকাব্যে প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ-মুনি কোনো একটি কারণে অপমাণিত ও রুদ্ধ হয়ে কাশী ত্যাগ করেন এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, একরাত্রের মধ্যে তিনি নিজগুণে কাশীর মতো সমান পবিত্র ও মাহাত্মপূর্ণ আরও একটি তীর্যস্থান তৈরি করে তুলবেন। তার জন্য তাঁকে একটি বিশেষ রাত্র বেছে নিয়ে সারারাত্র পূর্জাচনা ও একরাত্রে এককোটি মূর্তি তৈরী করতে হবে। এই পরিকল্পনা করে কাশী থেকে ফেরার পথে তিনি এসে ঊনকোটি পাহাড়ে উপস্থিত হন। এই পাহাড়ের নির্জনতা ও সৌন্দর্য বশিষ্ট মুনির মনকে শান্ত করল। তখনই তিনি ভাবলেন যে, এই স্থানটিই দ্বিতীয় কাশী হওয়া উপযুক্ত। এক নির্দিষ্ট রাতে বশিষ্ঠ মুনির নির্দেশে সুর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত কামার (কালু কামার) পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে খোঁদাই করতে শুরু করল ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি। পাশাপাশি একই সঙ্গে চলতে থাকল বশিষ্ঠ মুনির পূর্জাচনা। এই দিকে স্বর্গের দেবতাগণ পড়লেন ঘোর চিন্তায়। কারণ, হিন্দুধর্ম মতে পরিত্র শৈব তীর্থ কাশীতে যার মৃত্যু হয়, তার আত্মা সরাসরি স্বর্গে চলে যায়, এবার কাশীর সমান পবিত্র পুণ্য তীর্থ যদি আরেকটি হয়, তবে স্বর্গে অনাকাঙ্খিত মানুষের সংখ্যা

অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। তাই বশিষ্ট মুনির এই উদ্দ্যোগকে ব্যর্থ করার জন্য দেবতাগণ একটা চক্রান্ত করলেন এবং কোনো একজন দেবতা কাকের রূপ ধরে সূর্যোদয়ের মিথ্যা সংকেত দেবার জন্য ‘কা’ ‘কা’ করে ডাকতে শুরু করলেন। এদিকে কালুকামার কাকের ডাক শুনে ভোর হয়ে গেছে ভেবে মূর্তি নির্মাণ বন্ধ করে, ওই স্থান ত্যাগ করেচলে যান। কিছু সময় পর যখন সত্যি সূর্যোদয় হয়, তখন দেবতাদের চক্রান্তসফল হয় এবং বশিষ্ঠ মুনির দ্বিতীয় কাশী নির্মানের প্রতিজ্ঞও ব্যর্থ হয়। কালুকামার যখন মূর্তি তৈরী বন্ধ করেছিলেন, তখন আর একটিমাত্র মূর্তি তৈরি বাকি ছিল। এককোটি থেকে একটি মূর্তি কম হওয়ায় স্থানটির নামকরণ করা হয় ‘ঊনকোটি’।

অন্য আরেকটি কাহিণি হল এইরূপ – সমরেন্দ্র দেব্বর্মা তাঁর ‘ত্রিপুরার স্মৃতি’ গ্রন্থে ঊনকোটি সম্পর্কে একটি প্রচলতি কাহিনির উল্লেখ করেছেন“একদা বারাণসী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কৈলাসনাথ শম্ভু দেবগন সহ হিমালয় হইতে অবতরণ পূর্বক উদ্দিষ্ট স্থানে গমন সময়ে দিবা অবসানকালে ঊনকোটিতে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে সকলেই পথশ্রমে কাতর হওয়ায় এই স্থানে রাজনী যাপন পূর্বক সূর্যোদয়ের প্রক্কালেই যথাস্থানে পৌঁছিবেন – এইরূপ মনস্থ করিয়া তাঁহারা সকলে শয়ন করেন। কিন্তু নিশা অবসান পূর্বে উমাপতি শঙ্কর ব্যতিরেকে আর কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন দেবাদিদেব ভূতনাথ তদীয় সহযাত্রী দেবগণকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ পূর্বক বারাণসীতে গমন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিভাবরী শেষ হইয়া বায়স – রব হইলে দেবগণ পাষানে পরিণত হন। এক মহাদেবের অভাবে কোটি দেবতার পূর্ণ না হইয়া হওয়া বশত এই স্থান ঊনকোটি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে নতুবা ইহা বারাণসীতে পরিণত হইতে।”[৪]

প্রচলিত এই সমস্ত লোককাহিনিগুলির কোনোটিরই প্রামাণ্য তথ্য নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী দীপক ভট্রাচার্যের বিশ্লেষণ ও মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক – “ঊনকোটীশ্বর কালভৈরব যে দক্ষিণ ভারতীয় শিব-রূপ নন্ন দেবতার প্রভাবে সৃষ্টি সে তথ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নন্ন দেবতার মূর্তির মধ্যে তাঁর উপাসক মৃত্যুর পর বিলীন হয়ে যাবেন এই মনোকামনা করেই স্মৃতি মন্দির তৈরী করেছেন। - - - নন্ন এবং কোটি উভয়ই দ্রাবিড় প্রভাবিত। এই অঞ্চলে সেই সময় যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষের যথেষ্টই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল বিভিন্ন তথ্যসূত্রে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত খাসিগন, যারা ঊনকোটি ও

সন্নিহিত অঞ্চলে সংখ্যাধিক রূপেই অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই খাসি-ভাষী মানুষেরা সম্মানীয় ও শ্রদ্ধেয়নামের উচ্চারণের পূর্বে ‘উ’ ব্যবহার করেন। - - - সেই শ্রদ্ধেয় ‘নন্ন’ নামে উচ্চারনের পূর্বে ‘উ’ যোগ করাটাই স্বাভাবিক। তাহলে সম্পূর্ণ নামকরণটি হয়ে পড়ে উ-ন্ন – কট থেকে কালের প্রভাবে তা হয়ে যায় ঊনকোটি। কোটির চেয়ে এক কম বলে যা প্রচলিত সে রকম চিন্তাভাবনার উন্মেষ অনেক পরের ঘটনা।”[৫] তবে এক্ষেত্রে ভাষা তত্ত্বের বিশ্লেষনে এই তত্ত্বও যে কটতা ধোপে টিকবে, সে সমন্ধে তো সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় তাঁর ‘অবহেলিত ঊনকোটি’ প্রবন্ধে ঊনকোটি নামকরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন “শূণ্য শব্দটি, ‘হুনকূট’, ‘উনকূট’ হলেও আপত্তি থাকে না কিন্তু ‘কূট কি করে তৎসম শব্দ কোটীতে রূপান্তরিত হয়, এটা বুঝা দুষ্কর। তাই বলতে হয় যে, এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও সহজ সাধনের প্রসার লক্ষ্য করে ঊনকোটীর আদি নাম ‘শূনকূট’ কষ্ট কল্পনা মাত্র।”[৬]এখন একটা কথা বলাই সম্ভব যে,

ঊনকোটির নামকরণের সঠিক ইতিবৃত্ত ও রহস্য উন্মোচনের এক মাত্র পথ হল সঠিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা ও তার সঠিক বিশ্লেষণ।

ঊনকোটির মূর্তি বৈচিত্র:

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের জন্য বিখ্যাত স্থান সমূহের মধ্যে অন্যতম হল ঊনকোটি। এই স্থানের শিল্প কার্যের বৈচিত্রময়তাও তাই অতি স্বাভাবিক। এই স্থানে সমগ্র পাহাড়টিকেই শিল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানকার ভাস্কর্যগুলিকে কোনো কৃত্রিম সীমারেখায় আবদ্ধ করা হয়নি বলে স্বাভাবিক ভাবেই এখানে সহজ সরল আদিম বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্য সুষমা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঊনকোটির মূল ভাস্কর্য সমূহ প্রায় তিরিশফুট নীচে পাহাড়ের খাদের মধ্যে অবস্থিত। পাহাড় বেয়ে সেখানে নেমে পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ালে দেখা যায়, ঊনকোটীশ্বর কালভৈরব,তিনিই এখানকার মূল দেবতা। ত্রিনয়ন বিশিষ্ট সম্পূর্ণ একটি মুখমন্ডলের অবয়বে প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চতায় এই ভাস্কর্যটি তৈরী করা হয়েছে। এই মূর্তিটির মুখমন্ডলের অবয়বের মাথায় চুল নেই, রয়েছে প্রচুর কারুকাজ করা একটি বৃহৎ ও ব্যতিক্রমী শিরোপা ; পাশাপাশি লক্ষ্য করলে আরও দেখা যায়, শিরোপার দুই পাশে দু'টি বৃহৎ কানে রয়েছে দু'টি বৃহৎ কুন্তল, যেগুলির মধ্যে আদিবাসী জন-জীবনের ছাপ, শিল্প - সৌন্দর্যবোধ ও কারুকার্যের ছাপ অতি স্পষ্ট। অনেক বিজ্ঞজনেরা মনে করেন, বুদ্ধমূর্তি শৈলীতে বৃহৎ কানের যে ধারা রয়েছে, সেই পরম্পরাই ঊনকোটীর শিল্পীদের প্রভাবিত করেছে। এছাড়া এই ভাস্কর্যটির একটি বিচিত্র দিক হল, এর সারিবদ্ধ সমান দাঁতের পাটি ও পাকানো গোঁফ। এই সমান দাঁতও পাকানো গোফের উপস্থিতির কারণে অনেক বিজ্ঞজনেরা শিল্পকর্মটিকে 'মুখোসাকৃতির ভাস্কর্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। আলোচ্য ভাস্কর্যটির দুই পাশে রয়েছে মকর ও সিংহবাহনের দুই নারী মূর্তি। বিশেষজ্ঞজনের মতানুযায়ী এই দুই নারী মূর্তি হলেন দেবী গঙ্গা ও দেবী পার্বতী।

আলোচ্য বিশাল মুখন্ডলটি ছাড়া আরও বহুদেবতার মূর্তি ও মুখের উপস্থিতি ঊনকোটির মূর্তি সমূহের মধ্যে বর্তমান যথা - ঊনকোটীশ্বরের বিশাল মুখমন্ডলের কাছেই মাটিতে একটি একক প্রস্তর খন্ডে সৃষ্টি করা হয়েছে মহাদেবের প্রধান ভক্ত-নন্দীকে। মূর্তিটি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, একটু লক্ষ করলেই নজরে পড়বে একটি ষাড় বসে আছে যার পিঠ আদিবাসী রমণীদের পরিধেয় পাছড়ার শিল্প কারুকার্য মন্ডিত একখন্ড বস্ত্র দিয়ে ঢাকা। কাছাকাছি আরো একটি একক শিলাখন্ডের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে একটি কচ্ছপের ভাস্কর্য, যা খুব বেশি উন্নতমানের শিল্পকর্ম না হলেও নজর কাড়ে সকলে। ষাঁড় এবং কচ্ছপের এই যুগলবন্দি ও পাশাপাশি অবস্থান মহাদেব ও বিষ্ণুদেবের একত্রে উপস্থিতির প্রতীক বলেই বিবেচিত হয়। এছাড়াও পাহাড়ের গায়ে আরো কয়েকটি মুখের অবয়ব খোদিত রয়েছে, যাদের মাথায় রয়েছে মুক্তকেশ। একটু-দূর থেকে এই কেশ-বিন্যাশ ভাল ভাবে লক্ষ করলে মনে হবে, মাথা থেকে যেন অগ্নি শিখা নির্গত হচ্ছে।

এই স্থানের পশ্চিম অভিমুখ নামলে পাথরে খোদাই করা বেশ কিছু মূর্তির মধ্যে অধিকাংশ ভক্ত বা পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বিষ্ণু মূর্তি ও তিনটি বৈচিত্রপূর্ণ গনেশ মূর্তি। বৈচিত্রময় বলার কারণ হল, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এই গনেশ মূর্তিগুলি তৈরী করা হয়নি ; এই মূর্তিগুলিতে গনেশের রয়েছে বহু হাত, একাধিক দাঁত ও শঙ্খরূপ কর্ণাভরণ। এর মধ্যে দু'টি মূর্তি রয়েছে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং একটি বসা অবস্থায়। এই মূর্তিগুলির পাশেই

রয়েছে চারহাত বিশিষ্ট একটি বিষ্ণু মূর্তি যার মুখের গঠনে রয়েছে আদিবাসিদের মুখে স্পষ্ট প্রভাব।

একটি কথা এখানে না বললে নয় যে, ঊনকোটির শিল্পী বা শিল্পীগণ যে পারিপার্শ্বিক জনজীবন এবং সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তারপর জলের গতিপথ ধরে সোজা নিচের দিকে নামের থাকলে ভিন্ন ভিন্ন মাপের বেশ কয়কটি শিব লিঙ্গ নজরে পড়ে। আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় সেখানে শিব – পার্ব্বতীর মূর্তি যুগলে অবস্থান করছে এবং পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা রয়েছে শিব – উমার পরিনয় দৃশ্য। সেখানে পৌরোহিত্ব করেছেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং উপস্থিত রয়েছেন বিঘ্ননাশক গনেশ। তবে এই মূর্তিগুলি অবস্থা অতি করুণ। এই ভাস্কর্যগুলির কাছাকাছি রয়েছে একটি অদ্ভূত ও বিচিত্র গঠনের শিব মূর্তি যার রয়েছে পাঁচটি মাথা ও দশটি হাত এবং শিবের অস্ত্র হিসেবে ত্রিমূল নয়, রয়েছে ধনুক। উন্নত শিল্পগুণের জন্যে মূর্তিটি গবেষকদের দৃষ্টি বরাবরই আকর্ষণ করে থাকে।

তারপর আবার উপরে ওঠার পালা। এই পর্বে ক্রমশ নজরে পড়বে চতুর্মুখ লিঙ্গ এবং অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে ফেলে রাখা বেশ কিছু মূর্তি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে – হরিহর, অর্ধ-নারীশ্বর, শিব-পার্ব্বতী, গনেশ, ষাঁড়, হনুমান প্রভৃতি মূর্তিসমূহ। এই প্রত্যেকটি মূর্তিই খন্ড খন্ড প্রস্তর খন্ডে খোদাই করে তৈরী করা হয়েছে। মূর্তিগুলি গবেষণা করে অনেক বিজ্ঞজনদেরই অভিমত যে, এই সমস্ত মূর্তিগুলি কোনো একক শিল্পীর কীর্তি ন। আলোচ্য এই সকল মূর্তি বা ভাস্কর্য সমূহ ছাড়াও ঊনকোটিতে এমন অনেক শিল্পকর্ম বিরাজমান, যেগুলি পর্যটক বা গবেষক গনের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। ঊনকোটীশ্বরের মূল মুখমন্ডলের পাশে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় ভাস্কর্য, রয়েছে অনেক মুখমন্ডল। যেগুলির মধ্যে কোনো কোনো মুখে আবার গোঁফ ও বৃহৎ কর্ণাভরণ বিরাজমান, তবে মূর্তিগুলি ত্রি-নয়ন যুক্ত নয়, এই মুখমন্ডলের পাশের পাহাড়ে খোদাই করা রয়েছে দু'টি সাহসী নারী মূর্তি, যাদের চুল হাওয়ায় উড়ছে। সেখানেই রয়েছে পাখির পালক যুক্ত মুকুট মাথায় তীর মারার ভঙ্গিতে এক যুবকের ভাস্কর্য। তীর মারার ভঙ্গিতে সৃষ্ট বলে অনেকেই এই মূর্তিটিকে কামদেব বা মদন দেব আখ্যা দিয়েছেন। কারণ ধ্যানমগ্ন মহাদেবের সঙ্গে কামদেবের এই ভঙ্গির সম্পর্ক অতিনিবিড়। উল্লেখিত নারী মূর্তি বা যুবকের ভাস্কর্য প্রত্যেকটিতেই আদিবাসিদের ছাপ কিন্তু সকলেরই নজর কাড়ে।

ঊনকোটির অবহেলা:

ঊনকোটির ব্যতিক্রমি শিল্প সৃষ্টি, ভাস্কর্যের ভিন্নতা ও সর্বোপরি বহু পুরোনো ঐতিহাসিক নির্দেশন প্রভৃতি বহু করণে ভারতের সমগ্র উত্তর – পূর্বাঞ্চল তো বটেই, সমগ্র পূর্ব ভারতেও এই ধরনের শিল্প নির্দশন অতি বিরল। তাই উৎসাহিত গবেষকগণ ঊনকোটি সম্পর্কে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। কেউ বলেন এটি বারাণসী সমতুল্য পুণ্য শৈব তীর্থস্থান আবার কেউ বলেন এটি একটি 'স্মৃতি মন্দির', আরো অনেক পন্ডিতজনের অনেক অভিমত। প্রত্যেকেই নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক যুক্তি ও তথ্যের সমাহারও পরিবেশন করছেন। তবে একথাও সত্যি যে, কোনো মতের পক্ষেই আজ পর্যন্ত কোনো গঠিক প্রামান্য তথ্য পাওয়া যায়নি। ঊনকোটি কোন্ রাজার রাজত্ব কালে সৃষ্ট, কতদিনের পুরোনো এই সমস্ত আলোচনাই এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর আলোচনা মাত্র। ভারতীয় প্রত্নতাত্মিক মহলে ঊনকোটি যদিও একটি গুরুতবপূর্ণ স্থান, তথাপি এর অবহেলার ভাগ্য আজও শেষ হয়নি। তবে সেটা ঊনকোটির

ভাগ্য না ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য সেটাই বা কে বলবে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ভূমিকম্পে এবং দীর্ঘ দিনের অযত্ন – অবহেলাও ঔদাসীন্যে ঊনকোটিরবহুমূর্তি করুন ভাবে ভগ্নদশাগ্রস্ত হয়েছে এবং বহুমূর্তি স্থানচ্যুত হয়ে অন্য স্থানে পড়ে গেছে বা সরে গেছে। আবার অনেক মূর্তি ভেঙ্গেও গেছে। অনেক মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান নির্ণয় করা বর্তমানে অতি দুসাধ্য কাজ হয়ে পরেছে। ঊনকোটিতে এখনো এমন অনেক মূর্তি রয়েছে যেগুলির সঠিক পরিচয় আজও নির্নয় করা সম্ভব হয়নি।

আশার আলোতে ঊনকোটি:

ঊনকোটির অন্ধকার যুগে পেরিয়ে বর্তমানে ধীরে ধীরে আশার – আলো উদিত হতে দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু দিন ধরে ঊনকোটি নিয়ে অনেক চর্চা শুরু হয়েছে, চলছে বহু লেখা-লেখি, তৈরী হয়েছে ঊনকোটির তথ্য চিত্র। বহু আগ্রহী ও গবেষকগনের দিবা-রাত্রির এই পরিশ্রম তখন সম্পূর্ণ স্বর্থক হবে, যখন কোনো মূর্তি বিশেষজ্ঞ এই স্থান নিয়ে আগ্রহী হয়ে কাজ শুরু করবেন। তখনই ঊনকোটির সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কে বলতে পারে সুদূর ভবিষ্যতে এই শৈব তীর্থ ঊনকোটি, নতুন কোন্ পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

বর্তমানে ঊনকোটি ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি সকলের নিকট একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান। অশোকাষ্টমী ও পৌষসংক্রান্তিতে এই তীর্থের কুন্ডের জলে অবগাহন, স্নান, পূর্জাচনা একটি অতি পুণ্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলেই তীর্থযাত্রীদের তথা সমগ্র ত্রিপুরাবাসীদের একান্ত বিশ্বাস।সমরেন্দ্র দেব্বর্মা তাঁর 'ত্রিপুরার স্মৃতি' গ্রন্থটিতে এই মেলা সম্পর্কে বলেছে – "ঊনকোটি নামে সুপ্রসিদ্ধ এই তীর্থে বহুকাল অবধি প্রতিবৎসর অশোকাষ্টমী উপলক্ষে এক মেলা হইয়া আসিতেছে। সেই সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক এইস্থানে আগমনপূর্ব্বক স্নান – দানাদি করিয়া থাকে, এবং লোক – সমাগমে এই নিস্তদ্ধ পার্ব্বত্য – প্রদেশ কোলাহলে মুখরিতে হইয়া উঠে।"[৭]

বিভিন্ন প্রচলিত কিছু লোককথা আর অনুমান নির্ভর কিছু তথ্য কিংবা একবার ঊনকোটি ঘুরে এসে, এক নজরে ঊনকোটির ভাস্কর্য দেখে এত বড়ত্তমহৎ একটি শিল্পস্থাপত্যের পরিচয় দেওয়া বা বর্ণনা করা বোধহয় উচিত কাজ নয়। তবু একথা তো স্বীকার করতেই হয়, কিছু একটা সূত্রকে আকড়ে ধরেই অন্ধকারে পথ চলতে হয়। ত্রিপুরাবাসী হিসেবে এই কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ঊনকোটির অবহেলাকে গুরুত্ব দিয়ে মূর্তিগুলির যথার্য রূপ ও পরিচয় নির্ণয়ের স্বার্থে এবং এই স্থানের সঠিক ইতিহাস উদ্ধারের তাগিদে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ও মূর্তিবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন অতি দ্রুত করা প্রয়োজন। ত্রিপুরাবাসী নিজেদের সযত্নে লালিত বিশ্বাস ও ভালবাসায় ভর করে তাকিয়ে রয়েছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে, হয়তো সঠিক ইতিহাস উন্মোচনের পর 'শৈব তীর্থ ঊনকোটি' – ই হয়ে উঠবে ত্রিপুরার আরেক মুখ।

তথ্যসূত্র :

১) বিদ্যাভূষণ, সেন শ্রীকালীপ্রসন্ন (সম্পাদিত), 'শ্রীরাজমালা', দ্বিতীয়খন্ড, উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, আগরতলা, দ্বিতীয় সংস্কারণ, ২০০৩, পৃ -৪৫।

২) বিদ্যাভূষণ, সেন শ্রীকালীপ্রসন্ন (সম্পাদিত), (স্বর্গীয় গঙ্গাধর সিদ্ধান্ত বাগীশ বিরচিত), 'শ্রীরাজমালা' (ত্রিপুর রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত – তৃতীয় লহর), উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২০(জুন), পৃ – ১০।

৩) দাশ, নির্মল ও দত্ত, রমাপ্রসাদ (সম্পাদিত), 'শতাব্দীর ত্রিপুরা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ২০০৫, পৃ – ১৬১।

৪) দেব্বর্মা, সমরেন্দ্র, 'ত্রিপুরা স্মৃতি', সম্পাদনা – বিক্রম কিশোর দেব্বর্মান, পারুল প্রকাশনী, আগরতলা, নবতম সংস্করণ – ২০০৬, পৃ – ১৬০।
৫) ভট্টাচার্য, দীপক, 'ঊনকোটি', জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, ২০০৭, পৃ – ৬১।
৬) 'শতাব্দীর ত্রিপুরা' ঐ, পৃ – ১৬৩।
৭) 'ত্রিপুরার স্মৃতি', ঐ, পৃ – ১৭৮।

বিশ্বব্যাপী রামকথার প্রসার : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

পীযূষ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বঙ্কিম সরদার কলেজ

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা প্রদেশে রামকথার প্রচলন আছে- কারণ, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অপরিহার্য উৎসভূমি রামায়ণ। পুরাণকে আশ্রয় করে রচিত হলেও রামায়ণ এক সামাজিক মহাকাব্য। রামায়ণের প্রভাবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গার্হস্থ্য ধর্মের মানব সম্পর্ক আজও সজীব। পাশাপাশি রামায়ণের কথা নানা দেশের নানাজাতির চিত্তকে রসসিক্ত করেছে। বিপুলা এই পৃথিবীর অন্তরালে চলেছে নানান সৃষ্টি। এই সৃষ্টির আবহে বিশ্বমানবের সাহিত্য রসিক মনের জন্য রামকথা এক অক্ষয় অমর রস ভাণ্ডার হিসাবে বিরাজমান।
সূচক শব্দ: দশরথ জাতক, দ্বীপময় ভারতবর্ষ,রামকিয়েন, পেনা, কম্ব রামায়ণ।

মূল আলোচনা:

রামকাহিনি শুধু ভারতীয় জনমানসে নয়, বহির্ভারতের জনমানসেও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে যথাযথ প্রাসঙ্গিক—

> ‘রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখিয়াছেন। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়ভ্রাতায় স্বামীস্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতির সম্বন্ধ; রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।’

(প্রাচীন সাহিত্য-রামায়ণ,পৃ-৭১৩)

কিংবা,

> ‘রামায়ণ কথা ভারতবর্ষের কাছে কোন অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা—আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে;’

(প্রাচীন সাহিত্য-রামায়ণ, পৃ-৭১৪)

রামায়ণের কাহিনি এমন অটুট বন্ধনে আবদ্ধ যে— রামায়ণের কাহিনি যে স্থানে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই স্থানকে প্রভাব বিস্তার করে স্বমহিমায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

রাম কাহিনির উৎস সম্পর্কে বৌদ্ধগ্রন্থ জাতক এর কথা বলা যায় এবং এই কাহিনির অনুষঙ্গ হিসাবে বর্তমান রামায়ণের এইরূপ ধারণ করে। এইগ্রন্থে ‘দশরথ জাতক’ কাহিনি উল্লেখ করা যাক, এই কাহিনিতে সীতাহরণ কিংবা রাক্ষসদের কোনও উল্লেখ নেই। তাছাড়া সীতাকে রামচন্দ্রের পত্নী হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়নি। হয়েছে ভগ্নীরূপে। সম্পর্কে ভ্রাতা ভগ্নী হলেও রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করে তাঁকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করেছিলেন। যদিও ভারতবর্ষের কোথাও ভাই-বোনের বিবাহসম্পর্ক রীতি নেই। তবুও বৌদ্ধজাতকে এই রীতির স্বপক্ষে জোরালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

রামকাহিনির মধ্যেকার ব্যাপকতা এত গভীর যে, সে প্রভাব বিস্তার করেছিল চীনদেশে, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে দ্বীপময় ভারতবর্ষে---শ্যাম-কম্বোজ-সুবর্ণদ্বীপে। এমনকি এই কাহিনি সেইসব স্থানের জনজীবনে রামকথা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

অধ্যাপক সিলভা লেন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রামায়ণের চৈনিক রূপায়ণের সংবাদ প্রথম সর্বসমক্ষে আনেন। যদিও চৈনিক সংস্করণ গুলিতে রামায়ণের বর্ণিত নায়ক-নায়িকার কথা নেই। কিন্তু রামায়ণের অনেক কাহিনি সেইসব সংস্করণগুলিতে ধরা পড়েছিল। চীন থেকে রামায়ণের একটি তিব্বতীয় সংস্করণ পাওয়া গেছে—তিব্বতী রামায়ণে রামকে বলা হয়েছে 'রামন' (দশরথ পুত্র)। সীতাকে দশগ্রীবের কন্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জ্যোতিষীরা বলেন, কন্যাটি তার পিতা ও রাক্ষস বংশের ধ্বংসের কারণ হবে। এতে, রাবণ কন্যাটিকে একটি তাম্রপেটিকায় আবদ্ধ করে জলে ভাসিয়ে দেন। পেটিকাটি ভাসতে ভাসতে কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে হলকর্ষণের রেখায় আটকে যায়। তাই তার নাম রাখা হয় 'য়োনা-রোঞ্জো-মা''রামনে'র সাথে বিয়ে হয়। নাম দেওয়া হয় সীতা।

প্রকৃতপক্ষে মঙ্গোলীয় রামায়ণ নানা দিক থেকে তু-হুয়াং-এ প্রাপ্ত তিব্বতি রামায়ণকেই অনুসরণ করেছে। এই রামায়ণে ভরতের নাম পাওয়া যায়নি—বলা হয়েছে রামন ও লগমনের অনুজ ভাই। তিব্বতি রামায়ণে রাম সুগ্রীবকে লেজে একটি আয়না বাঁধতে বলা হয়েছে কিন্তু মঙ্গোলীয় রামায়ণে রাম সুগ্রীবকে কপালে আয়না বাঁধতে বলেছেন। সর্বোপরি মঙ্গোলীয় রামায়ণে গল্পকে বিশদরূপে ধরা হয়েছে যা তিব্বতি রামায়ণে অনুপস্থিত। এই সব দিক থেকে মঙ্গোলীয় রামায়ণে মৌলিকতা বজায় থেকেছে।

রামায়ণের কাহিনি বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলিতে। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং মুসলমানধর্ম গ্রহণের পরেও ভারতীয় সংস্কৃতি যথাযথ বর্তমান ছিল। সুমাত্রা জাভাতে, বালি দ্বীপে এবং শ্যাম মালয়ের ইন্দোনেশিয়া ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল। তার পরিচয় 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "হিন্দুভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কিরকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্রভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গীটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের।"(১০ পত্র)

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বালিদ্বীপে তো এখনও চাতুর্বণ্য প্রথা বর্তমান। ওদের ভাষায় বলে ব্রমানা, সাত্রিয়া, ওএসিস এবং সুচারা। প্রাচীন ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও লোকমুখে পরিচিত রামকথা 'রামায়ণ কাকাবিন' নামে পরিচিত রামায়ণ। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান ভদ্রসমাজের নামের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির সম্পর্ক অনেক বেশি। তাই তাদের নাম হয়—আদি বিজয়, স্বভাবআর্য, বীরপুস্তক, সহস্র প্রবীর, ধৈর্য সুব্রত, আর্য সুতীর্থ, রক্ষাকুসুম, শাস্ত্রবীর্য ইত্যাদি।

এমনকি ভারতীয় কাব্যকাহিনিও সেখানে ব্রাত্য হয়নি। রামায়ণ মহাভারতকে সেখানে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করা হয়েছে --- কম্বোডিয়া (কম্বোজ), শ্যাম, যবদ্বীপ ইত্যাদি রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির অসীম প্রভাব বর্তমান। ব্যাংককের বুদ্ধ মন্দিরের দেওয়ালে রামকাহিনির চিত্র চিত্রিত।

রামায়ণ চর্চা সম্পর্কে শ্যামদেশের রামায়ণ কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। মূল রামায়ণের সঙ্গে দেশীয় রামায়ণের সংযোগে প্রচলিত কাহিনি হয়েছে 'রামকিয়েন' বা

রাম কাহিনি। শ্যামদেশীয় উচ্চারণের জন্য চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তিত হয়েছে। সেখানে রামের নাম রাম, কিন্তু লক্ষ্মণের নাম 'ল'। ভরতকে বলা হয় 'প্রত'। সীতা হয়েছে 'সীদা'। এমনকি দশস্কন্ধ রাবণের নাম 'অশোকস্থ', জটায়ুর নাম 'সড়ায়ু'।

শ্যামীয় রামায়ণের কাহিনিতে অদ্ভুত রামায়ণের প্রক্ষেপ ঘটেছে অর্থাৎ সর্বাংশে বাল্মীকি রামায়ণের অনুসারী হয়নি। এখানে রামকিয়েনের কাহিনি খুব সংক্ষেপে বলা হল—

সীতা, মন্তোর (মন্দোদরীর) কন্যা, পিতা তশোকন্থ, কোষ্ঠীতে বংশ নামের কথা আছে। তাই রাবণ কন্যা সীতাকে ভাসিয়ে দিলেন নদীর জলে। রাজা জনক তাকে উদ্ধার করে কন্যা হিসাবে লালন-পালন করেন।

ওদিকে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম এবং লক্ষ্মণ বনে গেলেন দৈত্য বধ করতে এবং মুনিদের রক্ষা করতে। তারপর রাম ও 'লক্' মিথিলাতে যান। সেখানে রামের হরধনু ভঙ্গ এবং সীতা লাভ।

দশরথের ছোটরাণী দশরথকে সেবাযত্নে তুষ্ট করে তার পুত্র 'প্রত'-এর জন্য রাজ্য কামনা করেন। এরপর রাম, লক ও সীতার বনে গমন। এরপর মারীচ বধ, সীতাহরণ রাবণ কর্তৃক এবং পথে যেতে রামের বন্ধু সড়ায়ুর বধ।

রামায়ণের রামই ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রাবণকে বধ করেছিলেন। শ্যামীয় রামকথায় হনুমানকেই সেই কৃতিত্ব দান করা হয়েছে। সর্বোপরি শ্যামীয় রামকথা মুখ্যত বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব জাত নয় এর মূলে আছে তামিল রামায়ণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাল্মীকি রামায়ণের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী কবি কালিদাস। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত 'ত্রয়ী' গ্রন্থে বলেছেন, 'বাল্মীকির ভাব ও ভাষা, তাহার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গিকে কালীদাস সগর্বে গ্রহণ করিয়াছেন ... পিতৃপিতামহের সঞ্জিত ধনরত্নকে গ্রহণ করিবার এবং ব্যবহার করিবার ক্ষমতা যাহার নাই সেত অভাগ্য বঞ্চিত কালিদাসের সে ক্ষমতা ছিল, তাই তিনি বাল্মীকির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী।'

ভারতের পূর্বাঞ্চলে তিনটি সহোদরা ভাষা অসমীয়া, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার সাহিত্যের রামকথার নবরূপায়ণ ঘটে। মুখ্যত বাল্মীকি রামায়ণের উপর ভিত্তি করে এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেরস্পর্শ নিয়ে, কোনও কোনও সময় বাল্মীকি রামায়ণের আখ্যান-উপাখ্যানের সঙ্গে আরও কিছু উপাখ্যানের সংযোগ ঘটিয়ে পূর্বাঞ্চলের কবিরা নিজ নিজ ভাষায় রামায়ণ রচনা করে রামকাহিনিকে উল্লেখযোগ্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অসমীয়া সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি হরিহর মিশ্র চতুর্দশ শতকে লেখেন লব-কুশের যুদ্ধ, সেটি বাল্মীকি রামায়ণের উপর ভিত্তি করেই রচিত। এই চতুর্দশ শতকে মাধব কন্দলীই অসমীয়া ভাষায় প্রথম সার্থক রামায়ণ রচনা করেন। তিনি কবিরাজ নামেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে লেখা 'কন্দলী রামায়ণ' অসমীয়া সাহিত্যে বিশিষ্ট একটি সংযোজন। বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ হলেও লোকসমাজে প্রচলিত লোককথাকেও তিনি স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মাধবকন্দলীই পূর্বাঞ্চলীয় কোন প্রদেশীয় ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন।

মণিপুরী বা মৈত্রেয়ী জনগোষ্ঠী প্রায় দুহাজার বছর আগে হিন্দুধর্মের পরিমণ্ডলে এসে পড়েছিল। মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরে রামানন্দী বৈষ্ণবদের প্রভাবে রামপূজার প্রবর্তন ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা হলেও, মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রাম-সীতার মন্দির নির্মিত হয়। রাজা গরীব নেওয়াজ সিং (১৭০৯-৪৮) নিজে রামানন্দী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই ধর্মকে রাজধর্ম রূপেও মান্যতা দেন। সেই সময় কৃত্তিবাসের বাংলা

রামায়ণ মণিপুরী ভাষায় অনুদিত হয়। বলাবাহুল্য রামায়ণ কাহিনি সর্বাধিক প্রচার ঘটেছে কর্তৃকদের মাধ্যমে মণিপুরী, ভাষায় যাদের বলা হয় ওয়ারিলিবস (warileabos)। 'পেনা' নামক একতারা বাজিয়ে একজন মাত্র গায়ক কেবলমাত্র গানের মাধ্যমে রামায়ণ কাহিনি গান করে শোনান।

বর্তমান সময়ের ওড়িশার মুখ্যভাষা ওড়িয়া। এই দেশেরই প্রাচীন নাম ছিল উৎকল এবং ওড্রদেশ। উৎকল দেশেও রামকথার বিস্তার ঘটেছিল সুপ্রাচীন কালেই। মূলত ওড়িয়া সাহিত্যে রামকথা রচিত হওয়ার পূর্বে রামায়ণ কাহিনি ঐতিহ্যিক ধারায় বিস্তার লাভ করেছিল।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রাম কাহিনি নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় 'অনর্ঘ রাঘব' নাটক রচনা হয়েছিল। নাট্যকারের নাম মুরারি মিশ্র। তিনি রচনাশৈলীর জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল– নাটকের মতো ওড়িশার বিভিন্ন স্থানকেও উপস্থাপিত করা যা বাল্মীকি রামায়ণের থেকে ভিন্নতর, বস্তুত সপ্তদশ শতাব্দীতে উপেন্দ্রভঞ্জ ছিলেন অবিসংবাদিত রূপে শেষ ওড়িয়া কবি। তার শব্দ যোজনার দক্ষতা তাঁকে ওড়িয়া সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি রূপে স্মরণীয় করে রেখেছে। শব্দালংকার প্রয়োগে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে 'কাব্য জাদুকর' নামে অভিহিত করা চলে। তিনি লিখেছেন—

'উপ ইন্দ্রভঞ্জ কুহে তেঁকি বেণি বাহুকু।
ধরাতলে কবি বলি নাহি মানে কাহাকু।
বালমীকি কালিদাস পদে শরণ।
আউসব কবিংকর মাথে চরণ।।'

দুইবাহু তুলে উপেন্দ্র ভঞ্জ বলেন, পৃথিবীতে কোনও কবিকে তিনি কবি বলে মনে করেন না, বাল্মীকি ও কালিদাসের পায়ে তিনি শরণপ্রার্থী। আর সব কবিদের মাথায় তিনি পদাঘাত করেন। অষ্টাদশ শতকে ওড়িশার কবি কৃষ্ণ শ্রীচন্দন কালিদাসের মেঘদূতকাব্যের অনুকরণে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন আর এক দূতকাব্য। কাব্যটিতে রামকথা সমাধির মাল্যবন্ত পর্বত থেকে রামের সংবাদ নিয়ে লঙ্কার অশোক কাননে মেঘ চলেছে সীতার কাছে।

ওড়িয়া সাহিত্যে যত বেশি রামকথা সম্পর্কিত কাব্যরচিত হয়েছে, তা অবশ্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কাব্য ছাড়া চৌতিশা, লীলা, যাত্রা, ভজন রীতিতেও রামকাহিনি বহু বিস্তৃত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হল রামায়ণ সাহিত্যের অনুবাদ। তবে কৃত্তিবাস অনুদিত "শ্রীরাম পাঁচালি' বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, এটি ভাবানুবাদ। মূল বিষয়কে অবলম্বন করে তার ওপর স্বকীয় চিন্তা ধারার বিনম্র আলোকপাত কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়েছিল। তাই মধুসূদন বলেছিলেন 'রামায়ণ পাঁচালির অমর কবি কৃত্তিবাস যথার্থই বাংলাদেশের কীর্তিবাস' অশিক্ষিত জনসাধারণের উপযোগী করে সহজ কবিত্বে রামকথা পরিবেশন করাই ছিল কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। কবি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, শুধু রামসীতার চরিত্রই নয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণে সমস্ত চরিত্রই বাঙালির প্রাণের রসে সিক্ত। তার সৃষ্ট দশরথ বাংলারই কোন এক স্ত্রৈণবৃদ্ধ। রাম একান্ত পত্নীগত দুর্বলস্বামী ("বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,/ভুলিতে না পারি সীতা সদামনে জাগে।") সীতা সহনশীলা ভক্তিমতি কুলবধূ, ভোজন বিলাসিতা (ক্ষীরনাড়ু, পাঁপড়, মোদক রাশিরাশি।/পাকা কাঁঠালের কোষ চুষি।) পারিবারিক ও নৈতিক আদর্শ সমস্তই রামায়ণে ফুটে উঠেছে। বাঙালির কলহ প্রবণতাও (হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ / যজ্ঞকুণ্ড ভরিতায় করিল প্রস্রাব) ধরা পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি হিসেবে চন্দ্রাবতীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা দ্বিজবংশীদাসের কন্যা। ছড়া পাঁচালির ছন্দে তিনি সংক্ষেপে রামকথা পরিবেশন করেছিলেন। সীতার ননদ কৈকেয়ীর কন্যা ককুয়ার প্রসঙ্গ এই কাব্যে আছে। রাবণের মাহাত্ম্য বর্ণনার দ্বারা কাব্যের সূচনা অনেকটা মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের মতো, এরপরে রয়েছে রামের জন্ম, সীতার বিবাহ, সীতার বারমাসী ইত্যাদি, কাহিনির মধ্যে কোনো পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি বলে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'এই রামায়ণ কথা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, অনুবাদ সাহিত্যের সমপর্যায়ে এর স্থান হতে পারে না।'

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম রামকাহিনির কথাকার অদ্ভুত আচার্য (নিত্যানন্দ আচার্য)। রাম ও রাবণকে নিয়ে নানা ধরণের অদ্ভুত কাহিনি অদ্ভুত রামায়ণে নিবেশিত আছে। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে সীতা রাবণের কন্যা। রাবণ শতমুণ্ডধারী, দশরথের কন্যা কৈকেয়ীর কথাও এখানে উল্লেখ আছে। এছাড়া সীতা কর্তৃক সহস্র শীর্ষ রাবণবধের কাহিনি রয়েছে। বাল্মীকির সাতকাণ্ডে যা নেই এমন সব উদ্ভট কাহিনি এই রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে। কবিকে রাম ব্রাহ্মণ বেশে কাব্য রচনার আদেশ দেন। বলে কবি তাঁর রচনায় উল্লেখ করেন—

রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত আচার্য নাম তাহার কারণ।

অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সভাকবি শঙ্কর কবিচন্দ্র 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ রচনা করেন। অনেকে মনে করেন কবিচন্দ্র তার উপাধি, আসল নাম শঙ্কর। অনেকের বিশ্বাস কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত কাহিনি রচনায় কবিচন্দ্রের হাত আছে। কবি কোনো কোনো স্থানে নিজের কাব্যকে রামলীলা বা শ্রীমঙ্গল নামে ভূষিত করেছেন। তার কাহিনির সঙ্গে অধ্যাত্ম রামায়ণের যোগ আছে। কবির কলমে হনুমানের অংশটি আনয়নের চিত্রটি বেশউল্লেখযোগ্য—

'মুনি কহে কল্পে কল্পে রাম অবতার।
যতেক অঙ্গুরী দেয় সকলি তাহার।
শুনি হনু মনে মনে প্রত্যয় হইল।
মুনির প্রণাম করি অগুরি এক নিল।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মকে যুক্ত করে জগৎ রাম 'জগদ্রামী রামায়ণ' রচনা করেন। তাঁর রামকথার মধ্যে অদ্ভুতরামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণ সম্মিলিতভাবে ধরা পড়েছে। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে তারা ও সুগ্রীবে উপাখ্যান প্রসঙ্গে লেখেন—

'তারা নামে নারী হইল, সুগ্রীব মহিষী।
সুগ্রীবের কৈলা দূর দুর্গতির রাশি।'

এছাড়া দাশরথি রায় পাঁচালির ঢঙে রামায়ণ রচনা করেন। আর এই ধারার শেষ কবি রঘুনন্দন গোস্বামী, ১৮৩২ সালে 'রাম রসায়ণ' নামে রামকথা রচনা করেন।

ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রমুখ। এদের মধ্যে রামানন্দের শিষ্য নরহরিদাসের শিষ্য তুলসীদাস। তাঁর রচিত 'শ্রী রামচরিতমানস' হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম আকর। এই গ্রন্থে রাম লক্ষ্মণকে এক অনুপম বিশ্লেষণে ভূষিত করেছেন। দুই ভাই শ্যাম ও গৌরবর্ণ। বয়সে কিশোর, নেত্র সুখদায়ী ও বিশ্বচিত চোর—

'শ্যাম গৌর মৃদু বয়স কিশোরা।

লোচন সুখদ বিশ্বচিত চোরা।'

সর্বোপরি তিনি দেখান যে, একমাত্র রামনামই সত্যধর্মের পথ দেখায়—

'কলিযুগ লোগ না গহরনি গেয়ান
এক আধার রামগুণে গান।'

(কলিযুগে যাগযজ্ঞ ও কিংবা জ্ঞানের সাধনাতেও মোক্ষলাভ হয় না, কেবলমাত্র রামের গুণগান করাই মোক্ষপথের দিশারী)।

মারাঠি রামায়ণে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন একনাথ স্বামী (১৩৪৮-৯৯)। তিনিই প্রথম রামকথা অবলম্বনে 'ভাবার্থ রামায়ণ' রচনা করেন। একনাথের দৌহিত্র মুক্তেশ্বর রামায়ণের কাহিনি মারাঠি ভাষায় উপস্থাপন করেন।

তামিল রামায়ণের কথা উঠলে প্রথমে যার নাম উঠে আসেন তিনি হলেন, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৃতীয় কুলোতুঙ্গ চোল-এর রাজসভার সভাকবি কম্বন। বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে তিনি 'কম্ব রামায়ণ' বা রামকতাই রচনা করেন। কম্ব রামায়ণের আগে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বিভক্ত আলোয়ার সম্প্রদায় এবং শৈব নয়নার সম্প্রদায়ের কবিরা রামকাহিনিকে তাদের রচনার মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলেন। আলোয়ারের সম্প্রদায়ের পেরিয়ালওয়ার, কুলশেখর, থিরুমঙ্গই প্রমুখ কবিরা রামায়ণ কাহিনিকে নিজেদের কল্পনায় নতুন করে উপস্থাপন করেছেন।

তেলেগু রামায়ণের উল্লেখযোগ্য রামায়ণ গ্রন্থ সমূহ হল—'রঙ্গনাথ রামায়ণ' (১২৪০ খ্রিস্টাব্দ), 'ভাস্কর রামায়ণ' (ত্রয়োদশ শতক), 'মোল্ল রামায়ণ' (মোল্ল নামে মহিলা কবি চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে রচনা করেন। এবং 'বরাজু রামায়ণ' পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রূপে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ভাস্কর রামায়ণ ও মোল্ল রামায়ণ চম্পুরীতির গদ্য পদ্য সমাহারে রচিত; অন্য রামায়ণগুলি দ্বিপদীছন্দের কাব্য।

মালয়ালম ভাষায় রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম এঝুত্তচ্ছন (১৬ শতক) চিরামন (দ্বাদশ শতক), পূনম নাম্বুদিরি প্রমুখ। তুস চাটু এঝুত্তচ্ছন শুধু কবি ছিলেন না। ছিলেন দার্শনিক এবং সমাজ সংস্কারে অগ্রণী। অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদ করে তিনি মালয়ালাম সাহিত্যে যেমন রামকথার প্রসার ঘটান, তেমনি সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার সৃষ্টি প্রতিভার কাছে সমগ্র মালয়ালম সাহিত্যই ঋণী। তিনি গ্রন্থ সৃষ্টির পাশাপাশি কিলিপাটু নামে একটি কাব্য ছন্দ সৃষ্টি করে কবিতার ভাষাকেও সমৃদ্ধ করেছেন।

চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রামায়ণ সৃষ্টি হয়েছিল আদিতে নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র ছিল ক্ষত্রিয় যুবক। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্ষত্রিয় যুবককে ভগবান বিষ্ণুর অবতারে পরিণত করা হল; ফলে রামচন্দ্র জনমানসে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত। দেবভাষা সমাজের সবক্ষেত্রে প্রচলিত না হওয়ার জন্য অনুবাদের প্রয়োজন হল।

নবম-একাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম রচিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। এরপরে মূল চরিত্রগুলো ঠিক রেখে, কোথাও কোথাও পরিবর্তন করে এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি রামায়ণের মধ্যে আগমন ঘটে রামকথা প্রচার হতে থাকল, ফলে রামায়ণ কাহিনি পাঠকের মনোরঞ্জন করল। সেইসাথে রামকথার বিচিত্র বিপুল ভুবনকেই আমাদের মোহিত করায়।

তথ্যসূত্র:

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ), আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০১৭।
২. সুধীরকুমার করণ, রামায়ণের বিশ্বায়ন, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১২।
৩. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৭।
৪. রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাভা-যাত্রীর পত্র, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৩৯২।

‘দূর থেকে দেখা’ উপন্যাস : গ্রাম ও নগরজীবনের দ্বন্দ্বের আলোয়

রাম কোনাই
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী স্বনামধন্য কথাকার অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯)। দেশভাগের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন তা লেখককে প্রভাবিত করেছিল। ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যের দুটি দিক আমরা লক্ষ্য করি। একদিকে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বচিন্তা যা বিমল কর জগদীশ গুপ্তের রচনায় বর্তমান, অন্যদিকে সাধারণ বিষয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সূক্ষ্ম বর্ণনা। যা আমরা মহাশ্বেতা দেবীর কলমে ফুটে উঠতে দেখি আর এই পথেই হেঁটেছেন দেবেশ রায়, অসীম রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমূখ কথাসাহিত্যিকরা। এই সময় দেখা দেয় হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, নিম সাহিত্য আন্দোলন, শাস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন। বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা থেকে গ্রাম ও নগরজীবনের চিত্র দেখা যায়। গাছ, পাখি, পুকুর, মাটির ঘর, চাষ আবাদে ঘেরা গ্রামজীবনে দেশভাগের পরে ইট, বালি, পাথরে সম্পন্ন নগরের প্রভাব পড়তে শুরু করে। লেখক এর রচনার শুরু খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত ‘কিশোর-কিশোরী’ পত্রিকায় ১৯৪৮ সালে ‘ইতিহাস’ নামক গল্প দিয়ে। তিনি সারাজীবনে মাত্র নয়টি উপন্যাস লিখেছেন। সব উপন্যাসে যে গ্রামজীবন ও নগরজীবনের চিত্র উঠে এসেছে এমন নয়। তবে তার লেখা ‘দূর থেকে দেখা’ উপন্যাসে গ্রাম ও নগরজীবনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ঔপন্যাসিক অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘দূর থেকে দেখা’ উপন্যাসটি নিয়ে কোন লেখায় এখনও চোখে পড়েনি, তাই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: অর্থনৈতিক সংকট, রাজনীতি, শোষণ, সাম্য, সংস্কার, দ্বন্দ্ব, মিলন, আন্তরিকতা।

প্রতিপাদ্য বিষয়

কথাসাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী লেখালেখির জগৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছোট ছোট গ্রামকে কেন্দ্র করে। অবশ্য তিনি কলকাতার আশপাশের নগরজীবনের সূক্ষ্ম রূপও তার সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। দেশভাগের পরে গ্রামে উচ্চবর্গদের শোষণ থেকে নিম্নবর্গের ছোট ছোট কারিগর, কৃষক ও বিভিন্ন শিল্পীরা দিনাতিপাত করার যে অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগেছেন সেই চিত্র তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখায়। এরকমই একটা শিল্পীর জীবন নিয়ে লেখক রচনা করেছেন তার এই উপন্যাসটি। আর এই অর্থনৈতিক সমস্যার কারণেই একাধিক পরিবার গ্রাম থেকে নগরে উঠে এসেছে জীবন শান্তিতে কাটানোর জন্য। ঠিক এমনই একটি পরিবার না হলেও পরিবারের অংশ থেকে বেড়িয়ে এসেছে ভবদেব ভড় স্ত্রী রেবা ও সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে। একটি ছেলের ছোট থেকে বিবাহ ও একটি বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত গ্রামজীবনে বড় হওয়া ও ঠিক তারপরেই নগর অভিমুখে যাত্রা। নগর বা শহরের জীবনচর্চা মূলত শিল্প নির্ভর। তাই গ্রাম থেকে শহরে আসবে বলে মনে যে আনন্দ ছিল সেই আনন্দ প্রথম প্রথম থাকলেও তিক্ততার জন্ম নেয় ধীরে ধীরে। তবে তারা পাট্‌লি গ্রামের তাঁতীপাড়া ছেড়ে আসতে চাইনি, সে

ভেবেছে যদি আজ তার মা বেঁচে থাকতো, তবে হয়তো বাবা বা দাদারা এভাবে তাকে বাড়ি থেকে আসতে দিত না। এই রকম নানান চিন্তা নির্ণয় করে দেয় তৎকালীন পারিবারিক ভাঙনের চিত্র। গ্রামজীবনে সুখ থাকলেও কলকাতায় এসে মনে শান্তি নেই। কাজের লোক চিত্ত হয়তো সব করে দিচ্ছে, তবে তার টাকার লোভ। নগরজীবন টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না। ভবদেবের বারবার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে বাবা বসন্ত ভর ও দাদার সঙ্গে তাঁত বোনার কথা। আবার বাবা বা দাদাদের চাওয়াতেই সে কলকাতার কলেজে পড়াশোনা করেছে। নগরে প্রথমে এসে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঠিকঠাক বইও কিনতে পারেনি, তবুও জীবন চলেছে; হয়তো এভাবেই জীবন চলে যায়। সে বি. কম. পাস করেছে অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স নিয়ে। তারপর নিজে টাকা রোজগার করে গ্রামে বাড়ি করেছে। তবুও তাকে নগরে আসতে হয়েছে স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে। এখানে এসে স্ত্রী রেবার সঙ্গে কলহ—

> "বেবার গলা চড়ছে এবং বিপদ— বড়োলোকের বেটি মুখ খুললে ভবদেবের সাধ্যি নেই সামলায়। মগজের মধ্যে একটা চাপ। চাপটা একা একা সামলাতে হচ্ছে তাকে। এখানে কোথাও তার কোনো সহধর্মিনী বা বন্ধু কেউ নেই।"[১]

কারণ রেবার বাবা তন্তুবায় হলেও পণ হিসাবে আলমারি, খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা, ঘড়ি, সাইকেল, কুড়ি ভরি সোনা ছাড়াও তিন হাজার নগদ টাকা দিয়েছে। কিন্তু ভবদেবের বাবা ও দাদা তা আত্মসাৎ করলেও ভবদেব কিছু বলতে পারেনি এইজন্যই রেবার বিদ্বেষ চরমে। এই থেকেই আমরা বুঝতে পারছি গ্রামে পণপ্রথা বিলুপ্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'দেনাপাওনা' গল্পে পণপ্রথার বিরুদ্ধাচারণ করলেও আজও তা সমানেই রয়ে গেছে। গ্রাম-শহরের টানাপোড়েন নিয়ে ভবদেবের মানসিক শান্তি উঠে গেছে জীবন থেকে। তিনি কী আদৌ ভালো আছেন? যদি ভালো থাকতেন, তবে হয়তো পুরনো স্মৃতিগুলি তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেত না। গ্রামের মানুষের অসহায়তা, তারা ভাবে শহরে গিয়ে শান্তি, কিন্তু আদৌ কি শান্তি আছে শহরে? আসলে তারা মালিক মহাজনদের শোষণ, সারা বছর অভাব অনটন এর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। আর এই মুক্তির খোঁজেই তারা জড়িয়ে পড়ে আর এক বন্ধনে।

ভবদেব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। তাই সে তার বাবা বা দাদার দোষ ধরে না। যদি সে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হতো, তবে হয়তো পরিবারের সঙ্গে ঝামেলা করে নিজে শহরাভিমুখী না হয়ে নিজ প্রাপ্য বুঝে নিত কিন্তু সে জানে—

> "বাপ বসন্ত ভড় বড়ো শান্ত মানুষ। কারো সাতে-পাঁচে নেই গোছের নির্জীব। একাশি মেটেঘরটা মাথার ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেও নতুন করে ঘর ছাইবার মাজার জোর নেই যার, মাত্র তিন বিঘে জমিতে চাষের চালের ভাত ওঠে না সম্বৎসরের। গাইগোরুর গোঁজের দড়ি যেমন, সুতোর জন্যে মাথাটা বাঁধা থাকে রমাপদ হালদারের গদিতে।"[২]

রমাপদ হালদার পাট্‌লি গ্রামের তাঁতিদের মহাজন। সে গরিবের রক্ত শুষে নিচ্ছে। তৎকালীন সময়ে গ্রামের তাঁতশিল্পীরা কিভাবে মহাজনদের কাছে হেনস্থা হতো ও মহাজনদের দ্বারা শোষিত-পীড়িত-লাঞ্ছিত হতো সেই চিত্রই উঠে এসেছে। এই কাজ যেন ছেলেকে না করতে হয় সে কথা ভেবেই ভবদেবকে শহরে পাঠিয়ে পড়াশোনা করিয়েছেন তার বাবা। সব বাবা-মার ইচ্ছা থাকে ছেলে বড় হোক জীবনে উন্নতি করুক ভবদেবও শিক্ষিত হয়েছে। ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে। বিবাহ করেছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই। সর্বদা দ্বন্দ্বে ভুগেছে। না পেরেছে কাউকে বলতে না পেরেছে নিজেকে বোঝাতে। গ্রামের মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন যেমন আছে হিংসাও

কম নেই। বসন্ত ভর ভালোভাবে বাড়ি করলে সেটা যেমন লোকের চোখে লাগে, ঠিক তেমনি তারা গ্রামের মহাজনদের বাদ দিয়ে কাঁচা টাকার লোভে অন্য মহাজনদের তাঁত বুনতে গেলেও শুরু হয়ে যায় রাজনীতি ও দ্বন্দ্ব। কিন্তু তারা মিলিত হয়ে লড়তে জানে। সমাজের বাইরে কেউ কথা বললে তাকে মানিয়ে নিতে জানে। শহরে এসে ভবদেব একাকিত্বে দগ্ধ হতে বাধ্য হয়। তার বারবার মনে ভেসে ওঠে গ্রামের চিত্র—

> "পাট্‌লি গাঁয়েও কি এখন এই একই রোদ্দুর! ভাবনার ভারে যখন মগজটা অস্থির, চড়চড়ে রোদ্দুরে চাঁদি ফাটছে, গনগনে তেজে চোখের পাতায় গাছপালায় স্নিগ্ধ শান্ত গাঁয়ের ছবিটা মোলায়েম মলম।"[৩]

লেখক তৎকালীন সমাজের রূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামজীবন কীভাবে নগরাভিমুখী হচ্ছে তার সার্থক দৃষ্টান্ত। ভবদেব মানসিক দ্বন্দ্বে থাকলেও রেবা কী দ্বন্দ্বে ভুগছে? মনে হয় সে শহরে এসে একটু হলেও খুশি।

উপন্যাসের নায়ক ভবদের গ্রামে টিউশনি পড়িয়ে রাতের স্কুলে পড়াশোনা চালিয়েছে কলকাতায়। কলকাতায় তার সঙ্গ দিয়েছে গ্রামের দাদা মিহির। রেবা কলকাতার ভাড়া বাড়িতে এসে নিজেদের বড় অট্টালিকার স্বপ্নে বিভোর। সে ভুলে যায় তার স্বামী ব্যাঙ্কে যে চাকরি করে তাতে তাদের ভালোভাবে চলবে তার বেশি না। আবার ভবদেব ব্যাঙ্কে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজ করার কথা ভাবে। এখানে অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র স্পষ্ট। উপন্যাসটি সত্তর দশকের শেষপ্রান্তে রচিত। লেখক এই সময় যে বিষয়গুলি রচনা করছেন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৎকালীন বাস্তব রূপকে খুব সুনিপুণভাবে বর্ণনা করছেন। লেখক 'বৃষ্টির দিনে' গল্পেও তাঁতির ছেলের কলকাতার কলেজে পড়াশোনার কথা শোনান। তৎকালীন সময়ে তাঁতির ছেলে তাঁতি বা কৃষকের ছেলে কৃষক হবে এই চিন্তায় সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের বদল তিনি স্বেচ্ছায় দেখাচ্ছেন। তিনি মানুষের এগিয়ে যাওয়ার কথায় বলেন। তাই তিনি তাঁতির ছেলেকে ব্যাঙ্কের কর্মী করে অঙ্কন করেছেন। চিত্ত চরিত্রটি ব্যাঙ্কের কর্মী ভবদেবের বাড়ির আনাচে-কানাচে বা রেবার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার কথা ভাবে।

শহরে এসে বাড়ি থেকে সে বেরিয়েছে শান্তির খোঁজে। শহরে শান্তি নেই। নির্জনতা নেই। আছে মানুষের কোলাহল। যে বাবা আজ তাকে শহরে আসতে বাধ্য করেছে সেও একদিন ছেলেকে ভালোবেসেছে। তার মায়ের মুখে সে শুনেছে—

> "ভবদেবের মনে হল তার একটা বাপ ছিল একদিন। অন্য বাপ। বি.এ. পাসের পর সে চিঠি লিখেছিল কলকাতা থেকে। সেই চিঠি বর্ষার জলবাতাসের সঙ্গে মিশে উথালপাথাল করেছিল গোটা তাঁতিপাড়া। ঘটনাটা সে ছেঁড়াছেঁড়া শুনেছিল মায়ের কাছে, বাপও বলেছিল কিছুটা। বাদবাকি আর সব লালু নেতাই খুড়ো পড়শির মুখে।"[৪]

এমনকি ছেলে যদি শহর থেকে ফিরে না আসে এই কথা ভেবে বসন্ত ভর কষ্ট পেয়েছে। লেখক কলকাতা শহরকে মানুষ খেকো রাক্ষসীর সঙ্গে তুলনা করেছে। কারণ যারা কলকাতায় গেছে তারা নাকি আর গ্রামে ফেরে না। সত্যিই কি তাই? আমাদের প্রশ্ন জাগে। আসলে কল্লোলিনী তিলোত্তমা সকলকে বশ করতে পারেনা, তার মায়ায় ভোলাতে পারেনা। যদি পারতো, তবে ভবদেব আজ দ্বন্দ্বে ভুগত না। শহরে এসেই যেন তার জীবনটা তেতো হয়ে গেছে। কোলাহল মুখর শহরে যেন গ্রামের শান্ত মনোরম আলো বাতাস নেই। লেখক কী নগর সচেতন মানুষের

মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছেন? গ্রাম-শহরের টানাপোড়েনে ভবদেব তাঁতের শানের মাকু। তাকে এদিক থেকেও দগ্ধ হতে হচ্ছে আবার ওদিকেও তার স্বস্তি নেই।

ভবদেবের গ্রামের প্রতি পরিবারের অর্থাৎ বাবা দাদার প্রতি ভালোবাসা বোঝা যায় যেদিন শহরে চলে আসবে তার আগের দিনে রাত্রে—

> "সেদিন রাত্তিরে ছাদের কার্নিশে বসে একা একা কেঁদেছিল ভবদেব। মস্ত আকাশ জুড়ে অগুন্তি তারা। একটি বিশেষ নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে হিজিবিজি নানান কথা ভাবতে ভাবতে একটু অমনোযোগে নক্ষত্রটা কোথায় হারিয়ে যায়। খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও।"[৫]

কেউ বোঝেনি তাকে। হয়তো কেউ বোঝেনা তাদের যারা পরিবারের মানুষ কে ভালো রাখতে সব শেষকরেও আজ পরবাসী। তবু বেঁচে থাকতে হয়। সে আশাবাদী—

> "অস্থির দাপাদাপিতে ভয়ঙ্কর শপথ। টাকা চাই। অনেক টাকা। পুকুরপাড়ে জলে কাদায় শ্রাদ্ধের বৃষকাঠ বুড়ো বাপ নিজেই যদি পিণ্ড চায়, পিণ্ড দেবে সে। কব্জির কত জোর ওদের বাপব্যাটার! একজোড়া তাঁতের! বাপঠাকুদ্দার গাঁয়ে আবার সে জমি কিনবে একা- বাস্তুজমি, ধানী জমি, চড়ার জমি সব। নতুন করে বসতবাটি।"[৬]

তার এই জেদ কী পারবে তাকে পুনরায় গ্রামে নতুন করে জীবন শুরু করাতে? শহরের প্রতি তার যে ভালোবাসা নেই তা নয়, কিন্তু গ্রামের প্রতি ভালোবাসা ও বাবা-দাদার প্রতি অভিমান এবং পরবর্তীতে আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসার বাসনা— সবমিলিয়ে উপন্যাসটিতে গ্রাম ও নগরজীবনের দ্বন্দের বর্ণনা করেছেন লেখক। প্রশ্ন থেকেই যায় ভবদেবরা যদি গ্রামে আবার ফিরে আসে, তাহলে কী তারা শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে নাকি পুনরায় নগরজীবনে ফিরে যাওয়ার কথা ভাববে?

তথ্যসূত্র:

১। অগ্রন্থিত অমলেন্দু, বৈভাষিক, হুগলী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০২৪, পৃষ্ঠা ২৫।
২। ঐ, পৃষ্ঠা ২০।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা ২৯।
৪। ঐ।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা৭৩।
৬। ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬।

গৌণ ধর্মাচরণে যৌনতা : কর্তাভজা সম্প্রদায় ও উনিশ শতকের নৈতিকতা

সেন্টু কোনাই
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাপবাগ, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক বাংলায় যে সকল গৌণধর্ম গুলি ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করেছিল, বর্তমানে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয়। একাধিক গৌণধর্ম তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেও কর্তাভজা সম্প্রদায় আজও সমাজের প্রান্তিক মানুষের বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হয়ে আছে। গৌণধর্ম গুলিতে পাশ্চাত্যের রিলিজিয়ন (Religion)- এর মানদন্ডে যা অশুভ ও অনৈতিক গৌণধর্মের সংস্কৃতিতে অনেক ক্ষেত্রেই তা গৃহীত হয়েছে। যৌনতা গৌণধর্ম গুলির একটি অন্যতম উপাদান। ধর্ম সাধনায় যৌনতার ব্যবহারিক প্রয়োগ এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাদের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের কাছে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। কর্তাভজাদের বিশ্বাসও ঔপনিবেশিক বাংলায় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কাছে ভিক্টোরিয়ান নীতিবোধের বেড়াজালে আটকে গিয়েছে অশ্লীল বলে। নেমে এসেছে বিভিন্ন অভিযোগের তীর্যক বাণ। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা রাষ্ট্র নির্মিত নৈতিকতায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনায় নেমে এসেছে সামাজিক নিন্দা ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল। কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্তের সঙ্গে যুক্ত যৌনতার ব্যবহার ও তার প্রতি নিন্দা ও নিয়ন্ত্রণের ইতিহাসই এই আলোচনা মূল বিষয়।
সূচক শব্দ: গৌণধর্ম, কর্তাভজা, জ্যান্তে মরা, অশ্লীল।

মূল আলোচনা:

ঔপনিবেশিক বাংলায় যে সকল গৌণ ধর্মের সঙ্গে দেহতত্ত্ব বা যৌন আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত ছিল, কর্তাভজা সম্প্রদায় তাদের মধ্যে একটি। আউলচাঁদ ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি ছিলেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে উলা বা বীরনগর গ্রামে আউলচাঁদকে মাঠের মাঝে মহাদেব বারুই নামে এক ব্যক্তি পানের বরজ-এ কুঁড়িয়ে পান। পরে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি গৃহ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন এবং সম্ভবত ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত হন।[১] আউলচাঁদের উদার ধর্মনীতি প্রবর্তনের পিছনে সুফি সিলসিলা কাদেরী সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল বলে রমাকান্ত চক্রবর্তীমনে করেন।[২] কিন্তু কর্তাভজা সম্প্রদায়ের খ্যাতি তাঁর শিষ্য রামশরণ পাল ও রামশরণ পালের স্ত্রী সতী মায়ের মাধ্যমে ছড়িয়েছে। কীভাবে রামশরণ পাল ও আউলচাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে এবং কখনই বা এই ঘটনা ঘটে - সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। মনু লাল মিশ্র উল্লেখ করেছেন যে, ১১৬০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুন অন্ধকূপ হত্যার সময় আউলচাঁদের সঙ্গে রামশরণ পালের সাক্ষাৎ ঘটে।[৩] আউলচাঁদ রামশরণ পালসহ ২২ জন শিষ্যকে একসঙ্গে তাঁর ধর্মমতে দীক্ষা দেন। রামশরণের স্ত্রী সরস্বতী দেবী এক অজ্ঞাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। আউলচাঁদের সঙ্গে সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎ হলে আউলচাঁদ ক্ষতস্থানে ঘোষপাড়ার একটি পুকুরের কাদামাটি ডালিম গাছের তলায় বসে প্রলেপ দিলে সরস্বতী দেবী ব্যাধি মুক্ত হন। ফলে সেই ডালিম গাছ এবং সেই পুকুরের জল আউলচাঁদের অনুগামীদের মধ্যে পূজনীয় ও দর্শনীয় স্থান হয়ে ওঠে। সরস্বতী দেবী পরিণত হন

'*সতীমা*- এ। ঘোষপাড়া হয়ে ওঠে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। এই সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজার পাশাপাশি '*ঘোষপাড়ার ধর্ম*', '*সহজ ধর্ম*', '*একমনি ধর্ম*' বা '*সত্য ধর্ম*'প্রভৃতি। সত্য ধর্ম প্রসঙ্গে মনু লাল মিশ্র লিখেছেন- *"সহজ ধর্ম্ম কি?.... যাহাতে দ্বৈত জ্ঞান নাহি, অর্থাৎ সকলেই এক কৃপাময় পরম পুরুষের ভক্ত ও আগ্রাবহ সেবক... অথচ কোন ধর্মেই বিদ্বেষ ভাব জন্মায় না বা তাহা মিথ্যা এ ধারণাও করিয়া দেন না তাহাই সত্য ধর্ম্ম"*[৪]রামশরণ পালের অধস্তন গোপালকৃষ্ণ পাল তাঁদের ধর্ম প্রসঙ্গে একসময় বলেছিলেন- *"Ours is not a Gurushipping sect, as some have taken it to be.... the term 'Guru' and 'Sishya' as never employed among us; on the contrary, the words used are 'Mahashya' and 'Varati.'"*[৫]

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুরা তাঁদের শিষ্য বা বরাতীদের প্রারম্ভিক পর্বেই কিন্তু এই ধর্মে দীক্ষা দেননা। গুরু যখন মনে করেন যে, তাঁর শিষ্যের মন এই ধর্ম বা পথ অনুসরণ করার জন্য পরিপূর্ণ তখনই তাকে পুরোপুরি দীক্ষা দেওয়া হয়। আউলচাঁদ তাঁর অনুগামীদের জন্য '*ব্যবহার*' ও '*পরমার্থ*' নামক রীতি চালু করেন। ব্যবহার বা সামাজিক আচরণ ও পরমার্থ বা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনা আসে মন্ত্রের মাধ্যমে, যা সকলের পক্ষে অনুসরণ করা কষ্ট ও ধৈর্য্য সাপেক্ষ। ফলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে গড়ে ওঠে চারটি আদর্শ-*প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধি* এবং *নিবৃত্তি* নামক প্রথা। পরে এই চারটি সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয় চারটি দক্ষতা বা পারদর্শিতা। এগুলি হল- *সাধু, সতী, সুরা* এবং *মহৎ।* এগুলির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে প্রবর্তক- *সাধু, সাধক- সতী, সিদ্ধি-সুরা* এবং *নিবৃত্তি- মহৎ*- এর ধারণা।[৬]প্রবর্তক বলতে কর্তাভজা ধর্মমতে দীক্ষিত নতুন শিষ্যকে বোঝানো হয়। নবাগত শিষ্যের পরবর্তী স্তর সাধক।এই স্তরেই সাধক মিলিত হয় নারী সঙ্গিনীর সঙ্গে। পরবর্তী স্তরের সাধক উত্তীর্ণ হয় সিদ্ধিতে। এই স্তরে সাধক পরিণত হয় '*জীবন্তে মরা*' অবস্থায়। নারী সঙ্গিনীর মাধ্যমে সাধক নিজেকে এই স্তরেই নিয়ে যায়, যে স্তর আনন্দধামের সমতুল্য। সে নিজের বাহ্যিক সত্তাকে হারিয়ে পরিণত হয় অসীম সত্তায় এবং এই অবস্থায় পৌঁছতে হলে নারী দেহ সাধনা অবলম্বন করতে হয়। সাধকের নিজের বাহ্যিক লিঙ্গচেতনা লুপ্ত হয় এই পর্বে। সাধক নিজেকে ভাবতে থাকে কখনো নারী, কখনো পুরুষ। বাইনারি লিঙ্গ বিভাজনের জটিল তত্ত্ব এই পর্বে লুপ্ত হয়। সাধক নিজেকে প্রকৃতি বা নারী চেতনার মাধ্যমে ভাবিত করে পরমাত্মার অংশ হতে চাই। সুফিগণ এই স্তরের নাম দিয়েছেন '*ফণা*'। শশীভূষণ দাশগুপ্ত এই স্তর সম্পর্কে লিখেছেন- .... at a certain stage of spiritual culture the man should transform himself into woman and remember that he cannot have experienced of love so long he cannot realize the nature of women in him.[৭] সহজিয়াদের অনেকগুলি গানেও এই অবস্থার কথা বলা হয়েছে- *" পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে/ এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে"*, কিংবা *"স্বভাব প্রকৃতি হইলে তব রাগরতি"*[৮] এই কাম-গন্ধহীন জিতেন্দ্র অবস্থাকে কর্তাভজারা প্রকৃতি হয়ে প্রকৃতি সাধনা বলে উল্লেখ করেছেন। '*নারী হিজড়ে পুরুষ খোজা তবে হবি কর্তাভজা*' - প্রবাদটিও এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে। এ অবস্থাকে তারা বলেন '*জ্যান্তে মরা*' বা '*সর্বতো সহজাবস্থা*', যেখানে প্রকৃতি-পুরুষ সম্মেলনেও সাধক মরার মত নিষ্কাম থাকেন। এই অবস্থায় কাম প্রেমের অতীন্দ্রিয় ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয় এবং সাধকের সেখানে অটল বা মরার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।[৯] সুতরাং সাধকদের নারী সাধনার মাধ্যমে সাধনার বিভিন্ন স্তরকে অতিক্রম করে নিজের লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটিয়ে এক চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়ে অসীম আনন্দ লাভ চরম লক্ষ্য।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির মূল আকর গ্রন্থ '*ভাবের গীত*'। ভাবের গীতের একাধিক গানে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধকদের দেহ সাধনার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই দেহ সাধনার উদ্দেশ্য কিন্তু কখনই কাম চরিতার্থ নয়, বরং ইন্দ্রিয় বা দেহভোগের মাধ্যমে মানবদেহের রিপু বা কামকে পরাজয় করাই হল এর উদ্দেশ্য। একটি গীতে এই দার্শনিক সত্যটি ব্যক্ত হয়েছে-

"রিপু ছয় ইন্দ্রিয় দশ আছে ষোলজনা,
ইহাদের কথাতে ভুলো না
যেন বস্তু হারায়ো না।...
লাললশী রচে ফেলে ক্ষীর বেছে খাও"।[১০]

ছয়টি রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য আর দশটি ইন্দ্রিয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বাএবং ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদগুচ্ছ, লিঙ্গ, মুখ বা দাঁত পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে মানুষ সমস্ত ধরনের অশুভ কাজে লিপ্ত হয়। যদি এই ছয় রিপু এবং দশটি ইন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবেই মানুষ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নিজেকে মুক্ত সত্তা হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। রিপু এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে ত্যাগ করে নয়, বরং তাদের কে জয় করেই এই পথে পৌঁছাতে হয়। যার জন্য সাধককে প্রারম্ভিক পর্বে যৌনক্রিয়ায় সাধন সঙ্গিনীর সঙ্গে দেহ মিলনে লিপ্ত হতে হয়। বাউলদের যে মানুষ সাধনা তার প্রতিফলন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। মানুষ ভজনা অত্যন্ত জটিল এবং সাধারণ মানুষের খুব সহজেই বোধগম্য নয়। আমরা যারা পাঠক বা এই সম্প্রদায়ের অনুগামী নয়, তাদের পক্ষে এই ক্রিয়া-কলাপ অত্যন্ত রহস্যময় এবং অশ্লীল মনে হতে পারে। ফলে তাদের ধর্ম সাধনা সম্পর্কে সমাজের অন্যান্য বর্গের মানুষদের থেকে কাছে সমালোচনার তির্যক বাণ আসাটাই স্বাভাবিক।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলার একাধিক পত্রপত্রিকায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কঠোর এবং অসহিষ্ণু মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে সোমপ্রকাশ পত্রিকা লিখেছে- *"এবৎসর দোলে প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই; পুরুষ- দিগের সকলেই প্রায় মুর্খ"।*[১১] কর্তাভজাদের দেহ সাধনার প্রতি উচ্চবিত্তদের আক্রমণের লক্ষ্য হলেও এই সমালোচনার কারণ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুগামীদের ব্যাপকতা। সম্পাদক লিখছেন যে, এই একশো বছরে কর্তভজা সম্প্রদায়ের অনুগামীর সংখ্যা কম করেও এক লক্ষ-এ পরিণত হয়েছে।[১২] শিক্ষিত শ্রেণীর এই মনোভাবের পিছনে আরেকটি কারণ আছে। নারীর যৌন স্বাধীনতার বিষয়টি তৎকালীন সমাজে অকল্পনীয় ছিল। তার বিপরীতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুগামী নারীর নিজস্ব যৌন অধিকারও ছিল। এ কারণেই হয়তো নারীর যৌনতার অধিকার সম্পর্কে সচেতন কর্তাভজা সম্প্রদায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে কদর্য হয়ে উঠেছে। সম্পাদক নারীর স্বতন্ত্রতা কীভাবে নারীকে স্বেচ্ছাচারিনী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন -*"যে সমাজে স্ত্রী লোকেরা লজ্জা ও কুলভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় না, সেই সমাজের সেই স্ত্রী লোকেরা এক "কর্ত্তা"র অনুরোধে বহুসংখ্য অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না!! এক একটি পুরুষের নিকটে গড়ে ৪/৫ টী করিয়া যুবতী বসে আছে!!"*[১৩] নারীর যৌন স্বাধীনতা বাঙালি শিক্ষিতদের ভাবাবেগ এবং মনোভাবকে সবথেকে বেশি আঘাত করেছিল এই ধর্ম। অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ নিম্নবর্গের মানুষদের তাই সভ্য করার জন্য ইংরেজি

শিক্ষিত সমাজের ধর্জাধারীরা পাশ্চাত্যের নীতিমালার অদৃশ্য দন্ডবিধি নিয়ে এই গৌণ ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুলেছে। এ ধর্মের সাধকদের মধ্যে সাধনার সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটলে তা তুলে ধরা হয়েছে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে। ধর্মের নামে ব্যভিচার বর্ণনা করে সোমপ্রকাশ উল্লেখ করেছে- *"আমাদিগের সংবাদদাতা.... একটি দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। .... বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরবাবু একটি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাহার চতুর্দিকে বসিয়া কেহ পদ সেবা করিতেছে। কেহ গা টিপিয়া দিতেছেন, কেহ মুখে আহার দ্রব্য প্রদান করিতেছে, কেহ বা অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা গলদেশে পুষ্প মাল্য পরাইয়া দিতেছে। আমরাও অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি এ ধর্মাবলম্বিদিগের মধ্যে স্ত্রী বৃন্দাবনের প্রকৃত কৃষ্ণ লীলাটাই অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন কর্ত্তা কুল বালাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করেন, রমনীরা করযোড় করিয়া বৃক্ষ তল হইতে ইহা প্রার্থনা করিয়া লয়... অনুমান হইতেছে অনেক দুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও স্বার্থসিদ্ধির আশ্রয়ে ঐদলের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকেন"*।[১৪] বান্ধব পত্রিকাতেও এই সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণের সুর লক্ষ্য করা যায়-*"কর্ত্তাভজাদিগের মতে পরস্ত্রী সংসর্গ পাপ নহে। তাহারা বলে কর্ত্তা সকলের পিতা আমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী, কেউই আমাদের পর নাই, সুতরাং পরস্ত্রী পর পুরুষ এক কথায় কোন অর্থই নাই। পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীতে স্ত্রীতে প্রেমে যেমন দোষ নাই, তখন স্ত্রী পুরুষে প্রেম কেন দোষাবহ হইবে?.."*[১৫] শোনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র পালের সময়ে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে ব্যভিচারী এবং অসৎ লোকদের প্রবেশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার দত্ত লিখেছেন- *"বোধ হয়, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল, কিন্তু তাহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ ব্যভিচার- দোষ তাঁহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে। সম্প্রদায়- প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়- দেষের ভুয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়েছেন এবং তাঁহারা স্ব-সম্প্রদায়ী লোকদিগকে ভাতৃ- ভগিনী সম্মোধন করিয়া থাকেন; কিন্তু এইরূপ আত্মীয়-বোধে পরস্পর একমাত্র সহবাসই তাঁহাদের সর্বনাশের হেতু হইয়া উঠেছে।"*[১৬] উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একই কথা নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেছেন- *"যদিও পরস্ত্রী গমন কি গমনের ইচ্ছা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্ম প্রবর্তকের সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ; কিন্তু এক্ষণে নরসেবা ও নারী সেবাই এই ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তাভজা দলের মধ্যে হিসাব করিলে তিনভাগের অধিক স্ত্রীলোক ও এক ভাগের ন্যূন পুরুষ। প্রাচীন মহাত্মাদিগের মহাবাক্যের বিপরীত এই সমস্ত নরনারী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম দিন দিন দুর্দশাপন্ন হইয়া আসিতেছে।"*[১৭]

হয়তো শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কাছে নারী সাধনা ব্যভিচার এবং কুকর্ম বলে মনে হয়েছে। এই ব্যভিচারী ক্রিয়াকলাপ সেই সময়ের সাধকদের মধ্যেও দেখা যেত, যা অনেক সময় সত্যিই ছিল। সামাজিক জটিল গণ্ডির মধ্যে যখন নারী পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত দেহ মিলন স্বাভাবিক ভাবেই অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ বলে গণ্য হত। অনেকেই তখন দেহলালসা চরিতার্থ করার জন্য এই সম্প্রদায়কে বেছে নিত তাদের হাতিয়ার হিসাবে যেখানে তারা নিজেদের যৌন বাসনা চরিতার্থ করত। এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় ঈশ্বর পালের সময় প্রশাসন যখন এই ব্যভিচারী দেহ সাধনকে আইনী নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার চেষ্টা করে। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *'বিশ্বকোষ'* নামক রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র পাল এবং কর্তাভজা অনুগামীরা যে কতটা ব্যভিচারী হয়েছিল সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন- *"ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদির মালিক হইয়া বহুদিন কর্তৃত্ব করেন। তাঁহার প্রথম কর্তৃত্বর সময়ে সম্প্রদায়ের অবস্থা পূর্ববৎই ছিল। অনন্তর কতকগুলি অসৎ লোকের কুসংসর্গে তাঁহার অসত্য বৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যের ঘটনায়*

ঘোষপাড়ার এক ঘর একেবারে ছারখার হইয়া গেল...। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বকীয় কর্মফল ভোগের জন্য হতমান ও হতশ্রী হইয়া কলিকাতার বড় জেলে কারাবাস পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল।"[১৮]ঈশ্বরচন্দ্র পাল সম্পর্কে একই কথা শোনা যায় ক্যালকাটা রিভিউ-এর একটি অংশে- "Ishwar Chandra Pal 'the present head of the sect' lives in the style of Rajah, is grandfather was a Guala or Keeper of Cows... about 20 years of age with them defending the doctrine of Pantheism. Some of their secret rites are the most disgustingly licentious description."[১৯]

আদৌও এই সম্প্রদায়ে এরকম কোন ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল কিনা তা সন্দেহের বিষয়। কেননা, তৎকালীন সময়ে যৌনতার ওপর যেভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়েছিল তার বিপরীতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে যেভাবে যৌনতার চর্চা পরিলক্ষিত হয়, তাতে সেই সময়ে সামাজিক গণ্ডির মধ্যে বসবাসকারী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে যৌনতা তাদের কাছে ব্যভিচার বলেই গণ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। আগেই আলোচনা করেছি যে, গুরুর কাছে শিষ্য যখন নিজেকে অর্পণ করে এবং সাধন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তখন তাঁদের দেহসাধনা বা যৌনাচার একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া হিসেবেই বিবেচিত হয়। সেখানে গুরুর কাছে একাধিক নারীর বসে থাকাটা অতি স্বাভাবিক বিষয়। এই স্বাভাবিক বিষয়টি এই ধর্মের আওতার বাইরে অবস্থানকারীদের কদাচার মনে হতে পারে। প্রমাণ হিসেবে দাশু রায়ের পাঁচালীর দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণিত একটি রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ছত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে *"বৈষ্ণবের আখড়ায় যাওয়াই ঠিক- না হয় কর্তাভজার দলে যাওয়াও মন্দ নহে- ইতি বিরহীগণের সিদ্ধান্ত।"* এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, যে সমস্ত যুবতী নারী তাদের প্রেম বা কামনা প্রেমিকের কাছে নিবেদনে ভয় পায় সামাজিক জটিলতার কারণে, তারাই এই বৈষ্ণব আখড়া অথবা কর্তাভজাদের দলে মিশে গিয়ে নিজেদের যৌনাচারকে পরিতৃপ্ত করার উপায় বলে মনে করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে যেভাবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ব্যভিচার ও অশ্লীলতার নিদর্শনকে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে মনে হয় কিছু সংখ্যক অসৎ চরিত্রের মানুষ তাদের অসৎ অভিপ্রায় চরিতার্থ করার জন্য এই সম্প্রদায়ের বরাতি হিসেবে যোগদান করে। কেননা, এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু বছর পরেই কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর গ্রন্থেও কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। তাঁর কাছে কর্তাভজা সম্প্রদায় এবং তাদের ধর্মাচরণ অত্যন্ত জঘন্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি লিখেছেন- *"এ দলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যাধিক্য। সেই কারণেই বোধহয় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারের স্রোত এত প্রবল। ...যদিও পরস্ত্রী গমন বা তৎচিন্তা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম প্রবর্ত্তকের সম্পূর্ণ বিধি বিরুদ্ধ তত্রাপি বহু সংখ্যক নরনারী সর্ব্বদা একত্রে বসবাস করায় এক্ষণে নরসেবা ও নারী সেবাই এ ধর্মের সর্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইছে।"*[২৫] রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর আনুগামীদের কর্তাভজাদের ছত্রছায়া থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। সাবধান বাণী দিয়ে বলেছেন- *"হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ....কি জান? মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগবান লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সেসব মেয়েমানুষদের কাছে আনাগোনা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া বড় পাপ। এরা সত্তা হরণ করে।"*[২০] রামকৃষ্ণ মনে করেন নারীসঙ্গ ত্যাগ করলেই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। অথচ কর্তাভজাদের বিশ্বাসে ঈশ্বর লাভ নারীর সঙ্গে মিলনেই সম্ভব। দেহ সাধনায় যুক্ত গৌণধর্ম গুলি এই বিশ্বাসেই স্বতন্ত্র, যাদেরকে অনুধাবন করার জন্য তাদের সাধন প্রণালীকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আচরণকে ব্যভিচার বলার প্রবণতা এখানেই শেষ নয়।

তৎকালীন সময়ে গোঁড়া মুসলিম মৌলবীদের দ্বারা জারি করা একটি ফতোয়ায় বলা হয়েছে - "*ইহার আনুষঙ্গিক আরও বহুতর মত আছে যথা সর্বত্যাগি ম্লেচ্ছ ঘোষপাড়ার পাগলের কর্তাভজা*"।[২১] মুসলিম মৌলবীদের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি এরকম মনোভাবের কারণ অস্বাভাবিক নয়। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় নিম্নবর্গের মানুষরাই কর্তাভজার অনুগামী ছিল। মোহাম্মদ ইসমাইল তাঁর গবেষণায় লিখেছেন- "The Karta Bhaja, a sect founded in Bengal in the eighteenth century, who called their creed Satya- Dharma, included both Hindus and Muslims."[২২] বেশিরভাগ নিম্নবর্গের মানুষই জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে কর্তাভজা ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। এই অনুগামীদের মধ্যে না ছিল বর্ণ বৈষম্য, না জাতিগত ভেদাভেদ। ঘোষপাড়ায় যে জাতিভেদ প্রথা পরিলক্ষিত হত না এ প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় লেখা হয়েছে- "*এখানে জাতিভেদ নাই। সকল জাতিই সকলের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া থাকে। এ বিষয়ে ঘোষপাড়া জগন্নাথ ক্ষেত্রকেও পরাজয় করিয়াছে। সেখানে মুসলিমদিগের প্রবেশাধিকার নাই, এখানে মুসলমানরা স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করিতেছে..... কর্ত্তাভজা দলে জাতিভেদ নাই, স্ত্রী পুরুষ একত্রে বসিয়া উপাসনাদি করা হইয়া থাকে।*"[২৩] উচ্চবর্ণ নিজেদের সংস্কৃতিকে নিম্ন বা ইতর জাতির সংস্কৃতি থেকে পৃথক করতে থাকে। সংস্কৃতির এই বিভাজন শুধু দুটি বর্ণকে পৃথক করেনি, এই দুই বর্ণের বিশ্বাসকেও পৃথক করে। ফলে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা খুব সহজেই এই গৌণ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। সংস্কৃতির আলোচনায় ভারত তথা বাংলার প্রান্তীয় বিশ্বাসগুলি এই বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কর্তাভজা সম্প্রদায়েও এই বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলার প্রাচীন তান্ত্রিক মতাদর্শে দেহতত্ত্বের ন্যায় এই সম্প্রদায়ে আছে ঈশ্বর সাধনার ভিন্ন মার্গ। সমস্ত ধর্মগুলিতেই এই পথ নির্দেশিত হয়েছে স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও আচার- অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অথচ সভ্যতার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সমাজ পুঁজিবাদের কবলে জর্জরিত হয়ে শহুরে সংস্কৃতিকেই অগ্রগতির মানদন্ডরূপে গ্রহণ করেছে, তাতে লুপ্ত হচ্ছে প্রান্তিক বিশ্বাস ও প্রথা গুলি। ঔপনিবেশিক আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষার আমদানির ফলে পুঁথিগত শিক্ষায়তনে উত্থিত মূল্যবোধ গৌণ ধর্মগুলোকে অকেজো ও পশ্চাদপদ বলে চিহ্নিত করেছে, ফলে দেশীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাসগুলো একধরনের সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার কবলে নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করেছে। কর্তাভজা সম্প্রদায়েও একইভাবে যৌনতার নামাবলী নিয়ে সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় আক্রমণের মুখে পড়েছে। নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে নীরবেই হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের সাধক ও সাধনার পথ। কেননা, যৌনতার সংকীর্ণ ধারণাকে গ্রহণ করাই গৌণধর্ম গুলিতে যৌনতার ব্যবহার সভ্য সমাজে পরিণত হয়েছে অশ্লীল ও কদর্য রূপে। মূল্যবোধের কাঠগড়ায় অশ্লীলতা ও অসভ্যতার অভিযোগে যুক্ত এই গৌণধর্ম গুলি, বিশেষ করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই এই শ্রেণীর মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির আঙিনায় অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. নন্দী, রতন কুমার. ১৯৮৪. *কর্তাভজা : ধর্ম ও সাহিত্য,*কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৩৪।

২. Chakraborty, Ramakanta. 1995. *Vaishnavism in Bengal: 1486 1900.* Calcutta: Sanskrit Pushtak Bhandar. p.352.

৩. মিশ্র, মনুলাল. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ.*'কর্তাভজা ধর্মের আদিবৃত্তান্ত বা সহজ তত্ত্ব প্রকাশ'* উল্লেখরতন কুমার নন্দী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬।

৪. তদেব, পৃ- ৭৪।

৫. Garrett, J. H. E. 1910. *Bengal District Gazetteer- Nadia.* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot. p.49

৬. চক্রবর্তী, পৃ-৩৬৩।

৭. Dasgupta, Shashi Bhushan. 1946. *Obscure Religious Cults: As Background of Bengali Literature.* Calcutta: University of Calcutta. p.192

৮. নন্দী, প্রাগুক্ত পৃ-১১৯।

৯. তদেব।

১০. তদেব, পৃ-১২০।

১১. সোমপ্রকাশ পত্রিকা, ঘোষপাড়ার মেলা প্রসঙ্গে, ২৩ চৈত্র, ১২৭০, ২১ সংখ্যা।

১২. তদেব।

১৩. তদেব।

১৪. তদেব।

১৫. *বান্ধব,* ৮ সংখ্যা, ১২৮৮, উল্লেখরতন কুমার নন্দী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৮।

১৬. দত্ত, অক্ষয় কুমার, ২০১৭.*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,* প্রথম খন্ড, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৮৭০, পৃ- ১৯৪।

১৭. বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ. ১২৯৯ বঙ্গাব্দ.*বিশ্বকোষ,*তৃতীয় খন্ড, কলিকাতা: ইউ, সি, বসু এন্ড কোম্পানি, পৃ-২২৫।

১৮. তদেব, পৃ-২২৪।

১৯. Calcutta Review, Vol. VI, 1846, page no.407, quoted in কুমুদনাথ মল্লিক, ২০২২.*নদীয়া-কাহিনী,* ঢাকা: দিব্য প্রকাশ,প্রথম প্রকাশ ১৯১১ খ্রিঃ, পৃ- ২২৪।

২০. শ্রী'ম. *২০০৯.শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত,* দ্বিতীয় ভাগ, উনবিংশ খন্ড, কলকাতা : শুভম, পৃ-৩৩০।

২১. আহমেদ, রেজাউদ্দিন রিয়াজ উদ্দিন. সম্পা. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ. *বাউল ধ্বংস ফৎওয়া অর্থাৎ বাউল মত ধ্বংস বা রদকারী ফৎওয়া,* উল্লেখ আবুল আহসান চৌধুরী. ২০১৪. বাউল ধ্বংস ফৎওয়া য়া ও অন্যান্য, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, পৃ-১০৬।

২২. Ismail, Muhammad.1992. *Development of Sufism in Bengal.* Department of Islamic Studies, Aligarh: Aligarh Muslim University. PhD dissert. (Unpublished), p.192. http://hdl.handle.net/10603/57200. Accessed on 9th September 2023

২৩. সোমপ্রকাশ, ২৩ চৈত্র, ১২৭০, ২১ সংখ্যা, উল্লেখবিনয় ঘোষ, ১৯৬২.*সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজ চিত্র,* চতুর্থ খন্ড, কলকাতা: বীক্ষণ. পৃ- ৬৯৯-৭০০।

মধ্যযুগীয় ভারতে জল উত্তোলন কৌশলের ধারণা এবং জলসেচ প্রযুক্তি হিসেবে পার্শি চাকার উদ্ভব এবং বিবর্তন

সুমন মুখার্জী
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, মল্লারপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: পার্সিয়ান চাকা পিন-ড্রাম গিয়ারিং এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি কাঠের "মেশিন" এর আকৃতি ছিল এবং বলদ দিয়ে কাজ করা যেত। ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে, এটি সিন্ধু ও ট্রান্স-যমুনা অঞ্চলে কৃষকদের জল উত্তোলনের প্রধান যন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করত। জমিতে সেচের জন্য প্রচুর জলের উৎস ছিল। প্রাকৃতিক সরবরাহ ছিল বৃষ্টির জল। পুকুর এবং ট্যাঙ্কের এই জল মধ্যযুগীয় ভারতে সেচ ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্লাবন দ্বারা সৃষ্ট জলের খালগুলি দ্বারাও অনুরূপ ফাংশন পরিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু কূপগুলির জল, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ ছিল। মধ্যযুগীয় ভারতে বেশিরভাগ সেচ ব্যবস্থা কূপ থেকে জল নেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। পরবর্তীগুলি প্রায়শই রাজমিস্ত্রি দিয়ে তৈরি এবং উচ্চ প্রাচীর, ঘের এবং প্ল্যাটফর্ম ছিল। কুচ্ছ কূপও ছিল, কিন্তু সেগুলি অনেক বেশি জল তোলার মতো শক্তিশালী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত না। জল উত্তোলন কৌশল "পার্শিয়ান হুইল" বা সাকিয়া নামে পরিচিত। উন্নত সেচ প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল এবং দেশের অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল।
সূচক শব্দ: পার্শিয়ান চাকা, গিয়ারিং, সিন্ধু, ট্রান্স-যমুনা, সাকিয়া।

মূল আলোচনা:

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। তাই ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। মধ্যযুগীয় ভারতের সুলতানি এবং মুঘল আমলও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিকার্যে জলসেচ অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারতের জলবায়ুর বৈচিত্র্য ভারতের কৃষিব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা তথা অনিয়মিত চরিত্র কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করেছিল। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ দ্বারা কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতি ভারতের প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। সুলতানি এবং মুঘল যুগে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার আরও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। বৃষ্টি, নদী ও বন্যার জল ছাড়া সেচের প্রধান মাধ্যম ছিল কূপ খনন করে জল সংরক্ষণ ও বিতরণ। দিল্লি, আগ্রা ও দাক্ষিণাত্যে কৃষিতে সেচদানের জন্য বহু কূপ খনন করা হয়েছিল বলে পেলসার্ট, বার্ণিয়ে প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু খাল এবং কূপ থেকে সরাসরি কৃষিক্ষেত্রে জল নিয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। খুব অল্প সময়ে বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে জল সেচ করতে যান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল মধ্যযুগে। গভীর কূপ ও অগভীর জলাশয় থেকে জল উত্তোলন করার জন্য যেসব যান্ত্রিক, প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল—পার্শি চাকা বা *'Saqiya'*, 'নোরিয়া' (*'noria'*), 'চরস', (*'charkhs'*) ইত্যাদি। এসব উন্নত সেচ প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল এবং দেশের অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে জল উত্তোলন কৌশল এবং জল উত্তোলক যন্ত্রের অতীত ঐতিহ্য:
জল উত্তোলক যন্ত্রের কথা প্রাচীন ভারতে অজানা ছিল না। প্রাচীন ভারতে সাতবাহন রাজবংশের রাজত্বকালে দুটি বিশেষ ধরনের সেচ যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করা গেছিল। এদের একটি হল উদক যন্ত্র যার পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে নাসিক হতে প্রাপ্ত একটি লেখতে। যন্ত্রটির গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য না থাকলেও মনে করা হয় যে জল সরবরাহের কাজে এটি ব্যবহার করা হত। হালের *'গাথা সপ্তশতীতে'* 'অরহট্টঘটিকা' নামে অপর একটি জলযন্ত্রের উল্লেখ আছে।[1] যন্ত্রটি দেখতে চক্রের মতো, তার গায়ে ঘটিকা বসানো। চক্রটি বসানো হত কোনো বৃহৎ কূপে বা জলাশয়ের মধ্যে। চক্রটি ঘুরলে ঘটি জলে ভরে যেত এবং ঘুরন্ত চক্রের সঙ্গে ঘটি নিম্নমুখী হলে সে জল সেচের কাজে ব্যবহার করা যেত। A. L. Basham তাঁর *'The Wonder that was India'* গ্রন্থে বলেছেন—"The Persian wheel turned by an ox, is nowhere clearly mentioned in early sources, though it may have been used." আবার, D. Sharma বলেছেন, তথাকথিত পার্শি চাকায় পার্শি বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। ভারতে এটির কথা সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই জানা ছিল। Irfan Habib তাঁর 'Technological Changes and Society in Thirteenth and Fourteenth Century India' প্রবন্ধে নিঃশংসয় হয়ে বলেছেন—খ্রিস্টের সময় থেকেই 'অরঘট্ট' বা 'ঘটিযন্ত্র' নামক জল উত্তোলক যন্ত্রের প্রচলন ছিল এবং এই ব্যবস্থায় চাকার ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এক মৃৎপাত্রের জল তার অপরটিতে এসে পড়ত— কিন্তু সেখানে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যা থেকে বোঝা যায় পাত্রগুলি শিকলে বাঁধা থাকত কিনা। কোনো গিয়ার ব্যবস্থা ছিল কিনা, বা এগুলোকে কূপ থেকে জল তোলার কাজে লাগানো হত কিনা।[2] Joseph Needham তাঁর *'Science and Civilisation in China'* (Vol.4) গ্রন্থে বলেছেন—পালি সাহিত্যে 'ঘুরন্ত চাকা' বা 'Cakkavattaka' এবং 'অরহট্ট ঘটিযন্ত্র' এমন একটি যন্ত্র যাতে জলপ্রান্তে আটকানো থাকত তার উল্লেখ আছে।[3] Needham আরও বলেছেন, অষ্টম ও দশম শতকের জৈন রচনাগুলিতে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে জন্ম-কর্ম-মৃত্যু চক্রের রূপক হিসেবে। আবার, সপ্তম শতকে বাণভট্ট কর্তৃক রচিত *'হর্ষচরিতে'* একটি সমৃদ্ধ দেশের কথা উল্লেখ আছে যেখানে জিরা বীজের কেয়ারিতে 'উদ্ধৃত ঘটি' প্রভৃতি চাকায় বাঁধা পাত্র দ্বারা জল দেওয়া হত। লক্ষণীয়, কেইন, কওয়েল, টমাস প্রমুখ ইংরেজ অনুবাদকরা এটিকে পার্শি চাকার পাত্র বলেছেন। আবার, কলহন রচিত *'রাজতরঙ্গিণী'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য বিতস্তা নদীর জল সঞ্চালনের এবং ওই জল বিভিন্ন গ্রামে বন্টনের জন্য সারি সারি 'অরঘট্ট' জলচক্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন।[4] মারওয়াড় থেকে দ্বাদশ শতকের যে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে তাতে 'পার্শিচাকা' বা 'যন্ত্রকূপের' উল্লেখ পেয়েছেন L. Gopal। সেখানে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত মূল শব্দটি হল 'অরঘট্ট' বা 'অরহট্ট'। গভীরতর পর্যবেক্ষণের পর Needham বলেছেন যে, 'অরঘট্ট ঘটি যন্ত্রটির' সাদৃশ্য *'Saqiya'* বা পার্শি চাকার চেয়ে *'noria'* বা 'বেড় বরাবর বালতি লাগানো চাকা'র সঙ্গেই বেশি। *'বিনয় পিটক'* নিয়ে লেখা একটি পালি টীকাভাষ্যে বলা হয়েছে, অরঘট্টতে ছিল গোশকটের চাকার বেড় বরাবর মৃৎভাণ্ড বাঁধা, যেগুলিতে জল উঠত যখন চাকাটি ঘোরানো হত এক বা দু'জন লোক দ্বারা। আবার, বাণভট্টের *'কাদম্বরী'*তে বলা হয়েছে, উজ্জয়নী নগরের পরিপার্শ্বস্থ তরুবিথী ও রসাল ফলের বাগানে সেচের জন্য অবিরাম ঘূর্ণমান জল ঘটি যন্ত্রের কথা। এই দুটি সূত্রেই সিদ্ধান্ত সূচক সমর্থন রয়েছে যন্ত্রটি যে আদতে 'নোরিয়াই' এবং পার্শি চাকা নয়—এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি।[5]

'পার্শিচাকা' কী?:

'পার্শিচাকা' এবং 'নোরিয়া' ঠিক কি ছিল তা অবশ্যই আলোচনা করা প্রয়োজন। পার্শি চাকা সম্পর্কে Zaheer Baber তাঁর *'The Science of Empire'* গ্রন্থে বলেছেন—'The Persian wheel, or the *Saqiya*, Comprises three wheels and a beam horizontally attached to a toothed wheel outside the well on the one end, and yoked to a pair of bullocks on the other'. এই পদ্ধতিতে বড়ো চাকা বলদের সাহায্যে ঘুরিয়ে একসাথে অনেক জল তোলা হত এবং কৃষি জমিতে জল সেচ দ্রুত করা যেত। 'নোরিয়া'ও ছিল একই প্রকারের একটা যন্ত্র যেখানে জলপাত্রগুলি একটা চাকা ও দড়ির সাথে আটকে থাকত। কূপ থেকে জল তোলা ছাড়াও এটাকে মুক্ত নদী, জলাধার এবং হ্রদ থেকে জল উত্তোলনের কাজে ব্যবহার করা যেত। চাকাটা ঘুরত আনুভূমিকভাবে এবং মানুষের হাতের দ্বারা। A. P. Usher তাঁর *'A History of Mechanical Invasions'* গ্রন্থে বলেছেন—ঐ দুটি যন্ত্রের মধ্যে তফাত ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু সেচ প্রযুক্তির ইতিহাস সম্পর্কিত অধিকাংশ গবেষণাকর্মেই ওই তফাত ধরা পড়েনি। তার কারণ *'noria'* শব্দটি আরবি 'na' এবং 'ura' থেকে এসেছে এবং *'noria'*, *'Saqiya'* এবং *'doulab'* শব্দগুলি সমার্থক। কিন্তু ইদানীং পার্শি চাকার চালু প্রতিশব্দ 'অরহট' যে সংজ্ঞার্থ Wilson-এর শব্দকোষে দেওয়া হয়েছে (*Glosarry of Judicial and Revenue etc.*) তাতে স্পষ্টতই এটি 'নোরিয়া' ছাড়া অন্য কিছু নয়: একটি ঘূর্ণমান চাকা যা দিয়ে নদী বা ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী জলতল বিশিষ্ট জলাশয় থেকে জল তোলা হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে Irfan Habib বলেছেন যে, ব্যবহারিক ফলপ্রসূতার বিবেচনায় 'নোরিয়া' এবং পার্শি চাকার মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, 'নোরিয়া' ব্যবহার করা যেত কেবলমাত্রা নদী বা জলাশয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে, আর পার্শি চাকা দিয়ে গভীর কূপ থেকেও জল তোলা যেত। Needham সবদিক বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'নোরিয়া' ভারতে আবিষ্কৃত হয়ে প্রথম শতাব্দীতে হেলেনিক বিশ্বে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে প্রবেশ করে। 'নোরিয়া' সমসাময়িক ভারতে 'rahat' নামে পরিচিত ছিল। মধ্যযুগের সেচ প্রযুক্তিতে এটা বিস্মৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[6]

পার্শি চাকায় শিকলটির সাহায্যে কিছুটা গভীরতা থেকেও জল তোলা যায় এবং গিয়ার-ব্যবস্থা থাকার ফলে পশু শক্তির নিয়োগ ও শিকলের বেগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। এটা মোটামুটি বোঝা যায় যে, এই দুটি বৈশিষ্ট্য ভারতে এসেছিল বা বিকশিত হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে। শিকলটি দিয়ে প্রথমদিকে 'নোরিয়ার' মতোই কাজ করানো হত পায়ে মাড়িয়ে। N. G. Mukherjee তাঁর *'Handbook of Indian Agriculture'* গ্রন্থে রত্নগিরি ধরনের পার্শি চাকার ছবি ও বর্ণনা দিয়ে দেখিয়েছেন হস্তচালিত একটি ড্রামে সংলগ্ন একসারি জলপাত্র। এই যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ আসলে ঘটেছিল এটিতে গিয়ার ব্যবস্থা যুক্ত করায় কারণ, তা না হলে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে অবিরাম দ্রুত গতিতে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া যেত না। পার্শি চাকা সম্পর্কে প্রধান ঐতিহাসিক উৎসগুলি হল-1) মুঘল আমলের সাথে সম্পর্কিত লিখিত ফার্সি দলিল; 2) পঞ্চদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে আঁকা মিনিয়েচার পেইন্টিং এবং 3) ষোড়শ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে উৎপাদিত ইউরোপীয় বিবরণ।[7]

মুঘল ভারতে জল উত্তোলন কৌশল এবং জল উত্তোলক যন্ত্র হিসেবে 'পার্শিচাকা':

সমস্ত খুঁটিনাটিসহ ভারতে ব্যবহৃত পার্শি চাকার আদিতম বর্ণনা পাওয়া যায় মুঘল সম্রাট বাবরের *'বাবরনামা'* গ্রন্থে। এছাড়া, পাওয়া যায়, Jafar Hasan সম্পাদিত *'khulasat-ut-*

Tawarikh' গ্রন্থে এবং Sujan Rai Bhandari-এর লেখাতেও। ১৭শ শতাব্দীর শাহজাহানের রাজত্বকালের মুঘল চিত্রাঙ্কনেও পার্শি চাকার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই বর্ণনা ও অঙ্কনগুলি থেকে জানা যায় যে, শিকলগুলি জোড়া-কাছির হত এবং এতে জল ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার জন্য মৃৎপাত্রসহ কাঠের টুকরো বাঁধা থাকত। গিয়ার ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি কাঠের তৈরি, পশুশক্তি কাজে লাগিয়ে একটি পিনড্রাম ঘোরানো হত সেটি আবার যুক্ত ছিল কূপের উপরিস্থ শিকলবাহী চাকাটির সঙ্গে একই অক্ষদণ্ডে অবস্থিত একটি পিন হুইলের সাথে।[8]

লাহোর, দিপলপুর ও সরহিন্দ অঞ্চলে পার্শি চাকার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে বাবর তাঁর *'বাবরনামা'*তে উল্লেখ করেছেন। সুজন রাইও যন্ত্রটিকে পাঞ্জাবের লক্ষণ বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৬৩৪ সালে লেখা একটি ফার্সি রচনায় সিন্ধ অঞ্চলে যন্ত্রটির নজির ছিল বলে প্রমাণ করেছেন ইউসুফ মীরক তাঁর *'Mazhar-e-Shahjahani'* গ্রন্থে।[9] ১৯শ শতাব্দীর ইংরেজ পর্যবেক্ষক বিমস-এর নথি অনুসারে, এটিই ছিল বলতে গেলে পাঞ্জাবের একমাত্র জল তোলার যন্ত্র। ভিন তাঁর *'Personal Narrative of a visit to Gazani, Kabul and Afganistan'* এ দেখিয়েছেন, পাকপট্টন ও মূলতানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'পার্শি কূপের' ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিমস অবশ্য দোয়াবেও এটির ব্যবহারের বিবরণী দিয়েছেন, কিন্তু তা ছিল বেশী যমুনার দিকে।[10] আবার, Donald Butter তাঁর *"Topography and Statistics of Southern Districts of Awadh"* গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন—অযোদ্ধাতে এই যন্ত্র ১৮৩৯ সালেও পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল। পার্শি চাকার ব্যবহার এতটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার কারণ সম্ভবত অগভীর বা কম গভীর জলাশয় থেকে জল তোলার ক্ষেত্রে এটির তুলনামূলক অনুপোযোগিতা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কপিকল ও দড়ি দিয়ে তোলা চামড়ার বালতি বা 'চরস' ছিল অধিক কার্যকর।[11] তবে বিমস এবং সুজন রাই ভাণ্ডারি মনে করেন গভীর কুয়ো থেকে জল তোলার সময় পার্শি চাকায় কাজ চলত অবিরাম, যদিও দীর্ঘতর শিকলের বাড়তি ওজনের জন্য অধিক পশুশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন হত।[12] পার্শি চাকায় এমন বেল্ট লাগানো থাকত যেগুলোর প্রত্যেকটিতে একশোটি করে পাত্র লাগানো থাকত এবং প্রতিক্ষেপে কয়েকশো মণ জল ঢালতে পারত। গাঙ্গেয় অববাহিকায় পার্শি চাকার বিলম্বিত প্রচলনের একটা বড়ো কারণ হতে পারে এই যে, যন্ত্রটি কাঠের তৈরি নয়, এটি ধাতু নির্মিত। তা সত্ত্বেও পার্শি চাকার পূর্বভারতে অনুপ্রবেশ না হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসাবে এটাকে মেনে নেওয়া চলে না কারণ পাঞ্জাব ও সিন্ধু ছাড়া গভীর কূপ সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন অন্য কোথাও ছিল না—এটা মানা যায় না।[13]

জলসেচ প্রযুক্তি হিসেবে পার্শি চাকার বিবর্তন:

পূর্ব ভারতে এটির বিলম্বিত প্রচলনের অপর একটি কারণ হতে পারে যে, প্রথাগত কৃষিতে পার্শি চাকার ব্যবহার ছড়িয়ে গিয়েছিল পশ্চিমে পারস্য ও মিশর পেরিয়ে স্পেন পর্যন্ত। A. K. S. Lambton তাঁর *'Land lord and Peasant in Persia'* গ্রন্থে বলেছেন, পার্শি চাকা 'নোরিয়া' নামে পরিচিত ছিল এবং স্পেনীয়রা এই যন্ত্রটি পেয়েছিল মূরদের কাছ থেকে। এ থেকেই একটা সম্ভাবনা জোরদার হয়ে ওঠে যে, যন্ত্রটির প্রচলনের মূল উৎস ছিল ভারতের বাইরে পশ্চিমে—কারণ তাহলেই সিন্ধু অববাহিকায় এটির উপস্থিতির এবং পূর্বাঞ্চলে অনুপস্থিতির একটা যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[14]

ভারতের বাইরে যন্ত্রটির হদিশ সম্বন্ধে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বালতি শিকলের আদিতম উল্লেখ পাওয়া যায় বাইজান্টাইনের ফিলোর রচনায়। রোম সাম্রাজ্যে এটির ব্যাপক প্রচলনের কথা বলেছেন Usher। যদিও পশুশক্তি নিয়োগের সুবিধার্থে গিয়ার ব্যবস্থার প্রচলন

হয়েছিল অনেক পরে। গিয়ার সহ রোমান কলের উদ্ভব হয় দ্বাদশ শতাব্দীকেই। Needham বাইজান্টাইন ও আমেরিকান নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, মেট্রোডরাস নামে এক পার্শি ইহুদি ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন এবং লক্ষ করেছিলেন যে, জলচক্রগুলি এ দেশে নতুন উদ্ভাবন হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। তবে মেট্রোডরাসই ভারতে গিয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন—Neadham-এর এই বক্তব্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ Needham জল উত্তোলন যন্ত্রগুলিতে গিয়ার সংযুক্তির কাল নির্ণয়ের চেষ্টাই করেননি। ইসলামি প্রযুক্তি চর্চায় পার্শি চাকার উদ্ভব সম্পর্কে গবেষণা চলছে। জল তোলার উদ্দেশ্যে সারি সারি জলপাত্রকে দাঁতাল চাকায় করে ঘোরানোর বর্ণনা ও চিত্রায়ণ করেছেন আল-জামারি। R. J. Forbs তাঁর *'Studies in Ancient Technology'* গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন ইউরোপে পার্শি চাকার স্পেনের মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা থেকে দেখানো হয়েছে যে, আরবরাই ছিল এর উদ্ভাবক। ইসলাম ভূমি থেকে এটি চীনে পৌঁছায়, সেখানে এটির আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে ১৩১৩ সালে যা Needham বলেছেন।[15]

এসবের প্রেক্ষিতে তুর্কি বিজয় এবং তার অব্যবহিত পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পার্শি চাকা ভারতে এসেছে বলে, যে মতটি প্রচলিত আছে, সেটাকে অনাক্রম্য বলেই মনে হয়।[16] অতি সম্প্রতি Iqtidar Husain Siddiqui তাঁর 'Water Works and Irrigation System in India during Pre-Mughals Times' নামক গবেষণা পত্রে প্রমাণ করেছেন—পার্শি চাকা খুব সম্ভবত নিকট প্রাচ্য থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং ত্রয়োদশ শতকে বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচ প্রযুক্তি হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল। *'Sirat-i-Firuz Shahi'* গ্রন্থে বলা হয়েছিল, সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) রাজধানী ফিরোজাবাদের বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে সেচকার্যের জন্য পার্শি চাকার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভারতে পার্শি চাকার ব্যাপক প্রচলন ছিল। যাইহোক, ভারতে পার্শি চাকার অনুপ্রবেশ ও প্রচলনের ফলে সিন্ধু অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৫৯৫ সালে আবুল ফজল তাঁর *'আইন-ই-আকবরী'* গ্রন্থে লিখেছিলেন, কৃষিতে পাঞ্জাবের সমকক্ষ কেউ ছিল না এবং এ কৃষি অধিকাংশই ছিল কূপ সেচের উপর নির্ভরশীল। ১৬৯৫ সালে সুজন রাই ভাণ্ডারির লেখা থেকে জানা যায় যে, পাঞ্জাবের অধিকাংশ চাষবাসই ছিল কূপ সেচ নির্ভর। যদিও খরিফ শস্য এবং ফসলের দরের ওঠানামা নির্ভর করত বৃষ্টিপাতের ওপর। এর অর্থ হল যে, কূপ থেকে জলতোলার জন্য উন্নত সেচ যন্ত্র পার্শি চাকার গুরুত্ব পাঞ্জাবের কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে থাকতে বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঞ্জাব ছিল একটি জনবর্জিত অঞ্চল, কয়েকটি ফাঁক-ফোকরে অল্পস্বল্প বসতি ছিল এবং সেগুলিও আবার ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে যখন তখন মঙ্গোল হানাদারদের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হত। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে ঐ অঞ্চলে একটি বিপুল পুনর্বসতি ঘটে। সুজন রাই অবশ্য উচ্চ বারি দোয়াব অঞ্চলের ঐ বিকাশকে পার্শি চাকার অবদান হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তবে Irfan Habib মনে করেন, ঐ ঘটনার পিছনে যন্ত্রটির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। Irfan Habib তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ভারতের সেই জায়গাতেই যন্ত্রটির বহুল প্রচলন ছিল সেখানে জাঠরা ছিল প্রধান কৃষিজীবী সম্প্রদায়।[17]

হিউ-এন-সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে লিখেছিলেন, সিন্ধু নদের তীরে বহু সংখ্যক পশুপালক পরিবার বসবাস করত। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বিবরণটি স্পষ্টতই মনে হয় যে, জাঠদের কথাই তিনি বলেছেন। একাদশ শতকে এই জাঠরা গজনির মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল সিন্ধু

ও মুলতান অঞ্চলে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ওই জাঠদের আর্থ-সামাজিক চরিত্র ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছিল। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে জাঠদের উল্লেখ আছে লাহোর, মুলতান, দিল্লি ও আগ্রার বিভিন্ন পরগনার জমিদার হিসেবে। Nazr Ashraf তাঁর *'Dabistan-i-Mazahib'* গ্রন্থে বলেছিলেন, জাঠরা ছিল চাষি হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট। অন্যভাবে বলতে গেলে, সিন্ধু অববাহিকাতে মেষ-উট-গবাদি পশুপালক ওই বিশাল সম্প্রদায়টি একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময়ে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গেই সম্ভবত ঘটেছিল সম্প্রদায়টির কিয়দংশের অভিবাসন—মধ্য অববাহিকা থেকে উত্তরে এবং তারপরে পূর্বে ও দক্ষিণপূর্বে। ঘটনাটি মোটামুটি মিলে যায়—(ক) পার্শি চাকার ব্যাপন প্রক্রিয়ার সাথে, যা—বাবরের বিবৃতি থেকে বিচার করলে—ওই অঞ্চলে সম্পূর্ণ হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ নাগাদ এবং (খ) সুজন রাই-এর মতানুসারে, পঞ্চদশ শতকে পাঞ্জাবে যে ব্যাপক পুনরুজ্জীবন ঘটে ছিল তার সাথে। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা যথেষ্টই।[18]

১৬ থেকে ১৮ শতকের ভারতে পার্শি চাকার প্রভাব:

উত্তর ভারতে তুর্কিদের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত ত্রয়োদশ থেকে চৌদ্দ শতকের দিকে পারস্য চাকা বা *সাকিয়া* আমদানি করা হয়েছিল। বিশেষ করে সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনশীলতার জন্য এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। পার্শি চাকা পিন-ড্রাম গিয়ারিং-এর উপর ভিত্তি করে একটি কাঠের "মেশিন"-এর আকৃতি ছিল এবং বলদ দিয়ে কাজ করা যেত। ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে, এটি সিন্ধু ও ট্রান্স-যমুনা অঞ্চলে কৃষকদের জল উত্তোলনের প্রধান যন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করত। উত্তর-পশ্চিম ভারতেও শক্তির জড় উৎসগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছিল, যেমনটি মুঘল এবং মুঘল-পরবর্তী গুজরাটে জলের চাকার (চিনির কল এবং বায়ুকল ছাড়াও) অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। ক) এটি কৃষিতে বর্ধিত উৎপাদনশীলতাকে উদ্দীপিত করতে ভূমিকা পালন করেছিল; খ) প্রযুক্তির অন্যান্য দিকগুলিতে *সাকিয়ার* স্পিন-অফ প্রভাব-বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন, বিশেষ করে সামরিক প্রযুক্তি, এবং গ) যে কারণে কিছু উল্লেখযোগ্য দিক থেকে ভারতের গতিপথ পশ্চিম ইউরোপের থেকে ভিন্ন দেখায় যতদূর যান্ত্রিক প্রকৌশলের বিকাশের ক্ষেত্রে এবং এটি জলের ব্যবহারের নির্দিষ্টতার সাথে সম্পর্কিত যা ছিল কিনা-উত্তোলন ডিভাইস।

উপসংহারে বলা যায় যে, বৃহৎ জলাধার, ক্ষুদ্র কূপ, নালা ইত্যাদি মধ্যযুগীয় ভারতের সম্রাটদের পৃষ্টপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। ঐসব জলাধার, কূপ-নালা-খাল তথা সেচ কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি নির্ভর করত ঐ নির্দিষ্ট রাজবংশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং সাম্রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর। পার্শি চাকা প্রবর্তনের ফলে সিন্ধু অববাহিকায় কৃষি পরিস্থিতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। যার ফলে একাদশ থেকে ষোড়শ শতকের সময়ের মধ্যে পার্শি চাকার দ্বারা উন্নত সেচ কার্যের ফলে ঊষর, বন্ধুর জমিগুলোকে চাষযোগ্য করা সম্ভব হয় এবং সিন্ধু, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলের পূর্বতন যাযাবর মেষপালক গোষ্ঠী থেকে ব্যাপক সংখ্যায় অনুপ্রবেশ হয়েছিল কৃষি সম্প্রদায়ে। তাই সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় ভারতের কৃষি-অর্থনীতির উন্নতি ও বিকাশে পার্শি চাকার অবদান অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

1. H. C. Verma, *Harvesting Water and Rationalization of Agriculture in North Medieval India: Thirteenth-sixteenth Centuries*, Anamika Publishers & Distributors, New Delhi, 2001, pp. 17-20
2. Irfan Habib, *Technology in Medieval India C. 650-1750*, Tulika Books, New Delhi, 2016, pp.
3. V. D. Mahajan, *History of Medieval India*, S. Chand, New Delhi, 2007, p. 375
4. Irfan Habib, *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Economic History of Medieval India, 1200-1500*, Pearson, New Delhi, 2011, p. 43
5. Vipul Singh, *Interpreting Medieval India: Early medieval*, Delhi Sultanate, and regions (circa 750-1550), Macmillan Publishers, India, New Delhi, 2009, p. 7
6. David Gilmartin, *Blood and Water: The Indus River Basin in Modern History*, University of California Press, California, 2020, p. 257
7. Vinod Chandra Srivastava, *History of Agriculture in India, Up to C. 1200 A.D.*, Concept, New Delhi, 2008, p. 461
8. Salma Ahmed Farooqui, *A Comprehensive History of Medieval India: Twelfth to the Mid-eighteenth Century*, Pearson India Education Services, New Delhi, 2011, p. 34
9. Abhijit Mukherjee, *Riverine Systems: Understanding the Hydrological, Hydrosocial and Hydro-heritage Dynamics*, Capital Publishing, New Delhi, 2022, p. 338
10. Deepak Kumar, *Science and Society in Modern India*, Cambridge University Press, New Delhi, 2023, p. 16
11. Abraham Eraly, *The Mughal World: Life in India's Last Golden Age*, Penguin Books, New Delhi, 2007, p. 186
12. Satyajit Singh, *Taming the Waters: The Political Economy of Large Dams in India*, Oxford University Press, New Delhi, 2002, p. 30
13. Indu Banga, *Pre-colonial and Colonial Punjab: Society, Economy, Politics, and Culture*, Manohar, New Delhi, 2008, p. 89
14. Sunanda Kar, *Agrarian System in Northern India from the Seventh to the Twelfth Century*, Himalaya Publishing House, New Delhi, 1990, p. 45
15. Madhukar Shripad Mate, *A History of Water Management and Hydraulic Technology in India, 1500 B.C. to 1800 A.D.*, B.R. Publishing Corporation, New Delhi, 1998, p. 127
16. Vardhman Kumar Jain, *Trade and Traders in Western India, A.D. 100-1300*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1990, p. 29
17. B. C. Barah, *Traditional Water Harvesting Systems: An Ecological Economic Appraisal*, New Age International, New Delhi, 2011, p. 60
18. Kumud Nath Jha, *Economics and Impact of Technology Transfer to Rural Areas*, Deep & Deep Publications, New Delhi, 2009, p. 76 .

তৃতীয় লিঙ্গের আত্মকথা ও বিবিধ সংকট : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ’

মাধব মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বৃহন্নলা, তৃতীয় লিঙ্গ বর্তমান সময়ে ভীষণভাবে আলোচিত একটি বিষয়। তৃতীয় লিঙ্গের বিভিন্ন ধারার মানব-মানবীর অবস্থান, আত্মকথন, আত্ম ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক পরিমল থেকে পরি নামে রূপান্তরকামী হয়ে উঠার, দুলাল থেকে দুলালী হিজড়া হওয়ার, শারীরিক গঠনে মেয়ে হয়েও মনসত্তায় লেসবিয়ান প্রবণতা সম্পন্ন তৃপ্তি, আইভি চরিত্রগুলির লড়াই বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমকামিতা যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়, স্বাভাবিক যৌন প্রবণতা তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তবে হিজড়া পেশার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই তুলে ধরেছেন। হেটেরোসেক্সুয়াল সম্পন্ন নারী-পুরুষ ছাড়াও তৃতীয়লিঙ্গের মানব-মানবীর আত্মদ্বন্দ্ব, সমাজ বৈষম্যতার বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন।
সূচক/মূল শব্দ (Key Word): গে, লেসবিয়ান, রূপান্তরকামী, হিজড়া, মওগা, লগন, থটশপ, গোতিয়া, বহুচেরা দেবী, ছিন্নি।

মূল আলোচনা (Discussion):

উপন্যাস আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম শিল্পরূপ। স্বাধীনতা পরবর্তী বিবর্তনের ধারায় বাংলা উপন্যাস স্বতন্ত্রতা, বহুমুখী ভাবনা তথা ঐশ্বর্যে পূর্ণতা পেয়েছে। ঘটনাকেন্দ্রিক থেকে চরিত্রকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে আধুনিক উপন্যাস। চরিত্রকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলতে মানুষের অন্তর্মন এবং বাহ্যিক ভাবনা উভয়কেই বোঝায়। তবে ব্যক্তিত্ববাদের স্ফূরণে কেবল ব্যক্তিজীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম-ভাবনাই থাকে না, পাশাপাশি সমকালীন দেশ-কাল-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির প্রসঙ্গও প্রতিফলিত হয়। সমাজের অনালোকিত দিকগুলিকে মূল প্রেক্ষাপটে তুলে আনার প্রয়াস আজও জারি রেখেছেন আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা। নিষিদ্ধ পল্লীর ব্যক্তিজীবন কিংবা সমকামী ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে বাস্তবাশ্রয়ী আখ্যান নির্মিত হয়ে চলেছে। বিশেষত নব্বইয়ের দশক থেকে এই প্রবণতাটি অধিক লক্ষণীয়। তবে বাংলা উপন্যাসে হঠাৎ করে সমকামিতা প্রসঙ্গ চলে আসেনি। ভারতীয় পুরাণ কিংবা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে খণ্ডচিত্রের ন্যায় সমকাম প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ইন্দিরা’ উপন্যাসে ইন্দিরা-সুভাষিণীর বন্ধুসুলভ এক্সামিন পর্যায়ে, রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসে গোরা-বিনয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে সমকামিতার বিক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ মেলে। সমকামী-উভকামী সত্তার মানুষদের মূল প্রেক্ষাপটে রেখে স্বাধীনতা উত্তর কথাসাহিত্যিকেরা বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। এমনই তৃতীয়লিঙ্গের মানুষদের করুণ পরিণতির এক বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে। যে বিকল্প সত্তার নারী-পুরুষেরা সামাজিক স্বীকৃতি পায় না, তারা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে মানসিক অবসাদে ভোগেন, কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আর একাংশ সামাজিক-পারিবারিক অবজ্ঞার কারণে এবং

অর্থ উপার্জনের তাগিদে হিজড়া পাড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। 'কাউন্সেল ক্লাব' হল সমকামীদের সংগঠন। এদের লিফলেটের ট্যাগ লাইন রয়েছে—

"সব গোলাপই গোলাপ
কিন্তু সব গোলাপ যে লাল নয়।"[১]

স্বাভাবিক ভাবেই সব মানুষই মানুষ, কিন্তু নারী-পুরুষই যে একমাত্র পরিচয়ের মানদণ্ড এটাও একমাত্র সত্য নয়। যারা বিকল্প সত্তার মানুষ তাদের নিয়েই সমাজের যত মাথাব্যথা। সুস্থ সমাজ-পরিবার হয়তো তাদের ভাগ্যে থাকে না, তাই বলা যায়—

"আমার আশা আমার ভাষা
জানি শুধু আমি
জানি না তো জানেন কিনা
স্বয়ং অন্তর্যামী।
মা বোঝে না, কেউ বোঝে না
কোথায় আমার আমি।
ব্যঙ্গ করে বলতে পারো
তুইতো সমকামী।"[২]

উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে উৎসাহ দান করেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। 'রবিবার' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তৎকালীন সময়ে সমকামিতাকে সমাজ একটা ব্যাধি মনে করতেন এবং ৩৭৭ ধারায় সমকামী সম্পর্ক তখনও প্রকৃতি বিরুদ্ধ সম্পর্ক বলে বিবেচিত হত। এমতাবস্থায় উপন্যাস লেখার প্রেরণা লাভ প্রসঙ্গে বলেছেন— "ছোটবেলা থেকেই তথাকথিত 'মেয়েলি ছেলেদের' অপমানিত হতে দেখেছি সমাজের নানা ক্ষেত্রে। ওদের কষ্ট পাওয়া উপলব্ধি করেছি।"[৩]

উপন্যাসের সূচনাই হয়েছে একজন জিজ্ঞাসু প্রেমাসক্ত কবির কবিতাচারণের মধ্য দিয়ে—

"তুমি আকাশের চন্দ্রের সমা
তুমি মম হৃদয় মহিমা
তুমি রহিমা, তুমি গরিমা
তুমি মম হৃদয়ের ঝিমঝিমা
কিন্তু তুমি সত্যিই কি নারী?"[৪]

বাস্তবিকই সব নারীই কি নারী! কিংবা সব পুরুষই কি পুরুষ! কোনো ব্যক্তিসত্তার সুপ্ত পরিবর্তনশীলতা সেই সংশয়তাকে আরও বেশি জোরালো করে। অনিকেত দেখেছিল সন্ধ্যা হলেই কার্জন পার্কে, সার্দান অ্যাভিনিউতে লেকের ধারে, কালীঘাট, যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের সামনে 'গে', 'লেসবিয়ান'দের আনাগোনা দেখা যায়। এমনকি শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে 'মওগা'দের আনাগোনার কথা জানতে পারে। 'মওগা' হল সালোয়ার কামিজ পরা বুক উঁচু করা কিছু মানুষ, কিন্তু চোয়াল কঠিন, গাল দেখে মনে হয় দাড়ি কামানো। বিহারে মেয়ে নাচনী বিশেষ না পাওয়া যাওয়ায় পূর্ববর্তী দশকেও মওগাদের নাচার জন্য লগনে নিয়ে যাওয়া হত। "লগন বলতে মূলত ছাঙালি ও শাদি লগনকে বোঝানো হয়। এই লগনের নিরিখেই মরশুম বা সিজন নির্ধারিত হয়। সাধারণত দুটি পর্যায়ে মরশুমকে ভাগ করা যায়। এক, শীতের লগন,

দুই, গরমের লগন। ... লন্ডারা তাদের নিজস্ব উলটি ভাষায় বড়ো লগনকে আড়িয়াল এবং ছোটো লগনকে ঝিল্লি বলে থাকে।”[৫]

অনিকেত ‘থটশপ’ সংগঠনের সদস্যদের অনুরোধ করেন তাঁর অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। মূলত সমকামী সত্তার মানুষদের মনের কথাকে সদর্থক দৃষ্টিতে তুলে ধরা ‘সন্ধিক্ষণ’ অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে এসে পবন ধল যে বক্তব্য করেন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।– “গোলাপের রং তো আমরা গোলাপিই বুঝি। পিংক। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে শিল্পীসত্তা আছে, পরের জন্য দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনতা আছে, আবার হিংসা পরশ্রীকাতরতাও আছে। শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা।”[৬] এটি কেবল পবন ধলের নিজস্ব বক্তব্য নয় বরং সমগ্র তৃতীয় সত্তার মানবদের কথন। যদিও পবনের বক্তব্য ছাড়াও লেখক ‘ইয়োলো রোজ’ নামে একটি ওয়েবসাইটে হলুদ গোলাপের তাৎপর্য বিষয়ক প্রসঙ্গ খুঁজে পেয়েছিলেন। ‘সন্ধিক্ষণ’এর অনুষ্ঠান শোনার পর মঞ্জু পূর্বের বন্ধু অনিকেতের সাথে দেখা করতে আসে। মঞ্জুর ছেলে পরিমলও যে সমকামীদের মত আচরণ করে। সমকামীদের মানসিক সংকট বিষয়ে আলোচক চয়ন বসুর সঙ্গে মঞ্জুর সাক্ষাৎ করিয়ে দেন অনিকেত। চয়ন বসু বোঝাতে চান একজন পুরুষের মনে যদি নারীসত্তার অবস্থান করে তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, জন্মাবধিই তার শরীরে কামনা-বাসনাগুলি সেভাবেই গড়ে উঠেছে। এটি হরমনাল জনিত বিষয়। পরিবার-পারিপার্শ্বিক সমাজের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক সমকামী সন্তান আজও লড়াই করে চলেছে এবং উচ্চকণ্ঠে জানাচ্ছে ‘সমকাম কোনো রোগ নয়।’ পরিমলের ভাবনায় শক্তপোক্ত শরীরের মধ্যেই জীবন থাকে, শক্তি থাকে। যাকে বলে- পৌরুষ, মেয়েদের থলোথলো নরম শরীর দেখতে ভাল, কিন্তু সেই শরীরে লেপ্টে থাকতে তার ইচ্ছে করে না। কিন্তু পুরুষের শক্ত শরীরই তার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অরুপদার মধ্যে সেই শারীরিক স্বাদ খুঁজে পেয়েছিল পরিমল। তাই একপ্রকার কবিতা লিখে কৈশোরেই অরূপদাকে প্রেম নিবেদন করেছিল পরিমল –

“অরূপ দাদা অরূপ দাদা তোমার বাড়ি যাব,
অরূপ দাদা অরূপ দাদা তোমায় চুমু খাব।”[৭]

আসলে পরিমলের টিউশন টিচার ছিল অরূপ। এদিকে সমকামী সত্তার পরিমল ক্রমশই অরূপের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। আর অরূপ ছিল বাইসেক্সুয়াল। প্রেমিকা থাকার পরও অরূপ পরিমলের সরলতার সুযোগ নিয়ে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আচমকা অরূপ পরিমলকে ছেড়ে চলে যায়। সমকামীরা সর্বদাই হীনমন্যতার স্বীকার ছিল। তারা কখনো কখনো ঠকছে জেনেও মিথ্যে ভালোবাসায় আবদ্ধ থেকে যেত, কারণ তাদের যে আপন বলে কেউই নেই। কিন্তু তাদের নিঃসঙ্গতাকে দুবর্লতা ভাবার কিছু নেই। উপন্যাসে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাল্পনিক সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে সেখানে দেখা যায় অভিজিৎ মানবী দেবীর সঙ্গে নানা ভাবে চিট করেছিল। তবে তিনি হার মেনে নেননি। তিনি ঝাড়গ্রামে যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন সেই বাড়িও ছেড়ে দিতে হয়েছিল বাড়িওয়ালা এবং অভিজিতের ভগ্নীপতিদের কারণে। শত লড়াইয়ের মাঝেও মানবী দেবী অনন্য এক দৃষ্টান্ত রেখেছেন। অভিজিৎকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু রেজিস্টারির সময় নানা বাধা আসা শুরু হয়। তবুও তিনি হার মেনে নেননি। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তৃতীয়লিঙ্গের মানব-মানবীর মানসিক, শারীরিক সাহসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন “দেখুন লিঙ্গ কেটে ফেলা কত বড়ো সাহসের কাজ, অথচ ভীরুতা বোঝাতে বাংলায়

একটা শব্দ চালু আছে নপুংসকতা। নপুংসক মানেই ভীরু। কিন্তু নংপুসকরা যথেষ্ট সাহসী, অনেক মাসলওলা পুরুষের চাইতেও।”[৮] আজকের সমাজব্যবস্থায় এভাবেই বহু তৃতীয়লিঙ্গ ব্যক্তির তৃপ্তিময় জীবন সঞ্চারের পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছেন মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঔপন্যাসিক পরিমলকে স্বপ্ন পূরণের দিশারী রূপে অঙ্কন করেছেন। সমকামী সত্তা বিশিষ্ট হলেই যে জীবন অধঃপাতে যাবে এমনটা সত্য নয়। নিজ সত্তাকে নিয়ে সমান গুরুত্বের সহিত বাঁচার অধিকার সকলের রয়েছে। তাই সমকামী মানবেরা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত শরীরকে পেতে রূপান্তরকামী হয়ে যায়। উপন্যাসে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরিমলকে পাই। পরিমল নিজ সত্তার সাথে সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল, তাতে সে সফলও হয়েছে।– “পরি চাকরি করে যে কোম্পানিতে তার নাম ‘পিকক’স টেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড’। ময়ূরের পালক। ‘পিকক’ নামেই কোম্পানিটা বিখ্যাত। ওরা টালিগঞ্জের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত। সিনেমার জন্য কস্টিউম বানায়। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর সঙ্গেও কাজ করে।... থিমেটিক কস্টিউম-ডিজাইনার হিসেবে পরির নাম ফাটল খুব দ্রুত।”[৯] পরির খুব কাছের বন্ধু হয়ে উঠে চয়ন। সেও প্যারা টিচারের চাকরি পেয়েছে। উভয়ের জীবন এখন অনেকটা মসৃণ। পরির এবারে ইচ্ছে কেবল মেয়েদের মতো নয়, মেয়েই হয়ে ওঠা। তাই গলার স্বরকে মেয়েদের মতো সুরেলা করতে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়। সে নিজ ইচ্ছে, স্বপ্ন পূরণে কোনো খামতি রাখতে চায় না। এভাবেই অভিশপ্ত পুরীতে পরি নিজেকে খরা রৌদ্রের চম্পার ন্যায় বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। পরির ন্যায় স্বপ্নের উড়ানের ডানা মেলে পরিমল পরি হওয়ার সফলতার পথকে সুপ্রশস্ত করেছিল।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আরেক অন্ধকারপুরীকে আলোর দিশা দেখাতে চেয়েছেন— হিজড়া দল। হিজড়ারাও যে মানুষের মধ্যেই পরে, তাদেরও ভোটার, আধার, রেশন কার্ড হয়েছে, তারাও জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনে অংশ নেয় তা সমাজের একাংশ মেনে নিতে চায় না। রাষ্ট্রের কাছে তারা বোঝা স্বরূপ, সরকার তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কোনো সৎ চেষ্টাই দেখায় না। ফলে ক্রমাগত হিজড়াদের মধ্যে বেআইনি কারবার ঢুকে পড়ছে। তবে হিজড়ারা মানসিকভাবে সবচেয়ে বেশী একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতায় ভোগে। হিজড়াও তো প্রেমিক, স্বামী, সন্তানের আশা করে থাকে। কিন্তু তাদের তো স্বামী পাওয়ার কোনরূপ সুযোগ নেই। তাদের শরীরে তো সন্তানধারনের কোনো রূপ আশাই নেই। তাই তারা হিজড়া গোতিয়াদের মাঝে থেকেই সর্বসুখ খুঁজে নিতে চায়। আসলে সমাজের বহু সমকামী সত্তার মানুষেরা একবুক স্বাধীন নিঃশ্বাস নিতে এবং টাকা উপার্জন করতে হিজড়া মহল্লায় এসে হাজির হয়। হিজড়া দলে সকলে সমকামী এমনটা বলা ভুল হবে। অনেকেই আছে যারা মিথ্যে হিজড়া সেজে কেবলই টাকা রোজগারের লোভে হিজড়া পাড়ায় মরসুমে এসে হাজির হয়। গবেষক হিসেবে স্বয়ং আমি ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে দেখেছি এমন অনেক হিজড়া আছে যাদের স্ত্রী, সন্তান এমনকি নাতিপুতিও আছে। তবে তাদের সংসার দেশের বাড়িতে রেখে বাইরে কোনো হিজড়া দলের অধীনস্ত হয়ে হিজড়াবৃত্তি করে থাকে। যারা প্রকৃত হিজড়া নয় কেবল মরসুমে টাকা রোজগার করে আবার দেশে ফিরে যায় তাদের অধিকাংশই উভকামী সত্তার হয়ে থাকে। সমাজের কাছে অবহেলিত, অপমানিত, কোণঠাসা হতে হতে হিজড়ারা নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, কোড ল্যাঙ্গুয়েজ করে নিয়েছে। ‘চন্দ্রগ্রহণ’ পত্রিকার সম্পাদক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বপ্নময় চক্রবর্তী হিজড়াদের নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছেন “দক্ষিণ ভারতে একটা মন্দির আছে, সেখানে একজন পুরুষ হিজড়া অন্য এক হিজড়াকে এক দিনের জন্য বিয়ে করে এরকম কিছু

দেখার সুযোগ আছে। কিন্তু যেগুলো ওদের অত্যন্ত গোপন ক্রিয়া সেগুলো দেখার সুযোগ হয় না। দু একবার ওদের ডেরায় যে যাই নি তা নয়। তবে একা যেতে পারিনি আমার সাথে দু একজনের সাহায্য নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে ওদের ঢোলপূজোর মতো কিছু আচার দেখেছি।"[১০]

দুলাল চরিত্রের মধ্যে দিয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী হিজড়ার অবস্থান পরিণতিকে তুলে ধরেছেন। 'দুলাল উপাখ্যান' স্বপ্নময় চক্রবর্তী অনেকাংশে উত্তম পুরুষে লিখেছেন। সংসারী দুলালের জীবন শুরু হয়েছিল ফেরী করে। "আমি দুলাল, সাইকেল চালাচ্ছিলাম, সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে ঝুলছে শেকলের মতো সেফটিপিন, ক্লিপ, টিপের প্যাকেট। পিছনে ক্যারিয়ারে বাকসো রেখেছি কয়েকটা। তার মধ্যে ভাঁজ করা ব্রেসিয়ার। রডের দু'পাশে গেরস্থালি। রোদ্দুর লাগছে। মাথায় একটা টুপি থাকলে ভাল হত।"[১১] ফেরি করার সময় দুলালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল হাসি, চাত্তারা(চাঁদতারা), ফুলি, চামেলি হিজড়াদের সাথে। চাত্তারা সহ হিজড়ারা টোলিতে বেরিয়েছিল। সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে তারা নাচাতে শুরু করে। ফুলি ঢোল বাজিয়ে গান ধরে—

"মাটিতে চাঁদের উদয় হল রে হল
আকাশ থেকে ফুলের বিষ্টি হল রে হল
মায়ের কোলে সোনামণি এল রে এল
টোনার গায়ের বালাই যত গেল রে গেল।"[১২]

সেই হিজড়াদের সাথেই দুলাল ছেলে-স্ত্রী, সংসার ছেড়ে হিজড়া পাড়ায় এসে হাজির হয়। হিজড়া গুরু মা নাগেশ্বরী বহুচেরা দেবীর কাছে নিয়ে দুলালকে শিষ্যত্ব দেয় এবং দুলালের নামকরণ হয় দুলালী হিজড়ানি। গুরু মা নাগেশ্বরী দুলালীকে ছন্দলয়ে আগামীর পথ চলার কথা বলেন "শোন, তুই হয়ে গেলি দুলালী হিজড়ানি, কিন্তু মনে ভাববি তুই রাজরানি। যদি পাস নাগরবাবু, ধমক মেরে করবি কাবু, দোলাবি কোমর, করবি খোমর। লিকাম ভাড়া করবি নে, পারলে বাট্টু ভাড়া দিবি। খাবাদাবি কলকলাবি। মনখারাপকে কলা দেখাবি। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া যাই পুষিস না কেন – ছ'টা ছ পুষতে ভুলবিনে। ছলনা, ছেনালি, ছাপান, ছেমো, ছেলেমি আর ছ্যাঁচড়ামি।"[১৩] দুলালীও ধীরে ধীরে এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। চুল বড় করে, পাড়ায় টোলিতে যায়। বাচ্চা নাচিয়ে টাকা রোজগার করে বেশ খোশ মেজাজেই থাকে। রজনীর পথে পা বাড়িয়ে দুলালী স্বাভাবিক চিন্তা চেতনা হারিয়ে ক্রমাগতই ব্যভিচারী হয়ে উঠতে থাকে। শারীরিক চাহিদা সহ টাকার লোভে দুলালী কনে বউয়ের মত লছমনের আদরে মেতে উঠতে চায়। এরপর দেহব্যবসায় নেমে পড়ে দুলালী। একক কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে বিপদ প্রবণতা কম থাকলেও টাকার লোভে ঘরে পারিক আনে। পায়ুকাম, মুখমৈথুন ভীষণ ভাবে শারীরিক ক্ষতি করে থাকে, আর দুলালী এজাতীয় সেক্সেই অনিয়ন্ত্রিতভাবে মেতে থেকেছে। ফলে তার শেষ পরিণতি হয়েছে HIV পজিটিভ। দুলালী হিজড়া দলে থাকলেও প্রথম দিকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা পেত না। কারণ সে যে তখনও ছিন্নি হয়নি। সেকারণে গুরু মার কথা মত ছিন্নি হতে রাজি হয়। যদিও পূর্বের ফেলে আসা সংসার, সন্তান মন্টুর কথা ভেবে একমুহূর্তের জন্য পিছুপাও হয়। তবে শেষপর্যন্ত ঘোড়ুই ডাক্তারকে দিয়ে শরীর থেকে লিকাম, অণ্ডকোষ ছেদন করে দেয় দুলালী। কারণ এবারে তার যে পাক্কা হিজড়া হওয়ার বাসনা, অর্থাৎ 'দুলাল কাটে দুলালীর নিজস্ব কারণে।'

অনিকেত চপলকান্তি ভট্টাচার্যের 'বাংলার মেলা' বইটি পড়ে জানতে পেরেছিলেন বাসুবাটির পিরমাজারে বছরে একবার করে হিজড়ারা দলে দলে আসে। সেই রকমই এক

খাজাই পিরের মাজারের কাছে হারিয়ে যাওয়া রক্তাক্ত দুলালের খোঁজ পেয়েছিল তার মা। তারপর দুলালকে নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শেষে ডাঃ পলাশ সেনগুপ্ত জানান দুলাল HIV পজিটিভ। অসুস্থ দুলাল এরপর বাড়ি ফিরে এসেছিল। তার যে বাঁচার প্রবল ইচ্ছে ছিল তার প্রমাণ মেলে ভক্তিমনে বহুচেরা দেবীর পাঁচালি পাঠে। –

"ভক্তি ভরে যেবা নিত্য বহুচেরা পূজে
অন্য কোন দেবদেবী কভু নাহি খোঁজে।
দেবীর কৃপায় মন সদা মস্তি থাকে
জানিও সেই লোক মার কোলে থাকে।।"[১৪]

বহুচেরা দেবী হল হিজড়াদের আরাধ্য দেবতা। ঔপন্যাসিক এভাবেই হিজড়াদের স্বতন্ত্র জগৎটিকে তুলে ধরার প্রয়াসী ছিলেন। HIV হওয়ার পর দুলালকে পরিবার, গ্রামবাসী সকলেই অবজ্ঞা করতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত ঔপন্যাসিক দুলালের মৃত্যু ঘটান। তাতেই হয়তো সকলের মুক্তি হয়েছে। পরি যেখানে জীবনের সব স্বপ্ন পূরণের উড়ান মেলেছিল, সেখানে সুখের সংসার নিজ হাতে ছিন্ন করে দুলাল চন্দ্র মিরধা কেবল অর্থ, দেহজ সুখ-সংগমের কারণে যে হিজড়া দলে যোগ করেছিল, সেটাই তার জীবনে চূড়ান্ত অন্ধকার নিয়ে আসে। দুলাল চন্দ্র মিরধা কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়, বাস্তবে আজও অনেক তরুণ কিশোর-কিশোরীরা এভাবেই নিজেদের জীবনকে বিপদমুখী করে চলেছে।

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসটি আসলে মানবজাতির যৌনতা ও শারীরিক কামনা-বাসনার প্রেক্ষাপটে রচিত একটি মহাকাব্যিকধর্মী গ্রন্থ। কেননা যৌনতার সব ধারাগুলিকেই তিনি চিত্ররূপ দিয়েছেন। 'গে' রূপে অঙ্কন করেছেন দুলালচন্দ্র মিরধা, পরিমল, অরূপ ইত্যাদি চরিত্রগুলি; হিজড়া রূপে অঙ্কন করেছেন দুলালী, নাগেশ্বরী, চাত্তারা, হাসি, ফুলি ইত্যাদি চরিত্রগুলি; 'লেসবিয়ান' চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন তৃপ্তি, আইভি চরিত্রগুলি; রূপান্তরকামীর রূপ দিতে চেয়েছেন পরিমল থেকে পরি হওয়ার বাসনায়; আর হেটেরো-সেক্সুয়াল চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন অনিকেত চরিত্রটিকে। চরিত্রগত দিকে সমগ্রতার রূপ পাই। পাশাপাশি সময়-সমাজ-ইতিহাসের এক জ্বলন্ত দলিল 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসটি। সংবিধানের ৩৭৭ ধারা সংশোধন রায়দানের পূর্বেই ঔপন্যাসিক গ্রন্থটি রচনায় ব্রতী হন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে সময়ের বাস্তব ইতিহাস লিখিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। বিভিন্ন গ্রন্থ, সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল এই উপন্যাস। তাই সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে একবাক্যে দৃঢ় চিত্তে বলা যায় স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস একুশ শতকের অন্যতম কালজয়ী সাহিত্য হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র/সহায়ক গ্রন্থের উল্লেখ (References):

ক. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, দ্বাদশ সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, 'হলদে গোলাপ', কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, (১. পৃ. ৭৪), (২. পৃ. ৮১), (৩. পৃ. ৭), (৪. পৃ. ৯), (৬. পৃ- ৭৩), (৭. পৃ. ১০১), (৯. পৃ. ৫০০), (১১. পৃ. ২৮৭), (১২. পৃ. ২৯৮), (১৩. পৃ. ৩১২), (১৪. পৃ-১৭৩)।

খ. বসু, নিলয়, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৯, 'লন্ডা-ডান্সার অন্য হিজড়ের ভিন্ন ভুবন', কলকাতা-০৯, অনুষ্টুপ, (৫. পৃ. ৪৬)।

গ. 'কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন পত্রিকা সম্পাদক, সহযোগিতায় বৈদ্যনাথ মিশ্র, অনুলিখন চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, (সম্পা.), শারদ সংকলন ২০১৪, সংখ্যা-২২, 'চন্দ্রগ্রহণ' পত্রিকা, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-০৯, গীতা প্রিন্টার্স, (১০. পৃ. ২৮২)।

ঘ. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১২, 'বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন', কলকাতা-০২, প্রতিভাস, (৮. পৃ. ২২৭)।

ঙ. হোসেন, সেলিনা, (সম্পা.), প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৯, 'হিজড়া শব্দকোষ', ঢাকা- ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, সময়।

চ. মাল, শিবশংকর, (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শারদ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫, 'আত্মদ্রোহ - প্রসঙ্গ : তৃতীয় লিঙ্গ (বৃহন্নলা)', পশ্চিম মেদিনীপুর- ০১, গোল্ড লাইন পেপার এন্ড প্রিন্টিং।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে স্বপ্ন

শিবশঙ্কর নাইয়া
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ন্যায়বৈশেষিক মতে চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে অন্যতম হল বুদ্ধি বা জ্ঞান। সেই বুদ্ধি বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে দুই প্রকার। চার প্রকার অবিদ্যার মধ্যে অন্যতম স্বপ্ন। আত্মা ও মনের সংযোগ বিশেষ, পূর্বানুভূত বিষয়ক সংস্কার এবং অদৃষ্টবশতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত স্বপ্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। এই স্বপ্নজ্ঞান তিন প্রকার - সংস্কারের পটুত্ব জনিত স্বপ্ন জ্ঞান, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মাধাতুর এক একটির প্রধান বৈষম্য জনিত স্বপ্ন জ্ঞান এবং অদৃষ্টবিশেষ অর্থাৎ ধর্মাধর্ম জনিত স্বপ্ন জ্ঞান।
সূচক শব্দ: ন্যায়-বৈশেষিক, গুণ, বুদ্ধি, বিদ্যা, অবিদ্যা, স্বপ্ন, স্বপ্নান্তিক, নির্বহণ।

মূল আলোচনা:

ন্যায়-বৈশেষিক মতে গুণের যে চব্বিশ প্রকার ভেদ নির্ণয় করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম বুদ্ধি বা জ্ঞান। বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, প্রত্যয়, সংবিৎ, প্রতিপৎ, জ্ঞপ্তি, উপলব্ধি, মতি, চেতনা – এই শব্দগুলি জ্ঞানরূপে গুণের পর্যায় শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়। *অমরকোষে* বলা হয়েছে –

বুদ্ধির্মনীষা ধিষণা ধীঃ প্রজ্ঞা শেমুষী মতিঃ।
প্রেক্ষোপলব্ধিশ্চিৎ সংবিৎ প্রতিপজ্জ্ঞপ্তি চেতনাঃ[১]।।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে বুদ্ধি বা জ্ঞানকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা বিদ্যা ও অবিদ্যা। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য উদ্দেশকালে প্রথমে বিদ্যার উল্লেখ পরে অবিদ্যার উল্লেখ করলেও অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের প্রতীতিতে লাঘববশতঃ প্রথমে অবিদ্যার বিভাগ তারপর বিদ্যার বিভাগ দেখিয়েছেন। প্রশস্তপাদাচার্যের এই অবিদ্যা ও বিদ্যারূপে যে জ্ঞানের প্রকারভেদ তা সূত্রকার কণাদ সম্মত। মহর্ষি কণাদ বলেছেন – ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কার দোষাচ্চাবিদ্যা[২]। (৯.২.১০), অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষবশতঃ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। তদ্দুষ্টজ্ঞানম্[৩] (৯.২.১১) অর্থাৎ দুষ্ট জ্ঞানই অবিদ্যা। শঙ্করমিশ্র অবিদ্যা বা দুষ্ট জ্ঞানের সামান্য লক্ষণ বলেছেন – ব্যধিকরণপ্রকারাবচ্ছিন্ন জ্ঞান অথবা বিশেষ্যাবৃত্তি প্রকারক জ্ঞান। যেমন শুক্তিতে রজতের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানে প্রকার হল রজতত্ব। রজতত্বটি শুক্তিরূপ বিশেষ্যে থাকে না, কিন্তু শুক্তিভিন্ন রজতরূপ অধিকরণে থাকে বলে প্রকৃতস্থলে রজতত্ব প্রকারটি হল ব্যধিকরণ। সেই ব্যধিকরণ রজতত্ব প্রকারের দ্বারা 'ইহা রজত' এই জ্ঞানটি হল অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ রজতত্বনিষ্ঠ প্রকারতানিরূপিত। সেইজন্য ঐ জ্ঞানটি দুষ্ট বা ভ্রমজ্ঞান। এই অবিদ্যা বা দুষ্ট জ্ঞানকে প্রশস্তপাদাচার্য চার ভাগে ভাগ করেছেন। সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন।

প্রশস্তপাদাচার্য অবিদ্যার চতুর্থ বিভাগের মধ্যে যে স্বপ্নের কথা বলেছেন, সেই স্বপ্নজ্ঞানকে সব দার্শনিকই অযথার্থ জ্ঞান বলে স্বীকার করেছেন। ন্যায়দর্শনে স্বপ্নকে মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ বিপর্যয় নামক অপ্রমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যোগদর্শনেও এই স্বপ্নকে বিপর্যয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে। তবে যোগদর্শনে সুষুপ্তিতেও জ্ঞান বা বৃত্তি স্বীকার করেন। "আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম, আমি দুঃখে ঘুমিয়েছিলাম, গাঢ় মূঢ় হয়ে ঘুমিয়েছিলাম" এইরূপ তিন প্রকার স্মৃতি

সুষুপ্তির পর হয় বলে, সুষুপ্তিতেও চিত্তের বৃত্তি স্বীকার করা হয়। তবে যখন গাঢ় তমোরূপ দোষ আবির্ভূত হয়, তখন সকল বৃত্তির অভাব থাকে – এটাও যোগদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে[৪]।

বৈশেষিক দর্শনে স্বপ্নকে বিপর্যয় থেকে অতিরিক্ত একটি অন্য অবস্থা বলা হয়েছে। জাগ্রদবস্থায় যে ভ্রম হয়, তাকে বৈশেষিক বিপর্যয় বলেছেন। নিদ্রাবস্থায় যে মিথ্যাজ্ঞান হয়, তাহা অন্য অবস্থায় হয় না বলে তাকে স্বপ্নজ্ঞান নামে অতিরিক্ত অর্থাৎ চতুর্থ অবিদ্যা বা অযথার্থ জ্ঞান বলা হয়েছে।

স্বপ্ন

যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় নির্ব্যাপার হয়ে যায়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সম্পর্ক থাকে না, মন যখন শরীরের ইন্দ্রিয়শূন্য অংশে অবস্থান করে, সেই সময় আত্মার সঙ্গে মনের যে সংযোগবিশেষ হয়,সেই সংযোগকে স্বপ্ননামে অভিহিত করা হয়। এই সংযোগ এবং জাগ্রত অবস্থায় অনুভব হতে উৎপন্ন সংস্কার থেকেই স্বপ্নজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মতান্তরে আত্মমনঃসংযোগবিশেষ এবং অসৎ বিষয়ক অথচ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষাকার উৎপন্ন জ্ঞানই হল স্বপ্নজ্ঞান। বৈশেষিকমতে স্বপ্নজ্ঞান হল স্মৃতিভিন্ন অনুভবাত্মক জ্ঞান। এই মতে স্বপ্নজ্ঞান সংস্কারজন্য হলেও স্বপ্নজ্ঞানমাত্রই সংস্কারজন্য না হওয়ায় এবং স্মৃতি সংস্কারমাত্রজন্য হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান হল স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানবিশেষ। ইন্দ্রিয়সমূহ যখন বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়, মনও যখন বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসম্বদ্ধ হয়, তখন প্রলীনমনস্কব্যক্তির কেবল মনরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 'আমি চোখের দ্বারা দেখছি', 'ত্বকের দ্বারা অমুককে স্পর্শ করছি' ইত্যাদিরূপে অসৎ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধশূন্য আত্মার প্রদেশে মন যখন নিশ্চলরূপে অবস্থান করে, তখন এরূপ মনযুক্ত ব্যক্তি প্রলীনমনস্ক হন। দিবাভাগে ব্যাপাররত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা শরীর ব্যাপাররত হওয়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য অথবা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকের নিমিত্ত অদৃষ্টবশতঃ আত্মাতে প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। এই প্রযত্নকে অপেক্ষা করে আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষবশতঃ মনে এক প্রকার ক্রিয়াধারা উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া হতে অন্তহৃদয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিত আত্মপ্রদেশে অর্থাৎ মেধ্যানামক নাড়ীতে মন নিশ্চল হয়ে অবস্থান করলে সেই অবস্থায় পুরুষকে প্রলীনমনস্ক[৫] বলে। স্বপ্নে 'আমি নদী স্মরণ করেছিলাম' ইত্যাদি রূপে অনুব্যবসায়ের পরিবর্তে 'আমি নদী দেখেছিলাম'ইত্যাদিরূপে অনুব্যবসায় অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষবিশেষ হওয়ায় এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় স্বপ্নজ্ঞান অনুভববিশেষই, স্মৃতি[৬] নয়।

স্মৃতিভিন্ন অনুভবাত্মক জ্ঞানরূপে স্বীকৃত এই স্বপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি বিদ্যাচতুষ্টয় হতে স্বতন্ত্র। প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়সমূহের কারণত্ব স্বীকৃত হলেও স্বপ্নজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সমূহ উপরত থাকায় স্বপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান নয়। অনুরূপভাবে স্বপ্নজ্ঞানের উৎপত্তিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির অপেক্ষা না থাকায় অনুমিতিও বলা চলে না। আর্যজ্ঞানের প্রতি আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু স্বপ্নজ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে মন প্রলীন থাকায় আত্মা ও মনের ঐ বিশেষ সংযোগরূপ কারণ না থাকায় স্বপ্নজ্ঞানকে আর্যজ্ঞান বলা যায় না। আবার স্মৃতির জনক সংস্কার ও স্বপ্নের জনক সংস্কারের সাদৃশ্য না থাকায় স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতি নয়। অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানের উৎপত্তিতে নিদ্রা সংস্কারের উদ্বোধক হয়, স্মৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্বোধক নিদ্রা নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি বিদ্যার মধ্যে স্বপ্নকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই স্বপ্ন আবার সংশয়, বিপর্যয় ও অনধ্যবসায় নামক অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে স্বপ্নজ্ঞানকে সংশয়াদি অবিদ্যাত্রয়ের অন্তর্গত বলা চলে না। যেহেতু উৎপাদক কারণের ভিন্নতাবশতই স্বপ্নজ্ঞান সংশয়াদি থেকে ভিন্নরূপে সিদ্ধ হয়। যেমন বায়ু, পিত্ত, কফ-এই ধাতুত্রয়ের দ্বারা বিকৃত-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা অনুমান

বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান জন্মায়। সমানধর্ম প্রভৃতির জ্ঞান হতে সংশয় জন্মায়। সপক্ষ ও বিপক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ বলে উপলব্ধ ও অনুপলব্ধ-কোটি বিষয়ে অনধ্যবসায়াত্মক জ্ঞান হতে পৃথক্ হওয়ায় এবং কারও রাতে নিদ্রাবস্থায় 'আমি দিবসে অমুককে দেখছি', কোলকাতায় থেকে 'আমি বারাণসীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি', এরূপ জ্ঞান হওয়ায়, আবার অজাতবস্তু জাতরূপে, যুবা বৃদ্ধরূপে স্বপ্নে দৃষ্ট হওয়ায়-এরূপ কাল বিপর্যয়, দেশ বিপর্যয় ও ধর্ম বিপর্যয়বশতঃ স্বপ্নজ্ঞানমাত্রই পৃথক্ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানরূপে সিদ্ধ হয়। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে এই স্বপ্ন তিন প্রকার। এগুলি হল সংস্কারপাটবজন্য স্বপ্নজ্ঞান, ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টজন্য স্বপ্নজ্ঞান এবং বাত, পিত্ত ও কফ-এই ত্রিবিধ ধাতুর বৈকল্যজনিত স্বপ্নজ্ঞান। এখানে মনে রাখা উচিত, স্বপ্নজ্ঞান মাত্রের প্রতি সংস্কার, ধাতুদোষ ও অদৃষ্ট-এই ত্রিবিধ কারণ অপেক্ষিত হয়। তবে স্বপ্নমাত্রই এই ত্রিবিধ কারণ হতে উৎপন্ন হলেও স্বপ্নজ্ঞানের উৎপত্তি কালে যে কারণের প্রাবল্য অর্থাৎ আতিশয্য থাকে, সেই কারণের নাম অনুসারে স্বপ্নজ্ঞানের নামকরণ হয়। যেমন সংস্কারের পটুত্ববশতঃ উৎপন্ন স্বপ্নজ্ঞান হল সংস্কারপাটবজ স্বপ্নজ্ঞান। বাত প্রভৃতি ধাতুর প্রাবল্য বা বৈষম্য হতে উৎপন্ন স্বপ্নজ্ঞান হল ধাতুবৈষম্যজ স্বপ্নজ্ঞান। ধর্মাধর্মের প্রাবল্যবশতঃ উৎপন্ন স্বপ্নজ্ঞান হল অদৃষ্টজ স্বপ্নজ্ঞান। উক্ত কারণত্রয়ের মধ্যে যে কারণটি যখন প্রবল হয়, তখন অন্য কারণ দুটি গৌণভাবে থেকে স্বপ্নজ্ঞান উৎপন্ন করে[৭]।

সাধারণতঃ মানুষ যখন কোন বিষয়ে নিরন্তর চর্চা করে, অথবা দেখা মাত্র যে বিষয়ে প্রবল সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়কে সেই মানুষ স্বপ্নাবস্থায় দেখতে থাকে। যেমন ক্রোধী, কামুক ও লোভী ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় যথাক্রমেজ্ঞান জন্মায়। কিন্তু স্বপ্নজ্ঞান প্রলীনমনস্ক ব্যক্তিরই জন্মায়। কণাদ, প্রশস্তপাদাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ স্বপ্নকে স্বতন্ত্র অবিদ্যারূপে স্বীকার করলেও নব্যবৈশেষিক শিবাদিত্য মিশ্র স্বপ্নকে বিপর্যয়ের বা ভ্রমের প্রকারভেদরূপে স্বীকার করেছেন। প্রকৃত পক্ষে স্বপ্ন হল নিদ্রাকালীন মিথ্যাজ্ঞান, আর বিপর্যয় হল জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যাজ্ঞান। তা ছাড়া অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে কখনও ভ্রমজ্ঞান জন্মায় না। কিন্তু স্থলবিশেষে অপ্রসিদ্ধ বিষয়েও স্বপ্নজ্ঞান উৎপন্ন হতে দেখা যায় বলে স্বপ্ন বিপর্যয় হতে ভিন্নই হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-এই তিনটি অবস্থার মধ্যে জীব কালযাপন করে। জাগ্রৎ অবস্থা হল ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানাবস্থা। মেধ্যা বা হিতা নামক নাড়ীর সঙ্গে মনের সংযোগ হলে নিদ্রাবস্থা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় স্বপ্নজ্ঞানের জনক সংস্কারের উদ্বোধক অদৃষ্ট ক্রিয়াশীল হলে স্বপ্নজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মন যখন পূরীতৎ নাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন জীব সুষুপ্ত্যবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় কোনওরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না বলে একে জ্ঞানশূন্য জীবনাবস্থা বলে.অপরাধ, নারী ও ধনের জ্ঞান হয়। এগুলি হল সংস্কারপাটবজ স্বপ্নজ্ঞান। বাত, পিত্ত ও কফ-এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্যের অর্থাৎ প্রাবল্যের ফলে উৎপন্ন স্বপ্নজান হল ধাতুবৈষম্যজ স্বপ্নজ্ঞান। যেমন বাত অর্থাৎ বায়ুপ্রধান মানুষ স্বপ্নাবস্থায় ভূমিকম্প দেখে, বিমানযোগে নিজেকে আকাশে উড়তে দেখে। পিত্তপ্রধান মানুষ স্বপ্নে আগুনের শিখা, সোনার পর্বত প্রভৃতি দেখে। কফ প্রবল হলে মানুষ স্বপ্নে নদী, সাগর, এমনকী নিজেকে জলে সাঁতার কাটতে দেখে। এছাড়া কিছু কিছু স্বপ্ন আছে, যা অদৃষ্টজ। অদৃষ্টজ স্বপ্নে এমন কিছু ঘটনার জ্ঞান হতে পারে, যা জাগ্রদবস্থায় ঘটেনি। দূরস্থিত ঘটনা, যা নিজের জীবনে কখনও দেখা হয়নি, সেরূপ ঘটনাও অদৃষ্টজ স্বপ্নে দেখা দিতে পারে। হস্তী আরোহণ, ছত্রলাভ প্রভৃতি শুভ স্বপ্ন ধর্মরূপ অদৃষ্ট ও সংস্কার হতে উৎপন্ন হয়। আবার গর্দভ বা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি অশুভ স্বপ্ন অধর্মরূপ অদৃষ্ট ও সংস্কার হতে উৎপন্ন হয়। অদৃষ্টজ স্বপ্নের বর্ণনা শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত*[৮] মহাকাব্যে রয়েছে। যে দময়ন্তী নলকে জীবনে কখনও দেখেননি, সেই দময়ন্তী স্বপ্নে

নলকে দেখেছিলেন। অদৃষ্টবশতঃ জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়েরও স্বপ্নদর্শন হতে পারে; এমনকী যা অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ, স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যা কখনও নিজে অনুভব করেনি কিংবা আরোপপূর্বক চিন্তা করেনি, সেরূপ অপ্রসিদ্ধ বিষয়েও স্বপ্নদর্শন হতে পারে। যেমন সূর্যের বিগলন, চাঁদের অধঃপতন প্রভৃতি। এই সব স্বপ্নের প্রতি সংস্কার কারণ হয় না। ন্যায়মতে স্বপ্ন স্মৃতিতুল্য, স্মৃতি নয়। কিন্তু স্মৃতির ন্যায় সংস্কারবিশেষজন্য হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষ। ভাট্টমতে স্বপ্নজ্ঞান স্মৃতিবিশেষ। বেদান্তদর্শনে স্বপ্ন হল নিদ্রাকালীন মিথ্যাজ্ঞান।

স্বপ্নান্তিক

স্বপ্নাবস্থায় আর এক প্রকার জ্ঞান হতে দেখা যায়, যার দ্বারা স্বপ্নের পূর্বভাগে উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয় স্বপ্নের উত্তরভাগে জ্ঞাত হয়, এই জ্ঞানকে বলে স্বপ্নান্তিক[৯]। স্বপ্নান্তিক হল স্বপ্নজ্ঞানের মধ্যবর্তী জ্ঞানবিশেষ। স্বপ্নের অন্তে অর্থাৎ অবসানে স্বপ্নান্তিকের উৎপত্তি হয়। লোকে কখনও কখনও দৃষ্ট বিষয়কে স্বপ্নাবস্থায় চিন্তা করে। এই চিন্তারূপ জ্ঞান স্বপ্নের শেষভাগে হয়। যে কারণসমূহ থেকে প্রলীনমনস্ক পুরুষের স্বপ্নজ্ঞান হয়, সেই সমস্ত কারণ থেকেই প্রলীনমনস্ক পুরুষের স্বপ্নান্তিক জ্ঞানও হয়। তবে সমকারণজন্য সমব্যক্তিতে স্বপ্ন ও স্বপ্নান্তিকের উৎপত্তি হলেও পরস্পর ভিন্ন। কারণ স্বপ্নজ্ঞান পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুভবজন্য সংস্কার হতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বপ্নান্তিক শুধু স্বপ্নকালীন অনুভবজন্য সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয়। উদয়নাচার্যও বলেছেন- স্বপ্নান্তিক হল স্বপ্নের মধ্যবর্তী স্বপ্নজ্ঞানবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞানস্বরূপ। যেমন কোন গুরুভক্ত শিষ্য হয়তো কোন গ্রন্থের পংক্তি সঙ্গতভাবে পাঠ করতে পারছে না। পরে ঐ শিষ্যের স্বপ্নের মধ্যে গুরু প্রকট হয়ে শিষ্যকে গ্রন্থের পংক্তি বুঝিয়ে পাঠ লাগিয়ে দিলেন। শিষ্যও গুরুপ্রদত্ত বিদ্যার প্রতিসন্ধান অর্থাৎ চিন্তা করে স্বপ্নমধ্যেই পাঠ বুঝে নিল। অনেকে মনে করেন, স্বপ্নের মধ্যে 'আমি শুয়ে আছি' এরূপ যথার্থজ্ঞানও স্বপ্নান্তিক। আচার্যগণ বলেছেন, স্বপ্ন ও স্বপ্নান্তিক সমবিষয়ক, সমকারণজন্য ও সমব্যক্তিতে উৎপন্ন। তথাপি স্বপ্ন অসৎ বিষয়ক হওয়ায় অবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু স্বপ্নজ্ঞাত বিষয়ের যথাযথ প্রতিসন্ধান হওয়ায় স্বপ্নান্তিক যথার্থজ্ঞানরূপে স্বীকৃত এবং স্বপ্নাবস্থায় পূর্বানুভবজন্য সংস্কার হতে স্বপ্নকালে উৎপন্ন হওয়ায় স্বপ্নান্তিক স্মৃতিজ্ঞানরূপে কথিত হয়। স্মৃতি বিদ্যার অন্তর্ভূত হওয়ায় স্বপ্নান্তিক জ্ঞানও বিদ্যার মধ্যেই পরিগণিত।

নির্বহণ

বৈশেষিক দর্শনে তিনটি সূত্রে (৯/২/৭-৯)[১০] স্বপ্ন নামক তৃতীয় অবিদ্যা বলা হয়েছে, অনধ্যবসায়ের কথা নেই। সূত্র তিনটি যথাক্রমে-'তথা স্বপ্নঃ' (৯/২/৭), 'স্বপ্নান্তিকম্' (৯/২/৮) এবং 'ধর্মাচ্চ' (৯/২/৯)। বৈশেষিক দর্শনের উক্ত তিনটি সূত্রে বলা হয়েছে আত্মা ও মনের সংযোগ এবং সংস্কার থেকে যেমন স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেরূপ আত্মমনঃসংযোগ ও সংস্কার থেকে স্বপ্ন জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। স্বপ্নকালীনানুভবজনিত সংস্কার থেকে স্বপ্নান্তিক অর্থাৎ স্বপ্নে অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তা স্বপ্ন নয়, কিন্তু স্মৃতি। স্বপ্ন জ্ঞান ও স্বপ্নান্তিক জ্ঞানের প্রতি ধর্ম বা অধর্মও একটি কারণ। মোট কথা আত্মমনঃসংযোগ, সংস্কার ও ধর্ম, অধর্ম-এই তিনটি স্বপ্ন ও স্বপ্নান্তিকের কারণ।স্বপ্ন জ্ঞান কখন কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে প্রশস্তপাদাচার্য ব্যাখ্যাকরেছেন। সকল প্রাণি দিনের বেলায় বুদ্ধিপূর্বক শরীর ব্যাপারে মগ্ন থাকায় যখন পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তখন তাদের বিশ্রামের জন্য এবং আহার্য দ্রব্যের পরিপাকাদির জন্য ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টবশতঃ প্রযত্নিমিত্তক আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষবশতঃ রাত্রিতে দেহাবচ্ছেদে বহিরিন্দ্রিয়শূন্য আত্মপ্রদেশে মনঃ ক্রিয়াশূন্য হয়ে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তখন মনের যে অবস্থা হয়, তাকে

প্রলীনমন বলে। অন্তরিন্দ্রিয়ানধিষ্ঠিত বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করতে না পারায় তখন ইন্দ্রিয়সমূহও উপরত হয়।অর্থাৎ মন প্রলীন হলে প্রাণিগণের বহিরিন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার নিবৃত্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া চলতে থাকে। সেই অবস্থায় আত্মা ও মনের যে সংযোগবিশেষ হয় তা হতে সংস্কার ও অদৃষ্ট সহকারে যে জ্ঞান হয় তাকে স্বপ্ন বলে। আত্মা ও মনের সেই সংযোগবিশেষ, পূর্বানুভূতবিষয়ক সংস্কার এবং অদৃষ্টবশতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মত স্বপ্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। এই স্বপ্নজ্ঞান তিন প্রকার[১১] - সংস্কারের পটুত্ব জনিত স্বপ্ন জ্ঞান, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মাধাতুর এক একটির প্রধান বৈষম্য জনিত স্বপ্ন জ্ঞান এবং অদৃষ্টবিশেষ অর্থাৎ ধর্মাধর্ম জনিত স্বপ্ন জ্ঞান। সংস্কারের পটুত্ববশতঃ কামুক বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যখন যে বিষয়ে আদর বা দ্বেষ বশত চিন্তা করতে করতে স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তার সেইরূপ চিন্তাধারাই প্রত্যক্ষের মতো প্রকাশিত হয়। ঐরূপ স্বপ্ন জ্ঞান সংস্কারের পটুতাজনিত। ধাতুদোষবশত, বায়ু প্রধান বা বাতদোষে দূষিত ব্যক্তি স্বপ্নে আকাশ গমন প্রভৃতি অনুভব করে। পিত্ত দোষে দূষিত ব্যক্তি অগ্নি প্রবেশ প্রভৃতি উপলব্ধি করে। শ্লেষ্মা দোষে দূষিত ব্যক্তি নদী হ্রদ, সমুদ্রাদি উত্তীর্ণ হচ্ছে এইরূপ সংবেদিত হয়। অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম বা অধর্ম বশতঃনিজের অনুভূত অপরের অজ্ঞাত, নিজের অননুভূত অথচ অপরের জ্ঞাত পদার্থ বিষয়ের শুভ জ্ঞাপক স্বপ্ন দেখে, যেমন অশ্বারোহণ, হস্তারোহণ প্রভৃতি দেখে। এই সব স্বপ্ন ধর্ম ও সংস্কার বশতঃ উৎপন্ন হয়। আবার অধর্ম ও সংস্কার বশতঃ অশুভ জ্ঞাপক গর্দভে বা উষ্ট্রে আরোহণ, তৈলম্রক্ষণ প্রভৃতি। যেখানে অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বিষয়ের স্বপ্নজ্ঞান হয়, তা অদৃষ্ট বশতই হয়ে থাকে।স্বপ্নান্তিক জ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্নের অনুভূত বিষয়ের যে পুনঃ জ্ঞান, তাও স্মৃতি বলেই কথিত হয়। তা আর পৃথক্ জ্ঞান নয়। অর্থাৎ স্বপ্নান্তিকটি স্মৃতিজ্ঞানই তা থেকে স্বপ্নান্তিক ভিন্ন নয়, যাতে পঞ্চম অবিদ্যা সিদ্ধ হতে পারে। মোট কথা স্বপ্নান্তিক জ্ঞানটি স্মৃতির অন্তর্গত।

তথ্যসূত্র:

১. অমরসিংহ, ২০১১(পুঃ মুঃ), *অমরকোষঃ*, বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, পৃ. ৫৫।
২. চক্রবর্তী, দেবাশিষ, ২০০৩, *বৈশেষিকসূত্র অফ কণাদ*, নিউ দিল্লি, ডি. কে. প্রিন্ট ওয়ার্ল্ড (প্রাঃ) লিঃ, পৃ. ১০৫।
৩. তদেব, পৃ. ১০৬।
৪. দামোদরাশ্রম দণ্ডীস্বামী, ২০১০, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ১৫২।
৫ . প্রশস্তপাদ, *বৈশেষিকদর্শনপ্রশস্তপাদভাষ্য*, জীবানন্দ, পৃ. ৪৩৬।
৬ . সুদর্শনাচার্য, ১৯৮৬, *ন্যায়ভাষ্যম্*, দিল্লী, সুধী প্রকাশন, পৃ. ২২৯।
৭ . করগঙ্গাধর ,২০০৯ ,*তর্কভাষা*(২য় খণ্ড), কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃ. ৩০৭।
৮. দাস, দেবকুমার, ২০১৬(তৃতীয় মুদ্রণ), *নৈষধচরিতম্* (প্রথমঃ সর্গঃ), কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ৪৪।
৯. চক্রবর্তী, দেবাশিষ, ২০০৩, *বৈশেষিকসূত্র অফ কণাদ*, নিউ দিল্লি, ডি. কে. প্রিন্ট ওয়ার্ল্ড (প্রাঃ) লিঃ, পৃ. ১০৫।
১০ . তদেব।
১১. দামোদরাশ্রম দণ্ডীস্বামী, ২০১০, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ১৫৩।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভাষার ভূমিকা

সুব্রত মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বর্তমান বিশ্বে ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বাণিজ্যিক অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত অন্তর্ভুক্তির প্রধান শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বব্যপী অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে ভাষার বৈচিত্র্য কৌশলগত সুবিধা তৈরি করে, যা নতুন বাজারে প্রবেশ এবং স্থানীয় গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে সহায়ক। গুগল ও ফেসবুকের মতো প্রযুক্তি সংস্থাগুলো তাদের বিষয়বস্তুতে বহুভাষিক মাধ্যম যুক্ত করেছে, যা স্থানীয় ভাষায় শিক্ষার প্রসার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করেছে। বহুভাষিক দক্ষতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বহুভাষিক নীতি। এছাড়া, গুগল ট্রান্সলেটর, স্থানীয় ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যম ও আঞ্চলিক ভাষাভিত্তিক প্রযুক্তি প্রভৃতির ব্যবহার সাধারণ মানুষের কাছে আর্থ-সামাজিক অংশগ্রহণকে আরো সহজ করেছে। অর্থনীতি, বাণিজ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভাষার অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারে বৈচিত্র্যময় সমাজ ও তার সমন্বিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে বিস্তারিত ভাবে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, বাজার ও ব্যবসায়িক পরিবেশে ভাষার প্রভাব, ভাষা ও আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বিশ্ব-বাণিজ্যে বহুভাষিক দক্ষতার ভূমিকা, ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে উদাহরণ ভিত্তিক একটি বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: ভাষা ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অন্তর্ভুক্তি, বহুভাষিক দক্ষতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্থ-সামাজিক অংশগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা, বৈচিত্র্যময় সমাজ।

ভূমিকা: বর্তমানে, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে, ভাষা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের যুগে, বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রযুক্তি এবং তাদের বৈচিত্র্যের গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। এখন ভাষা আর কেবল ভাবের আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের চিন্তা, জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলক রূপেও আত্মপ্রকাশ করছে। ফলস্বরূপ, ভাষার গুরুত্বকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোতে নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। বাজার ও ব্যবসায়িক পরিবেশে ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে নতুন বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে, যেখানে ভাষার বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কৌশলগত সুবিধা তৈরি করে। ভাষাভিত্তিক দক্ষতা স্থানীয় গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং তাদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গুগল বা ফেসবুককে। যারা তাদের বিষয়বস্তুতে বহুভাষিক মাধ্যম যুক্ত করেছে। ভাষাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি মানুষের আর্থিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, যেমন বাংলাদেশে চাকমা বা মারমা ভাষাভাষী জনগণের জন্য স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে, বহুভাষিক দক্ষতা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নে বহুভাষিক নীতি ব্যবসায়িক সুবিধা তৈরি করেছে। এছাড়া, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বহুভাষার ব্যবহার যেমন (গুগল ট্রান্সলেটর) তথ্য প্রবাহকে সহজ করেছে, তেমনি স্থানীয় ভাষায় ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো মানুষের মধ্যে বিস্তৃত করেছে। ভাষা ও প্রযুক্তির সমন্বয় সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করছে। তাই বর্তমানে অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নয় বরং উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হিসেবেও কাজ করছে। স্থানীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে, যা বিভিন্ন সংস্কৃতিকে একত্রিত করে এক বৈচিত্র্যময় সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার কীভাবে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ায়, বাজার ও ব্যবসায়িক পরিবেশে ভাষার ভূমিকা, ভাষার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ, বিশ্বব্যপী বাণিজ্যে বহুভাষিক দক্ষতার প্রভাব এবং ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশকে উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ: অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়নে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য, স্থানীয় ভাষা বা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিস্তার। যখন মানুষ তাদের স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়, তখন শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের বাধাগুলো অনেকাংশে দূর হয়, ফলে তাদের শেখার প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়। মাতৃভাষা এমন একটি মাধ্যম, যা মানুষের সাথে তাদের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং স্বপ্নকে একত্রিত করতে বহুগুণ সক্ষম। যখন স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, তখন ব্যক্তিরা জ্ঞান সহজে গ্রহণ করতে পারেন এবং তা প্রয়োগেও যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগও তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ বা ভারতের মতো দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন কোনো বিষয় স্থানীয় ভাষায় শেখানো হয়, তখন ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টিকে দ্রুত অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলে শিক্ষার বিস্তার ও তার কার্যকারিতার গতি বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে গ্রামের মানুষদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা তাদের আয় এবং কর্মসংস্থানে সরাসরি প্রভাব ফেলে। অনেক সময় দেখা যায়, বিদেশি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের চাপে অনেক মেধাবী ছাত্রও অসুবিধায় পড়ে এবং তাদের উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ভাষায় কৃষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ভারতবর্ষে অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে স্থানীয় ভাষায় কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি শেখানো হয়, যা তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। নিজস্ব ভাষায় শেখানোর ফলে কৃষকরা তথ্যগুলো সহজেই আত্মস্থ করতে পারেন এবং প্রযুক্তি প্রয়োগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন। এর ফলে কৃষিখাতে উন্নতি ঘটে এবং সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। পরিশেষে বলা যায়, স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিতে এক বৃহৎ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানুষ যখন নিজের ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়, যা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়ায়। তাই, অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

বাজার ও ব্যবসায়িক পরিবেশে ভাষার প্রভাব: বাজার ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের উন্নয়নে ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চিন্তাভাবনা, মনোভাব এবং

ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম। একটি নতুন বাজারে প্রবেশ করার জন্য, বিশেষ করে যেখানে সংস্কৃতি ও ভাষার ভিন্নতা রয়েছে, ভাষার দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ। যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে তাদের পণ্য ও সেবা উপস্থাপন করে, তখন তারা ওই অঞ্চলের গ্রাহকদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিশেষতঃ, এদের ভাষাগত দক্ষতা স্থানীয় জনগণের মধ্যে এমন এক আস্থা তৈরি করে যার ফলস্বরূপ ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে কোন পণ্য যদি স্থানীয় ভাষায় প্রচারিত হয়, তাহলে সেটি গ্রাহকদের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে এবং ক্রেতাদের মাঝে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্থানীয় ভাষায় তথ্য সহজে বোধগম্য হওয়ায় গ্রাহকরা পণ্যটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে এবং সঠিক ক্রয় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ায় ভাষার দক্ষতা বিক্রয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ভাষাভাষী অংশীদারদের সাথে মজবুত সম্পর্ক তৈরি করতে ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক চুক্তি ও আলোচনায় ভাষার উপর দক্ষতা থাকলে ভুল বোঝাবুঝি এবং যোগাযোগজনিত সমস্যার সম্ভাবনা কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বহুজাতিক কোম্পানি স্থানীয় ভাষায় তাদের ক্লায়েন্ট বা অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ করে, তবে তারা স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রয়োজনগুলোর প্রতি সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়। এটি কেবল ব্যবসায়িক সম্পর্ককে সুদৃঢ়ই করে না, বরং দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। পণ্য ও সেবা প্রসারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন এবং গ্রাহক সহায়তা পরিষেবায় ভাষার গুরুত্বও অপরিসীম। যখন গ্রাহকরা তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে পণ্য পরিষেবা গ্রহণে সুযোগ পান, তখন তারা সেবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং ব্র্যান্ডের প্রতি তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে কাস্টমার কেয়ার পরিষেবা দেওয়া হলে, কোম্পানির প্রতি গ্রাহকের আস্থা ও স্বস্তি বাড়ে, যা তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত করে। সর্বোপরি, ভাষা ব্যবসার ক্ষেত্রে কৌশলগত সুবিধা প্রদান করে, যা বাজার প্রসার এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নতুন বাজার তৈরি এবং ব্যবসার প্রসারে ভাষার যথাযথ ব্যবহার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

ভাষা ও আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি: ভাষাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মূল উপাদান। বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। এটি শুধু বৈচিত্র্যকে মান্যতা প্রদান করে না, বরং সমাজে সম্প্রীতি এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রকেও প্রশস্ত করে। ভারত ও বাংলাদেশের মতো দেশে এই ভাষাভিত্তিক বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে দুই দেশেই সঠিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিই একমাত্র মাধ্যম যেটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভাষী গোষ্ঠী যেমন বাংলা, চাকমা, মারমা বা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী রয়েছে। এই ভাষাগোষ্ঠীগুলোকে যদি সমান সুযোগের অধিকারী করা হয়, তবে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, চাকমা বা মারমা ভাষাভাষীদের জন্য সরকারি নীতিমালা তৈরি হলে তারা শিক্ষায় আরো এগিয়ে যাবে এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে আরো বেশি মাত্রাতে অংশগ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েবে। ভারতেও বহুভাষিকতা প্রচুর বৈচিত্র্য এনেছে। বিশেষ করে প্রতিটি

রাজ্যের নিজস্ব ভাষার উপস্থিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মহারাষ্ট্রে মারাঠি ভাষাভাষী গোষ্ঠী এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রাজ্যভিত্তিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের নিজস্ব ভাষায় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষার সুযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তার ফলে তারা দ্রুত অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে উন্নত করে এবং দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে সহায়ক হয়। ভাষাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বিকাশ নয়, বরং এটি দেশের সামগ্রিক আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। যদি নীতিনির্ধারকরা স্থানীয় ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়, তবে সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ে এবং ভাষাভিত্তিক বৈষম্য কমে। এর ফলে কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সমান সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা প্রত্যেক মানুষের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও উন্নতির পথকে সুগম করে। পরিশেষে এটাই উল্লেখ্য যে, ভাষাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র একটি সাম্যের ভিত্তি গড়ে তোলে না, বরং অর্থনীতির শক্তিকেও বাড়ায়। বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর সমন্বয়ে তৈরি এই অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশটি সবার জন্য লাভজনক এবং অর্থনীতির সুস্থ বিকাশকে নিশ্চিত করে।

বিশ্ব-বাণিজ্যে বহুভাষিক দক্ষতার ভূমিকা: বিশ্ব-বাণিজ্যে সফল হতে ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বোঝা এবং বহুভাষিক দক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। যখন একটি কোম্পানি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে, তখন বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রাহকদের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগকে শক্তিশালী করতে বহুভাষিক দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি উদাহরণ হিসেবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, একটি ভারতীয় কোম্পানি যদি জাপানের বাজারে প্রবেশ করতে চায়, তবে তাদের জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। জাপানি ভাষায় তাদের পণ্য ও পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে তারা স্থানীয় গ্রাহকদের সাথে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই বহুভাষিক দক্ষতা কেবল ভাষার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমই করে না, বরং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাও তৈরি করে। বহুভাষিক দক্ষতার মাধ্যমে একটি ব্যবসা কেবল নতুন বাজারে প্রবেশ করতেই পারে না, বরং স্থানীয় প্রতিযোগিতার সাথে মানিয়ে নিতে এবং ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের পণ্য বা পরিষেবা উন্নয়নেও সক্ষম হয়। যেমন, অ্যামাজন ও নেটফ্লিক্সের মতো কোম্পানিগুলি বিভিন্ন দেশে তাদের পণ্য ও সেবার বর্ণনা স্থানীয় ভাষায় প্রদান করে এবং গ্রাহকদের সুবিধার জন্য তাদের ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা স্থানীয় ভাষায় রূপান্তর করে তাদের কাছে অত্যন্ত সহজে উপস্থাপন করে। এর ফলে তারা আন্তর্জাতিক বাজারে সফলভাবে তাদের ব্যবসায়িক স্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুভাষিক দক্ষতা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও অংশীদারিত্বেও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষাভাষী অংশীদারদের সাথে বোঝাপড়া তৈরি করা, চুক্তি সম্পাদন করা, এবং ব্যবসায়িক আলোচনায় স্বচ্ছতা আনয়ন বহুভাষিক দক্ষতার মাধ্যমে সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিভিন্ন ভাষাভাষী সদস্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে বহুভাষিক দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া, বহুভাষিকতার মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন সহজ হয়, কারণ তারা বুঝতে পারে যে কোম্পানি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে মূল্য দেয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

বহুভাষিক দক্ষতা তাই শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যই এনে দেয় না, বরং সংস্কৃতিগত সেতুবন্ধন তৈরি করে, যা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলায় সহায়ক। সর্বোপরি, বহুভাষিক দক্ষতা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন সুযোগ তৈরি করে, স্থানীয় চাহিদা পূরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী পরিচয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ভাষা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও প্রযুক্তি সরঞ্জামগুলোর উদ্ভাবনে বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে ব্যবহারের সুযোগ যেমন ব্যবহারকারীদের কাছে সহজলভ্যতা বাড়ায়, তেমনি প্রযুক্তির প্রসারেও ভূমিকা রাখে। ভাষা ও প্রযুক্তির এই সমন্বয় সাধারণ মানুষের জন্য প্রযুক্তিকে সহজ করে তুলছে এবং বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তিগত সেতুবন্ধন গড়ে তুলছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও তথ্যের সহজ প্রবাহ নিশ্চিত করা। উদাহরণ হিসেবে গুগল বা ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে নেওয়া যেতে পারে, যেগুলো আজ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি বড় বড় ভাষাতেও উপলব্ধ। গুগল ট্রান্সলেটের মতো অ্যাপ্লিকেশন ভাষার বাধা কাটিয়ে ব্যবহারকারীদের জন্য দ্রুত অনুবাদের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, যা ব্যবসা, শিক্ষা এবং ভ্রমণ ক্ষেত্রে ব্যাপক সুবিধা এনে দিয়েছে। আজকাল অনেকেই তাদের মাতৃভাষায় প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন, যার ফলে তাদের মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের আগ্রহ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্মগুলোতেও ভাষার বড় প্রভাব রয়েছে। কৌরসেরা, উডেমি বা অন্যান্য ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলো বিভিন্ন ভাষায় কোর্স তৈরি করে, যা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষায় প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়। বিশেষ করে এমন অঞ্চলে, যেখানে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা কম, সেখানে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা সামগ্রী পাওয়া মানে প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের একটি বড় পদক্ষেপ। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও ভাষা ও প্রযুক্তি মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন ভাষায় তাদের অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইট সরবরাহ করছে, যা স্থানীয় বাজারে তাদের পণ্য বা পরিষেবার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করছে। উদাহরণস্বরূপ অ্যামাজন বা ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্ম তাদের কনটেন্ট এবং ইন্টারফেসে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে, যা তাদের স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে সাহায্য করছে।

এছাড়া, স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সমর্থনও গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে সাহায্য করে। কাস্টমার সার্ভিস বা গ্রাহক সহায়তা যখন গ্রাহকের ভাষায় পাওয়া যায়, তখন তারা সেই সেবার প্রতি আরও বেশি আস্থা অনুভব করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী গ্রাহককে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কোম্পানি স্থানীয় ভাষায় সেবা প্রদান করছে। সর্বোপরি, প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ভাষার সহায়ক ভূমিকা আধুনিক সমাজে বহুমুখী সুবিধা প্রদান করছে। ভাষার সমর্থনে প্রযুক্তি সহজ, গ্রহণযোগ্য এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। ভাষা ও প্রযুক্তির এই সমন্বয় ভবিষ্যতে মানুষের জীবনযাত্রা আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে বলে আধুনিক গবেষকরা অত্যন্ত আশাবাদী।

উপসংহার: ভাষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান বিশ্বে বৈচিত্র্যময় সমাজ গড়ার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ভাষার অন্তর্ভুক্তি ও বহুভাষিক দক্ষতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের শক্তিশালী উপাদান, যা সমাজ, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে মানুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুভাষিক

দক্ষতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় গ্রাহকদের আস্থা অর্জন ও নতুন বাজারে প্রবেশের সুবিধা দেয়। একাধিক ভাষায় যোগাযোগের ক্ষমতা, স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে চলতে এবং অংশীদারিত্ব মজবুত করতে অত্যন্ত সহায়ক। ভাষাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য, যা বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ তৈরি করে। প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও ভাষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যেমন গুগল ট্রান্সলেটর ও ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, ব্যবহারকারীদের স্থানীয় ভাষায় শিক্ষামূলক সামগ্রী প্রদান করে, যা প্রযুক্তিকে আরও গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে। সর্বোপরি, ভাষা ও বহুভাষিক দক্ষতা আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক বিকাশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা একটি ন্যায়সংগত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব গড়তে সহায়ক।

তথ্যসূচী:

- অন্নদাশঙ্কর রায়, যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা, পথে প্রবাসে ও নির্বাচিত প্রবন্ধ, https://www.ebanglalibrary.com/
- আব্দুল কাইয়ুম, মাতৃভাষায় দক্ষতা কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়ায়? প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ২৩: ৩৫।
- জুলিয়া আলম, ভাষার অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিকায়ন, বাংলা ট্রিবিউন, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১৫:৫৭।
- মহফুজ পরভেজ, ভাষার ফেব্রুয়ারি আশার ফেব্রুয়ারি, মাতৃভাষার গুরুত্ব রক্ষা, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৮।
- শ্যামশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: উচ্চশিক্ষা জগতে সমস্যা, উৎস মানুষ, এপ্রিল-জুন, ২০২৪, ২৩:২৫।

The Idea of Interdependence and Environmentalism in Buddhism

Abinash Sengupta
Assistant Professor, Dept. of History
Kharagpur College

Abstract: The doctrines of interdependence and interconnectedness of Buddhism are in perfect harmony with the present philosophy of the interrelationship of humans with ecosystems. Buddhism imparts that all phenomena are interconnected and interdependent. This understanding fosters a sense of responsibility towards the natural world. Buddhism accentuates the significance of minimizing harm to all living beings, together with animals, plants, and ecosystems. It endorses mindfulness and awareness of one's actions and their impact on the environment. The concept of 'Dependent Origination' describes the interconnectedness of all phenomena and pointed out the consequences of human actions on the environment. It advice to decrease the consumption for minimizing harm to the environment. Buddhist in present days are enthusiastically engaged in conservation activities and reacts to the suffering caused by environmental degradation. The main aim of Buddhism is to get rid of suffering, the root sources of which are greed, ignorance, and hatred. Buddhists emphasizes living in harmony with nature and highlight the importance of compassion and wisdom in relation to the nature.
Key words: Buddhism, Interdependence, Ecology, Environment, Interrelation.

Idea of environmentalism and ecology in Buddhism has huge scope for study as the worldview of Buddhism remains naturally eco-friendly and appropriate to the natural environment.[1]The concepts and practices central to Buddhism are tremendously significant to ecological thinking.[2]Since the beginning of the universe, humans and organisms have depended on nature for natural resources. Because apart from organic elements, earth, water, clouds, sunlight and other natural resources are integral elements of nature. Conservation and protection of the environment is essential for human survival as well as for all animal species and that is why we must respect and preserve the ecosystem. All living things are interdependent and interrelated with each other for their own survival. It is impossible for humans to survive without other animals and natural resources of the world.[3]Concerning of creation, environmentalists of Buddhism spread kindness, compassion, and respect beyond people and animals to comprise plants and the earth.[4] The mindful living, which is the teachings of Buddhism, develops

a view of human beings, nature, and their relationship which is fundamentally ecological.[5]

Buddhist discussion of ecosystems dates back to the time of Gautama Buddha. During the period of Buddha, efforts were made to preserve the ecological balance through religious and philosophical teachings. Since the 4th century BC, civilization had been expanding in the fertile lands of the Ganga river basin and its surrounding areas. The use of fire and iron led to the development of new plantations. From this period, exploitation of fauna and flora increased and the deliberate exploitation of natural resources exacerbated the problem. During this time, Buddhism emphasized the importance of protecting and preserving wealth and expressed awareness of it. The awareness of worldly happiness and suffering that can be found in Buddhist thought expresses not only its usefulness but also a constant vigilance of the living world. And that is why Buddhism was so successful.[6]

Buddhist has an extensive and close relationship with nature and forests. The Sala tree, Buddha was born under it, enlightened under the Bodhi tree, and contributed his first sermon in the forest named Isippatanamarukatayawan, and died under the Sala tree. Buddha lived closely with nature and taught his admirers to take care of environment. His advice concerning forest is to refrain from taking life of living forms. It seems that, this precept is based on kindness and also as an environmental ethic to conserve and protect animals and plants. Unquestionably Buddha was caring of water conservation what is seen in the discipline he announced keeping out monks and nuns from disposing waste into canals or rivers. Buddhism considered sinful and unethical to pollute water because to survive, all life forms depend on water.[7] According to Buddha's teachings, love and compassion should be extended to all sentient beings. He was concerned about the tiny creatures in water and guided to safeguard that creatures while using water. He also instructed to his admirers to avoid needlessly damaging plants and their seeds.[8]

A careful consideration of the natural environment manifests itself in the concept of human morality underlying Buddhism. The Agganna Sutta, referring to the earth's journey through evolution and states that natural processes are affected by human conduct and policy.[9] First, environmental degradation and human moral degradation are interrelated. Second, the over exploitation of natural resources is associated with the decline of human morality. Buddhists are aware about the destruction of the forests, air and water pollution, caused by people acting through these evils, encouraged by economic gain and the material profits.[10]

The Buddhist understanding is more clearly expressed in the Chakkavatti-Sihanada Sutta, which attributes human moral deterioration and environmental degradation to this unimaginable plight.In a section of the

Anguttara Nikaya, the Buddha hinted that ecosystem destruction is inevitable as a result of unplanned and arbitrary resource use and occurs when society becomes full of immorality and, disillusionment and worthlessness grip humanity. In other words, the degradation of the environment accelerates when human morality declines. In fact, Buddhism's over emphasis on morality that should be seen as a practice whose primary goal is to emphasize the conservation and proper use of natural resources.[11]Agganna Sutta believes that due to human's selfish aspirations and 'unwanted exploitation' of natural resources, environmental crisis has arisen in the universe which is harming our ecosystem and environment.

Lynn White Jr. Scholars claimed that Buddhism articulates its statements about the natural world more clearly than Christianity, Judaism, and other religions. Various forms of Chinese and Japanese Buddhism regard every animal and plant as worthy of comparison with God. Buddhist texts always advise against harming the plant world. The mentality of showing respect for plants, animals and birds emerges from the basic concept of creation mystery of Buddhism where it is said that all sentient beings organisms are closely interrelated.[12]So the Buddhist attitude of non-violence, benevolence and compassion is not limited to humans, but includes other animals as well. So according to Buddhism, because of the fundamental interdependence and interconnectedness of all phenomena, Buddhism refers to the concept of "Dependent Origination" which means that no entity can exist and generate independently and every entity exists due to its relations and conditions with other entities. So all living things in the universe are interrelated and dependent to each other.The concept of "Dependent Origination" which related to nature and environment is similar to the notion of ecology.[13]

Buddhists follow the principles of Panchasila known as the Five Precepts. Buddhist doctrine of Ahimsa, the first of the five precepts (pancasila), refers to the ethic of non-harming, and advises to practice compassion (Karuna) and loving-kindness (metta) toward all beings.It also advises to abandon all weapons harmful to living beings.It suggests for cultivating compassion and empathy for plants and animals.Their size may be big or small and visible or invisible, because just as our life is precious to us, so we should value the lives of others and promote respectful behavior towards living beings. The Buddha believed that if man developed respect and compassion for all animals, he could live with wild animals without fear.[14]Also the idea of anatman, (doctrine of no-self), provides a decent conceptual basis for a more holistic, inter-subjective perspective, that seems essential for an environmentally and ecologically sustainable lifestyle.[15]

Buddhists believe that, forests should never be over exploited. Tibetan Buddhists are very wise to say that it is not good to over use anything of great

value in the world because it will lose its quality and as a result the world will turn towards destruction.[16]In fact, according to Buddhists, a cooperative relationship should be established with nature, never trying to dominate nature, as the fundamental belief of Buddhism is that humans and all other living beings are interconnected by a chain, and since man is a part of the universe, he should obey the laws of nature.

The ancient Buddhist monastic rules, as described in the Vinaya-Pitaka, contain numerous injunctions against environmental irresponsibility. Some of its advices are written to avoid harm to sensitive animals. It is said that, if anybody cut trees or dig the ground, this may be resulted in the death of tiny living beings. In Buddhism, killing or injuring an animal are considered harmful and fundamentally immoral.Buddhism also accepts the common belief that gods reside in trees. Trees provide many services to man such as fruit, shade etc. therefore it deserves to be thanked for that. That is why no tree should be cut or mutilated from which it has benefited.[17] Plants should be treated as friends or partners and should be protected from any injury for the sake of long-term use.[18] The interrelationship between trees and humans is clearly depicted in the Buddhist scriptures.It is explained that nature is completely neutral, so one must be compassionate and respectful of nature and its elements. Buddhism emphasizes morality and explains that if one sleeps or rests under the shade of a tree, he should not break the branches of that tree. If he does, he is an evil person.[19]

Buddhism does not believe in man's ability to dominate the animal, and does not consider man as a separate power or special creation of God.[20]Economist E. F. Schumacher has shown that Buddhists do not believe in human beings attempting to judge the world in terms of human values and experiences, and from this point of view, they believe that the human race has no right to arbitrarily exploit and oppress nature, because nature is not only for human consumption. Just because man has more intelligence,he has no right to exploit the rest of the living world. Rather, people should show kindness and gratitude to other animals. Schumacher believes that man is the child of nature, not the master of nature.[21] Actually, all living and non-living things are fundamentally accepted to be equal in life levels according to Buddhism. The term “life levels” is not similar with the common meaning of life, but talks about to the fundamental power as life energy which supports living beings and this fundamental power may be termed “life” possibly subsists in non-living things similarly.[22]

Buddhists use the word Dhamma to refer the strict adherence to the laws of nature as they are well aware of the preservation of the environment and ecosystem. Humans must use natural resources as little as possible and as they are undoubtedly an integral part of nature and have the right to live, so

Buddhism emphasizes the careful use of natural resources. Buddhists believe that if humans obey the laws of nature, its environment will be preserved as well. In the scripture Sigalovada Sutta, Lord Buddha advises humans to respect nature and natural resources and to use without injury, like a bee collecting nectar from a flower without injuring it.[23]Kulasutta states that our society will prosper if we follow the principle of limited consumption.

Buddhism believes in the principles of karma and rebirth. According to Buddhism, someone is reborn as a human being, perhaps as a result of the meritorious actions of his previous birth. It is his luck but it is temporary. It may be that, in the next life you can take birth as an animal, and may be an animal was born as a human in the previous life.[24]In this management of the birth cycle, therefore, from man to insect, everyone is a close friend and relative, so kindness should be shown to all. Jatakas story also agrees with the above opinion and supports that close relatives can possibly be reincarnated as animals, so we must treat all animals with respect. The attitude of Buddhist towards animals can be considered as noble. In the chain of uncountable rebirths, Buddhists recommends to treat all beings as mother or father. Buddhist texts always use the phrase "all living beings" rather than "man", "people".[25]The main principle of Avatamsaka Sutra normally called the Wreath or Garlands Sutra may be abridged in the phrase: All is one; one is all.[26]Buddhism provides a non-dualistic, nonhierarchical, holistic worldview that touches all sentient beings, humans and animals.[27]According to Thai monk Buddhadasa Bhikkhu, "The entire cosmos is a cooperative. The sun, moon, and stars live together as a cooperative. The same is true for humans and animals, trees, and the earth. When we realize that the world is a mutual, interdependent, cooperative enterprise, then we can build a noble environment."[28]

The Jataka accounts regarding the Buddha's past lives reveals a worthy knowledge of the Buddhist teaching instincts respect for animals. Christopher Chapple has provided a list of the animals which are to be found in these accounts. Among five hundred fifty stories recognised as canonical by Theravadins, half of the animals are presented as central characters. Seventy separate types of animals are being presented by varying frequency. Monkeys are appears in twenty-seven tales, lions are presented nineteen times, and the mouse are only once.[29]The Jatakas descriptions were important in making the sense of community between man and the animal by presenting that animals suffer from the similar anxieties and problems of human kind. In Jatakas, animals are humanizing, which may lead to a greater humaneness to animals.[30]Maximum of the Jataka stories are displayed that animals sacrifices their own life for saving others. The Jatakas explores the main Buddhist virtues of wisdom, nonviolence, compassion, loving-kindness, and generosity. These show the interdependence among all beings.[31]

Buddhism instructs us that the method of healing our self must go hand in hand through building our planet a more liveable place for generations to come. Buddhist offering best solutions to these problems in order to make Buddhism pertinent for the twenty-first century.[32]Buddhist ideas on ecology and environment presented a unique and valuable perspective on environmental sustainability. Buddhism delivers a framework through highlighting the importance of non-harming, impermanence, interdependence and kindness for understanding the complex web of relationship between humans and the natural world. Ahimsa is a significant ethical perception existing in all Buddhism, for avoiding damage to any other subjectivity and this specific form of non-violence is practiced to guard both flora and fauna, which supplies fuel for social justice activism.The environmentalism of Buddhism may contribute to interdenominational dialogue on environmental sustainability and protection of ecological balance and also it can be inspired the collective actions.

References:

(1) Donald K. Swearer, 'An Assessment of Buddhist Eco-Philosophy', The Harvard Theological Review, Apr., 2006, Vol. 99, No. 2 (Apr., 2006), Cambridge University Press, P. 125

(2) Rita M. Gross, 'Buddhism and Ecofeminism: Untangling the Threads of Buddhist Ecology and Western Thought', Journal for the Study of Religion, 2011, Vol. 24, No. 2, Special Issue, Association for the Study of Religion in Southern Africa, pp.17-32

(3) Vikram Singh, 'Ecological Conservation and Buddhism', IRJMSH, Vol 6, Issue 7, [Year 2015] ISSN 2277 – 9809 (0nline) 2348–9359, P.80

(4) Donald K. Swearer, 'Principles and Poetry, Places and Stories: The Resources of Buddhist Ecology', Daedalus, Fall, 2001, Vol. 130, No. 4, Religion and Ecology: Can the Climate Change? Fall, 2001, P.227

(5) Allan Hunt Badiner, (Ed.)'Dharma Gaia: A Harvest of Essays in Buddhism and Ecology', Berkeley, Parallax Press, 1990, pp. xiv-xv

(6) Vijay Kumar Thakur, 'Deforestation, Ecological Degradation and The Buddhist Response in Early India: A Preliminary Enquiry', Proceedings of the Indian History Congress, 1999, Vol. 60, Diamond Jubilee, (1999), P. 79

(7) Kongsak Thathong, 'A spiritual dimension and environmental education: Buddhism and environmental crisis', Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46 (2012), Elsevier, P. 5065

(8) S. Dhammika, 'Nature and the Environment in Early Buddhism', Buddha Dhamma Mandala Society, Singapore, 2015, P. 10

(9) Vijay Kumar Thakur, ibid, 1999, P.80

(10) Susan M. Darlington, 'The Ordination of a Tree: The Buddhist Ecology Movement in Thailand', Ethnology, Winter, 1998, Vol.37, No.1,University of Pittsburgh- Of the Commonwealth System of Higher Education, P.1

(11) Vijay Kumar Thakur, ibid, 1999, P.80

(12) Lynn White Jr., 'The Historical Roots of Our Ecological Crisis', Science, 1967, 150: 1204 in KTS Sarao, "Buddhist Quest for Deep Ecology",In S. R. Bhatt (Ed),

Buddhist Thought and Culture in India and Korea. Indian Council of Philosophical Research. 2003, P.3
(13) Victor S. Kuwahara and Shuichi Yamamoto, 'How does Buddhism Contribute to the Environmental Problems?',P.72, Digital Library of Buddhist Studies, http://enlight.lib.ntu.edu.tw
(14) Vikram Singh, ibid, 2015, P.82
(15) Lucas Johnstone, 'The Nature of Buddhism: A Survey of Relevant Literature and Themes', Worldviews, 2006, Vol. 10, No.1 (2006), Brill, P.79
(16) P. Morgan, & C. Lawton (ed), 'Ethical issues in Six Religious Traditions', Edinburgh University Press, Edinburgh, 1996, P.93
(17) Kabil Singh 'How Buddhism Can Help Protect Nature', S. Davies (Ed), Tree of Life: Buddhism and Protection of Nature, Geneva: Buddhist Perception of Nature, 1987, P. 10
(18) O.P. Dwivedi, (Ed), 'World Religions and the Environment', 1989, New Delhi. P. 19
(19) Vikram Singh, ibid, 2015, pp. 80, 83
(20) F. Hall, 'The Soul of a People', Macmillan, London, 1902,pp. 229-247
(21) E.F. Schumacher, 'Small is Beautiful: Economics as if people Mattered', Harper & Row, New York, 1973, P. 49
(22) Victor S. Kuwahara and Shuichi Yamamoto, 'How does Buddhism contribute to the Environmental Problems?' P. 72, Digital Library of Buddhist Studies, http://enlight.lib.ntu.edu.tw
(23) Vikram Singh, ibid, 2015, P.81
(24) KTS Sarao, 'Buddhist Quest for Deep Ecology',In S. R. Bhatt (ed), Buddhist Thought and Culture in India and Korea. Indian Council of Philosophical Research. 2003, P.3
(25) Oyuna V. Dorzhigushaeva and Aryana V. Kiplyuks, 'Environmental Ethics of Buddhism', International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 11, No. 3, March 2020, P.155
(26) Alfred Bloom, 'Buddhism, Nature and the Environment', The Eastern Buddhist, May, 1972, New Series, Vol.5, No. 1 (May, 1972), Eastern Buddhist Society, P. 120
(27) Donald K. Swearer, ibid, 2006, P.127
(28) Bhikkhu Buddhadasa&Phutasasanik Kap Kan Anurak Thamachat, 'Buddhist and the Care of Nature', Bangkok, Komol Thimthong Foundation, 1990, P. 35
(29) David L. Gosling, 'Religion and Ecology in India and Southeast Asia', Routledge, London and New York, 2001, P.71
(30) Alfred Bloom, 'Buddhism, Nature and the Environment', The Eastern Buddhist, May, 1972, New Series, Vol.5, No.1 (May. 1972, Eastern Buddhist Society, pp.115-129
(31) Leslie E. Sponsel, 'Buddhism and Ecology: Theory and Practice',University of Hawai, PoraneeNatadecha-Sponsel, Research Institute for Spiritual Ecology.
(32) Sulak Sivaraksa, 'Ecological Sufferings: From a Buddhist Perspective', Buddhist-Christian Studies, 2014, Vol. 34 (2014), University of Hawai Press on behalf of Society for Buddhist-Christian Studies ,pp.147-153.

Perspectives on Equity and Inclusion of Marginalized Community with Reference to NEP 2020

Biswajit Khan
Assistant Professor, Department of Education
Ashok Nilay Nivedita College of Education,
South 24 Parganas, West Bengal, India
Lipika Das
M.Ed., Satyapriya Roy College of Education,
Kolkata, West Bengal, India

ABSTRACT: The National Education Policy (NEP) 2020 of India aims to foster an inclusiveand equitable education system, emphasizing the need for equal access to quality education for all, particularly marginalized communities. This policy recognizes that social and economic disparities hinder theprogress of vulnerable groups, including Schedule caste (SCs), Scheduled tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Women, children with disabilitiesand socio economically disadvantaged groups. NEP 2020 Proposes a range of strategies to address these gaps to empower marginalized communities, providing them with the tools and opportunities necessary for social mobility and full participation in the nation's development. This focus on equity and inclusion is intended to foster a more just and egalitarian society, where all individuals, regardless of their background, can achieve their educational, social and professional potential. Key measures include the provision of scholarships, reservations in educational institutions and the creation of specialized support systems to ensure these communities have access to equality of education.The paper highlights the importance of affirmative actions, targeted educational programs, institutional reforms, universal access and inclusive curriculum aimed at bridging educational disparities. It also discusses the opportunities in achieving true inclusivity, emphasizing the need for cultural sensitivity, community engagement and resource allocation. The study concludes by implementation of these policies is critical in shaping on education system that truly reflects the principles of equity and inclusion, allowing marginalized groups to overcome historical barriers and attain their full potential.

Key Words: Equity, Inclusion, Marginalized Community, NEP 2020.

INTRODUCTION:

The National Educational Policy (NEP) 2020 represents a landmark reform in Indian educational framework with a deep commitment to equity and inclusion. One of its key objectives is to provide quality education to all students, regardless of their socio-economic background, caste, gender or disability. In this context, the NEP2020 acknowledges the pressing need to address the disparities faced by marginalized communities in accessing and benefiting from the educational system. India's marginalized communities, including Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST),Other Backward Classes (OBC), minorities, and economically disadvantaged groups, have long faced system barriers that hinder their full participation in education. Education is a powerful tool that can prevent inequality. By this it is possible to maintain social justice, social harmony, equity, dignity and happiness for Indian society. Equity and inclusionis concerned with fairness, justice and it recognizes that people may have different circumstances. In a diverse country like India, where educational inequalities are deeply rooted in socio economic, cultural and geographical factors. The policy highlights the importance of creating fair educational system. By prioritizing the needs of marginalised groups. The policy recognizes that traditional education system often fails to address the varied challenges faced by marginalised community, it promotes measures such as universal access to education, inclusive curriculum and pedagogy, academic support etc.

India, as proposed by PM Narendra Modi, the NEP 2020 provide access to the educational opportunities, especially for SC, ST, OBC, Disabled, Women, Transgender and many other forms or marginals. It has appeared as a document of commitment for proper dignified, equality and inclusion emerged in our society. NEP 2020 is emphasized to avoid all these segregation and isolation. It is protective discrimination and constitutional safeguards for all marginalised group of society. NEP 2020 edict reservation policy as per Indian constitutional article. It is a document of commitment for proper dignified, equality and inclusion of the marginal. In India province targets social, economic, political justice for all human. Move onwards in the way of ‘New India’ as set one’s heart on by PM Sree Narendra Modi. NEP 2020 confirm persistence of successful ongoing programme. Being it is inform for fundamental reforms in the educational system, through equity and inclusion will make India a world knowledge power and all marginalized groups will give importance of quality education as well as encourage lifelong opportunities for all people. The ultimate goal is to create on education system that is not only inclusive in theory but also in practice, ensuring that all children, regardless of their background, have access to quality education and the opportunities it affords. Through these initiatives, NEP 2020 aims to empower marginalized communities by fostering an education system that is not only inclusive but also responsive to the challenges and

aspirations of these groups, ensuring that they have the supportive tools, adequate resources and giving opportunities to succeed in a rapidly evolving world.

OBJECTIVES OF THE STUDY

- To promote inclusion, bringing out equity and developing respect for diversity.
- To look up the inclusion of marginalized community.
- To study focus on the social justice and holistic development of marginalized community with special reference NEP 2020.
- To study the impact of NEP 2020 on marginalized community.
- To look up promoting equal access to the education to all forms of marginals.

METHODOLOGY

This study employs a qualitative approach and descriptive research design. The study relevant secondary data was gathered from books, papers, and other websites, documents as well as from magazines, Journals and other publications. The findings and conclusion were then drawn after this data was in-depth analysis of the concepts explore the equity and inclusion of marginalized community in NEP 2020.

DISCUSSION

Landscape of equity and inclusion of marginalized community with reference Indian constitution to NEP 2020:

The landscape of equity and inclusion for marginalized community in India, as outlined through the Indian constitution and the NEP2020 reflects on social justice and equal opportunities for all citizens. The preamble of the constitution emphasizes the importance of education and equal opportunities without discrimination, where fundamental rights ensure equal opportunities empowerment of marginalized groups. Based on the Indian constitutional framework the NEP 2020 of the Government of India emphasized on providing humane education, address disparities, promote inclusivity and equal rights.These two documents provide a foundational legal and policy framework that seeks to address historical inequalities and foster a more inclusive society, with a particular focus on marginalized groups such as Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), women, religious minorities, Persons with disabilities (PWD) and others.

The Indian Constitution and National Education Policy (NEP 2020) plays a crucial role in promoting equity and inclusion within the country. Here some Indian Constitution article ways in which it Supports:

- Article 14: Including the right to equality which prohibits discrimination.

- Article15 (4) and 16(4): Provide reservations ineducation, employment and legislature for historically marginalized groups such as SC, ST and OBC.
- Article 15: Prohibition of discrimination based on sex.
- Article 16: Ensures equality of opportunity for all citizens in matters related to public employment
- Article 17: Abolishes untouchability based on caste or social status.
- Article 29 and 30: Protect the rights of minorities, including religious, linguistic, and cultural minorities, to preserve their distinct identify.
- Article 45: Free and compulsory education for children.
- Article 46: Promote educational and economic interests of the weaker section of the people.

In essence, the Indian constitution such as powerful tool for social justice, promote inclusivity, ensure equality of the nation. It is not only provide protection of weaker section, but also ensures that marginalized communities opportunities for equality, disparity, empowerment of the society.

The NEP 2020 introduced by the Government of India, make a transformative shift for education system in India. It emphasizes on quality, diversity, access, and inclusion in society with a particular focus on marginalized communities.The policy provides a comprehensive framework to promote equity and inclusion of marginalized communities addressing historical and systematic barriers and promote accessing quality education.NEP 2020 ensure that provide to equality life irrespective of their gender, socio-economic status, disability etc.

NEP 2020 (Part-1: School Education) in Chapter 6 specifically addresses the needs of marginalized communities in India. This chapter is to break the historical and systematic barriers that prevent marginalized communities from accessing quality education. Here in a detailed description in below:

- Section 6.1 Importance of removing barriers such as financial constraint, geographical isolation and discrimination.
- Section 6.2 Addressing socio-economic disparities in education across the country.
- Section 6.3 States special support for marginalized groups, like as scholarships, free textbooks, uniforms, hostelsetc.
- Section 6.4 Promotegender inclusion Includes girls, transgender, gender-diverse groups.
- Section 6.5 Focas on an inclusive approach to education for children with disabilities.
- Section 6.6 Proposed flexible learning options such as distance education and open schools.
- Section 6.7 Emphasizes the importance of multilingualism and recommends the use of mother tongue or regional languages as the medium of instruction.

- Section 6.8 Statesestablishment of support systems for disadvantaged groups such as counselling services, mentorship programs and peer support groups.
- Section 6.9 Focus on rural and remote areas for a target approach to improvingeducation.
- Section 6.10 Encouraged a socially inclusive curriculum to reflect the diverse cultures, traditions of different communities, especially marginalized groups.
- Section 6.11 Proposes bridge courses, remedial classes and special educational interventions to address these gaps and helps of marginalized group of students.
- Section 6.12 Focus on inclusive classroom for build their capacity to handle diverse classrooms.
- Section 6.13 Ensure that reservations and affirmative action policies in universities and colleges of marginalized Communities.
- Section 6.14 Emphasizes on targeted strategies for tribal students. The inclusion of tribal languages in the curriculum, the establishment of tribal school or educational centers access to quality education.
- Section 6.15 Provides of safe learning environments where every child perspective of gender, caste or disability feels secure.
- Section 6.16 Recommends increasing financial and material support for students from marginalized community.
- Section 6.17 Encourages activeparental involvement especially those from marginalized rural backgrounds.
- Section 6.18 Ensure that digital platforms, virtual classrooms and assistive technology for students of marginalized community, have access to quality learning experiences.
- Section 6.19 Proposes a strong monitoring mechanism to ensure that quality measures through collection of data on disadvantaged groups.
- Section 6.20 Advocates for the launch of public awareness campaigns to Promote the importance of education for all, especially for marginalized groups.

These sections of the NEP 2020 Provide a detailed roadmap to ensure that the education system as well as social organization in India. By addressing the unique challenges faced by marginalized communities and to create a more inclusive and equitable education system.

Equity and inclusion of marginalized community with reference NEP 2020:
NEP 2020 emphasis on promoting equity and inclusion for marginalized communities. Here are some key aspects related to equity and inclusion in NEP 2020.

1. **Access to education for marginalized Communities:**

Universal access: NEP 2020 aims to provide universal access to equality education for particular marginalized groups like as SC, ST, OBC, and socio economically disadvantaged groups.

Special Emphasis on underrepresented groups: This policy focus on first-generation learners' children from marginalized communities, those who are rural and remote areas.

2. **Inclusive curriculum:**

This includes cultural diversity, indigenous knowledge systems and the history and contributions of marginalized Communities.

3. **Language and medium of instruction:**

The policy promoting multilingualism. This is particularly beneficial for children from marginalized Communities, who face challenges in understanding content they are not familiar with.

4. **Scholarship and financial support:**

NEP 2020 significant expansion in scholarship schemes for students of marginalized communities. It also for financial aid and waivers for students from economically weaker sections to access both schooling and higher education.

5. **Teacher training and sensitization:**

Teacher will be trained to understand diversity engage with students from backgrounds. and create inclusive learning Environment.

6. **Technology and digital inclusion:**

NEP 2020 promote for the use of technology to bridge educational gaps, especially for marginalized communities like e-Content, online learning platforms, providing internet access, and digital devices.

7. **Special programs for Socio-economically disadvantaged groups (SEDGS):**

Focus interventions for marginalized community includes for SC, ST, OBC, minorities, children with disabilities and children from economically disadvantaged backgrounds. Focus on specific support and tailored initiatives.

8. **Free and Compulsory Education:**

Ensures free education for all children particularly focusing on marginalized groups.

9. **Gender Equity:**

NEP 2020 emphasis on gender inclusion across all girls, transgender students and other minorities have equal opportunities.

10. **Reservation and affirmative action:**

Reservations in Higher Education to opportunities for students from SC, ST, and OBC.

11. Support for remote and rural areas:
Special Recommendations for rural, tribal, and remote communities to overcome barriers like economic, distance from educational centres, lack of Infrastructure, limited resources.

CHALLENGES TO IMPLEMENTATION ON EQUITY AND INCLUSION

Challenges to Implementation while NEP 2020 provides a comprehensive framework for equity and inclusion, its effective implementation faces several challenges:

- Many marginalized communities, especially in rural and tribal areas, lack of adequate resources such as, educational infrastructure, access to digital tools, qualified teachers etc.
- Many marginalized communities are not fully aware of the opportunities provided under NEP 2020, like as scholarships, special support for or provisions for children with disabilities.
- NEP 2020 emphasis on mother tongue instruction, but there may be resistance to the use of regional languages in places where Hindi or English is the dominant medium of Instruction.
- Teacher havea important role of inclusive society but always not a possible, teachers must be adequately trained in understanding the needs of marginalized students, including those with disabilities and cultural backgrounds.

RECOMMENDATION AND SUGGESTION

The recommendations and suggestion are provided keeping in mind the equity and inclusion of marginalized community who are involved and get benefits.

- Marginalized communities often live in lack of basic infrastructure, without adequate resources, inclusive education initiatives may be difficult. So, the government should allocate more funds specially for the education of marginalized communities.
- Marginalized communities also face cultural and social barriers. Involving the community can help overcome challenges and develop school attendance and performance.
- Provide encouragement for institutions that successfully implement diversity and inclusion in their direction, with an emphasis on creating role models for from marginalized communities.
- Introduce merit-cam-means scholarships. Specifically for Students from marginalized backgrounds, as well as first-generation learners.
- Pre-school to Higher Education should offer additional academic support for marginalized groups, such as remedial classes, peer tutoring, career counselling etc.

- Encourage marginalized community to actively participate in school management committees.
- Promote vocational education, skills training andguarantee job placements for marginalized groups.
- Provide opportunities for create educational tools, materials and to Teacher training programs these communities can access education in their education in their mother tongues.

CONCLUSION

India's journey toward equity and inclusion for marginalized communities has been shaped significantly by the Indian Constitution and more recently, the NEP 2020. While significant progress has been made challenges persist, requiring continuous efforts to ensure that the benefits of education are equally accessible to all sections of society. These documents provide a foundational legal and policy framework that seeks to address historical inequalities and foster a more inclusive society, with a particular focus on groups. Through its provisions, the NEP seeks to ensure that every child, irrespective of their background, socio-economic status, gender and disability has the opportunity to receive quality education, by addressing issues of access, affordability and equality, the policy aims to ensure that no child is left behind, regardless of their social, economic, cultural or physical circumstances. NEP 2020 holds the promise of more equitable education system that is better equipped tomeet the needs of India's diverse population. However, its true success will depend on the effective execution of its provisions andensuring that the voices of marginalized communities are not only heard but actively empowered in the educational process. The success of these initiatives will depend on effective implementation, active participation from various stakeholders and a commitment to overcoming socio-economic and systemic barriers that continue to affect marginalized groups in India.

REFERENCES:

1. Chawla, D.B. (2024). Transforming Indian Education: An Overview of NEP 2020. *International Journal of Innovations In Science Engineering And Management, 3(3), 75-81.*
   Retrieved Form: https://ijisem.com/journal/index.php/ijisem/article/view/31
2. Gupta, L. (2024). National Education Policy (NEP) 2020 and the path to equitable education for gender-diverse students. *National Journal on 'Social Issues & Problems',*13(02), 79-82.
   Retrieved Form: https://www.researchgate.net/profile/Lakshana-Gupta/publication/387053953_
3. Jana, D. M. (2021). Perspectives on Equitable and Inclusive Education with Reference to National Education Policy-2020.*Future of Media Education,338-347.*

Retrieved
Form:https://www.academia.edu/download/84798961/Future_of_Media_Education_NMC2021.pdf
4. Kalita, D.P.C. (2024). Equitable and Inclusive Education of NEP 2020: It's Importance for Learning Perspective. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(5), 1-6.
Retrieved Form: https://www.ijfmr.com/papers/2024/5/27460.pdf
5. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Government of India.
Retrieved Form:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
6. Shivam, P.K. (2024). Transforming Education for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Connection to NEP-2020.*Online International Interdisciplinary Research Journal,14, 27-33.*
Retrieved Form: https://www.researchgate.net/profile/Priyank-Shivam/publication/382179063
7. Singh, D., & Mishra, R. S. (2023). Equity and Inclusion in Indian Education: Constitutional Principles and NEP 2020 Approaches. *BSSS Journal of Education*, 12(1), 106-117.
Retrieved Form: https://doi.org/10.51767/je1208
8. Varshney, D.P., & Ahlawat, D.D. (2022). National educational policy-2020: Vision on inclusive education for 21st century learners. *International Journal of Multidisciplinary Trends*, 4(2), 88-94.
Retrieved Form: https://www.multisubjectjournal.com/article/192/4-2-43-608.pdf.

Role of Visual Identity Design in Branding Higher Educational Institutions of West Bengal

Rahul Kumar Shaw
Research Scholar, Department of Applied Arts
Banaras Hindu University, Varanasi, India

ABSTRACT: This paper explores the significance of visual identity design in higher education branding, focusing on West Bengal institutions. Visual identity serves as the face of a brand, creating emotional connections and recognition through the strategic use of elements like logos, emblems, seals, colours, and typography. The study analyses the visual identities of select higher education institutions in West Bengal, as per the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024, highlighting the blend of traditional and contemporary design approaches. Historical institutions like Jadavpur University and Calcutta University maintain traditional design elements, reflecting national symbols and heritage, while modern institutions such as IISER adopt more subjective, contemporary styles. The paper emphasises the importance of balancing an institution's historical and cultural context with its vision, advocating for minimalistic designs that ensure versatility across diverse media. The findings provide valuable insights into the role of visual identity in academic branding, offering a reference for future higher education branding strategies.
KEYWORDS: Visual Identity, Higher Education Branding, National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024, Traditional Design Elements, Contemporary Design, Minimalistic Design.

1. INTRODUCTION:

Visual identity: The word itself is the face of any branding; as we say, it is a key term. In higher education institutions, branding is a part of how an educational institution creates its image in the outside world. Thus, visual identity design comes into existence in branding.

Visual identity design is not merely an aesthetic feature but is fundamentally the face of the brand. It serves as the first point of contact between the brand and its audience, shaping perceptions, creating emotional connections, and fostering recognition through strategic use of visual elements. (Henderson, P. W., & Cote, J. A. 1998)

In the context of higher education, visual identity serves as the tangible representation of an institution’s brand, encapsulating its history, culture, and

aspirations through consistent and thoughtfully designed visual elements. (Chapleo, C. 2015).

Previous studies on branding in higher educational institutions show a lack of visual design aspects. This paper aims to address visual identity design and its importance in branding. It also addresses the importance of West Bengal's educational and cultural role. As we know, Bengal was the epicentre of the Indian Renaissance in the 20th century. Education, culture, and art are at their highest pick, which affects its visual aspects. In the design context, visual identity design also affects educational branding.

This paper structured the content analysis of the visual identity design elements, such as Logo, Emblem, seal, colour, and typography, from the selective higher educational institutions of West Bengal to the preference of the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024.

1.1 Contribution

The research contributes significantly to the design and branding aspects of higher education institutions by systematically analysing visual identity elements such as logos, emblems, seals, colour schemes, and typography. It highlights the critical role of these elements in shaping and maintaining an institution's image, thereby bridging a gap in the existing literature where the visual design of institutional branding is often overlooked. Through content analysis, this study offers a comprehensive understanding of how visual identity influences perceptions of an institution’s credibility, legacy, and cultural alignment.

Additionally, the findings provide actionable design guidelines, emphasising the alignment of visual identity with regional, cultural, and historical contexts, as seen in the case of institutions in West Bengal. This aligns institutional branding with their core values and heritage, fostering a deeper connection with stakeholders. Such insights are invaluable for academic policymakers, helping them understand the strategic importance of visual identity in enhancing institutional reputation and competitive advantage.

The research serves as a practical resource for designers and professionals in related fields, offering frameworks and benchmarks for creating impactful visual identities that resonate with both local and global audiences. Ultimately, this study not only advances academic discourse on educational branding but also serves as a guide for developing cohesive, culturally enriched, and visually compelling identities for higher education institutions.

2. RESEARCH QUESTIONS

The research addresses the three basic questions: are

1. Which parameters have to be understood by visual design and branding?
2. Does visual identity design play a crucial role in branding?
3. Does visual identity design affect institutional branding?

3. RESEARCH METHOD

The study adopts a content analysis methodology to examine the role of visual identity in branding among top higher educational institutions in West Bengal, selected based on the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024. Content analysis is a systematic and objective technique for analysing visual and textual elements, enabling the research to uncover patterns, meanings, and associations within institutional branding. This method is particularly well-suited for exploring the tangible components of visual identities, such as seals, emblems, logos, colour palettes, and typography, as well as their integration into institutional branding strategies.

The research involves collecting and categorising visual elements from the selected institutions to assess their design principles, cultural influences, and consistency with branding objectives. Special attention is given to these elements' symbolic, historical, and aesthetic aspects, recognising West Bengal's unique cultural and educational heritage. By analysing these elements, the study aims to identify how visual identity aligns with the institution's mission, vision, and values and impacts stakeholder perceptions.

The study also considers regional influences, examining how West Bengal's rich artistic and cultural traditions shape the visual language of institutional branding. This analysis provides insights into how visual identity design can enhance institutional recognition, foster cultural resonance, and contribute to a competitive edge in the higher education sector.

3.1 Analysis

Before advancing further, it is necessary to present a conceptual understanding of the term related to this paper. According to Wheeler (2017), *"Visual identity is a key component of branding, serving as a cohesive system that communicates an organisation's purpose and character through its visual elements, thereby influencing perception and fostering recognition."* This highlights the importance of a unified visual system that allows a university to project a clear and consistent image. The key elements within this system, such as typography, color schemes, and logo design, serve as foundational tools that help shape the brand's identity. Henderson and Cote (1998) assert that *"Typography, colour schemes, and logo design are the core elements of visual identity that work synergistically to build brand recognition and emotional resonance."* These components, when used effectively, can forge strong emotional connections with both prospective students and the wider academic community.

In the context of higher education, the visual elements of a university's brand go beyond aesthetic appeal—they function as a symbolic representation of the institution's values and academic reputation. As Waeraas and Solbakk (2009) emphasize, *"The visual elements of a university's brand, including logos, colours, and typography, act as a 'signature' that reinforces its academic*

reputation and positions it as a desirable choice among competitors." This underscores how a university's visual identity can influence its perception in a competitive educational market. Furthermore, in an era of increasing commercialization in higher education, it becomes crucial for institutions to develop a visual identity that resonates with diverse audiences. Hemsley-Brown and Goonawardana (2007) note that *"Developing a strong visual identity helps universities navigate the increasing commercialization of higher education, ensuring their values are effectively communicated to diverse audiences."*

Kapferer (2012) emphasises that *"To build a strong brand, visual design must encompass several key parameters, including clarity of message, consistency in use, visual appeal, and the ability to adapt to changing market dynamics without losing the essence of the brand."*

These principles guide universities in creating a flexible and resilient brand identity that can evolve without compromising its core values. Therefore, a carefully designed visual identity is essential for shaping how universities are perceived in the academic sector and within the broader global market.

Table 1: Serial-wise list of the top two higher educational institutes in West Bengal from four different categories in the NIRF ranking 2024 (*Some institutes are repeated in other categories in the NIRF ranking, which are not included in this table; the next institute in the ranking is selected sequentially*).

Universities	Colleges	Research Institutes	Engineering
• Jadavpur University (Rank 9) • Calcutta University (Rank 18)	• Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College (Rank 3) • St. Xavier`s College (Rank 6)	• Indian Institute of Technology Kharagpur (Rank 3) • Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (Rank 38)	• National Institute of Technology Durgapur (Rank 44) • Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (Rank 49)

3.2 Content analysis to investigate visual identity design elements (Seal, Embalm & logo, including colour palette and typography) of higher educational institutions in West Bengal from five different categories in the NIRF ranking 2024.

Table 2: The categorisation of Universities among higher educational institutions in West Bengal, based on the NIRF 2024 rankings

Jadavpur University, Kolkata	**Introduction:** The university Seal and emblem consist of three lamps circled in lotus petals, executed under the direction of Sri Nandalal Bose. The lamps represent Knowledge, while the three flames represent intellectual training, emotional integration, and the imagination of spiritual development. The lotus petals in the periphery represent philosophy, the fine arts, and culture. **Colour palette:** The university branding uses a single colour, Indian red, which is deeply associated with the land of Bengal, its history, and tradition. The colour reflects vibrancy and vitality; in Indian culture, red is a sacred colour, representing purity, devotion, and auspiciousness. Its earthy tone also suggests a connection to the land and groundedness, which suits brands focusing on sustainability or heritage. **Typography:** The typography is used as bilingual. The upper part is in Bengali Script, and the bottom is in Devnagari. Both fonts are primarily handcrafted in nature and liable for their use.
Calcutta University, Kolkata	**Introduction:** The university's current seal features a lotus at its centre, encircled by human figures holding hands. The outer circle includes a depiction of the sun, symbolising a source of energy. **Colour palette:** The university seal is shown in black. Black often symbolises authority, tradition, and sophistication. Its use conveys a sense of strength, formality, and timelessness, aligning with an academic institution's values and heritage. Additionally, black ensures high contrast and clarity, making the seal easily recognisable across various mediums. It can also represent neutrality and universality, emphasising the institution's inclusive and academic focus if used strategically. **Typography:** The seal's typography displays the university's name and motto in a clean, well-

	balanced layout using a legible sans-serif font. This modern style ensures clarity and readability, making the text easily visible across different mediums.

Table 3: The categorisation of Colleges among higher educational institutions in West Bengal, based on the NIRF 2024 rankings

Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College, Kolkata	**Introduction:** The emblem of the Ramakrishna Mission, designed by Swami Vivekananda, by order of Ramakrishna. It is a profound symbol of harmony and synthesis. It reflects his message of spiritual fulfilment through the union of Karma, Bhakti, Jnana, and Yoga. The emblem's elements, wavy waters (Karma), lotus (Bhakti), rising sun (Jnana), serpent (Yoga and awakened Kundalini), and swan (Paramatman), represent the path to realising one's true Self and achieving spiritual freedom. Swamiji emphasised that this realisation frees one from limitations and connects one with universal existence, embodying the essence of his teachings: "Be free. This is the whole of religion. **Color Palette:** The emblem of the Ramakrishna Mission follows natural hues. The outer serpent is golden yellow, the swan is bluish-white, the ocean is blue, and the sun and its rays are in orange and yellow. The lotus is pink, and the ribbon at the bottom is yellow and orange. **Typography:** The emblem's typography uses Devanagari at the bottom of the seal for the motto of the Ramakrishna Mission. At the same time, the mission's name is written in English using a sans-serif font on a separate traditional ribbon.
	Introduction: The Crest of St. Xavier's College, inspired by the Jassu Crest of Saint Francis Xavier's family, adapts to Indian surroundings. The white and blue escutcheon features a tiger, a palm tree, and a crescent moon, symbolising Xavier's heritage. The "HIS" inscription signifies Jesuit identity, while the checked base reflects Xaverian unity. Encircled by a garter inscribed "St.

St. Xavier`s College, Kolkata	Xavier's College, Calcutta" and surmounted by a Cross emitting holy rays, the emblem is completed with the motto "Nihil Ultra" (Nothing Beyond). **Colour Palette:** The emblem of St. Xavier's College, Kolkata, features a vibrant colour palette based on the primary hues of red, blue, and yellow. Red symbolises courage, strength, and passion, reflecting the institution's commitment to fostering leadership and resilience. Blue represents wisdom, integrity, and the pursuit of knowledge, aligning with the college's academic excellence and ethical foundation. Yellow signifies creativity, optimism, and enlightenment, encapsulating the vibrant spirit and intellectual growth encouraged within the campus. **Typography:** St. Xavier's College, Kolkata's emblem incorporates two distinct typography styles to blend tradition and modernity. The circular text features an Old English font, evoking a sense of heritage, authority, and classical elegance that reflects the institution's rich historical legacy. In contrast, the bottom section employs a sans-serif font, which is clean, modern, and legible, symbolising progress, accessibility, and a forward-looking vision.

Table 4: The categorisation of Research Institutes among higher educational institutions in West Bengal, based on the NIRF 2024 rankings

Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur	**Introduction:** The emblem of IIT Kharagpur combines symbolic elements to express its core values and mission. At its centre is a peepal tree with five leaves, symbolising growth, knowledge, and enduring wisdom. Beneath the tree is an open book representing the pursuit of education and learning, which also signifies the four Veda. The emblem is enclosed in a circular design with gear nods, symbolising technology and engineering. The outermost ring of the design evokes the image of the sun. **Colour:** The emblem of IIT Kharagpur uses a single

	blue colour, symbolizing trust, wisdom, stability, and intelligence. This monochromatic palette ensures simplicity, clarity, and professionalism, reinforcing its strong visual identity and global reputation as a prestigious educational and research institution. **Typography:** The emblem features a bilingual logotype arranged in a circular format. The upper section displays the text in an English sans serif font, while the inner section uses the Devanagari script. The established year is also presented in English numerals at the bottom, accompanied by the motto, which is also displayed in Devanagari.
IISER KOLKATA Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, Mohanpur	**Introduction:** The logo of IISER Kolkata features a modern, contemporary design with a minimalist and abstract approach. The central elongated element likely amalgamates the letters "IIS" while also resembling the pattern of DNA. The black centre symbolises an eyeball, and the three panels on the left represent science and research's past, present, and future significance. **Colour:** The logo incorporates a simple yet effective color palette featuring two primary hues: neutral grey and sky blue. The neutral grey conveys a sense of balance, sophistication, and professionalism, while the sky blue evokes a feeling of innovation, clarity, and openness, aligning with the scientific and research. **Typography:** The logo features a modern sans-serif condensed font, carefully chosen to enhance legibility and complement the minimalist design approach. This typeface reflects a contemporary aesthetic, emphasising clarity and precision while aligning with the institution's innovative and forward-thinking identity.

Table 5: The categorisation of Engineering Institutes among higher educational institutions in West Bengal, based on the NIRF 2024 rankings

National Institute of Technology Durgapur, Durgapur	**Introduction:** The emblem of NIT Durgapur prominently features an earthen lamp at its centre, symbolising knowledge and enlightenment. Surrounding the lamp is a triangle, which likely represents the institute's stability, strength, and purposeful direction. Encasing this central motif is an outer design resembling the sun's rays, reflecting the idea of gearing up skills and fostering innovation. **Colour:** The seal features blue for trust, wisdom, and stability, symbolising scholarly excellence, and red for the flame, representing energy, passion, and the spark of enlightenment. Together, they embody the balance of tradition and progress. **Typography:** The emblem features NIT's full name in a clean, modern sans-serif English font, ensuring clarity and professionalism. Below it, the institute's location is displayed in the same font for consistency. At the bottom, the institute's motto is presented in elegant Sanskrit text.
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah	**Introduction:** The IIEST recently unveiled a modern logo highlighting the iconic Historical Clock Tower, symbolising its legacy. The logo integrates a redesigned gear motif, blending tradition with modernity. This gear also symbolises a rising sun, representing innovation, progress, and a bright future. **Colour:** The logo features a minimal design with blue and yellow as primary colours. Blue symbolises trust, knowledge, and stability, while yellow represents energy, optimism, and innovation. **Typography:** The logo incorporates bilingual typography, showcasing the institute's name in English and Devanagari. The Sanskrit text at the top of the logo displays the institute's tagline, reflecting its cultural roots. The established year is at the bottom, presented in English and Devanagari, to maintain a harmonious and inclusive design.

3.3 Result of Content analysis from investigating visual identity design elements (Seal, Embalm & logo, including colour palette and typography) of higher educational institutions in West Bengal from four different categories in the NIRF ranking 2024.

Jadavpur University, Kolkata	The emblem of Jadavpur University combines cultural and traditional motifs, reflecting its rich heritage and values. Designed by renowned artist Shri Nandalal Bose, it embodies a deep connection to Indian art and culture. Serving as both a seal and the foundation for its modern logo, the design bridges historical roots with contemporary relevance. Technically, the emblem's minimalist design ensures versatility and adaptability across diverse media, including print, web, and digital platforms. Its simplicity, clean lines, and balanced composition guarantee clarity and scalability, maintaining aesthetic value at all sizes. By blending tradition with innovation, the emblem is a timeless and efficient symbol, representing the university consistently and effectively.
Calcutta University, Kolkata	The current visual identity evolved from the earlier seal, incorporating a blend of cultural motifs. This contemporary design is thoughtfully crafted for diverse applications, balancing tradition with modernity. A single colour enhances its elegance while using lines that place it within the minimalist design category. Its versatility ensures seamless use across various media, from print to web. The typography is legible and suitable for official purposes, ensuring clarity and readability across all platforms.
Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College, Kolkata	The emblem's concept and design were meticulously crafted, symbolising Indian culture, education, and tradition. The logo incorporates natural colours that appeal to a wide audience, from laypersons to intellectuals. The typography is thoughtfully designed to ensure readability and reliability, seamlessly integrating with the emblem's aesthetic. Using a single colour enhances its simplicity and institutional identity, making it a standout example of emblem design in form and function.
St. Xavier`s College, Kolkata	The visual identity of St. Xavier's College reflects its historical roots and is influenced by Christian symbolism, as evident in its visual elements. The emblem does not adhere to contemporary minimalist design principles, which could lead

	to technical challenges when adapting it for diverse applications and modern usage.
Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur	The visual identity of IIT Kharagpur reflects Indian knowledge systems and conveys its core message through its emblem. Thoughtful typography and a single colour enhance the logo's versatility, making it highly adaptable across diverse media platforms.
Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, Mohanpur	The visual identity of IISER follows contemporary minimal design trends, utilising a limited colour palette and illustrative elements. This approach makes the design aesthetically pleasing and ensures it is technically sound and versatile. The simplicity of the design enhances its clarity and impact across various media while maintaining a modern, professional look that resonates with the institute's forward-thinking ethos. By focusing on minimalism, the visual identity remains timeless and easily adaptable to different formats and platforms.
National Institute of Technology Durgapur, Durgapur	NIT's visual identity features an emblem that blends traditional and contemporary design elements, making it versatile and easily adaptable across various media. A carefully chosen colour palette enhances the identity's visibility and product appeal while maintaining a modern aesthetic. This balanced design ensures that the emblem reflects the institution's heritage and remains relevant and impactful in today's diverse and dynamic media landscape. Its simplicity and clarity make it effective for various applications, from print to digital platforms.
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah	IIEST's visual identity features a new logo, replacing the traditional emblem. Using an iconic building in the design strengthens its connection with stakeholders, symbolising the institution's legacy and vision. The minimal graphic elements and carefully selected colour palette create a harmonious contemporary and traditional design blend. This modern approach ensures that the logo is visually appealing and highly adaptable, resonating with a broad audience while maintaining a sense of timelessness and relevance. Its simplicity allows for easy recognition and versatility across various media and platforms.

4. Conclusion:

In the content analysis of the visual identity of top higher education institutions in West Bengal, concerning the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024, it was found that many historical institutions, such as Jadavpur University and Calcutta University, follow more traditional design elements in their overall visual identity. These institutions often incorporate national symbols and classic motifs that reflect their long-standing heritage. On the other hand, more contemporary institutions like IISER tend to use subjective and modern elements in their visual identities, reflecting their forward-thinking approach.

The key takeaway from this analysis is that an institution's visual identity should balance its geographical and historical context and its core message. A successful identity blends local significance with the institution's unique vision. Furthermore, the design should follow minimalistic principles, using a limited colour palette and focusing on simplicity. This ensures that the identity remains versatile, practical across diverse media, and adaptable to changing platforms.

West Bengal offers some excellent examples of academic visual identity design, especially among more contemporary institutions. These designs resonate with modern trends and provide a valuable reference for future branding efforts at other higher education institutions. Such thoughtful, minimalistic designs can play a key role in shaping the visual identities of educational institutions in the years to come.

REFERENCES:

- Chapleo, C. (2015). University branding: What do students want to know? *Journal of Higher Education Policy and Management, 37*(6), 674-686.
- Henderson, P. W., & Cote, J. A. (1998). Guidelines for selecting or modifying logos. *Journal of Marketing, 62*(2), 14–30. https://doi.org/10.2307/1252158
- Hemsley-Brown, J., & Goonawardana, S. (2007). Brand harmonization in the international higher education market. *Journal of Business Research, 60*(9), 942-948. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.01.019
- Waeraas, A., & Solbakk, M. N. (2009). Defining the essence of a university: Lessons from higher education branding. *Higher Education, 57*(4), 449-462. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9155-z
- Wheeler, A. (2017). *Designing brand identity: An essential guide for the whole branding team* (5th ed.). John Wiley & Sons.

Image Sources:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Jadavpur_University#/media/File:Jadavpur_University_Logo.svg
- https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Calcutta#/media/File:University_of_Calcutta_logo.svg
- https://www.yogaiya.in/project/ramakrishna-mission-vivekananda-university/

- https://en.wikipedia.org/wiki/St._Xavier%27s_College,_Kolkata#/media/File:St._Xavier's_College,_Kolkata_logo.jpg
- https://en.wikipedia.org/wiki/IIT_Kharagpur#/media/File:IIT_Kharagpur_Logo.svg
- https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Institute_of_Science_Education_and_Research,_Kolkata#/media/File:IISER-K_Logo.svg
- https://logos.fandom.com/wiki/National_Institute_of_Technology_Durgapur?file=220px-NIT_Durgapur_Logo.png
- https://en.wikipedia.org/wiki/IIEST,_Shibpur#/media/File:IIEST_Shibpur_Logo.svg

Web Sources:

- https://sudiptodascalcutta.tripod.com/backup/jadavpur.htm
- https://belurmath.org/emblem/
- https://sxccal.edu/about-the-college#collapseSeven.

Dr. B.R. Ambedkar's Legacy and Contribution to Education in India

Ratan Sarkar
Assistant Professor, Dept. of Teachers' Training (B.Ed.)
Prabhat Kumar College, Contai (Affiliated to Vidyasagar University)

Abstract: Dr. B.R. Ambedkar, a prominent figure in the annals of Indian history, made noteworthy contributions across various spheres of society, particularly in the realm of education. This article delves into Dr. Ambedkar's educational legacy, delving into his staunch advocacy for the universalization of education, his pivotal role in formulating educational policies, his founding of educational establishments, and his fervent support for logical reasoning and the empowerment of women through education. By conducting a thorough examination of his contributions, this paper underscores the enduring influence of Dr. Ambedkar's educational vision and its significance for ongoing efforts towards educational reform in contemporary India.
Keywords: Dr. B.R. Ambedkar, Education, Advocacy, Educational Institutions, Rational Thinking, Women's Education, Social Justice, Equality, Empowerment, Educational Reform.

Introduction:

Dr. B.R. Ambedkar, esteemed for his pivotal role in crafting the Indian Constitution and his relentless championing of social justice, demonstrated a deep comprehension of the transformative potential inherent in education (Dhavaleshwar&Banasode, 2017; B. R. Ambedkar, 2013). Within his perspective, education was not solely a tool for acquiring knowledge, but rather the fundamental basis upon which individuals could liberate themselves from the shackles of oppression and prejudice (Keer, 1962; Ambedkar 1987). Dr. Ambedkar's steadfast dedication to advancing education, particularly for marginalized groups such as the Dalits, stands as a lasting testament to his principles of equality and empowerment (Datta, 2019; Vajpeyi, 2016; Dr. B.R. Ambedkar's Role In Women Empowerment, 2012). The present study aims to investigate the diverse contributions of Dr. B.R. Ambedkar to the educational landscape of India. It delves into his advocacy efforts, policy initiatives, establishment of educational institutions, and broader influence on shaping educational discourse within the nation. Through an examination of Dr. Ambedkar's educational initiatives, this paper endeavors to shed light on the profound legacy he has bequeathed and the enduring relevance of his ideals in contemporary endeavors for educational reform and social justice.

Dr. Ambedkar's Advocacy for Education for All

Dr. B.R. Ambedkar's support for education was motivated by his conviction that it played a crucial role in dismantling the oppressive caste system and promoting social equality within Indian society. He tirelessly advocated for equal educational opportunities, considering it a basic right that could free individuals from the chains of discrimination and marginalization (Zelliot, 2004; Velaskar, 2012).Being born into a Dalit family himself, Dr. Ambedkar was intimately aware of the systemic obstacles hindering marginalized communities from accessing education. He understood that education was not just a means for personal progress but a powerful tool for societal change. By arming individuals with knowledge and skills, education could challenge existing hierarchies and pave the way for a fairer and more just society (Gore, 1993).Dr. Ambedkar's advocacy for education was characterized by his unwavering resolve to challenge the existing norms. He fearlessly confronted social conventions and discriminatory practices that prevented Dalits and other marginalized groups from educational opportunities. Through his speeches, writings, and activism, he consistently stressed the importance of offering quality education to all members of society, regardless of caste, religion, or gender (Velaskar, 2012; BR Ambedkar: A Personal Tribute, 2004).At the core of Dr. Ambedkar's vision was the belief that education could disrupt the cycle of poverty and oppression perpetuated by the caste system. He was convinced that by providing individuals with knowledge and critical thinking abilities, education could enable them to stand up for their rights, challenge injustice, and strive for a more just future (Gore, 1993).In addition to advocating for equal access to education, Dr. Ambedkar also supported educational reform. He called for changes in the curriculum to encompass the diverse experiences and contributions of all communities, particularly those that had been historically marginalized (Keer, 1962). Moreover, he emphasized the importance of instilling values of social justice, equality, and empathy within educational institutions.Dr. Ambedkar's advocacy for education serves as a source of inspiration for activists and educators in India and beyond. His unwavering dedication to the transformative potential of education remains a guiding light for current efforts to create a more inclusive and fair society (Kumar, 2015). By honoring his legacy, we reaffirm our commitment to realizing his dream of a world where education acts as a beacon of hope and liberation for all.

Dr. Ambedkar's Role in Drafting Education Policies

Dr. B.R. Ambedkar's leadership, in his capacity as the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution, played a crucial role in shaping the educational clauses enshrined in the Constitution. His steadfast dedication to the principles of equality and social justice guaranteed that education became a basic entitlement available to all citizens, thereby establishing the groundwork for

inclusive educational policies in post-independence India (B. R. Ambedkar, 2003; Velaskar, 2012). Dr. Ambedkar's educational vision was firmly grounded in his comprehension of the widespread inequalities perpetuated by the caste system and socio-economic gaps in Indian society. He viewed education as a potent instrument for breaking down these barriers and fostering a more just society (Verma &Sohrot, 2004). Hence, throughout the Constitution drafting process, Dr. Ambedkar ardently supported the cause of education, advocating for its incorporation as a fundamental entitlement (Ambedkar: The man behind India's Constitution, 2017; Velaskar, 2012). A significant contribution of Dr. Ambedkar in shaping education policies was the inclusion of directive principles mandating the state to offer free and mandatory education to all children up to fourteen years of age (Ramadas, 2002). Article 45 of the Indian Constitution mirrors this commitment, establishing the groundwork for subsequent educational reforms aimed at ensuring universal access to education. Dr. Ambedkar's insistence on integrating principles of equality guaranteed that the educational provisions in the Constitution were not merely rhetoric but actionable directives for the state (Hanumanthappa, 2021; Agrawal, 2021). His vision stressed the necessity of affirmative action and special measures to tackle the historical injustices experienced by marginalized communities, especially Dalits, in accessing education. Additionally, Dr. Ambedkar's advocacy for inclusive education extended beyond formal schooling to encompass broader principles of social justice and empowerment. He acknowledged the significance of education in fostering critical thinking, rationality, and civic engagement among individuals, thereby promoting a more informed and participatory democracy (Sonpimple& Mohankumar, 2014). The legacy of Dr. Ambedkar's contributions to educational policy-making continues to reverberate in modern initiatives such as the Right to Education Act, which aims to guarantee free and compulsory education for all children, irrespective of their socio-economic status. His visionary leadership laid the groundwork for inclusive educational policies that aim to bridge the gaps of inequality and offer equitable opportunities to all citizens (Hanumanthappa, 2021). Therefore, Dr. B.R. Ambedkar's pivotal role in formulating educational policies for independent India underscores his profound commitment to advancing equality and social justice through education. His insistence on including educational provisions in the Constitution ensured that education emerged as a fundamental entitlement, thus paving the way for transformative reforms in the nation's educational framework.

Establishment of Educational Institutions

Dr. B.R. Ambedkar, in acknowledgment of the crucial necessity for educational infrastructure to elevate marginalized communities, initiated the founding of educational establishments with the aim of delivering high-quality education to

Dalits and other disadvantaged groups (Observing the Centenary of Dr. B.R. Ambedkar's enrollment as an advocate, 2023). Among these establishments, the People's Education Society (PES) occupies a significant position, illustrating Dr. Ambedkar's steadfast dedication to educational empowerment. Established by Dr. Ambedkar in 1945, the People's Education Society emerged as a beacon of optimism for individuals marginalized by caste-driven discrimination and socio-economic gaps. Envisioning the provision of fair educational opportunities, especially for Dalits who had historically been deprived of such chances, Dr. Ambedkar laid the groundwork for establishments that would evolve into symbols of societal change. One such institution operating under the umbrella of the People's Education Society is Siddharth College of Arts, Science, and Commerce, situated in Mumbai. Founded with the objective of furnishing comprehensive education to students from various backgrounds, Siddharth College embodies Dr. Ambedkar's vision of all-encompassing education (Queen, 2017). Through its extensive syllabus and dedication to nurturing analytical thinking and social awareness, the college persists in upholding the principles of its initiator. Siddharth College stands as evidence of Dr. Ambedkar's unwavering endeavors to establish educational environments where individuals from marginalized communities can attain superior education and actualize their complete capabilities (Hanumanthappa, 2021). The college not solely imparts scholarly knowledge but also cultivates principles of fairness, egalitarianism, and empowerment among its enrollees, thereby contributing to the wider objective of societal advancement. Additionally, Dr. Ambedkar's establishment of educational institutions mirrors his confidence in the transformative influence of education as a mechanism for dismantling the cycle of destitution and subjugation. Through the provision of educational opportunities, Dr. Ambedkar aimed to authorize individuals to challenge societal conventions and advocate for their entitlements, consequently fostering a more just and equitable society (Kumar, 2015; Special Content, 2018; Queen, 2017). Fundamentally, Dr. B. R. Ambedkar's initiation of educational establishments like the People's Education Society and Siddharth College underscores his enduring dedication to educational empowerment and social equity. These institutions not only grant admission to education but also operate as symbols of resilience and optimism for marginalized communities, embodying Dr. Ambedkar's aspiration for a more inclusive and fair society.

Promotion of Rational Thinking and Women's Education

Dr. B.R. Ambedkar was not only a visionary leader but also a staunch advocate for rational thinking, scientific temper, and women's education. He posited that these elements were essential tools for confronting superstitions, biases, and social injustices prevalent in Indian society. Dr. Ambedkar's endeavors in advancing rationality and championing women's education paved the way for

significant endeavors aimed at fostering gender parity in the realm of education(Verma &Sohrot, 2004). Recognizing the potency of education in nurturing critical thinking and rationality among individuals, Dr. Ambedkar acknowledged that superstitions and dogmas often functioned as instruments of subjugation, perpetuating disparities and impeding societal advancement. Consequently, he underscored the significance of cultivating a scientific mindset through education, prompting individuals to interrogate prevailing convictions and traditions grounded in evidence and logic (Zelliot, 2003). Through his literary works, orations, and advocacy, Dr. Ambedkar diligently toiled to dispel fallacies and confront illogical practices deeply rooted in Indian society. He contended that the promotion of rational thinking was crucial not only for individual empowerment but also for constructing a more enlightened and progressive society. Moreover, Dr. Ambedkar acknowledged the pivotal role of women's education in effecting social reform and nation-building. He grasped that the deprivation of educational opportunities for women not only sustained gender disparities but also impeded overall societal progress (Vajpeyi,2016). Hence, he championed endeavors aimed at fostering women's education and empowerment. Dr. Ambedkar's advocacy for women's education was underpinned by his conviction that educated women could assume a transformative role in contesting patriarchal norms, asserting their entitlements, and contributing to the socio-economic advancement of the nation. He accentuated the necessity of establishing educational pathways for women, thereby empowering them to actively engage in public spheres and decision-making processes. Dr. Ambedkar's initiatives in advancing rational thought and women's education facilitated considerable advancements towards gender equality in education (Pawar& Moon, 2008).His advocacy laid the groundwork for programs like the expansion of educational opportunities for girls, the advocacy for gender-inclusive curricula, and the enforcement of measures aimed at dismantling obstacles to women's education. Ultimately, Dr. B.R. Ambedkar's propagation of rational thinking and support for women's education epitomize his resolute dedication to social equity and parity. His endeavors in contesting superstitions and biases while fostering gender equality in education have created a lasting heritage, instigating continual endeavors towards constructing a more inclusive and enlightened society.

Conclusion

Dr. B.R. Ambedkar's educational legacy serves as a testament to his steadfast dedication to social justice, equality, and empowerment. His advocacy, policies, and founding of educational institutions have left a lasting impact on India's educational sphere, motivating generations to strive for a society that is more inclusive and just. Dr. Ambedkar's educational vision was firmly grounded in the belief that education is not just a tool for acquiring knowledge, but also a potent

instrument for challenging injustices and reshaping society. He acknowledged the transformative potential of education in dismantling the barriers of discrimination and oppression, especially for marginalized communities like the Dalits. In his role as the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar played a crucial part in shaping the educational rights enshrined in the Constitution. His emphasis on integrating principles of equality and social justice ensured that education became a fundamental entitlement accessible to all citizens. Dr. Ambedkar's vision set the stage for inclusive educational policies in post-independence India. Additionally, his establishment of educational institutions such as the People's Education Society and Siddharth College exemplified his commitment to offering quality education to marginalized groups. These establishments remain as symbols of empowerment and optimism, embodying Dr. Ambedkar's vision of a more inclusive and just society. Dr. Ambedkar's advocacy for rational thinking and support for women's education further highlight his dedication to social transformation and nation-building. His initiatives paved the way for significant progress towards gender equality in education and challenged deep-seated superstitions and biases that impeded social advancement. As India progresses on its path towards educational transformation, Dr. Ambedkar's vision acts as a beacon, reminding us of the transformative influence of education in constructing a brighter future for all. His legacy continues to inspire endeavors aimed at fostering a more inclusive, fair, and enlightened society, where each individual has the chance to realize their full potential through education.

References:

About Dr. B. R. Ambedkar | MEA. (n.d.). Ministry of External Affairs, Government of India. Retrieved from: https://www.mea.gov.in/about-amb.htm. Accessed on 12.04.2024.

Agrawal, S. (2021, April 30). Education and Its Influence on the Nation-Building Process: A Reflection on Ambedkar’s Views in Colonial India. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2455328X211008451

Ambedkar B. R. (1987). *Works by Babasaheb Ambedkar*, Vol. III. Bombay: Government of Maharashtra.

Ambedkar: The man behind India's constitution. (2017, December 6). Retrieved from: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-42234642. Accessed on 23.04.2024.

B. R. Ambedkar. (2003, March 17). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar. Accessed on 23.04.2024.

B. R. Ambedkar. (2013, April 1). Retrieved from: https://encyclopedia.thefreedictionary.com/B.+R.+Ambedkar. Accessed on 23.04.2024.

B. R. Ambedkar: A Personal Tribute. (2004, May 29). Retrieved from: https://www.countercurrents.org/dalit-prasad290504.htm. Accessed on 23.04.2024.

Centenary of Dr. B.R. Ambedkar's enrolment as an advocate. (2023, January 1). Retrieved from: https://main.sci.gov.in/AMB/home. Accessed on 21.04.2024.

Datta, R. (2019, February 22). Emancipating and Strengthening Indian Women: An Analysis of B. R. Ambedkar's Contribution. *Contemporary Voice of Dalit*, *11*(1), 25–32. https://doi.org/10.1177/2455328x18819901

Dhavaleshwar, C., &Banasode, C. C. (2017). Dr. B R Ambedkar as a Social Worker for the Marginalised Sections. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3044336

Dr. B. R. Ambedkar. (n.d). Dr. B.R. Ambedkar: Biography, Contributions & Legacies. Retrieved from: https://www.angelfire.com/ak/ambedkar/index.html. Accessed on 12.04.2024.

Dr. B. R. Ambedkar's Role in Women Empowerment. (2012, April 3). Retrieved from: https://www.legalservicesindia.com/article/1611/Dr.-B.R.-Ambedkar%E2%80%99s-Role-In-Women-Empowerment.html. Accessed on 21.04.2024.

Education for Liberation: Ambedkar's Thought and Dalit Women's Perspectives. (2012, July 5). https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/097318491200900206

Gore, M.S. (1993). *The social context of an ideology: Ambedkar's political and social thought*. New Delhi: Sage.

Hanumanthappa, D. G. (2021). Dr. B R Ambedkar's Impact on Dalit Rights. *International Journal of Political Science, 7*(2), 9-12. doi: https://doi.org/10.20431/2454-9452.0702003.

Keer, D. (1962). *Dr. Ambedkar: Life and mission*. Bombay: Popular Prakashan.

Kumar, A. (2015). *Radical equality: Ambedkar, Gandhi, and the risk of democracy.* Stanford: Stanford University Press.

Kumar, A., Bapuji, H., & Mir, R. (2021, February 25). "Educate, Agitate, Organize": Inequality and Ethics in the Writings of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. *Journal of Business Ethics*, *178*(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04770-y

Omvedt, G. (2004). *Ambedkar: Towards an enlightened India*. New Delhi: Penguin.

Pawar, U., & Moon, M. (2008). *We also made history: Women in the Ambedkarite movement*. New Delhi: Zubaan.

Queen, C. S. (2017). Ambedkar. *Buddhism and Jainism*, 88–96. https://doi.org/10.1007/978-94-024-0852-2_104

Ramadas, V. (2002). *Dr. B. R. Ambedkar as an educational and social reformer* [Thesis. Department of Adult Education and Extension Services, University of Calicut, Malappuram, Kerala, India].

Rodrigues, V. (2002). *The essential writings of B. R Ambedkar*. New Delhi: Oxford University Press.

Saha, M. (2016, December 6). Why Ambedkar's life and teaching is still relevant. Retrieved from: https://www.wionews.com/south-asia/opinion-why-ambedkars-life-and-teaching-is-still-relevant-9804 . Accessed on 23.04.2024.

Sonpimple, U., & Mohankumar, A. (2014, October 4). *Round Table India - Ambedkar's long neglected philosophy of education*. Retrieved from: http://roundtableindia.co.in/index.php?option=com_content&view=article&id=7668:amplifying-ignored-voices-through-education-drawing-lines-with-ambedkar&catid=119&Itemid=132. Accessed on 23.03.2024.

Special Content. (2018, April 20). Retrieved from: http://employmentnews.gov.in/NewEmp/MoreContentNew.aspx. Accessed on 12.04.2024.

Vajpeyi, A. (2016, June). Ambedkar and the Struggle for Women's Equality. *ANTYAJAA: Indian Journal of Women and Social Change*, *1*(1), 5–9. https://doi.org/10.1177/2455632716645966

Velaskar, P. (2012, July). Education for Liberation: Ambedkar's Thought and Dalit Women's Perspectives. *Contemporary Education Dialogue*, *9*(2), 245–271. https://doi.org/10.1177/097318491200900206

Verma, D., &Sohrot, A. (2004). *Ambedkar's vision and education of weaker sections* (1st ed.). Dr. Babasaheb Ambedkar National Institute of Social Sciences in association with Manak Publication Pvt. Ltd.

Zelliot, E. (2003). Dr Ambedkar and the empowerment of women. In Rao A. (Ed.), *Gender and caste* (pp. 204–217). New Delhi: Kali for Women.

Zelliot, E. (2004). *Dr. Babasaheb Ambedkar and the untouchable movement*. New Delhi: Blumoon Books.

Steel, Concrete, and Empire : The Development of Bridge Technology in Colonial Bengal

Santigopal Jana
Independent Researcher

Abstract: The colonial period in Bengal marked a transformative era in the realm of infrastructure development, with bridge construction playing a pivotal role in reshaping the region's landscape. British engineers, equipped with advanced technologies and materials like steel and concrete, sought to overcome Bengal's challenging geography of sprawling rivers, deltas, and wetlands. Bridges such as the Howrah Bridge and the Jubilee Bridge emerged as iconic examples of this transformation, showcasing the technological prowess and strategic priorities of the British Empire. These structures were not merely feats of engineering but also instruments of imperial control and economic exploitation.Through an analysis of key bridge projects, this paper highlights how these developments were intricately tied to the colonial agenda of resource extraction and administrative consolidation. While these bridges facilitated the seamless transport of raw materials such as jute, tea, and coal to global markets, they also disrupted local ecosystems and altered traditional livelihoods. The prioritization of urban connectivity and trade hubs underscored the exploitative nature of colonial policies, which often marginalized rural populations.This study examines the social, economic, and technological dimensions of bridge construction in colonial Bengal, offering a nuanced understanding of its dual legacy. It underscores the role of bridges as both symbols of progress and tools of exploitation, bridging not just rivers but also the complex intersections of imperial ambition, technological innovation, and socio-economic transformation. By situating Bengal's bridge-building efforts within the broader context of British colonialism, this paper provides insights into how infrastructure served as a cornerstone of imperial power while leaving a lasting impact on the region's historical and cultural fabric.

Keywords: Colonial Bengal, bridge construction, steel and concrete, British Empire.

Introduction: The colonial era in Bengal, spanning from the late 18th to mid-20th centuries, marked a period of unprecedented infrastructural transformation driven by the British Empire's strategic priorities. At the core of this transformation was the construction of bridges, which symbolized the technological and administrative ambitions of colonial rule. These structures were not only engineering marvels of their time but also instruments of imperial control, designed to facilitate economic exploitation and administrative

consolidation. Bengal's unique geography, characterized by an extensive network of rivers, deltas, and wetlands, posed significant challenges to connectivity, making the development of bridges an essential component of colonial infrastructure policy.Bridges such as the Howrah Bridge, Jubilee Bridge, and Hardinge Bridge exemplified the British Empire's commitment to modernizing Bengal's transportation network.By employing cutting-edge materials like steel and reinforced concrete, British engineers revolutionized bridge construction, creating durable structures capable of spanning the region's wide rivers. These bridges were strategically located to connect industrial hubs, agricultural zones, and ports, ensuring the efficient movement of goods and resources. However, this infrastructure was largely designed to serve the economic interests of the empire, often at the expense of local communities and ecosystems.

The construction of bridges in colonial Bengal was deeply intertwined with the broader objectives of British imperialism. They were integral to the expansion of trade networks, particularly for exporting raw materials such as jute, coal, and tea, which were vital to the British economy. Simultaneously, these projects reinforced the power dynamics of colonial rule, as local labor was exploited under harsh conditions to achieve imperial objectives.

Political and Economic Context: The colonization of Bengal by the British East India Company in the mid-18th century marked the beginning of a strategic transformation of the region's infrastructure. By the 19th century, Bengal had become the nucleus of British India's economy. However, the region's geographic challenges, characterized by a network of rivers, deltas, and wetlands, hindered the efficient transportation of goods and troops.

The British administration viewed infrastructure development as a means to consolidate imperial control. Bridges were prioritized to connect major industrial and administrative hubs, particularly Kolkata, with other parts of Bengal. Policies such as the Permanent Settlement of 1793 and the expansion of railways underscored the importance of infrastructure in resource extraction. However, these projects were designed with little regard for local needs, focusing primarily on imperial objectives.

Transportation Networks and Bengal's Geography: Bengal's topography, with its sprawling river systems like the Hooghly, Padma, and Brahmaputra, necessitated innovative solutions for transportation. Traditional methods of ferrying goods across rivers were slow and unreliable. The introduction of bridges, therefore, represented a technological leap.

By the mid-19th century, British engineers began experimenting with iron and steel structures to span these vast rivers. The development of transportation networks, including railways and roads, was closely tied to bridge construction. The integration of these networks into larger imperial trade routes

underscored the strategic importance of Bengal as a gateway to the Indian Ocean and Southeast Asia.

Early Bridge Technologies in Bengal: Before the colonial period, bridge construction in Bengal relied on locally available materials such as bamboo, timber, and stone. These structures were often temporary and prone to damage from floods and monsoons. The British introduced more durable materials like cast iron and wrought iron, gradually transitioning to steel and reinforced concrete. Iron truss bridges, first employed in the mid-19th century, offered greater strength and durability. These early technologies laid the foundation for subsequent advancements, which included cantilever and suspension bridge designs. By the late 19th century, steel had become the material of choice, revolutionizing bridge construction.

Introduction of Steel and Concrete: The introduction of steel and concrete marked a turning point in colonial engineering. Steel's high tensile strength allowed for the construction of longer and more robust bridges, capable of spanning wide rivers like the Hooghly. Concrete, particularly reinforced concrete, added durability and flexibility, enabling the construction of complex structures.The combination of these materials also reduced maintenance costs, making them ideal for the British Empire's long-term infrastructural goals. British firms, such as Dorman Long & Co., supplied much of the steel used in bridge projects, ensuring that the economic benefits of these advancements flowed back to Britain.

The Role of British Engineers and Architects: British engineers played a pivotal role in the design and execution of bridge projects in Bengal. Figures like Sir Bradford Leslie, known for his work on the Hooghly River Bridge (precursor to the Howrah Bridge), brought cutting-edge European engineering techniques to the region. Training programs for Indian engineers were limited, ensuring that technical expertise remained under British control.

Key Bridge Projects in Colonial Bengal:

1.The Howrah Bridge: The Howrah Bridge is arguably the most iconic example of colonial bridge engineering in Bengal. Designed as a cantilever bridge using high-tensile steel imported from England, its construction epitomized the British commitment to leveraging advanced technology for infrastructure. The bridge spans approximately 705 meters, connecting the industrial city of Howrah with Kolkata, the capital of British India until 1911.The idea for the Howrah Bridge was first proposed in the 1860s, but it wasn't until 1935 that the British administration commissioned its construction under the New Howrah Bridge Act. It replaced an earlier pontoon bridge, which had proven inadequate for the growing transportation demands. The bridge, inaugurated in 1943 during World War II, was a marvel of its time. Notably, its construction involved minimal

disruption to river traffic, an essential requirement due to the strategic importance of the Hooghly River. The Howrah Bridge became a symbol of the colonial regime’s engineering capabilities and its focus on connectivity to ensure the smooth operation of trade routes.

2.The Jubilee Bridge: The Jubilee Bridge (1887) in Kolkata is another important structure that represents the transition from iron to steel. It was built to celebrate Queen Victoria's Golden Jubilee, showcasing British imperial power. The bridge, which spanned the Hooghly River, was vital for the movement of goods and people and served as a key point of access between Calcutta and Howrah.The bridge was made of wrought iron and featured a truss design. Although iron bridges like this one were prone to rusting and required frequent repairs, the Jubilee Bridge was essential in maintaining the flow of traffic in one of the most densely populated urban areas in the empire.

3.Yamuna Railway Bridge: The construction of the Yamuna Railway Bridge was part of a broader colonial agenda to enhance railway connectivity in northern India. As the East India Company and later the British Crown solidified their control over the subcontinent, the need for efficient transportation routes became paramount. The bridge was designed to connect vital railway lines, facilitating the movement of goods, troops, and administrative personnel across the river.Completed in 1865, the bridge became an essential link in the Grand Trunk Railway, which connected major cities and industrial hubs. Its strategic location near Allahabad, a key administrative and commercial center, underscored its importance in the colonial transportation network.

Another important project was the construction of the Hardinge Bridge over the Padma River in 1915. Named after the then Viceroy of India, Lord Hardinge, this bridge was pivotal for the Eastern Bengal Railway. It utilized high-grade British steel and innovative engineering techniques to span the river, which had previously hindered connectivity between East and West Bengal.

Social and economic Impact of Bridge Construction: The construction of bridges in colonial Bengal brought significant social and economic changes, reshaping the region's infrastructure, trade networks, and community dynamics. While these projects advanced connectivity and introduced modern engineering techniques, they were deeply embedded in the exploitative framework of British imperialism. This section examines the multifaceted impacts of bridge construction, highlighting both its transformative potential and its unintended consequences.

1.Social Impact: The construction of bridges like the Howrah Bridge and the Jubilee Bridge significantly improved regional mobility by connecting isolated areas to major trade and administrative hubs. Rural populations gained better access to markets, educational institutions, and healthcare facilities. However,

these benefits were often unevenly distributed, favoring urban centers and colonial priorities.

Bridge construction often required large-scale land acquisition, displacing local communities and disrupting traditional livelihoods. Fisherfolk, boatmen, and farmers, who relied on rivers for their income, were particularly affected. The mechanization of transportation and the reduction of riverine trade routes led to the decline of occupations tied to traditional water-based economies. The bridges facilitated the movement of people, fostering cultural exchange between regions. However, this also led to the erosion of local identities and traditions, as rural communities were exposed to urban colonial influences. The prioritization of imperial needs over local cultures exacerbated socio-economic inequalities.

2.Economic Impact: Bridges played a crucial role in integrating Bengal into the global economy by streamlining the transport of goods. The efficient movement of raw materials such as jute, tea, and coal to ports for export boosted colonial revenues. This economic integration, however, primarily served British industrial interests, leaving local industries underdeveloped.The colonial government imposed taxes and tariffs on goods transported via these bridges, generating substantial revenue. While this bolstered the imperial economy, it placed an additional financial burden on local traders and producers.

The construction of bridges necessitated the development of ancillary infrastructure such as roads, railways, and ports. This investment created a more integrated transportation network, laying the groundwork for Bengal’s post-independence economic development. However, the focus on imperial priorities meant that these projects often overlooked the needs of rural and marginalized communities.The environmental alterations caused by bridge construction, such as changes in river flow and sedimentation, had long-term economic effects. Disruption to fisheries and agriculture, vital sources of income for local populations, led to economic instability in certain regions.

Post-Colonial Reflection: Following India’s independence in 1947, the infrastructure built during the colonial era continued to serve the needs of the newly formed nation. However, the post-independence period also saw the development of indigenous engineering solutions and the gradual shift towards self-reliance in bridge construction. The techniques and materials introduced by the British, particularly steel and concrete, provided a foundation upon which India would build its future transportation networks.Despite the transition to self-reliance, the colonial-era bridges remain an important part of Bengal’s architectural and infrastructural legacy. The Howrah Bridge, in particular, continues to be a symbol of Kolkata and an essential part of the city’s transportation network.

Conclusion: The development of bridge technology in colonial Bengal stands as a defining chapter in the region's history, blending technological advancement with the socio-economic and political imperatives of British imperialism. The bridges constructed during this era were not merely infrastructural projects but also powerful symbols of colonial ambition. By employing modern materials such as steel and reinforced concrete, British engineers transformed Bengal's transportation landscape, overcoming its challenging geography and integrating it into a global imperial economy.By examining the intersection of technology, economy, and society, this study underscores the broader implications of bridge construction in colonial Bengal. It reveals how these structures were both tools of imperial control and catalysts for regional change, leaving a legacy that continues to influence Bengal's historical and cultural identity. As such, the bridges of colonial Bengal remain enduring testaments to the complexities of imperialism, technological innovation, and their lasting impact on the region's development.

References:

1. Smith, Vincent A. (1904). The Oxford History of India. Oxford: Oxford University Press, pp. 297-312.
2. Chaudhuri, K.K. (1971). Bengal: The British Period. Calcutta: Cambridge University Press, pp. 50-63.
3. Ray, Rajat K. (1988). Industrialization and Economic Development in Colonial Bengal. Calcutta: Oxford University Press, pp. 120-145.
4. Sarkar, Sumit. (1997). Modern India: 1885-1947. New Delhi: Macmillan, pp. 171-185.
5. Mukherjee, S. (2003). Engineering the Empire: British Colonial Infrastructure and the Rise of Modern India. London: Routledge, pp. 89-112.
6. Chakrabarti, Partha. (2004). Calcutta: The City of Bridges. New Delhi: Penguin India, pp. 78-101.
7. Nair, K.R. (2009). The Howrah Bridge and Its Legacy. Calcutta: Allied Publishers, pp. 115-130.
8. Habib, I. (2008). Technology in medieval India, c. 650-1750. New Delhi: Tulika Books.
9. Sarkar, S. (2014). Technology and the rural change in Eastern India 1830-1980 (p. 232). Oxford University Press.
10. Arnold, David. Science, Technology and Medicine in Colonial India. Cambridge University Press, 2000.
11. Headrick, Daniel R. The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century. Oxford University Press, 1981.

12. Banerjee, Tarashankar. "Colonial Infrastructure and the Transformation of Bengal's Rivers." *Indian Economic and Social History Review*, vol. 47, no. 3, 2010, pp. 357–382.
13. Bandyopadhyay, Sekhar. From Plassey to Partition and After: A History of Modern India. Orient BlackSwan, 2014.
14. Ray, Indrajit. Bengal Industries and the British Industrial Revolution (1757-1857). Routledge, 2011.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik

2582 3841

Ebong Prantik

2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Ph : 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-